ইযাহুল মুসলিম

[মুসলিম জিল্‌দে সানীর অদ্বিতীয় বাংলা শরাহ্‌]

সংকলন

মাওলানা আবু বকর সিরাজী

(তাকমিলায়ে ফতহুল মুলহিম অবলম্বনে লিখিত)

সম্পাদনা ও সংযোজনা

মুফ্‌তী হিফজুর রহমান

প্রবীণ মুহাদ্দিস ও প্রধান মুফতী জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া,

মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

চতুর্থ মুদ্রণ ঃ নভেম্বর — ২০০৮
তৃতীয় মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি — ২০০৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ এপ্রিল — ২০০৭
প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই— ২০০৬

প্রকাশক ◗ শহীদুল ইসলাম, দারুল উলূম লাইব্রেরী, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড) ১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, মোবাইল ঃ ০১৯১৮-১৮৮০৮৫

স্বত্ব ◗ সংরক্ষিত, প্রচ্ছদ ◗ নাজমুল হায়দায় কম্পিউটার কম্পোজ ◗
এম. হক কম্পিউটার্স

মূল্য ঃ তিনশত ত্রিশ টাকা মাত্র

PRICE : TAKA THREE HUNDRED THIRTY ONLY

অর্পণ

মুহ্তারাম মাওলানা আব্দুল বারী (দা. বা.)

শ্রদ্ধেয় বড় ভাই ইসমাঈল

কে

লেখকের আরয

পরম করুণাময় আল্লাহ্ পাকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যিনি মানুষকে কলমের মাধ্যমে ভাব প্রকাশ ও ইল্‌ম প্রচার-প্রসারের সুযোগ করে দিয়েছেন। লক্ষ কোটি দরূদ ও সালাম পেশ করছি রাসূল (সা.)-এর রওজায়ে আতহারে, যিনি যে কোন মাধ্যমে ইলমের প্রচার-প্রসারকে আ'মালে জারিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। পুণ্যবান সেসব মহামানবগণের দরজা বুলন্দির কামনা করছি যাঁরা লিখনীর মাধ্যমে দুনিয়ার আনাচে-কানাচে ইলম পৌঁছিয়েছেন।

পাঠকমাত্রই জানেন, কুরআনের পর যে দু'টি গ্রন্থের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সবাই একমত সহীহ্ মুসলিম তার একটি। ইমাম মুসলিম (রহ.) এই গ্রন্থটিতে বিশাল হাদীস ভাণ্ডার থেকে শুধুমাত্র সহীহ্ হাদীস সংকলন করেছেন। এর সাথে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো কিতাবটিকে করেছে অতুলনীয়, অসাধারণ। এ কারণেই বিশ্বখ্যাত আলিমগণ যেমন ইমাম নববী, (ইন্তিকাল, ৬৭৬ হিঃ) ইমাম মাযরী (ইন্তিকাল, ৫৩৬ হিঃ), কাজী ইয়ায (ইন্তিকাল, ৫৪৪ হিঃ), আবুল আব্বাস কুরতবী (ইন্তিকাল ৬৫৬ হিঃ) ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ উব্বী (ইন্তিকাল ৮২৭ হিঃ), ইমাম সুয়ূতী (ইন্তিকাল, ৯১১ হিঃ), ইমাম কাস্‌তাল্লানী (ইন্তিকাল, ৯২৩ হিঃ), ইমাম মোল্লা আলী কারী (ইন্তিকাল, ১০১৪ হিঃ), শাহ্‌ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী, আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওসমানী প্রমুখ মনীষীগণ এর সার নির্যাস নিংড়ে পাঠকদের কাছে তুলে ধরেছেন। এর ধারাবাহিকতা আজও অক্ষুণ্ন আছে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জন নিজ নিজ ভাষায় বিশালাকারে কিংবা সংক্ষেপে অতি সংক্ষেপে এই কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখে যাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও লিখবেন।

মূলতঃ মাতৃভাষায় সংক্ষিপ্তাকারে মুসলিম সানীর একটি সরল ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রকাশ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষাই আমাকে এই গ্রন্থখানি সংকলনে উদ্বুদ্ধ করে। এরপর মুফতী আবুল হাসান শরীয়তপুরী সাহেব যখন এ কাজে সহযোগিতার আশ্বাস দেন তখন আকাঙ্ক্ষা আরো তীব্র হয়। শেষ পর্যন্ত এই কাজে হাত দেই এবং কিতাবের শুরুর দিকের আলোচনাগুলো এখানে স্থান দেই। এতে আল্লামা তাকী উসমানী (দা. বা.)-এর তাকমিলাতু ফাতহিল

মুলহিম এর সারাংশ তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে সহযোগিতা নিয়েছি বাংলাদেশ ও হিন্দুস্তান থেকে মুদ্রিত বিভিন্ন শরাহ-শুরূহাতের।

কিতাবটিকে মুফিদ করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় কিতাবের শেষে উলূমুল হাদীস সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেয়া হয়েছে। আশা করি পাঠকরা বিশেষ করে বেফাক পরীক্ষার্থীরা এতে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

আমার বিশ্বাস কাঁচা হাতের এই অযোগ্য লেখা পাঠকরা রীতিমত অস্বীকার করে বসতেন যদি না ঢাকার ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপিঠ জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়ার প্রধান মুফতী, সুযোগ্য মুহাদ্দিস ও বিশিষ্ট লিখক মুহ্তারাম মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেব (দা. বা.)-এর দক্ষ হাত সম্পাদনার অসি না চালাতেন।

পুস্তকটি বাজারের মুখ দেখে যাঁর বদান্যতায় তিনি সত্যিকার অর্থেই একজন উদ্দীপ্ত তরুণ আলিম। আল্লাহ্ তা'আলা এই তরুণ আলিম দারুল উলূম লাইব্রেরীর মালিক মাওলানা শহীদুল ইসলামের প্রতিভা ও প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং তাঁর প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করুন।

বলে রাখি, ক্ষুদ্র হলেও এই কিতাবটি প্রকাশ করা আমার জন্য সহজ ছিল না। এটা দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফল। এই দীর্ঘদিন যাঁরা আমাকে পথ দেখিয়েছেন, ইল্ম শিক্ষা দিয়েছেন তাঁদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

আমি কৃতজ্ঞ পিতামাতা ও বড় ভাই ও আমার আসাতিযায়ে কিরামের প্রতি তাঁরাই অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাকে এই রাস্তার পথিক বানিয়েছেন। পাঠকের দুয়ারে আমি উপস্থিত। আশা করি, তাঁরা আমার কাঁচা হাতকে পাকা করার সুযোগ দিবেন এবং কাঁচা বলে ছুঁড়ে ফেলবেন না। পাঠকদের বলে রাখি যদি কিতাবের কোথাও কোন প্রকার ভুল কিংবা অসঙ্গত কোন কিছু ধরা পড়ে তাহলে আমাদের জানালে আমরা কৃতজ্ঞ হব এবং পরবর্তীতে তা শুধরে নেব ইনশাআল্লাহ্। এতে যা কিছু ভালো তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আর যা মন্দ তার দায় দায়িত্ব আমি অধমের।

দু'আর মুহতাজ
মাওলানা আবু বকর সিরাজী
বওড়া, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ

জামিয়া রাহ্মানিয়া আরাবিয়া মুহাম্মাদপুর ঢাকা-এর প্রধান মুফতী সুযোগ্য মুহাদ্দিস ও বিশিষ্ট লিখক মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেব (দা. বা.)-এর বাণী ও দু'আ

الحمدلله رب العلمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمدالنبي الرسول الأمين ، وعلى أله وأصحابه أجمعين ، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . أمابعد .

'সহীহ্ মুসলিম' বিশুদ্ধ হাদীসের এক অনিঃশেষিত হাদীসভাণ্ডার। ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর সারাজীবন হাদীসের পিছনে ব্যয় করে কঠোর শ্রম, সাধনা, মেধা ও মেহনত খরচ করে উম্মতে মুসলিমার সামনে হাদীসের যে অমূল্য রত্নভাণ্ডার রেখে গেছেন এক কথায় তা অনন্য, অনবদ্য। বলা যায়, এর মাধ্যমে তিনি মুসলিম জাতিকে কৃতজ্ঞতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে গেছেন। সত্যিকার অর্থে মুসলিম জাতি কোনদিন তাঁর ঋণ শোধ করতে পারবে না। কেননা, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম, যা তিনি কেয়ামত পর্যন্ত সম্পূর্ণ অবিকৃত রাখবেন। আর এর পিছনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছেন উম্মতের মুজতাহিদ ও বিশুদ্ধ হাদীস সংকলক মুহাদ্দিসগণ। আর এই শ্রেণীর মধ্যে ইমাম মুসলিম (রহ.) একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব। তাঁর কংকলিত 'সহীহ্ মুসলিম' শুধু একটি হাদীসের কিতাবই নয় বরং ফকীহ্-আলিম, সুফি-সাধক, জ্ঞানী-গবেষক, সাহিত্যিক ও আইনবিদ প্রতিটি মানুষের প্রাণের খোরাক এটি। আমার দীর্ঘ অধ্যাপনার জীবনে এই বাস্তবতা নির্ভুলভাবে অনুভূত হয়েছে। আমার এই বক্তব্যের যথার্থতা খুঁজে পাওয়া যাবে সহীহ্ মুসলিমের শরাহ-ব্যাখ্যাগ্রন্থের দীর্ঘ ফিরিস্তি দেখলে। হিজরী তৃতীয় শতকের মাঝামাঝি সময়ে সংকলন হওয়ার পর অধ্যাবধি জ্ঞানতাপসরা এর কত ধরনের ব্যাখ্য ও শরাহ গ্রন্থ লিখেছেন তার হিসেবে আছে? কাশফুয যুনূন, ইযাহুল মাকনূন, হাদিয়্যাতুল আরেফীন প্রভৃতি কিতাবে শরাহ শুরূহাতের যে তালিকা দেয়া হয়েছে এর বাইরে যে আরো শরাহ-শুরূহাত নেই তা হলফ করে বলা যায় না।

যা হোক, আমি বলছিলাম সহীহ্ মুসলিম নিয়ে গবেষণার ধারাবাহিকতা আগেও যেমন ছিল এখনও তেমনই অক্ষুণ্ন আছে। আমার ধারণা দারুল উলূম দেওবন্দের কল্যাণে এই ধরা বর্তমানে ভারত উপমহাদেশে বেশি

সক্রিয়। বাংলাদেশেও এই প্রক্রিয়া দ্বীপ্তমান। তবে বাস্তব অভিজ্ঞতা হলো গবেষণার বস্তুকে নিজের মত করে নেয়া এবং নিজেকে গবেষণার বস্তুর মত করে বানিয়ে নেয়া ছাড়া এই প্রক্রিয়ায় সফলতার সম্ভাবনা কম। আর এর জন্য প্রয়োজন কোন বিষয়কে মাতৃভাষায় হৃদয়াঙ্গম করা। আমার দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনের অর্জিত অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে, ছাত্ররা মাতৃভাষায় একটি বিষয় যত স্বাচ্ছন্দ্যে হৃদয়াঙ্গম করতে পারে অন্যকোন ভাষায় তেমন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। অবশ্য যে দু'একজন আরবী বা অন্য কোন ভাষাকে মাতৃভাষার মত করে নিয়েছে তাদের কথা ভিন্ন, তাদের প্রতি আমার মোবারকবাদ।

সম্ভবতঃ এই দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়েই তরুণ আলিম স্নেহভাজন মাওলানা আবূ বকর সিরাজী ইযাহুল মুসলিম নামে 'মুসলিম জিল্‌দে সানীর' সংক্ষিপ্ত একটি বাংলা ব্যাখ্যাগ্রন্থ সংকলন করেন। كتاب البيوع। সহ অন্যান্য কতক জটিল মাসআলার আলোচনা মাতৃভাষা বাংলায় সংকলিত হওয়ায় আমি আনন্দিত হই কিন্তু সেই আনন্দ নিমিষেই হাওয়ায় মিশে যায় যখন দারুল উলূম লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী আমার আরেক স্নেহভাজন উদ্দীপ্ত তরুণ মাওলানা শহীদুল ইসলাম কিতাবটি সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব আমার কাঁধে চাপিয়ে দেয়। শত ব্যস্ততার মাঝে একাজ যে সম্ভব নয় তাঁকে সেটা বোঝানোই গেল না! শেষ পর্যন্ত স্নেহের দাবি প্রবল হয়ে ওঠে এবং তাঁর পীড়াপীড়িতে সম্পাদনার কাজে হাত দেই। কাজ শুরু করে লিখক সম্পর্কে আমার আস্থা আরো গাঢ় হতে থাকে।

আলহামদুলিল্লাহ! লিখকের সাবলীল উপস্থাপনা, ভাষার মাধুর্যতা প্রশংসার দাবিদার। আসলে মাতৃভাষাভাষীদের সামনে ইসলামের মাহাত্ম্য যারা তুলে ধরতে চান, ইসলাম বিদ্বেষী লিখার বিরুদ্ধে যারা কলম ধরার সাহস দেখাতে চান এবং এর জন্য যা যা প্রয়োজন আমার বিশ্বাস তরুণ এই লিখকের মধ্যে আস্তে আস্তে সেই গুণাবলীর বিকাশ ঘটছে। বিভিন্ন ইসলামী পত্র-পত্রিকায় তার লিখা প্রবন্ধ ও নিবন্ধ এই সম্ভাবনার পথ উজ্জ্বল করছে। এসব প্রমাণ করে এই তরুণের লিখার হাত কাঁচা হলেও একেবারে ফেলনার নয়। পাঠক মহলের উৎসাহ-উদ্দীপনা এসব তরুণদের চলার পথকে সংকটমুক্ত করবে, করবে মসৃণ। আমাদের অবহেলায় যেন এসব তরুণরা ধূমকেতুর ন্যায়

হঠাৎ উদয় আবার নিমিষেই উধাও না হয়ে যায়, এ ব্যাপারে আমাদের খেয়াল রাখা জরুরী।

সে যাই হোক, শত ব্যস্ততার মাঝে কাজ চালিয়ে যাই এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন, পরিমার্জন করি। কিতাবটিকে বিন্যাস করা হয়েছে শাইখুল ইসলাম ওস্তাদ মুহ্তারাম আল্লামা তাকী উসমানী (দা. বা.) সংকলিত تكملة فتح الملهم-এর ধারা অনুযায়ী। বলা যায় এটা তাকমিলারই অনুবাদ গ্রন্থ। আমার বিশ্বাস এটা পাঠকদের আস্থা ও অনুরাগের কারণ হবে। সাধারণ পাঠকদের সাথে বেফাক পরীক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে এর শেষের দিকে উলূমুল হাদীসের কিছু তথ্য পেশ করা হয়েছে যা পরীক্ষার্থীদের অনেক কাজে দিবে বলে আশা রাখি। সেই সাথে কিতাবের শুরুতে ইসলামী অর্থনীতির পরিচয় ও পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের সাথে এর তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্য আল্লামা তাকী উসমানীর كتاب البيوع-এর হুবহু অনুবাদ তুলে ধরা হয়েছে। এ সবই আমাদের নিরন্তন প্রয়াস যার মাধ্যমে আমরা পাঠকের কাছাকাছি আসতে চেয়েছি। কতটুকু সফল হয়েছি সেই বিচারের দায়িত্ব সম্মানিত পাঠক মহলের। আমাদের কাজ ছিল চেষ্টা করার সেটা করেছি। আমরা জানি একমাত্র কালামুল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু নির্ভুল নয় আর এটাও জানি গঠনমূলক সমালোচনা সবসময় কল্যাণ বয়ে আনে। তাই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়বে সম্মানিত পাঠক সেটাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং শোধরানোর ব্যবস্থা করবেন। পাঠকদের কাছে আমাদের এই ক্ষুদ্র দাবি বাহুল্য বলে মনে করি না।

বিনয়াবত
মুফতী হিফজুর রহমান

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

পরিশিষ্ট

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

পেশ কালাম

অধিকাংশ ফেকাহ ও হাদীস শাস্ত্রের লিখকদের একটি সাধারণ রীতি হলো, كتاب البيوع-এর (বিক্রয় সংক্রান্ত আলোচনা)-কে كتاب النكاح، كتاب الطلاق-এর পরে উল্লেখ করা। এর কারণ হলো, তাঁরা সর্বপ্রথম আলোচনা শুরু করেন মৌলিক ইবাদত (নিখাঁদ ইবাদত) দ্বারা। যেমন, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত ইত্যাদি। এরপরে যেসব বিষয়কে আলোচনায় স্থান দেন যা ইবাদত ও লেনদেন সংশ্লিষ্ট। যেমন বিবাহ। তৃতীয় পর্যায়ে এসে সেসব বিষয়কে আলোচনায় স্থান দেন যে নিখাঁদ লেনদেন। আর লেনদেনের বিষয়াদির মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে كتاب البيوع-কে তৃতীয় স্তরে আলোচনায় স্থান দেয়া হয়।

সুতরাং كتاب البيوع-এর আলোচনার সূত্র ধরে আমরা দ্বীনের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিষয় معاملات তথা পারস্পরিক লেনদেনের আইন-কানুন সংক্রান্ত আলোচনায় লিপ্ত হতে চাই। তবে মূল আলোচনার পূর্বে অতি সংক্ষিপ্তাকারে ইসলামী অর্থনীতির দু'চারটি মৌলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই। যেগুলো ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তি। কেননা এ সম্পর্কে উদাসীনতার কারণে মানুষ মারাত্মক ভুল করে বসে। বিশেষ করে আমাদের এই যুগে যেখানে জীবিকা আর অর্থনীতিকে মানুষ নিজেদের জীবনের প্রধান ও মূল লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছে। আর এ কারণেই অর্থনীতির বিষয়টি আজ রীতিমত গবেষণার বিষয় এবং পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রী বোদ্ধাদের চিন্তার যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

১। ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থনীতি

জীবিকা উপার্জন ও অর্থনীতির নানা দিক নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে সূক্ষ্ম একটি বিষয় আলোচনায় আসা দরকার। যার দ্বারা ইসলামী অর্থনীতি এবং বিশ্ব ব্যবস্থায় প্রচলিত অন্যান্য অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

আর সেটা হলো, ইসলাম যদিও বৈরাগ্যতাকে সমর্থন করে না এবং একে পরিত্যাগ করাতেই রয়েছে বৈষয়িক সুবিধা এবং বৈধ অর্থনীতিতে মুসলমানের উদ্যোমকে ইসলাম শুধু উত্তমই নয় কোন কোন ক্ষেত্রে জরুরী সাব্যস্ত করেছে। কিন্তু ইসলাম অর্থনৈতিক উন্নতি অগ্রগতিকে মানব জীবনের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানিয়ে নেয়াকে সমর্থন করে না। এখান থেকেই ইসলামী অর্থনীতি এবং বস্তুবাদী অর্থনীতির মধ্যকার মৌলিক পার্থক্য ধরা পড়ে। আর তা হলো বস্তুবাদী

অর্থনীতি জীবিকা উপার্জনকে মানুষের প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলে মনে করে। তাদের ধারণা মতে ইহজীবনে মানুষের প্রধান কর্তব্য হলো বিলাসিতা এবং ধন-ঐশ্বর্যের পিছনে মগ্ন থাকা। এর বাইরে আর কোন কর্তব্য নেই।

ইসলামী অর্থনীতি মানুষের জীবিকা ও রুটি-রোজগার উপার্জনের বিষয়টি অবশ্যই স্বীকার করে। কিন্তু এটাকে জীবনের প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য এবং ব্রত বানিয়ে নেয়াকে কস্মিনকালেও সমর্থন করে না। এ কারণেই আপনি লক্ষ্য করতে পারবেন যে, একদিকে যেমন বৈরাগ্য ও দুনিয়া বিমুখতাকে কুরআন নিন্দা করেছে অপরদিকে আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহরাজী তালাশের আদেশ দেয়া হচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্যকে আল্লাহর ফজল বা অনুগ্রহ এবং ধন-সম্পদকে "আল খাইর" বা কল্যাণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, খাদ্যকে আখ্যায়িত করা হয়েছে اَلطَّيِّبَاتُ مِنَ الرِّزْقِ "পবিত্র খাবার", পোশাককে "আল্লাহ্ প্রদত্ত সৌন্দর্য" এবং বসবাসের জায়গাকে "প্রশান্তির জায়গা" হিসেবে। কিন্তু এত কিছুর পরও আপনি অবাক না হয়ে পারবেন না যে, এই দুনিয়া বা ইহকালকেই অন্য জায়গায় مَتَاعُ الْغُرُوْرِ বা ধোঁকার বস্তু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে আদৌ কোন সংঘর্ষ বা বৈপরীত্য নেই। এর প্রধান রহস্য হলো, পরম গন্তব্যে পৌঁছতে সফরের উপায় উপকরণকে একজন মুসাফির যে দৃষ্টিতে দেখে ঠিক জীবিকা উপার্জন ও দুনিয়ার আসবাবপত্রকে কুরআন সেই দৃষ্টিতেই দেখে থাকে।

এটাই ঈমান ও চারিত্রিক উৎকর্ষতার লক্ষণ যার দ্বারা মানুষ তার প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জন এবং প্রকৃত গন্তব্যে পৌঁছতে সক্ষম। একমাত্র এই পথেই মানুষ তার প্রকৃত সফলতা ও পরকালের বাধা উত্তরণে সক্ষম হতে পারে। কথা শুধু এতটুকু যে, অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে তাকে সাময়িক সময় জাগতিক পথে পা মাড়াতে হবে এবং কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে নির্বিঘ্নে পৌঁছতে অতি প্রয়োজনীয় দুনিয়ার কিছু বস্তু অর্জন করতে হবে। মানুষ যখন নিজেকে এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত করতে পারবে তখন সে জাগতিক বস্তুকে একটি ব্রীজ বা সেতুর মতো ভাবতে পারবে যার সাহায্যে মানুষ ওপারে তার আসল ঠিকানায় পৌঁছে যায়। আর যেসব মানুষের মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি হয়েছে তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে জীবিকা তাদের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ। খাবার 'আল খাইর' পোশাক 'আল্লাহ্ প্রদত্ত সৌন্দর্য' এবং বাসস্থান 'প্রশান্তি'। পক্ষান্তরে যেসব মানুষ মাঝপথে হারিয়ে যায়, ভুলে যায় তার গন্তব্যের কথা, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী চাকচিক্যকে জীবনের

মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানিয়ে নেয় সমস্ত চিন্তা-চেতনাকে এর পিছনে ব্যয় করে তখন এই "অনুগ্রহ", "কল্যাণ" আর "আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রশান্তি" তার জন্য متاع الغرور। বা ধোঁকার বস্তু ফিতনা এবং দুশমনে পরিণত হয়ে যায়। আল্লাহ্ পাক কুরআনের এক আয়াতে এ বিষয়টিই পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন। এই ভাষায়—

وَابْتَغِ فِيْمَا اٰتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَالْاٰخِرَةَ وَلَاتَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ـ

আল্লাহ্ তোমাকে যা দান করেছেন, তদ্দ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভুলে যেও না। -সূরা কাসাস ঃ আয়াত ৭৭

২। সম্পদ ও মালিকানার হাকীকত বা বাস্তবতা

ইসলামী অর্থনীতির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো 'সম্পদ' যে প্রকারের হোক না কেন প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহর সৃষ্টি এবং আল্লাহই এর মূল মালিক। সাময়িক সময়ের জন্য মানুষ কর্তৃক এর মালিকানা লাভ করাটা আল্লাহর দান মাত্র। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন—وَاٰتُوْهُمْ مِنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْ اٰتَاكُمْ "তোমরা তাদেরকে 'আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ' থেকে কিছু দান করো।"

কুরআনের অন্য জায়গায়ও এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর কারণ হলো মানুষ কোন কিছুই পয়দা করতে পারে না। সে পারে শুধু নিজের শ্রমটুকু ব্যয় করতে। এর বাইরে তো কিছু নয়। তার সমস্ত শ্রম ও প্রচেষ্টার ফল নির্ভর করে আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর। কেননা, আমরা দেখি একজন কৃষক মাঠে শুধুমাত্র বীজটা বপন করে। কিন্তু এ থেকে ফসল উৎপাদন এবং এর প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধের কোন শক্তিই তার নেই। ক্ষুদ্র একটি বীজ থেকে চারা, চারা থেকে কিশলয়, এরপর গাছ, গাছ থেকে ফল-এসব আল্লাহ্র কুদরত ছাড়া অন্যকারো পক্ষে সম্ভব? আল্লাহ্ পাক বলেন—

اَفَرَاَيْتُمْ مَاتَحْرُثُوْنَ ؟ ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُوْنَ ـ

তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা তাকে উৎপন্ন কর না আমি উৎপনকারী? সূরা ওয়াকি'আ, আয়াত ৬৩-৬৪

অন্যত্র ইরশাদ করেন—

أَوَلَمْ يَرَوْ أَنَّا خَلَقْنَالَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُوْنَ ـ

তারা কি দেখে না, তাদের জন্য আমি আমার নিজ হাতের তৈরী বস্তুর দ্বারা চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তারাই এগুলোর মালিক।

উল্লেখিত এসব আয়াতে সম্পদ ও এর মালিকানা সত্ত্বেও বাস্তব অবস্থার প্রকৃত রূপ তুলে ধরা হয়েছে। আর তা হলো, যে নামেই হোক, যে আকৃতিতেই হোক দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদের মালিক মহান আল্লাহ্। তিনিই মানুষকে রিযিক দেন, তিনিই তাদের সকল বস্তুর ব্যবস্থা করে দেন।

সুতরাং আল্লাহ্ই যেহেতু এসব বস্তুর মালিক, অতএব মানুষ একে শরীয়ত সম্মত পন্থায় ব্যয় করতে বাধ্য। মনগড়া পথে ব্যয় করার অধিকার মানুষের নেই। বরং সম্পদ ব্যয় করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্র নির্দেশের সামনে সে মাথা নোয়াতে বাধ্য। মানুষ সম্পদ লাভ করতে পারে কিন্তু ভোগ কিংবা ব্যয়ের ব্যাপারে সে স্বাধীন নয়, বরং আল্লাহ্ প্রদত্ত পথে সে ব্যয় করতে বাধ্য। তার অপরিহার্য দায়িত্ব হলো, আল্লাহ্ যেখানে সম্পদ ব্যয় করার আদেশ দিয়েছেন সেখানে ব্যয় করা এবং যেখানে ব্যয় করতে নিষেধ করেছেন সেখানে ব্যয় করা থেকে বিরত থাকা। আল্লাহ্ পাক বলেন—

وَابْتَغِ فِيْمَا اٰتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ـ

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ـ

আল্লাহ্ তোমাকে যা দান করেছেন, তদ্দ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না এবং মানুষের প্রতি ইহসান কর আল্লাহ্ যেমন তোমার প্রতি ইহসান করেছেন আর জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না।

এ সকল আয়াত মালিকানার ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছে। এ থেকে নিম্নোক্ত বিধান জানা যায়।

১। মানুষের হাতে যত সম্পদ আছে এর সবকিছুর মালিক স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা।

২। সম্পদ ব্যয় করার সময় কেউ যেন তার প্রধান উদ্দেশ্য আখেরাতকে ভুলে না যায়।

৩। সকল সম্পদ যেহেতু আল্লাহ্র দান সেহেতু সম্পদকে আল্লাহ্র নির্দেশ মত ব্যয় করতে হবে। ব্যয় করার ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

(ক) আল্লাহ্ পাক ধনাঢ্যদেরকে অসহায়দের প্রতি দয়ার্দ ও সহমর্মী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সম্পদের একটি অংশ তাদের পিছনে ব্যয় করা অপরিহার্য

কর্তব্য। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি যেমন ইহসান করেছেন তারও অন্যের প্রতি ইহসান করা জরুরী।

(খ) যেসব সম্পদ খরচ করতে নিষেধ করা হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে খরচ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা, মানুষকে সামগ্রিক অকল্যাণ বা দুনিয়ায় ফাসাদ সৃষ্টি হয় এ ধরনের ক্ষেত্রে সম্পদ খরচ করার অনুমতি দেয়া হয়নি। আর এটাই হলো মালিকানা সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি যার দ্বারা সমাজতন্ত্রী ও পুঁজিবাদী মালিকানার মধ্যে পার্থক্য নির্ণিত হয়। আর এটা জানা কথা যে, পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার মূল হলো বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনা। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মানুষ সম্পদ খরচ করার ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারী মনোভাব পোষণ করে। তার ধারণা এর মধ্যে অন্য কারো অধিকার নেই এবং তার সম্পদ যেভাবে মনে চায় সেভাবে খরচ করবে! কুরআনে এ ধরনের স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। হযরত শোআইব (আঃ)-এর কওম এ ধরনের মনোভাব পোষণ করত বলে তাদের কথা কুরআনে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—

أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ.

"তারা বলল, হে শোআইব (আ.)! আপনার নামায কি আপনাকে এটাই শিক্ষা দেয় যে, আমরা ঐসব উপাস্যকে পরিত্যাগ করব আমাদের বাপ-দাদারা যাদের উপাসনা করত? অথবা আমাদের ধন-সম্পদে ইচ্ছামত যা কিছু করে থাকি তা ছেড়ে দিব? —সূরা হূদ, আয়াত ৮৭

শোআইব (আ.)-এর কওম সম্পদের ব্যাপরে যে ধরনের মনোভাব পোষণ করত আজকের পুঁজিপতিদের মনোভাবও ঠিক সেরূপ। মানুষের এই স্বেচ্ছাচারী মনোভাবকে অগ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করে বলা হয়েছে— المال مال الله "সবকিছুর প্রকৃত মালিক আল্লাহ্!"

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে— الذى اتاكم "যিনি তোমাদের দান করেছেন।" এই আয়াত দ্বারা পুঁজিবাদের সাথে সাথে সমাজতন্ত্রীদের মতকেও খণ্ডন করা হয়েছে যারা কোন অবস্থাতেই ব্যক্তি মালিকানার অস্তিত্ব স্বীকার করে না।

এ পর্যায়ে আমাদের কর্তব্য হলো, ইসলামী অর্থনীতির সাথে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রী মতবাদের মধ্যে পার্থক্য কি তা উপস্থাপন করা এবং প্রত্যেকটা সম্পর্কে আলাদাভাবে আলোচনা করা।

পুঁজিবাদ ঃ শুধু ব্যক্তি মালিকানা স্বীকারই করে না বরং মনে করে ব্যক্তি তার মালিকানার ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। সম্পদের ব্যাপারে সে পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী।

সমাজতন্ত্র ঃ এতে ব্যক্তি মালিকার সুযোগ নেই। কেউ কোন অবস্থাতেই সম্পদের মালিক হতে পারে না।

ইসলাম ঃ ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করে। কিন্তু মালিক সম্পদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। সে সম্পদকে এমন ক্ষেত্রে ব্যবহার করার অধিকার রাখে না যাতে সমাজ ও দশের ক্ষতি হয়।

আধুনিক অর্থনীতি ব্যবস্থার সাথে ইসলামের সম্পর্ক

মৌলিক এই দুটি ভূমিকা উল্লেখ করে ইসলাম ও প্রচলিত অর্থনীতি ব্যবস্থার মধ্যকার পার্থক্যের কিছু নমুনা তুলে ধরতে চাই। এই অর্থনীতি ব্যবস্থার বুনিয়াদ এবং ইসলামের দৃষ্টিতে সেটার ত্রুটির দিকগুলো আলোচনা করতে চাই।

অর্থনীতি ব্যবস্থার সার-সংক্ষেপ

যে কোন অর্থনীতি ব্যবস্থায় মোট চারটি বিষয় প্রাধান্য পায়। অর্থনীতির পরিভাষায় এগুলোকে مسئلة استخدام الوسائل، مسئلة الترجيحات، مسئلة توزيع الثروة، مسئلة الازدهار এবং বলা হয়।

مسئلة الترجيحات-এর অর্থ হলো ঃ সমাজের প্রয়োজন ও অবস্থা বুঝে ফসলাদী উৎপন্নের বিষয়টাকে প্রাধান্য দেয়া। কেননা প্রতিটি রাষ্ট্রে যেসব আবাদী ভূমি থাকে সেগুলো একেক অংশ একেক ফসল উৎপাদনের উপযোগী হয়ে থাকে। সুতরাং প্রতিটি রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে একেক ফসল একেক এলাকায় উৎপাদনের ব্যবস্থা করা। এতে করে একটি রাষ্ট্রের পুরো ভূমি যথার্থভাবে কাজে আসবে এবং সে দেশের কল-কারখানাও সচল থাকবে। কেননা, দেখা যায় একটি দেশে ধান ও গম উভয়টা উৎপাদিত হয়, কফি এবং তামাকও উৎপাদিত হয়। সুতরাং কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হলো, এগুলোর মধ্যে সেটাকে বেশি গুরুত্ব দেয়া যা দেশ ও সমাজের জন্য বেশি লাভজনক ও উপকারী।

আর استخدام الوسائل-এর অর্থ হলো, কাঙ্ক্ষিত ফসল লাভের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ বন্টন করা। অর্থনীতিতে সাফল্য কামনাকারী প্রতিটি রাষ্ট্রে এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী এবং বিভিন্ন রকম ফসলের মধ্যে যেটি দেশ ও দশের বেশি প্রয়োজনীয় সেটার জন্য আলাদা নজর রাখা ও এর জন্য অধিক উপকরণ সরবরাহ করা উচিত। এর জন্য আগেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, কি পরিমাণ ভূমি গম চাষের জন্য, কি পরিমাণ ধান কিংবা আখ চাষের জন্য বরাদ্দ করা হবে তা ঠিক করা। সেই সাথে রাষ্ট্রের কি পরিমাণ কল-কারখানা

কাপড় তৈরির জন্য, কি পরিমাণ চিনি বা ঔষধ ইত্যাদি তৈরির জন্য বরাদ্দ করা হবে তাও নির্ধারণ করা। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, নির্ধারণের মাপকাঠি যেন মানুষের প্রয়োজন ও হাজতের ভিত্তিতে হয়। অন্যথায় অপ্রয়োজনীয় ফসল উৎপাদনের পিছনে দেশের মূল্যবান উপায় উপকরণ খরচ হতে থাকবে।

এবার আসা যাক توزيع الثروة-এর আলোচনায়। এটা হলো মূলত প্রাকৃতিক উপায় উপকরণ সরবরাহকরার পর যে সম্পদ হস্তগত হয় তা দেশের জনগণের মধ্যে সরবরাহ করা এবং এর মাপকাঠি কি হবে তা নির্ণয় করা।

চতুর্থ পর্যায়ে আসে مسئلة الازدهار বা উন্নয়নের বিষয়টি। এ কথার ব্যাখ্যা হলো, সমাজের প্রতি সদস্য চায় তার কাজকে নির্দিষ্ট একটি গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না রাখা। বরং প্রত্যেকেই তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে উন্নতি-অগ্রগতি কামনা করে। আর এটাই করা উচিত। তাহলেই কেবলমাত্র শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রে উপকারী ও লাভজনক বিভিন্ন বস্তু আবিষ্কার ও উৎপাদিত হবে। সুতরাং প্রতিটি রাষ্ট্রে একদল আলাদা সদস্য থাকা দরকার যারা সর্বদা এই বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবে এবং নিত্যনতুন বস্তু আবিষ্কারের জন্য তৎপর থাকবে।

এই হলো প্রতিটি অর্থনীতির মৌলিক চারটি উপাদান। তবে কার্যকরের ক্ষেত্রে একেক জনের একেক রকমের মত ও চিন্তাধারা রয়েছে। সামনে আমরা অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এসব উপাদান নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ্।

পুঁজিবাদী দর্শন

পুঁজিবাদী দর্শন হলো, অর্থনীতির ভিত্তি ঠিক রাখার একমাত্র পন্থা প্রত্যেককে সম্পদ উপার্জন ও মালিকানার ব্যাপারে "উন্মুক্ত স্বাধীনতা" প্রদান করা। যাতে করে সে প্রত্যেকেই নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করে সম্পদ সংগ্রহে মত্ত হতে পারে। যখন এ ধরনের স্বাধীনতা প্রদান করা হবে কেবলমাত্র তখনই অর্থনীতির উপরোক্ত চারটি উপাদান সহজভাবে সমাধা হবে এবং বড় ধরনের অর্থনৈতিক সফলতা দেখা যাবে।

পুঁজিপতিদের কথা মতে ব্যাপারটা এমন। এখানে দু'টি বিষয় রয়েছে, যার ওপর অর্থনৈতিক ভিত্তি নির্ভরশীল। বিষয় দু'টি হলো, এক. যোগান, দুই. চাহিদা। যোগানের অর্থ হলো, বিক্রেতা কর্তৃক পণ্য সামগ্রিকে বাজারে পেশ করা, আর চাহিদার অর্থ হলো ক্রেতা কর্তৃক সেই পণ্য ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বাজারে

হাজির হওয়া। বর্তমান প্রচলিত অর্থব্যবস্থার প্রচলিত একটি মতবাদ এই যে, বাজারে পণ্যের যোগান যত কম হবে এর চাহিদা ও মূল্য ততই বৃদ্ধি পাবে। পক্ষান্তরে পণ্যের যোগান যত বেশি হবে পণ্যের মূল্য ততই কমতে থাকবে। যেমন বাজারে যদি কাপড় থাকে এক হাজার পিস আর এর ক্রেতা থাকে সাতশজন তাহলে স্বীকৃত কথা যে, এক্ষেত্রে কাপড়ের মূল্য কমে যাবে। পক্ষান্তরে সাতশত কাপড়ের মোকাবেলায় যদি ক্রেতা হয় একহাজার তাহলে এক্ষেত্রে কাপড়ের মূল্য অনেকে বেড়ে যাবে। এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। সুতরাং পুঁজিবাদীদের মতবাদ অনুযায়ী ব্যক্তিকে যদি সম্পদ অর্জনের ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয় তাহলে সে এ ব্যপারে চরম স্বেচ্ছাচারী হয়ে যাবে এবং পণ্যসামগ্রী আটকে দিয়ে মূল্য বৃদ্ধির অপেক্ষায় বসে থাকবে। কেননা তার মাথায় এই চিন্তা কাজ করবে যে, যদি বাজারে পণ্যসামগ্রী উপস্থিত করা হয় তাহলে মানুষের প্রয়োজন মিটে যাওয়ায় মূল্য স্থিতিশীল থাকবে এবং এতে লাভ কমে যাবে।

এ কারণেই প্রত্যেক ব্যক্তি যদি জীবিকা উপার্জন বা ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজন মেটানোর ব্যাপারে বাধ্যগত হয় তাহলে তার দ্বারা অন্যরা লাভবান হতে পারবে এবং সে অন্যদের কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকবে। আর এটাই প্রাকৃতিকভাবে যোগান ও চাহিদা ব্যবস্থার সবচেয়ে শক্তিশালী পন্থা।

পুঁজিবাদীরা এক্ষেত্রে এসে বলে এই দু'টি শক্তি (যোগান ও চাহিদা) পুরো অর্থনীতি ব্যবস্থাকে সচল করে রাখে! এর দ্বারাই অর্থ অর্থনীতির চারটি উপাদানের প্রথম দু'টি উপাদান (مسئلة الترجيحات এবং استخدام الوسائل)-এর সুষ্ঠু সমাধান হয়। যখন উৎপাদনের বিষয়টি সামনে আসবে তখন লোকটি যদি পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয় তাহলে এক্ষেত্রে যাতে বেশি লাভবান হওয়া যাবে সেটাকে সে প্রাধান্য দিতে সক্ষম হবে এবং সে সেসব বস্তুর উৎপাদনের প্রতি বেশি মনোনিবেশ করবে যার চাহিদা বেশি এবং বাজারে এর প্রয়োজনীয়তাও সমধিক।

এমনিভাবে যখন استخدام الوسائل-এর বিষয় সামনে আসবে তখন প্রতিটি লোক সেসব উৎপাদনের পেছনে নিজের শিল্প উপকরণ বিনিয়োগ করবে যাতে তার সঠিক মুনাফার সম্ভাবনা বিদ্যমান। আর কোন বস্তু ততক্ষণ পর্যন্ত বেশি লাভবানের কারণ হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ জিনিসের চাহিদা বেশি না হয়। এমনিভাবে কোন বস্তুর ততক্ষণ পর্যন্ত চাহিদা বাড়ে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এ

বস্তুর প্রতি মানুষের হাজত সৃষ্টি না হয়। এতে এই অবস্থা হবে যে, মনে করুন কোন কোম্পানী চাহিদা বুঝে জুতা তৈরি করে। কিন্তু কোন সময় জুতার মূল্য কমে যাওয়ার তো যে কোন কারণেই হোক) সম্ভব রয়েছে। যদি ঘটনা তাই হয় তাহলে কিছু উৎপাদনকারী উৎপাদন করা থেকে বিরত থাকবে। আর এ কারণে বাজারে পণ্য সংকটের কারণে স্বাভাবিকভাবেই মূল্য বেড়ে যাবে কয়েক গুণ। এতে করে ঐ কোম্পানীগুলো তো পুনরায় চালু হবেই নতুন কোন কোম্পানী চালু হওয়াও বিচিত্র কিছু নয়।

সুতরাং উচিত হলো, বাজারের চাহিদা অনুযায়ী জুতা সরবরাহ করা। তাহলেই কেবল বাজার স্থিতিশীল থাকবে।

توزيع الثروة-এর ব্যাপারে পুঁজিবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো এটাকেও যোগান ও চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কেননা উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ মিলেই কেবল মাত্র সম্পদের (বা ফসলের) মালিক হওয়া যায়। যেমন, ভূমি, অর্থ, পরিশ্রম এবং বিনিয়োগকারী। সুতরাং ভূমি কেরায়া পাওয়ার যোগ্য। মাল (অর্থ) বর্ধিত অংশ পাওয়ার যোগ্য। শ্রম মুজরী পাওয়ার যোগ্য এবং বিনিয়োগকারী মুনাফা লাভের যোগ্য। তবে উল্লেখিত এই চারটি বস্তুর পরিমাণ নির্ধারিত হবে চাহিদা এবং যোগানের ভিত্তিতে। কেননা যদি ভূমির চাহিদা বেশি থাকে তাহলে কেরায়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে আর চাহিদা কম থাকলে পরিমাণ হ্রাস পাবে। বাকি তিনটির ক্ষেত্রেও হুবহু একই কথা প্রযোজ্য। ঠিক এভাবেই 'চাহিদা' এবং 'যোগান' সম্পদ বণ্টন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

مسئلة ازدهار বা উন্নয়নের বিষয়টিও ঠিক এমন। এর কারণ হলো মানুষ যখন ইচ্ছেমত মুনাফা ও সম্পদ লাভের ব্যাপারে স্বাধীন হবে তখন সে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি, আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম উদ্ভাবনের চেষ্টা করবে। যাতে করে এর প্রতি মানুষের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং মূল্য বাড়ে। আর এ পদ্ধতিতে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে (উন্নয়নের পথে) অগ্রসর হওয়া সম্ভব। এই হলো মোটামুটি পুঁজিবাদী অর্থনীতি দর্শনের কিঞ্চিত নমুনা। অবশ্য তাদের অর্থনীতি দর্শনের মৌলিক বিষয়গুলোকে আপনি এভাবেও চিহ্নিত করতে পারেন।

১। "অবাধ মালিকানা" স্বাধীনতা ঃ এমনকি কোন ব্যক্তি কোনরূপ বাধা-বিপত্তি ছাড়াই যাবতীয় পণ্য-সামগ্রীর মালিক হতে পারে।

২। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ঃ সুতরাং প্রতিটি ব্যক্তি তার সম্পদের নীতিমালা প্রণয়ন এবং তা বিনিয়োগের পদ্ধতির ব্যাপারে রাষ্ট্রের দখলমুক্ত।

৩। মুনাফা লাভের স্বাধীনতা ঃ পুঁজিবাদের মতে মুনাফা হলো ব্যক্তির পরিশ্রমের ফল। এ সম্পর্কীয় বিধি-বিধানের ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও রাষ্ট্রের প্রভাবমুক্ত।

সমাজতন্ত্রী দর্শন

সমাজতন্ত্রী দর্শন পুঁজিবাদী দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের কথা হলো অর্থনীতি ব্যবস্থাপনা কোনক্রমেই নিষ্প্রাণ "যোগান ও চাহিদা" (العرض, والطلب)-এর হাতে ন্যস্ত করা যায় না। কেননা এ দু'টি নির্জীব এবং বুদ্ধিহীন অন্ধ বস্তু। এর মাধ্যমে বৈষম্যমুক্ত সুষম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বড় ধরনের জটিলতা এবং ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া ছাড়া সম্ভব নয়। তাছাড়া এ দু'টি শক্তি হলো এমন বোবা শক্তি যার হাতে স্বয়ংক্রিয় এমন কোন যন্ত্র নেই যার মাধ্যমে ফসল ইত্যাদি উৎপাদন করা সম্ভব। অথবা একবার ব্যবস্থাপনার পর দ্বিতীয়বার ফসল উৎপাদন করবে ব্যাপারটা এমনও নয়। বরং উৎপাদনের যন্ত্রপাতি পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা দীর্ঘমেয়াদী একটা কাজ। আর দীর্ঘ এই সময়টাতে বিনা প্রয়োজনে অসংখ্য উপকরণ নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং সমাজ ও রাষ্ট্রের চাহিদা অনুযায়ী অর্থনীতি ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠ পদ্ধতি হলো কারো ব্যক্তি মালিকানায় উৎপাদনের উপকরণ সামগ্রী ন্যস্ত করা যাবে না। বরং এ সবকিছুর মালিকানা থাকবে রাষ্ট্রের হাতে। আর রাষ্ট্রই যাবতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (Economic Planning) আঞ্জাম দিবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রতিটি সদস্যের জীবন-যাপনের জন্য যে প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে সেটা নিরূপণ এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও থাকবে রাষ্ট্রের হাতে। রাষ্ট্রপক্ষই উৎপাদন, পরিকল্পনা জনগণের হাজত পূরণ সহ যাবতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করবে। যেহেতু সরকারের হাতে সবকিছুর মালিকানা বিদ্যমান এজন্য জনগণের প্রয়োজন মিটানোর দায়িত্ব সরকারের ওপর। আর রাষ্ট্র পক্ষ থেকেই জনগণ যেহেতু জীবিকা পাচ্ছে এজন্য তাদেরকে আলাদাভাবে কোনকিছু উৎপাদন বা লাভজনক বিনিয়োগের প্রয়োজন নেই। কিংবা প্রয়োজন নেই কোন কিছু ইজারা বা ভাড়া নেয়ার। রাষ্ট্রের সম্পদকেই "মজুরী" হিসেবে তাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। সমাজতন্ত্রী পরিভাষায় ইজারা, লাভজনক বিনিয়োগ বা অন্য কোনভাবে উপকৃত হওয়া নিষেধ। কেননা তাদের মতে শ্রমের মূল্যই হচ্ছে পণ্যের মূল্য! পুঁজিবাদী বাজারে লভ্যাংশ সুদ কিংবা ইজারা হিসেবে পরিশ্রমের চেয়ে অধিক যে মূল্য নেয়া হয় তাদের পরিভাষায় তা فائض القيمة (মূল্যের বাড়তি অংশ) নামে পরিচিত। ইংরেজিতে এটা Surplus Value নামে পরিচিত। এটা তাদের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট জুলুম!

ইসলামী দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রী মতবাদের ত্রুটি

সমাজতন্ত্রীরা যুক্তির প্রথম ধাপেই ত্রুটি করে ফেলেছে। কেননা এ ধরনের সামাজিক শৃঙ্খলা রাষ্ট্রীয় অধীনে নিয়ন্ত্রিত হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া রাষ্ট্রের অধীনে এ ধরনের দায়িত্ব ন্যস্ত মানবিক স্বভাবের বিপরীত। কেননা মানুষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এ ান যে, এর সাথে তার তবিয়ত ও স্বভাবের সম্পর্ক জড়িত থাকে। পক্ষান্তরে এটাকে যদি প্রশাসনের হাতে ন্যস্ত করা হয় তাহলে বিষয়টি কৃত্রিমতায় রূপ নেবে এবং স্বাভাবিক তবিয়ত ও ফিতরাতের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে।

এ ধরনের হস্তক্ষেপের উদাহরণ এই হতে পারে যে, আমরা বিভিন্ন দেশের দিকে তাকালে দেখতে পাই, সে দেশের যুবক-যুবতীরা বংশীয় মিল দেখে কিংবা আরো বিভিন্ন দিকে সাদৃশ্য বজায় রেখে নিজেদের মধ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কতক সময় আবার এই সম্পর্কের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হয় এবং বিবাহ ভেঙ্গে যায়। কিন্তু তাই বলে কোন বুদ্ধিমান লোক এ ধরনের সমস্যা নিরসনের জন্য বিবাহ-শাদীর বিষয়টা রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত করতে পারে না যে, রাষ্ট্র নির্ধারণ করে দিবে অমুক যুবক অমুক যুবতীকে বিবাহ করবে। অমুক যুবতী অমুক যুবক ছাড়া অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না ইত্যাদি।

রাষ্ট্র যদি এ ধরনের পদক্ষেপ নেয় তাহলে তা হবে মানুষের ফিতরাত, রুচি ও তবিয়তের সম্পূর্ণ বিপরীত। এ ধরনের শৃঙ্খলা মানুষের ফিতরাত ও রুচি কর্তৃক পরিচালিত। এতে রাষ্ট্র বা অন্য কোন দখলদারী সম্পূর্ণ বেমানান। ঠিক তদ্রূপ অর্থনৈতিক শৃঙ্খলাও এভাবেই পরিচালিত হওয়া উচিত। এতে ভিন্ন কোন দখলদারিত্ব থাকা মানেই অসংখ্য সমস্যার বীজ রোপণ করা এবং নানা রকম ফাসাদের পথ খুলে দেয়া। এরূপ করলে যে সব সমস্যা দেখা দিবে তা হলো ঃ

১। এরূপ করায় উৎপাদনের যাবতীয় উপকরণ থাকবে রাষ্ট্রের হাতে। আর রাষ্ট্র ফিরিশতা কিংবা নিষ্পাপ কতক লোকের দ্বারা পরিচালিত নয়। বরং অন্য দশজন লোভী, স্বার্থপর লোকের মতই গুটিকয়েক লোক দ্বারা পরিচালিত। সুতরাং এসব লোকগুলো যদি রাষ্ট্রীয় সকল সম্পদ হাতে পেয়ে নিজের স্বার্থের পিছনে তা ব্যয় করে এবং সামাজিক কল্যাণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে তাহলে কি ধরনের বিপর্যয় নেমে আসবে তা সহজেই অনুমেয় এবং অতীতে ঘটেছেও তাই।

২। এ ধরনের পরিকল্পনা হবে অনেক সময় অতি সূক্ষ্ম এবং অভিনব, অদ্ভুত যা সমাজের প্রকৃত সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখতে পারবে না। কেননা সমাজের চাহিদা দিন দিন পরিবর্তন হতে থাকে। হয়ত বছরে একবার বা দুইবার এ ধরনের পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি করা হয়ে তাকে। সুতরাং নিত্যনতুন সৃষ্ট

বছরের মাঝখানের এই সমস্যা সমাধানে এসব পরিকল্পনা কি ভূমিকা রাখবে? তাছাড়া এসব সমস্যার মূল কারণ উদ্ঘাটন করা এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ সময়ের। সুতরাং পুঁজিবাদীদের ওপর তারা যে প্রশ্ন করে বসত ঠিক সে প্রশ্নই তাদের ঘাড়ে চেপে বসবে এক্ষেত্রে।

৩। এই কাজ ও পরিকল্পনাটি সহজ নয়। সহজ করাও সম্ভব নয়। বরং রাষ্ট্র পক্ষ থেকে জোর জুলুমের মাধ্যমেই কেবল এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা যায়। কেননা অনেক সময় তাকে এমন দায়িত্ব দেয়া হয় যাতে সে সন্তুষ্ট নয় কিংবা এমন কাজ দেয়া হয় যা করতে সে সমর্থ নয়। এতে করে ব্যক্তিকল্যাণ ও রাষ্ট্রীয় কল্যাণের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়।

পুঁজিবাদী মতবাদে ত্রুটি (সমস্যা)

পুঁজিবাদী মতবাদের গোড়ার দিকটার ভিত্তি সঠিক হলেও এর চূড়ান্ত রূপরেখায় এসে গলদ হয়ে গেছে। সেটা হলো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা কোন পরিকল্পনার অধীনে সুসম্পন্ন হতে পারবে না বরং চাহিদা ও যোগানের ওপর তা নির্ভর করবে। এটা স্বাভাবিক কথা, আমরাও তা অস্বীকার করি না। কিন্তু এতে ব্যক্তিকে এমন স্বাধীনতা দেয়া হয় যে, এতে করে তুলনামূলক অনেক বেশি লাভ করা হয় যা মোটেই সমীচীন ছিল না। এই স্বাধীনতাকে কোন শর্তের জালে আবদ্ধ করা হয় না এবং স্বাধীনতার ফলে যে যোগান ও চাহিদার বিষয়টা তাদের হাতে যিম্মি হয়ে পড়ে এ ব্যাপারে চরম উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়। এতে করে গোড়াতে তারা যে ফিতরী শৃঙ্খলা বিন্যস্ত করেছিল তার উদ্দেশ্যই বাতিল হয়ে যায়। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো ঃ

যেহেতু প্রতিটি লোক অধিক মুনাফা লাভের ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীন, এ কারণে সে এপথে এগুতে সুদ, জুয়া, গুদামজাত, চড়া মূল্যে বিক্রয় সহ সব ধরনের বক্রপথ অবলম্বন করতে দ্বিধাগ্রস্থ হবে না। কেননা এগুলোর সবটিতেই তো অধিক মুনাফা লাভ করা সম্ভব। সুতরাং ধনীরাই এভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণ করবে এবং পণ্য সামগ্রীর মূল্য তাদের ইচ্ছামত বাড়তে থাকবে। এতে করে বাজারে কেবল মাত্র সেসব পণ্য সামগ্রীই পাওয়া যাবে যা তারা চাইবে। শ্রমিক-মজুরদের সেই পারিশ্রমিক দেয়া হবে যা তারা নির্ধারণ করবে। কেননা তারাই যে বাজারের মালিক আর সম্পদের শাসনকর্তা! এসব লেকেরা যোগান আর চাহিদাকে অকেজো ও নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে। কেননা এ দু'টি বিষয় তখনই কাজ দেয় যখন বাজার থাকে অবৈধ হস্তক্ষেপমুক্ত সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং ক্রেতারা নানা রকম পণ্য লাভের ব্যাপারে থাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিত। পক্ষান্তরে যদি একজন কিংবা গুটিকয়েক

লোক বাজার নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে ক্রেতারা তাদের মনমত পণ্য কিনতে পারবে না। পণ্যের বাজারে আগুন লাগবে। যোগান ও চাহিদার সকল উদ্দেশ্য নিস্ফল হয়ে যাবে।

এ সবকিছু ঘটে পুঁজিবাদী অবাধ স্বাধীনতার কারণে যে স্বাধীনতার পতাকা পুঁজিবাদীরা অত্যন্ত গর্বভরে উত্তোলন করেছে। কেননা এই অবাধ স্বাধীনতার কারণেই একটি লোক সুদ, জুয়া, মজুতকরণ, অধিক মুনাফা লাভ প্রভৃতি উপায়ে অঢেল সম্পদের মালিক হয়। অতঃপর এই অঢেল সম্পদ দিয়ে বড় বড় মিল কারখানা গড়ে তোলে। এরপর মিল কারখানার উৎপাদিত পণ্য দিয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণ করবে। এভাবে সে এত স্বেচ্ছাচারী হবে যে, সব ধরনের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে তার ইচ্ছার গোলাম বানাবে। ঘটনাচক্রে কোন ব্যবসায়ী যদি তার সমপর্যায়ে পৌঁছে যায় তাহলে সে তার সাথে ব্যবসায়িক আঁতাত গড়ে তুলবে। এর ফলে সকল ব্যবসায়ীর বোলচাল ও স্বার্থ হবে এক ও অভিন্ন। এভাবে ক্রেতাকে তাদের ইচছামত পণ্য ক্রয় করার সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হবে।

(হে পুঁজিবাদীরা!) তোমাদের মুক্ত স্বাধীন বাজার কোথায়? কোথায় স্বাধীন যোগান ও চাহিদা? কোথায় প্রতিযোগিতার সুযোগ?

এসব প্রশ্নের উত্তর পুঁজিবাদী দর্শনের বন্দী ফাইলে আবদ্ধ। ইহজগতে হয়ত এর কোন সুফল দেখা যাবে না কিংবা কোন সুসংবাদ শোনা যাবে না।

এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে পুঁজিবাদীরা যে ভিত্তিতে অর্থনৈতিক কর্মপন্থা স্থির করেছিল হয়ত সুদূর ভবিষ্যতে সে অনুযায়ী কর্মপন্থা স্থির করার অলীক স্বপ্ন দেখে! "যোগান ও চাহিদা" দু'টি বস্তুকে তারা যে পর্যায়ে নিয়ে গেছে তাতে এ দু'টি বস্তু নিষ্ক্রিয় একটি জড় পদার্থে পরিণত হয়েছে, যা স্বাধীনভাবে কোন কাজ করতে পারছে না। যা পারছে তা হাতে গোনা কয়েকজনের মধ্যে। এতে করে নানা রকম অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে। যেমন-

১। রাষ্ট্রের অতি নগণ্য সংখ্যক লোক অঢেল সম্পদের কর্তৃত্ব লাভ করছে। আর এই ক্ষুদ্র সংখ্যক লোক নিজ মহলে থেমে থাকছে না বরং তারা একটি বিশ্ব শক্তি অর্জনের চেষ্টা চালাচ্ছে। বহিঃরাষ্ট্রের কিংবা বড় বড় ব্যাংকের অংশদারিত্ব লাভ করছে। আর এসব অংশদারিত্ব ও সম্পদের শক্তিমত্তার কারণে তারা রাজনৈতিক ময়দানেও হস্তক্ষেপ করছে।

২। এই প্রক্রিয়ার ফলে "একক স্বাধীনতা" ধনাঢ্যদের পৈত্রিক সম্পদে পরিণত হয়েছে। গরীব বেচারাদের অর্থনৈতিক এই প্রক্রিয়ায় ধনাঢ্যদের সমানে মাথা নত করা ছাড়া আর কোন পথ নেই।

৩। এ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কারণে সমাজের চাহিদা মত ফসল, পণ্য ইত্যাদি উৎপাদিত হয় না বরং যাতে লাভ বেশি থাকে সেটা উৎপাদনের প্রতি মানুষের ঝোঁক থাকে বেশি। সুতরাং যদি দেখা যায় যে, নাট্য ও নৃত্যশালা বানানোতে অধিক মুনাফা হচ্ছে তাহলে এটা বানানোর পিছনে সর্বপ্রকার উপকরণ ব্যয় করা হচ্ছে। এর কারণে যদি গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ পিছিয়ে কিংবা বাদ পড়ে যায় সেটার প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয় না।

ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

ইসলামী অর্থনীতি চিরাচরিত পন্থায় সীমালঙ্ঘন কিংবা পূর্ণ স্বাধীনতা না দিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ একটি পন্থা অবলম্বন করেছে। যদিও অর্থনৈতিক যেসব পরিভাষা আছে, যেমন, 'অর্থনৈতিক বিধান', 'যোগান ও চাহিদা' ইত্যাদি কুরআন বা সুন্নাতে উল্লেখ পাওয়া যায় না কিন্তু কুরআন, সুন্নাহ পাঠ করে যা বুঝা যায় তা হলো ইসলাম নিজে অর্থনৈতিক রূপরেখা প্রণয়ন না করে বিষয়টি মানুষের ফিতরতের ওপর ছেড়ে দিয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন—

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا - سورة الزخرف الاية ٣٢

আমি তাদের মধ্যে রিযিক বণ্টন করে দিয়েছি এবং তাদের মধ্যে কাউকে অপরজনের ওপর প্রাধান্য দিয়েছি। যাতে করে একজন অপরজনকে সেবকরূপে গ্রহণ করে। আলোচ্য আয়াতে রিযিক বণ্টনের বিষয়টি আল্লাহ্র হাতে ন্যস্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা আল্লাহ্র হাতে ন্যস্ত। তবে এক্ষেত্রে ফিতরী কিছু শক্তি কাজ করে যাকে আমরা চাহিদা ও যোগান নামে আখ্যায়িত করতে পারি। কেননা আল্লাহ্ পাকই একজনকে অপরজনের প্রতি মুহতাজ বানিয়ে দিয়েছেন। ক্রেতা যেমন বিক্রেতার প্রতি মুহতাজ, ঠিক তদ্রূপ বিক্রেতাও ক্রেতার প্রতি মুহতাজ। একজন অপরজন থেকে অমুখাপেক্ষী নয়। এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে এই বলে—

يتخذ بعضهم بعضا سخريا -

যাতে একে অপরকে সেবকরূপে গ্রহণ করে।

এমনিভাবে আমরা হাদীসেও এর সমর্থন পাই। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা কতক লোক রাসূল (সা.)-কে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)!

বাজারে পণ্যের দাম বেড়ে গেছে, আপনি একটা বিহিত ব্যবস্থা করুন। রাসূল (সা.) বললেন—

إِنَّ اللّٰهَ هُوَالْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّىْ لَأَرْجُوْ أَنْ أَلْقَى اللّٰهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِىْ بِمَظْلَمَةٍ فِىْ دَمٍ وَلَا مَالٍ {أخرجه أبوداؤد والترمذى وابن ماجه والدارمى كلهم فى البيوع وصححه الترمذى واخرجه أيضا احمد فى مسنده ـ ٣ : ١٠٦ و ٢٨٦

রাসূল (সা.) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলাই সবকিছুতে সংকোচনকারী, প্রশস্তকারী, রিযিকদাতা। আর আমি কামনা করি যে, আল্লাহ্র সাথে আমি এমতাবস্থায় মিলিত হই যে, তোমাদের কেউ যেন আমার বিরুদ্ধে সম্পদ বা খুনের অভিযোগ না করে।

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) কর্তৃক আবূ দাঊদ ও মুসনাদে আহমদের এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে—এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর কাছে আগমন করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! পণ্যের দাম নির্ধারণ করে দিন। রাসূল (সা.) বললেন, বরং আমি স্বাভাবিক অবস্থার জন্য দু'আ করি। অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি এসে আগের মতোই দাবি করলেন। তখন রাসূল (সা.) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলাই দাম কমান, দাম বাড়ান। আর আমি আল্লাহ্র কাছে এমতাবস্থায় হাজির হতে চাই না যে, আমার প্রতি কারো জুলুমের অভিযোগ রয়েছে।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়াতে আছে—

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : نحلا السِّعْرُ عَلٰى عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالُوْا لَهٗ : لَوْ قَوَّمْتَ لَنَا سَعْرَنَا، قَالَ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمُقَوِّمُ أَوِ الْمُعْسِرِ إِنِّىْ لَأَرْجُوْ أَنْ أُفَارِقَكُمْ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِىْ بِمَظْلَمَةٍ فِىْ مَالٍ وَلَا نَفْسٍ ـ أخرجه احمد فى مسنده ـ ٣/٥٨ :

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, আসবাগ ইবনে নাবাতাহ্ (রহ.)-এর এক রেওয়ায়াতে আছে—

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اَللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قِيْلَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ : قَوِّمْ لَنَاالسَّعْرَ، قَالَ : إِنَّ غَلاَءَ السَّعْرِوَ رُخْصَهُ بِيَدِ اللّٰهِ ، أُرِيْدَ أَنْ أَلْقَى رَبِّى وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِى بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ ـ أخرجه البزار فى مسنده،

كما فى كشف الاستار عن زوائد البزار ٢/ ٨٥ رقم ١٢٦٣

"হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) কে বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! আমাদের সুবিধার্থে বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করে দিন। রাসূল (সা.) বললেন, বস্তুর দাম বাড়া-কমা আল্লাহ্র হাতে ন্যস্ত। আমি চাই আল্লাহ্র সাথে এমনভাবে সাক্ষাত করি যে, যেন কেউ আমার বিরুদ্ধে জুলুমের অভিযোগ করার সুযোগ না পায়।"

এসব হাদীসে রাসূল (সা.) বস্তুর মূল্য বাড়া কমাকে আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বলে ঘোষণা করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, পণ্যসামগ্রির ব্যবস্থাপনা রাষ্ট্রের বিশেষ কোন পরিকল্পনাধীন নয়। বরং এটা এমন বিষয় যার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা নিজের যিম্মায় রেখেছেন। আর আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হওয়ার অর্থ হলো, এটা ঐ নিয়মের আওতায় চলবে ফিতরীভাবে মানুষকে যে নিয়মে সৃষ্টি করা হয়েছে।

সুতরাং হাদীস দ্বারা বাজারের যোগান ও চাহিদার ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি জানা গেল এবং এটাও জানা গেল যে, বাজারে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা মানুষের স্বভাবজাত (তবিয়তের) বিপরীত। যার ওপর ভিত্তি করে মানুষের সামাজিক জীবনাচার। আর এটাও পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এতে হস্তক্ষেপ করা হবে জুলুমের শামিল। চাই তা রাষ্ট্র পক্ষ থেকে হোক কিংবা ব্যবসায়ী সংঘ থেকে হোক।

অন্য একটি হাদীসও এর সমর্থন করে। হযরত জাবের (রা.) থেকে হাদীসটি বর্ণিত।

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اَللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَيَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوْ النَّاسَ يَرْزُقُ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ـ أخرجه مسلم والترمذى ـ

"রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, শহুরে ব্যক্তি যেন গ্রাম্য ব্যক্তির পক্ষ হতে বিক্রি না করে। মানুষকে স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দাও। আল্লাহ্ তা'আলা একে অপরের মাধ্যমে মানুষকে রিযিক দিবেন।"

সংক্ষিপ্ত এই বাক্যে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের পরস্পরের জীবিকা সংগ্রহের চিরন্তন একটি পন্থার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বিক্রেতার মাধ্যমে ক্রেতাকে এবং ক্রেতার মাধ্যমে বিক্রেতাকে রিযিক দান করেন। সুতরাং তৃতীয় শক্তির এতে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা এবং খোদা প্রদত্ত শাশ্বত এই জীবন ব্যবস্থায় দখলদারিত্ব করতে যাওয়া হবে চরম বোকামী। হাদীস দ্বারা এ কথাই পরিষ্কার বুঝা যায় যে, বাজার নিয়ন্ত্রিত হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ ফিতরী বিষয়, যাকে কোনভাবে প্রভাবান্বিত করা জায়িয নয়।

সারকথা হলো, ইসলাম চায় বাজারের নিয়ন্ত্রণ মানুষের চিরাচরিত নীতিমালার ওপরেই বহাল থাকুক এবং সর্বপ্রকার অবৈধ হস্তক্ষেপ ও দখলদারিত্ব থেকে এটা মুক্ত থাকুক।

তবে একথার অর্থ এই নয় যে, এই বিধান পালন করতে গিয়ে কতিপয় ব্যবসায়ীকে অবাধ স্বাধীনতা দেয়া হবে যাতে তারা যা চায় তাই করতে পারে। কেননা এ ধরনের অবাধ স্বাধীনতা দিলে তারা অবৈধ ফায়দা লুটবে এবং গুদামজাতকরণ সহ অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী নানারকম উপায়ে অঢেল সম্পদ লাভ করবে বরং এই স্বাধীনতার পরিধি হবে সীমিত এবং ইসলাম প্রদত্ত শর্ত শরায়েতের অধীনে, যাতে করে ব্যক্তি স্বাধীনতা সামাজিক স্বাধীনতা ও বাজারের ভারসাম্যতা ধ্বংস না করতে পারে। যা পুঁজিবাদী দর্শনে অহরহ ঘটে থাকে। বরং ইসলামে ব্যক্তি স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে এতটুকু যা বাজার তথা অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার অধীন হয়।

আর এ কারণেই সুদ, জুয়া ইত্যাদি হারাম করা হয়েছে। কেননা এসব উপায়ে শুধুমাত্র ধনাঢ্য লোকগুলো উপকৃত হওয়ার সুযোগ পায়। ইতিহাস সাক্ষী, শুধুমাত্র এসব সমাজ বিধ্বংসী উপায় অবলম্বন করার ফলেই পুঁজিবাদীরা এতদূর অগ্রসর হতে পেরেছে। কেননা তারা এসব উপায়ে সম্পদ সংগ্রহ করাকে বৈধ মনে করে এবং বাজারে এমন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে যার কারণে বাজারের ভারসাম্যতা নষ্ট হয়ে তা পঙ্গু ও অকেজো হয়ে যায়।

এ সবেরই সূত্র ধরে গুদামজাত করণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, শহরের উপকণ্ঠে গিয়ে পণ্য ক্রয় (تلقى جلب) গ্রাম্য ব্যক্তির হয়ে শহুরে ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয় (بيع حاضر لباد) সহ সকল প্রকার ক্ষতিকর ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা এসব প্রক্রিয়া বাজারের ভারসাম্যতা নষ্ট করে, যোগান ও চাহিদার স্বাভাবিক গতিপথে বাধা সৃষ্টি করে এবং গুটিকয়েক লোকের হাতে সম্পদের পাহাড় গড়ার পথ প্রশস্ত করে।

ইমাম বায্যার (রহ.), ইমাম আহমদ (রহ.), আবূ ইয়ালা (রহ.) এবং তাবরানী (রহ.) হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে রেওয়ায়াত করেন—

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنِ احْتَكَرَ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللّٰهِ وَبَرِئَ اللّٰهُ مِنْهُ ، قَالَ وَ أَيُّمَا أهل عرصة ظل فيهم امرأ من المسلمين طويا يعني جائعا فقد برئت ذمة الله منهم -

"যে ব্যক্তি গুদামজাত করল সে আল্লাহ্র যিম্মা থেকে বের হয়ে গেল এবং আল্লাহ্ও তার যিম্মা থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন।"

ইসলামী বিধানের আরেকটি বিধান হলো ব্যবসায়ীদেরকে অর্থনৈতিক সংঘ/সমিতি গঠনে বাধা দেয়া। কেননা এর ফলে অর্থলোভী কতক ব্যবসায়ীর হাতে বাজারের নিয়ন্ত্রণ ভার চলে আসে এবং স্বাভাবিক গতিশীলতা স্থবির হয়ে পড়ে। ফোকাহায়ে কিরাম সুস্পষ্টভাবে একথা বলেছেন যে, ব্যবসায়ীদেরকে বাজারের পণ্যের দর ঠিক করার জন্য সভা-সমিতি করতে দেয়া যাবে না। দেখুন হিদায়ার كتاب القسمة

সুতরাং ব্যবসায়ী গোষ্ঠী যদি এরূপ কিছু করে বসে তাহলে রাষ্ট্র পক্ষের অধিকার থাকবে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা এবং পণ্যের মূল্য স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা। ইসলামী বিধানের আরেকটি হলো যাকাত, সদকা, কাফ্ফারা, কুরবানী, ভরণ-পোষণ, মীরাছ ইত্যাদি। কেননা এসব বিধানের কারণেও সম্পদশালীদের অর্থবিত্ত নামের সাগরের ঢেউ কিছুটা হলেও আছড়ে পড়ে সমাজের দুস্থদের দুয়ারে। ইসলামে সম্পদের খাজানা তৈরি এবং গুদামজাতকরণের দরজা রুদ্ধ এবং দানের দরজা উন্মুক্ত। আর এর গূঢ় রহস্য কি কুরআন তা বর্ণনা করেছে এই ভাষায়— كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ -

"যাতে করে তোমাদের মধ্যে যারা ধনী তাদের হাতে ধন-দৌলতের স্তূপ গড়ে না ওঠে।"

সারকথা হলো, ইসলামে ব্যক্তি স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে ঠিক তবে তা সীমিত গণ্ডির মধ্যে এবং এক্ষেত্রে সমাজ ও রাষ্ট্রের সুবিধাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এবং ইসলাম চায় চাহিদা ও যোগানের বিষয়টা মানুষের স্বাভাবিক গতিশীলতা দ্বারা পরিচালিত হোক। বাজার থাকুক সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত, স্বাধীন। স্টক নামের আগ্রাসী ছোবল বন্ধ হোক যার কারণে অর্থের লাগাম সমাজের নগণ্য কয়েকজন লোকের হাতে এসে যায় এবং চাহিদা ও যোগানের স্থিতিশীলতা ব্যাহত হয়। একমাত্র এ

কারণেই অনেক লেনদেন হারাম করা হয়েছে এবং স্টক করা সহ অস্বাভাবিক কিছু ঘটলে রাষ্ট্র কর্তৃক এখানে হস্তক্ষেপ করতে বলা হয়েছে।

ইসলামী অর্থনীতির সার সংক্ষেপ আমরা এভাবে বর্ণনা করতে পারি যে, ইসলামে অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে এ ধরনের অবাধ স্বাধীনতা দেয়া হয়নি যা পুঁজিবাদী দর্শনে দেয়া হয়েছে। বরং অর্থনীতির ভারসাম্য বজায় রাখতে ইসলামে তিন ধরনের দখলদারিত্ব বা হস্তক্ষেপ বৈধ করা হয়েছে। যথা ঃ

১। تدخل الدين তথা শরীয়ত কর্তৃক কর্তৃত্ব

শরীয়তের এই কর্তৃত্বের কারণে কোন ব্যক্তির শরীয়ত বহির্ভূত পন্থায় সম্পদ উপার্জনের সুযোগ নেই। সুতরাং সুদ, জুয়াসহ সকল প্রকার বাতিল ও ফাসিদ লেনদেন এবং ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন করা নিষেধ।

২। تدخل الحكومة তথা রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব

বাজার যখন স্বাভাবিকভাবে মানুষের ফিতরত অনুযায়ী চলতে থাকে ইসলাম সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে এতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপের অনুমোদন দেয় না। পূর্বের বিভিন্ন হাদীসে যা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো একথাই বলে। হ্যাঁ, যদি কোন ব্যক্তি বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে চায় এবং অবৈধ উপায়ে সম্পদ সংগ্রহের উদ্যোগ নেয় তাহলে ইসলাম সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেয়। ফেকাহ্‌র কিতাবে যার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।৫৩৬

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ : مَنْ دَخَلَ فِىْ شَيْئٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمَيْنَ لِيَغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ أَنْ يَقْذِفَهُ فِىْ مُعَظَّمٍ مِنَ النَّارِ وَرَأْسَهُ أَسْفَلَهُ .

"যে ব্যক্তি মুসলমানের সম্পদে দখলদারিত্ব করতে যায় তাদের ওপর বস্তুটির মূল্য চড়িয়ে দেয়ার জন্য এক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র দায়িত্ব এসে যায় তাকে নিম্নমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করার।" —হাকেম, বাইহাকী, তাবারানী, আহমদ, কানযুল উম্মাল ৪/৫৬

হযরত ওমর (রা.) হাতিব ইবনে আবী বালতা'আতা (রা.) কে এই মর্মে নির্দেশ দেন যে, إماأن تزيد فى السعر و أما ان تدفع من سوقنا হাদীসটি ইমাম মালিক (রহ.), বাইহাকী, আরদ ইবনে হুসাইদ উল্লেখ করেছেন।

—কানযুল উম্মাল ৪/১০৪, হাদীস ৮৮২

এসব হাদীস প্রমাণ করে যে, বাজারে কোন অস্থিতিশীল অবস্থা পরিলক্ষিত হলে রাষ্ট্র কর্তৃক হস্তক্ষেপ করা বৈধ।

৩। تدخل الأخلاق বা নৈতিক দখলদারিত্ব

মনে রাখতে হবে যে, নৈতিক বিধি-বিধান ইসলাম থেকে মুক্ত নয়, বিশেষ করে অর্থনীতির ক্ষেত্রে। কেননা প্রয়োজনের তুলনায় অধিক মুনাফা লাভ করা মানুষের মূল উদ্দেশ্য হতে পারে না। পূর্বে আমরা এ সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করে এসেছি। ইসলাম মানুষের অন্তরে এই শিক্ষা গেঁথে দিয়েছে যে, লেনদেনের ক্ষেত্রে অপরের সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে। অন্যকে নিজের ওপর প্রাধান্য দিতে হবে যদিও নিজে অভুক্ত থাকে। দান সদকার ব্যাপারে প্রতিযোগি মনোভাবাপন্ন হতে হবে এবং সম্পদ উপার্জনের মরণ নেশায় বুঁদ না হতে হবে। আর বলাই বাহুল্য যে, এ ধরনের বিধি-বিধান কুরআন হাদীসে ভরপুর। বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ এখানে নেই।

সত্যিকার অর্থে যদি ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শ বাস্তবায়িত করা যায় তাহলে পুঁজিবাদী দর্শনের কোন কুপ্রভাব সমাজে টিকে থাকতে পারবে না। আর সমাজতন্ত্রী দর্শনেরও কোন প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হবে না।

অর্থনীতি তখন জুলুম, কঠোরতা ও আত্মিক স্বার্থপরতার প্রভাবমুক্ত হয়ে পূর্ণ ইনসাফের সাথে তার সঠিক গতিপথে পরিচালিত হবে সমাজে ফিরে আসবে সেই হারানো দিনের ঐতিহ্য এবং সামাজিক ভারসাম্যতা।

والله سبحانه الموفق

তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম–খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩০০-৩১৩

অধ্যায় ঃ ক্রয়-বিক্রয় ঃ كتاب البيوع

بيع-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ

بيع-এর শাব্দিক অর্থ হাত, বদল করা। আর শরীয়তের পরিভাষায়, সন্তুষ্ট চিত্তে মালের বিনিময়ে মালের লেনদেনকে بيع বলা হয়।

المنجد। অভিধান প্রণেতা بيع-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ

اَلْبَيْعُ هُوَبَذْلُ الْمُثْمَنِ وَاَخْذُ الثَّمَنِ اَوْ اَخْذُ الْمُثْمَنِ وَبَذْلُ الثَّمَنِ وَهُوَمِنَ الْاَضْدَادِ ـ

তথা এটি বিপরীতবোধক একটি শব্দ। কোন সময় খরিদের অর্থে এবং কোন সময় বিক্রয়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন সময় এটি যে কোন হাত বদলের (লেনদেনের) অর্থে ব্যবহৃত হয় চাই মাল হোক বা না হোক। যেমন—কুরআনে কারীমে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةً এখানে হযরত ইউসুফ (আ.) নিশ্চিতাবেই مبيع (বিক্রিত বস্তু) নন। মালের লেনদেন না হওয়া সত্ত্বেও এখানে بيع শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এরূপ ঃ

مُبَادَلَةُ الشَّيْئِ مَرْغُوْبًافِيْهِ بِمِثْلِهِ-তথা আকর্ষণযোগ্য বস্তুকে অনুরূপ কোন বস্তু দ্বারা লেনদেন করা। উল্লেখিত সংজ্ঞা অনুযায়ী মৃত প্রাণী, রক্ত ইত্যাদির লেনদেনকে بيع বলা যাবে না। কেননা এটা شيئ مرغوب বা আকর্ষণযোগ্য বস্তু নয়।

بيع-এর ركن হলো 'ঈজাব ও কবুল।' شرط হলো; ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের লেনদেন করার যোগ্যতা থাকা। এর محل (প্রতিফলিত হওয়ার ক্ষেত্র হলো) مال متقوم (তথা মূল্য বিশিষ্ট মাল)।

হুকুম ঃ بيع تام-এর ক্ষেত্রে ক্রেতার খরিদা মালের মধ্যে এবং বিক্রেতার "মূল্যের মধ্যে" তাৎক্ষণিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

আর موقوف-এর ক্ষেত্রে অনুমতি প্রদানের পর উভয়বিদ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

নামকরণের কারণ

بيع শব্দটিকে باع থেকে নেয়া হয়েছে। উভয় হাত প্রশস্ত করা পরিমাণকে باع বলা হয়। ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ে যেহেতু লেনদেনের সময় হাত প্রশস্ত করে এজন্য একে بيع বলা হয়। এমনিভাবে بايع يبايع مبايعة-এর অর্থ হাতের ওপর হাত রাখা। ক্রয়-বিক্রয়ের সময় যেহেতু ক্রেতা-বিক্রেতা কর্তৃক একে অপরের হাতের ওপর হাত রাখার রেওয়াজ ছিল এজন্য এর নাম রাখা হয়েছে بيع । এই কারণেই بيع-কে سفقة (করতালী, লেনদেন) বলা হয়। অবশ্য بيع-এর উৎপত্তিমূল باع এ কথা প্রশ্নমুক্ত নয়। কেননা بيع হলো يائى (عين কালিমার ى বিশিষ্ট) আর باع শব্দটি واوى (عين কামিলা او বিশিষ্ট)। ব্যবহারের ক্ষেত্রে এরূপই দেখা যায়। যেমন বলা হয় باع يبوع بوعا (عين কালিমায় او) এমনিভাবে বলা হয় بعت الشيئ ابوعه بوعا ।

ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতা

কুরআন, হাদীস ইজমা (এবং কিয়াস) সর্বপ্রকার দলীল দ্বারা ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতা প্রমাণিত।

কুরআনের দলীল ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ (১) اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا আল্লাহ্ তা'আলা বেচাকেনাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন।

(২) وَاَشْهِدُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ বেচাকেনার সময় সাক্ষী রাখো।

(৩) لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً الخ তোমরা অবৈধভাবে অন্যের মাল ভোগ করোনা। বরং বৈধভাবে ব্যবসার মাধ্যমে ভোগ করো।

(৪) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের প্রভুর অনুগ্রহ তালাশ করাতে কোন দোষ নেই

হাদীসের দলীল ঃ (১) রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, اى الكسب اطيب কোন প্রকারের উপার্জন সর্বোত্তম? তিনি বললেন, প্রত্যেক ব্যক্তির হাতের উপার্জন এবং বৈধ ক্রয়-বিক্রয়ের উপার্জন সর্বোত্তম উপার্জন।" —বাযযার-আহমদ

(২) انما البيع عن تراض বেচাকেনা হয় সন্তুষ্টির ভিত্তিতে। —বাইহাকী ইবনে মাজাহ

(৩) وَقَدْ بُعِثَ الرَّسُوْلُ وَالنَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ فَاَقَرَّهُمْ عَلَيْهِ রাসূল (সা.)-কে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে, আর সে সময় মানুষ লেনদেন করত, তিনি তাদেরকে এ অবস্থাতেই বহাল রাখেন। তিনি একথাও বলেন—বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীগণ কেয়ামতের দিন নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সাথে উঠবে। —তিরমিযী

ইজমা ঃ উম্মতে মুসলিমা (যে কোন মতের হোন না কেন) বেচা কেনার বৈধতার ওপর সবাই একমত হয়েছেন।

হিকমত বা কিয়াস ঃ যুক্তিও এর বৈধতার স্বপক্ষে রায় প্রদান করে। কেননা স্বাভাবিকভাবেই মানুষ একে অন্যের বস্তুর মুখাপেক্ষী। আর কেউ তো বিনিময় ছাড়া প্রদান করবে না। তাই بيع-এর বৈধতা প্রদান করে মানুষের প্রয়োজন পূরণ এবং স্বাভাবিক জীবন যাত্রার পথকে সুগম করা হয়েছে। স্বভাবগতভাবেই মানুষ অন্যের সাহায্যপ্রার্থী। আর একে অন্যের সাহায্য ছাড়া স্বাভাবিক জীবন যাত্রা সচল থাকতে পারে না। বিধায় যুক্তি অনুযায়ী বেচাকেনা (بيع)-কে বৈধ করাই উচিত ছিল এবং করাও হয়েছে তাই।

ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতার হিকমত

বেচাকেনার বৈধতার মধ্যে অনেক হিকমত রয়েছে কিছুটা ইশারা করেছি তার মধ্যে আরও কিছু হলো ঃ (১) শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন (২) চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, খেয়ানত, ঝগড়া-বিবাদ এবং সকল প্রকার অবৈধ পন্থা বন্ধ করা।

(৩) জীবন যাপনে শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং বিশ্ব পরিস্থিতি শান্ত রাখা। কেননা মানুষ অন্যের সম্পদের প্রতি মুখাপেক্ষী হবে এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং লেনদেনের পথকে যদি রুদ্ধ করে দেয়া হয় তাহলে মানুষের সামাজিক জীবনে ধস নামা এবং দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া অতি আবশ্যক ব্যাপার।

بـيـع-এর প্রকারভেদ

যেহেতু بيع-এর প্রকারভেদ অনেক তাই كتاب البيع (بيع-কে একবচন) না এনে كتاب البيوع (بيع-কে বহুবচনের সাথে) উল্লেখ করা হয়েছে।

بـيـع-এর প্রকারভেদ নিম্নরূপ

(১) بيع مطلق ঃ বস্তুর বিনিময়ে অর্থের লেনদেনকে بيع مطلق বলে।

(২) بيع المقايضة ঃ বস্তুর বিনিময়ে বস্তুর লেনদেনকে بيع مقايضة বলা হয়।

(৩) بيع سلم ঃ নগদ অর্থের বিনিময়ে বাকিতে বস্তু হস্তান্তর করাকে بيع سلم বলা হয়।

(৪) بيع صرف ঃ অর্থের বিনিময়ে অর্থ লেনদেনকে بيع صرف বলে।

(৫) بيع مرابحة ঃ ক্রয়কৃত মূল্যের চেয়ে কিছু লাভে ক্রয়-বিক্রয়কে بيع مرابحة বলে।

(৬) بيع تولية ঃ বস্তুকে ক্রয়কৃত মূল্যে (লাভ করা ছাড়া) বিক্রয়কে بيع تولية বলে।

(৭) بيع وضيعة ঃ ক্রয়কৃত মূল্যের কমে (লোকসান দিয়ে) বিক্রয় করাকে بيع وضيعة বলে।

(৮) بيع مساومة ঃ পূর্বের মূল্য উল্লেখ না করে স্বাভাবিক ক্রয়-বিক্রয়কে بيع مساومة বলে।

(৯) সর্বদিক দিয়ে পরিপূর্ণ ক্রয়-বিক্রয়কে بيع لازم বলে।

(১০) ক্রেতা-বিক্রেতার কারো خيار থাকলে একে بيع غيرلازم বলে।

(১১) بيع صحيح ঃ ক্রয়-বিক্রয়ের যাবতীয় শর্ত পাওয়া গেলে একে بيع صحيح বলে।

(১২) بيع باطل ঃ ক্রয়-বিক্রয়ের وصف এবং اصل-এর মধ্যে ত্রুটি পাওয়া গেলে একে بيع باطل বলে।

(১৩) بيع فاسد ঃ ক্রয়-বিক্রয়ের وصف-এর মধ্যে ত্রুটি থাকলে একে بيع فاسد বলে।

(১৪) بيع مكروه ঃ প্রাসঙ্গিক কোন ত্রুটি দেখা দিলে একে بيع مكروه বলে। বিস্তারিত বিবরণ ফেকার কিতাবে দ্রষ্টব্য।

باب ابطال بيع الملا مسة والمنابذة

অধ্যায় ঃ স্পর্শ ও ছুঁড়ে মারার মাধ্যমে কৃত ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ হওয়া প্রসঙ্গে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وفى رواية عنه قَالَ : نَهٰى عَنْ بَيْعَتَيْنِ : اَلْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ ـ

ملامسة এবং منابذة শব্দ দু'টি باب مفاعلة-এর মাসদার। মূল لمس (তথা স্পর্শ করা) এবং نبذ (নিক্ষেপ করা)।

بيع ملامسة - بيع منابذة জাহিলী যুগে বহুল প্রচলিত দু'টি ক্রয়-বিক্রয়ের নাম। এ দু'টির ব্যাখ্যায় (পরিচয়ে) আলিমদের বিভিন্ন মত পাওয়া যায়।

১. ملامسة-এর ব্যাখ্যা

(১) বিক্রেতা বলবে—আমি তোমার কাছ থেকে এই বস্তুটি এত দাম দিয়ে কিনলাম। আমি তোমাকে ছুঁয়ে ফেলার সাথে সাথেই ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হয়ে যাবে। অথবা ক্রেতা কর্তৃক অনুরূপ বলা। এই ব্যাখ্যাটি ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) থেকে বর্ণিত। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) উমদাতুল কারীতে তা উল্লেখ করেছেন।

(২) مبيع (বিক্রিত বস্তু) ঢেকে অথবা অন্ধকারে রেখে মালিক কর্তৃক একথা বলা যে, আমি তোমার কাছে বস্তুটি এই শর্তে বিক্রি করলাম যে, তোমার স্পর্শ করাকেই দেখার মধ্যে গণ্য করা হবে। দেখার পর তোমার কোন اختيار থাকবে না। তাফসীরটি ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর। ইমাম নববী (রহ.) শরহে নববীতে তা উল্লেখ করেছেন।

(৩) উভয়েই কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা করা ছাড়া একে অপরের কাপড় খরিদ করা এবং একথা বলা যে, যখন আমি তোমার কাপড় স্পর্শ করব এবং তুমি আমার কাপড় স্পর্শ করবে তখন بيع - منعقد (কার্যকর) হবে। এটি হযরত আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত আছে।

এক্ষেত্রে لمس-কেই ايجاب ও قبول-এর স্থলাভিষিক্ত মনে করা হবে। এই তাফসীরটি হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত।

(৪) কোন বস্তু এই শর্তে ক্রয় করা যে, ক্রেতা বস্তুটি স্পর্শ করা মাত্র خيار مجلس বাতিল হয়ে যাবে। তাফসীরটি ইমাম নববীর। তবে এই ক্রয়-বিক্রয়টি ঐসব লোকদের কথা অনুযায়ী বাতিল বলে গণ্য হবে যাঁরা خيار مجلس-এর প্রবক্তা। আহনাফ এর বিপরীত। কেননা তাঁরা خيار مجلس-এর অস্তিত্বই স্বীকার করেন না।

২. المنابذة-এর ব্যাখ্যা

(১) ক্রেতা-বিক্রেতা কর্তৃক একে অন্যের দিকে কাপড় ছুঁড়ে মারা। আর এই ছুঁড়ে মারাকেই بيع হিসেবে গণ্য করা। অথচ কেউ কারো কাপড় দেখেওনি এবং উভয়ের মধ্যে ايجاب - قبول ও পাওয়া যায়নি। এটা ইমাম শাফেঈর (রহ.) ব্যাখ্যা।

(২) বিক্রেতা কর্তৃক একথা বলা যে, আমি তোমার কাছে এই বস্তুটি বিক্রয় করব। বস্তুটি তোমার দিকে ছুঁড়ে মারার সাথে সাথে بيع লাযিম হয়ে যাবে, তোমার কোন ইখতিয়ার থাকবে না।

(৩) কেউ কেউ বলেন, এখানে مبيع (বিক্রিত বস্তু) নিক্ষেপ করা উদ্দেশ্য নয় বরং আলাদাভাবে পাথর নিক্ষেপ করা উদ্দেশ্য। যাকে بيع الحصاة বলা হয়। এর বিশদ বিবরণ পরে আসছে। তবে এই ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়। —দেখুন اوجز المسالك খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা ৩০১, শাইখ যাকারিয়া (রহ.) প্রণীত

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) বলেছেন-জমহুর ওলামাদের মতে, উল্লেখিত এই দুই প্রকার ক্রয়-বিক্রয় প্রতারণা এবং জুয়ার মধ্যে শামিল। কেননা, ক্রেতা যা দেখার সুযোগ পায়নি এবং এতে চিন্তা করার অবকাশ পায়নি তাতে প্রতারিত হওয়া অতি সাধারণ ব্যাপার।

৩. بيع الشيئ الغائب অনুপস্থিত বস্তু বিক্রি করা

(১) আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এই অধ্যায় সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতের একাংশ হলো ঃ ويكون ذلك بيعهما من غير نظر . অর্থাৎ منابذة-এর ক্ষেত্রে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ দেয়া ছাড়াই একে অপরের দিকে কাপড় ছুঁড়ে দেয়াই بيع হিসেবে গণ্য হওয়া। অর্থাৎ ক্রেতার চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ না থাকা। এভাবেই কাপড়টি নিতে তাকে বাধ্য করা।

এসব আলোচনা দ্বারা বুঝা গেলো যে, منابذة যেহেতু বাতিল, সে কারণে شيئ غائب (অনুপস্থিত বস্তু) বিক্রি করাও বাতিল হিসেবেই গণ্য হবে। সুতরাং কোন বস্তু দেখা ছাড়া খরিদ করলে এই চুক্তিই (عقد) সহীহ্ হবে না। ইমাম শাফেঈর قول جديد এটাই।

(২) ইমাম আবূ হানীফা (রহ.), আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ প্রমুখ আলিমগণের মতে না দেখা বস্তুর عقد শুদ্ধ হবে বটে কিন্তু দেখার পর ক্রেতার خيار হাসিল হবে। এ মতের পক্ষে রয়েছেন হযরত ইবনে আব্বাস, ইমাম নখয়ী, ইমাম শা'বী, ইমাম হাসান বসরী, ইমাম আওযায়ী (রহ.) প্রমুখ।

দলীল ঃ

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اشْتَرٰى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ اِذَا رَاٰهُ ـ اخرجه الدار قطنى والبيهقى

"যে ব্যক্তি না দেখে কোন বস্তু খরিদ করল দেখার পর তার খেয়ার হাসিল হবে।" —দারা কুতনী, বাইহাকী

(২) না দেখার কারণে যে জটিলতা (অজ্ঞতা) সৃষ্টি হয়, তা ঝগড়া-বিবাদ পর্যন্ত গড়ায় না। কেননা দেখার পর ক্রেতার পছন্দ না হলে ফেরত দিবে আর বিক্রেতাও ফেরত নিতে বাধ্য থাকবে।

(৩) ইমাম আহমদ ও ইমাম ইসহাক (রহ.)-এর মতে অনুপস্থিত বস্তুর যাবতীয় গুণাবলী বর্ণনা করে দিলে বেচাকেনা সহীহ্ হবে। দেখার পর যদি مبيع বর্ণিত গুণাবলীর সাথে মিলে যায় তাহলে بيع লাযিম হবে এবং ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে না। আর বর্ণিত গুণাবলীর বিপরীত দেখা গেলে ক্রেতার জন্য خيار رؤيت হাসিল হবে। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেঈ থেকে অনুরূপ قول বর্ণিত আছে।

তাঁদের দলীলের জবাব

ইমাম শাফেঈ (রহ.) বর্ণিত দলীলের জবাব হলো ঃ منابذة-এর ক্ষেত্রে ক্রেতার কোন প্রকার اختيار থাকে না তাই بيع منابذة নাজায়িয। কিন্তু بيع شئ غائب-এর ক্ষেত্রে যেহেতু দেখার পর ক্রেতার اختيار থাকে এজন্য

এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নাজায়িয হবে না। সুতরাং অনুপস্থিত বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়কে بيع منابذة-এর মত মনে করার কোন যুক্তি থাকতে পারে না।

৪. بيع التعاطى-এর ব্যাখ্যা

تعاطى অর্থ পরস্পরে আদান প্রদান করা। সাধারণ অর্থে بيع تعاطى বলা হয় ঈজাব ও কবুল ছাড়া ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে ক্রেতা কর্তৃক খরিদা বস্তু এবং বিক্রেতা কর্তৃক বিক্রিত বস্তুর মূল্য গ্রহণ করা। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন بيع منابذه ও بيع ملامسة-এর মধ্যে لمس ও نبذ-কে بيع হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, আর এই দুই প্রকার بيع নাজায়িয হওয়ার কারণ হলো এর মধ্যে ايجاب وقبول পাওয়া যায় না। ঠিক তদ্রূপ بيع بالتعاطى-এর মধ্যেও ঈজাব কবুল না থাকায় এটা بيع ملامسة ومنابذة-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং ওগুলোর ন্যায় بيع بالتعاطى ও নাজায়িয।

কিন্তু ইবনে হাজারের (রহ.) এই কথা সঠিক নয়। কেননা এক্ষেত্রে বস্তু ও মূল্যের আদান প্রদান ক্রেতা ও বিক্রেতার সন্তুষ্টচিত্তে হয়ে থাকে। আর এই সন্তুষ্টি (رضامندى)-ই ঈজাব কবুল হিসেবে বিবেচিত হবে।

ঈজাব ও কবুল মূলতঃ সন্তুষ্টি প্রকাশের জন্যই হয়ে থাকে। সুতরাং অন্য কোন পন্থায় যদি সন্তুষ্টি প্রকাশ করা যায় তাহলে সমস্যা কোথায়?

—ই'লাউস সুনান–খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা ১২৭

দান, সদকা ও হাদিয়া প্রভৃতির মধ্যে সাধারণত تعاطى-এর পন্থাই অবলম্বন করা হয়। এতে ঈজাব কবুল থাকে না। সুতরাং (সর্বক্ষেত্রে) ঈজাব কবুলের শর্ত জুড়ে দিলে মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।

এমনিভাবে بيع بالتعاطى-এর ক্ষেত্রে مبيع-কে দেখে শুনেই গ্রহণ করা হয় অন্যথায় خيار رؤيت থাকত।

এসব দিক বিবেচনা করে بيع بالتعاطى-কে بيع ملامسة ও منابذة-এর কাতারে রাখা ঠিক হবে না।

৫ : لبستين-এর ব্যাখ্যা

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়াতটি নিম্নরূপ ঃ

نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلُبْسَتَيْنِ -

"রাসূল (স.) আমাদেরকে দুই ধরনের ক্রয়-বিক্রয় ও কাপড় পরিধানের দু'টি পদ্ধতিকে নিষেধ করেছেন।" উল্লেখিত হাদীসে পরিধানের পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়নি। তবে অন্যান্য হাদীসে এর পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে।

(১) اشتمال صماء বলা হয় চাদর দ্বারা পুরো শরীরকে এমন ভাবে ঢেকে ফেলা যে, কোন দিকে খোলা যায় না এবং হাতকে ভেতরে এমনভাবে জড়িয়ে রাখা যে, বের করা দুষ্কর হয়ে পড়ে।

যেহেতু এই পরিস্থিতিতে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা সৃষ্টি হয় এজন্য এর নাম রাখা হয়েছে صماء বলে।

صماء মূলত এমন এক ধরনের পাথর যার কোন ছিদ্র নেই। এ ধরনের কাপড়) পরিধান নিষেধ করা হয়েছে ইহুদীদের সাথে সাদৃশ্য থেকে বেঁচে থাকার জন্য। সাথে সাথে এটা জাহান্নামীদের পরিধান পদ্ধতিও বটে। এতে পা পিছলে পড়ে আহত হওয়ার আশংকাও উড়িয়ে দেয়া যায় না।

অবশ্য ফোকাহায়ে কিরাম اشتمال صماء-এর আরেকটি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। যথা ঃ সারা গায়ে একটি মাত্র চাদর জড়িয়ে এক পাশকে মাথার ওপর উঠিয়ে রাখা। এই পদ্ধতিতে লজ্জাস্থান খুলে যায় বলে তা হারাম বলে গণ্য হবে।

(২) احتباء : احتباء বলা হয় নিতম্বের ওপর বসে উভয় পায়ের গোছা খাড়া করে কাপড় বা হাত দিয়ে তা বেঁধে ফেলা। এক কাপড় পরিধান করে এরূপ করলে সতর খুলে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকায় এরূপ করা নিষেধ।

হ্যাঁ, যদি নিচে ভিন্ন কোন কাপড় থাকে তাহলে নিষেধ হবে না। কেননা রাসূল (স.) কোন কোন সময় এরূপ করতেন।

باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذى فيه غرر

অধ্যায় ঃ কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ হওয়া প্রসঙ্গে

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ .

(১) بيع الحصاة ঃ শব্দটির মধ্যে بيع শব্দকে نوع-এর দিকে اضافت করা হয়েছে। যেমন بيع الخيار ، بيع الملامسة ইত্যাদি। আল্লামা ইবনে কাইয়ূম (রহ.) বলেন— وَأَمَّا بَيْعُ الْحَصَاةِ فَهِىَ مِنْ بَابِ اِضَافَةِ الْمَصْدَرِ اِلٰى نُوْعِهِ كَبَيْعِ الْخِيَارِ لا اِلٰى مَفْعُوْلِهِ كَبَيْعِ الْمَيْتَةِ .

অর্থাৎ, بيع الحصاة শব্দটি اضافت-এর ক্ষেত্রে مصدر-কে তার نوع-এর সাথে اضافت করা হয়েছে। যেমন بيع الخيار মাসদারটিকে মাফউলের সাথে اضافت করা হয়নি, যেমন (করা হয়েছে) بيع الميتة (এর মধ্যে)।

অবশ্য بيع الغرر শব্দের মধ্যে بيع-কে مفعول-এর দিকে اضافت করা হয়েছে। এখানে غرر-এর অর্থ مغرور به (তথা اسم مفعول-এর অর্থ প্রদান করছে যার অর্থ প্রতারিত)

بيع الحصاة-এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যেমন—

(১) বিক্রেতা বলবে, আমি তোমার কাছে অনেকগুলো কাপড়ের মধ্য হতে সেটা বিক্রি করলাম যার ওপর আমার নিক্ষিপ্ত কংকর পতিত হবে অথবা বলবে তোমার নিক্ষিপ্ত কংকর যেটার ওপর পতিত হবে সেটা বিক্রি করলাম।

(২) অথবা একথা বলা, আমি তোমার কাছে জমিনের ততটুকু অংশ বিক্রি করলাম, যতটুকু পর্যন্ত তোমার নিক্ষিপ্ত কংকর পৌঁছে।

(৩) হাতে একমুঠো কংকর নিয়ে এরূপ বলা যে, হাতে যে পরিমাণ কংকর আছে বস্তুর মূল্য সে পরিমাণ।

(৪) যতগুলো কংকর থাকবে مبيع ও হবে ততগুলো। যেমন পাঁচটি কংকরের ক্ষেত্রে কাপড় (مبيع) এর সংখ্যা হবে পাঁচটি।

(৫) কংকর হাতে নিয়ে একথা বলা যে, হাত হতে যখন কংকর পড়ে যাবে তখন بيع লাযিম হবে।

(৬) একথা বলা যে, যখন তোমার দিকে কংকরগুলো ছুঁড়ে মারব তখন بيع লাযিম হবে।

(৭) অথবা একথা বলবে যে, তোমার দিকে কংকর ছুঁড়ে মারার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তোমার ইখতিয়ার থাকবে।

بيع الحصاة-এর বর্ণিত সকল পদ্ধতি ফাসিদ এবং নাজায়িয। কেননা এটা জাহিলী যুগের একটি بيع এবং অস্পষ্টতা থাকার কারণে এর মধ্যে ধোঁকা ও প্রতারণার সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান।

হুযূর (সা.) بيع الحصاة-এর সাথে সাথে بيع الغرر-কেও নিষেধ করেছেন। মূলত بيع الغرر-কে আলাদা উল্লেখ করাটা تعميم بعد التخصيص-এর অন্তর্ভুক্ত। এরূপ উল্লেখ করার কারণ হলো ধোঁকা-প্রতারণাকে সমূলে নিপাত করা। আসলে এই অধ্যায়টি নানাবিধ বেচাকেনা সম্পর্কে। আর এটা একটা قاعدة كلية এবং মৌলিক উসূল যে, যেখানেই ধোঁকা-প্রতারণার গন্ধ পাওয়া যাবে সেখানেই ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হবে। যেমন— بيع معدوم (অস্তিত্বহীন বস্তু বিক্রি করা) بيع مجهول পলায়নকারী গোলাম বিক্রয়, আকাশে উড়ন্ত পাখি বিক্রি করা, পানির নিচে থাকা মাছ বিক্রি করা, পশু-প্রাণীর পেটের বাচ্চা আগাম বিক্রয় করা।

হ্যাঁ, বস্তুর অজ্ঞতা (অস্পষ্টতা) যদি কম হয় এবং এ ধরনের লেনদেনের প্রতি মানুষ মুখাপেক্ষী হয়, সেই সাথে মানুষের রীতি অনুযায়ী যদি এ ধরনের جهالت ঝগড়া-ঝাটি সৃষ্টি না করে তাহলে তা জায়িয হবে।

যেমন, গোসলখানা ভাড়া নিয়ে ব্যবহার করা। এটা জায়িয অথচ গোসলখানায় কি পরিমাণ পানি ব্যবহৃত হবে তা জানা যায় না। বিস্তারিত ফিকাহর কিতাবে বিদ্যমান।

باب تحريم بيع حبل الحبلة

অধ্যায় ঃ গর্ভের বাচ্চা বিক্রি করা হারাম হওয়া প্রসঙ্গে

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ نَهٰى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ.

(১) حبل الحبلة উভয় শব্দে باء ফাতাহার সাথে এবং এটিই বিশুদ্ধ কেউ حبل-এর ب-কে সাকিন করে পড়েছেন, এটা ভুল। حبل শব্দটি مصدر অর্থ حمل (গর্ভ)। আর حبلة - حابل-এর বহুবচন। যেমন ظالم-এর বহুবচ ظلمة এবং فاجر-এর বহুবচন فجرة

حبل শব্দটি মূলতঃ মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন حبلت المرأة তবে কোন কোন সময় মানুষ ভিন্ন অন্য প্রাণীর ক্ষেত্রেও তা প্রয়োগ হয়। যেম এই হাদীসে এসেছে।

(২) بيع حبل الحبلة-এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে।

(ক) কোন জিনিস ক্রয় করে এর মূল্য পরিশোধের সময় নির্ধারণ ক গর্ভবতী প্রাণী বাচ্চা প্রসব করা পর্যন্ত। যেমন এরূপ বললো, যেদিন আমার এ গর্ভবতী উট বাচ্চা প্রসব করবে সেদিন তোমার মূল্য পরিশোধ করব।

ব্যাখ্যাটি হযরত نافع থেকে বর্ণিত। ইমাম শাফেঈ, মালেক ও একদ ওলামা এই মতের সমর্থক।

(খ) গর্ভবতী প্রাণী বাচ্চা প্রসব করার পর সেই বাচ্চা বড় হয়ে যখন গর্ভবতী হবে সেই গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত মূল্য পরিশোধের সময় নির্ধারণ করা। যেদিন এই গর্ভবতী প্রাণীর বাচ্চা গর্ভবতী হয়ে বাচ্চা প্রসব করবে সেদিন মূল্য পরিশোধ করা হবে। এটি হযরত ইবনে ওমরের (রা.) ব্যাখ্যা।

(গ) গর্ভবতী প্রাণীর গর্ভের বাচ্চা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গর্ভ ধারণ পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করা। (আগেরটার সাথে পার্থক্য এতটুকু যে, সেখানে গর্ভ খালাসের শর্ত ছিল কিন্তু এখানে শুধু গর্ভ ধারণের শর্ত করা হয়েছে) খালাসের শর্ত করা হয়নি।

(ঘ) গর্ভবতী প্রাণীর গর্ভের বাচ্চা অথবা গর্ভের বাচ্চার গর্ভকে আগেভাগেই বিক্রি করা। অভিধান অনুযায়ী এই মতটিই বিশুদ্ধতম। ইমাম আহমদ (রহ.) ও ইসহাক (রহ.) এই মত পোষণ করেছেন। حبل الحبلة-এর উল্লেখিত সকল

প্রকার বেচাকেনা নাজায়িয। প্রথম তিনটিতে মূল্য পরিশোধের সময় অজ্ঞাত থাকার কারণে এবং চতুর্থটিতে معدوم ও مجهول ক্রয়-বিক্রয়ের কারণে এবং অর্পণে অক্ষম বস্তু বিক্রি করা لازم আসার কারণে।

باب تحريم بيع الرجل على بيع اخيه وسومه على سومه وتحريم النجش

অধ্যায় ঃ অপরজনের কেনাকাটার সময় কেনাকাটা এবং দালালী করা হারাম হওয়া প্রসঙ্গে

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ وَلاَ يَخْطُبُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ اِلاَّ اَنْ يَّأْذَنَ لَهٗ ، وفى رواية عن اَبِىْ هُرَيْرَةَ ان رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلٰى سَوْمِ اَخِيْهِ وفى رواية عنه ان رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلاَ تَنَاجَشُوْا ـ

এই অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকারের মাসআলা বর্ণিত হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে নিম্নে আলোচনা করা হচ্ছে।

১। بيع البعض على البعض

بيع البعض على البعض-এর পদ্ধতি হলো ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে কোন বস্তু নির্ধারিত মূল্যে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি করে ফেলেছে এখন শুধু নেয়া বাকি। এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি এসে ক্রেতাকে বললো, আমি এরচে' ভালো জিনিস এরচে' কম দামে দেব অথবা বললো, এই দামে এরচে' ভালো জিনিস দেব।

একথা সুস্পষ্ট যে, এর দ্বারা মালওয়ালা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ কারণে এরূপ করা মাকরূহ।

২। شراء البعض على البعض

شراء البعض على البعض-এর পদ্ধতি হলো—ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে কোন নির্দিষ্ট মূল্যের ওপর চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর এক ব্যক্তি এসে বিক্রেতাকে বললো, আমি এরচে' বেশি দামে জিনিসটি নেব এটা আমাকে দিয়ে দাও। যেহেতু প্রথম ক্রেতা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে তাই এ ধরনের আচরণ নিশ্চয় মাকরূহ হবে।

অবশ্য ক্রেতা-বিক্রেতা যদি কেবলমাত্র বেচাকেনায় দামাদামি করতে থাকে এখনো চুক্তিবদ্ধ হয়নি, এমতাবস্থায় তৃতীয় ব্যক্তি এসে ক্রয় করে নিলে মাকরূহ হওয়া ছাড়াই بيع সহীহ্ হবে। بيع من يزيد - তথা নিলামের মধ্যে যেমনটা হয়ে থাকে।

৩। بيع من يزيد / بيع المزايدة (نيلام) (নিলাম)।

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন— لايسم المسلم على سوم اخيه ।

অর্থাৎ কোন মুসলমান যেন অপর মুসলমান ভাইয়ের দামাদামী করাকালীন নিজের জন্য দামাদামী না করে। এই হাদীসের ভিত্তিতে অনেকে নিলাম বিক্রয়কে নাজায়িয মনে করেন। যেমন ঃ

১। ইমাম ইবরাহীম নখয়ীর (রহ.) মতে সর্বাবস্থায় بيع من يزيد (নিলাম) নাজায়িয।

২। ইমাম আওযাঈ ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে শুধু মাত্র গনীমত ও ওয়ারিসী মালের মধ্যে জায়িয অন্যগুলোতে নাজায়িয।

৩। জমহুর ওলামা ও ইমামগণের মতে নিলাম বিক্রি নিঃশর্তে (মতলক) জায়িয। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (সা.) একটি পেয়ালা ও কাপড় বিক্রি করার উদ্দেশ্যে বললেন, কে এই দু'টি জিনিস খরিদ করবে? এক ব্যক্তি বললো, এক দিরহাম দিয়ে আমি এ দু'টি কিনলাম। রাসূল (সা.) বললেন, من يزيد على هذا؟-কে এর চেয়ে বেশি দেবে? অপর ব্যক্তি বললো, আমি দুই দিরহাম দিব। রাসূল (সা.) দ্বিতীয় ব্যক্তিকে পেয়ালা ও বস্ত্রখণ্ড দিয়ে দিলেন। (اخرجه اصحاب السنن الاربعة) সুতরাং باب حديث-এ বর্ণিত شراء ، بيع এবং سوم বলে যে নিষেধাজ্ঞার কথা বলা হয়েছে সেটা হলো মূল্য নির্ধারণের এবং একে অপরের প্রতি আকর্ষিত হওয়ার পর। আর بيع من يزيد (নিলাম বিক্রি) চুক্তিবদ্ধ ও মূল্য নির্ধারণের আগে হয়ে থাকে। সুতরাং بيع من يزيد এবং بيع البعض على البعض এক রকম নয়।

আল্লামা ইবনে কুদামা (রহ.) বলেন, ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে لايسم الرجل على سوم اخيه হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসের চারটি সূরত হতে পারে।

১। বিক্রেতার পক্ষ থেকে بيع সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ সন্তুষ্টি পাওয়া গেছে। এক্ষেত্রে السوم على اخيه নাজায়িয হবে। আর নিষেধাজ্ঞার হাদীস এই সূরতকে কেন্দ্র করেই বর্ণিত হয়েছে।

২। বিক্রেতা কর্তৃক এমন কোন নিদর্শন প্রকাশ পাওয়া যার দ্বারা বিক্রিতে সে সন্তুষ্ট নয় বুঝায়। এই সূরতে سوم নাজায়িয হবে না। কেননা রাসূল (সা.) নিজেও নিলাম (بيع من يزيد) করেছেন। মুসলিম উম্মাহর ইজমা সাবেত হয়েছে এর বৈধতার ব্যাপারে। সাহাবাগণ বাজারে بيع بالمزايدة করতেন।

৩। বিক্রেতা কর্তৃক সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি কোনকিছুই প্রকাশ পায়নি। এক্ষেত্রেও سوم এবং زيادة নাজায়িয হবে না। দলীল ঃ ফাতিমা বিনতে কায়েসের হাদীস ঃ তিনি হুযূর (সা.)-এর কাছে উল্লেখ করলেন যে, মু'আবিয়া ও আবূ জাহাম (রা.) তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিচ্ছেন। হুযূর (স.) তাঁকে উসামাকে বিবাহের পরামর্শ দিলেন। অথচ হুযূর (সা.) একজনের পয়গামের ওপর আরেকজনের পয়গাম দেয়াকে নিষেধ করেছেন। যেমন একজনের سوم-এর ওপর অপরজনের سوم-কে নিষেধ করেছেন। সুতরাং নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও একটি যে কারণে বৈধ হবে সেই কারণ এরূপই অন্য বিষেধাজ্ঞায় পাওয়া গেলে তা অবশ্যই জায়িয হবে।

৪। বিক্রেতা কর্তৃক স্পষ্ট করে কিছু বলা ছাড়া বিক্রির ওপর সন্তুষ্টি প্রকাশ পাওয়া। কাজি বলেন, এক্ষেত্রে مساومة নিষেধ নয়। বর্ণিত আছে, আহমদ (রহ.) হযরত ফাতিমা বিনতে কায়েসের হাদীস দ্বারা এর বৈধতার ওপর দলীল পেশ করেছেন। —মুগনী, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৭৯

দালালী করা ঃ نجش

قوله عليه السلام : وَلَا تَنَاجَشُوْا وَفِيْ رِوَايَةٍ نَهْىٰ عَنِ النَّجَشِ ـ

نجش-এর শাব্দিক অর্থ

نجش بفتح النون وسكون الجيم ويجوز فتحُ الجيم ايضا-এর অর্থ ঃ উত্তেজিত করা, উৎসাহিত করা, দালালী করা।

معناه اللغوى اثارة الصيد وتنفيره من مكان الى مكان-এর শাব্দিক অর্থ, পাখি উড়ানো। একস্থান থেকে আরেক স্থানে তাড়িয়ে দেয়া। বলা হয় نجشت الصيد আমি শিকার উড়িয়ে দিয়েছি।

বলা হয়ে থাকে نجش-এর শাব্দিক অর্থ ধোঁকা, প্রশংসা করা, সীমাতিরিক্ত প্রশংসা করা।

نجش-এর পারিভাষিক অর্থ

اَنْ يَزِيْدَ الرَّجُلُ فِىْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ لاَ لِرُغْبَةٍ فِىْ شِرَاءِهَا بَلْ لِيَخْدَعَ غَيْرَهٗ لِيَزِيْدَ وَيَشْتَرِيْهَا . অর্থাৎ শুধুমাত্র অন্যকে প্রতারিত ও বেশি মূল্যে খরিদ করতে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বস্তুর মূল্য বাড়িয়ে বলা। অথচ খরিদ করার আদৌ কোন ইচ্ছা নেই তার। অথবা বস্তুটিকে বাজারজাত করতে মিথ্যা প্রশংসা করা।

দালালীর হুকুম

নাজাশ তথা দালালী করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। বিক্রেতার নির্দেশ ছাড়া কিংবা বিক্রেতার অজ্ঞাতে কেউ যদি এরূপ করে তাহলে শুধু মাত্র সেই গোনাহগার হবে। আর যদি উভয়ের যোগসাজশে হয় তাহলে উভয়েই গুনাহগার হবে। হ্যাঁ, যদি এরকম হয় যে, নির্বুদ্ধিতার কারণে বিক্রেতা প্রতারিত হয় কিংবা লোকেরা বাজারদরের চেয়ে কম দিয়ে বিক্রেতার কাছ থেকে খরিদ করে নেয় তাহলে তাকে শুধুমাত্র ন্যায্যমূল্য পাইয়ে দেয়ার জন্য অতটুকু পরিমাণ নাজাশ করতে পারবে যদ্বারা সে ন্যায্যমূল্য পায়। এক্ষেত্রে সে আল্লাহ্‌র কাছে প্রতিদান পাবে। কেননা সে অন্যের ক্ষতি করা ছাড়া নিজের মুসলমান ভাইয়ের উপকার করছে। —ফত্‌হুল বারী, দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার

এ পদ্ধতিতে সংঘটিত বিক্রয়ের হুকুম

দালালের হস্তক্ষেপে যে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হয়েছে হানাফী ও শাফেঈ মাযহাব অনুযায়ী তা বিশুদ্ধ বলে গণ্য হবে। অবশ্য দালালী করার কারণে সে গোনাহগার হবে। আহলে জাহের এবং ইমাম মালেক ও আহমদের এক قول অনুযায়ী এই بيع বাতিল বলে গণ্য হবে।

আহমদের আরেক قول অনুযায়ী بيع সহীহ্। তবে অতিরিক্ত চড়া মূল্যের

ক্ষেত্রে ক্রেতার خيار فسخ হাসিল হবে। অবশ্য আমাদের আহনাফের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী গুনাহ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় فسخ করা দ্বীনদারী রক্ষার্থে (ديانة) ওয়াজিব। —রদ্দুল মুহ্তার

باب تحريم تلقى الجلب

অধ্যায় ঃ শহরের বাইরে গিয়ে মাল খরিদ করা হারাম হওয়া প্রসঙ্গে

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ تَتَلَقَّى السِّلَعَ حَتّٰى تَبْلُغَ الْاَسْوَاقَ وفى رواية نهى عَنِ التَّلَقِّىْ وفى رواية نهى عَنْ تَلَقِّى الْبُيُوْعِ وفى رواية عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّتَلَقَّى الْجَلَبَ وَفِى رواية عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تَلَقُّوْا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرٰى مِنْهُ فَاِذَا اَتٰى سَيِّدُهُ بِالسُّوْقِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ ـ

تلقى الجلب-এর অর্থ এবং এটা নিষেধ হওয়ার হিকমত ঃ

تلقى ـ تفعل ـ باب-এর মাসদার। অর্থ, মিলিত হওয়া, এস্তেক্‌বাল করা, অগ্রসর হওয়া। جلب ، جالب-এর বহুবচন। যেমন— خدم ـ خادم-এর বহুবচন।

جالب বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যে ব্যবসায়ী মালামাল নিয়ে শহরে আগমন করে।

تلقى جلب-এর অর্থ এই দাঁড়াচ্ছে যে, কোন কাফেলা মালামাল নিয়ে শহরে প্রবেশ করার আগেই সেই মাল কিনে ফেলা।

এরূপ করা নিষেধ দুই কারণে। (১) বিক্রেতার ক্ষতি। কেননা শহরে প্রবেশের আগেই রাস্তাতেই এই মালামাল বিক্রি করলে বিক্রেতা প্রতারিত হতে পারে। হতে পারে ক্রেতা বিক্রেতাকে দাম যাচাইয়ের সুযোগ না দিয়ে কমমূল্যে কিনে ফেলবে।

(২) শহরবাসীর ক্ষতি। কেননা শহরে পৌঁছার আগেই কিনে ফেলা মালামাল (متلقى) স্বেচ্ছাচারিতামূলক অধিক মূল্যে বিক্রি করবে।

تلقى الجلب-এর হুকুম

تلقى جلب নাজায়িয ও মাকরূহ হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। তবে ইমাম শাফেঈ, আহমদ, মালেকের মতে تلقى جلب (مطلقا) বিনা শর্তে মাকরূহ।

আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলেছেন, উল্লেখিত ইমামগণ এ প্রকারের ক্রয়-বিক্রয়কে মাকরূহ বললেও কেউই হারাম বলেননি। ফেকাহর একটি উসূল হলো, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি যদি 'আনুষাঙ্গিক" হয় তাহলে এই ক্রয়-বিক্রয় (بيع) টি মাকরূহ বলে বিবেচিত হয়। আর ত্রুটি যদি 'পুরো সংশ্লিষ্ট' (وصف متصل) হয় তাহলে ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ বলে বিবেচিত হয়। —হাশিয়ায়ে হিদায়া, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫০

আর আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে متلقى যদি জিনিস পত্রের প্রকৃত মূল্য গোপন করে ক্রয় করে অথবা এতে শহরবাসী ক্ষতির সম্মুখীন হয় তাহলে মাকরূহ, অন্যথায় মাকরূহ নয়।

হাদীসে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে এটা মূলতঃ মূল্য গোপন করা ও শহরবাসীর ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে যে ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আল্লামা ইবনে হুমাম (রহ.)ও ঐই জওয়াব প্রদান করেছেন। দেখুন-আইনী, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪২৬, বযলুল মাজহুদ খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৬৮, তা'লীক খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩২৬ ইত্যাদি।

এভাবে সংঘটিত ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম

এরকম পন্থায় بيع যদি হয়েই যায় তাহলে জমহুর ওলামাদের মতে সেটা বৈধ বলেই গণ্য হবে। তবে متلقى গুনাহগার হবে। আর আহলে জাহেরের মতে এই পন্থায় সংঘটিত بيع বাতিল বলে গণ্য হবে।

শাফেঈ ও হাম্বলীদের মতে শহরে পৌছার পর جالب (বিক্রেতা) এর بيع-কে فسخ করার অধিকার থাকবে।

আহনাফের মতে বিষয়টি কিছুটা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। যথা ঃ

ক্রেতা যদি جالب-কে শহরের মূল্যের কম মূল্য দিয়ে প্রতারিত করে থাকে তাহলে এই প্রতারণতার দু'টি দিক রয়েছে।

(১) غرر قولى কথার মাধ্যমে প্রতারণা করা। অর্থাৎ বিক্রেতাকে বললো,

যে মূল্যে ক্রয় করছি শহরে এর মূল্য এরকমই। অথচ শহরে মূল্য আরও বেশি। এক্ষেত্রে قضاءً (বিচার প্রক্রিয়ায়) বিক্রেতা خيار فسخ-এর অধিকারী হবে।

(২) غرر فعلى ঃ অর্থাৎ কোন কিছু না বলে কম দামে খরিদ করেছে। এ ক্ষেত্রে ديانة (দ্বীনদারির চাহিদা অনুযায়ী) خيار فسخ-এর অধিকারী হবে কিন্তু قضاء (বিচার প্রক্রিয়ায়) فسخ-এর ইখতিয়ার পাবে না।

باب تحريم بيع الحاضر للبادى

অধ্যায় ঃ শহুরে ব্যক্তি গ্রাম্য ব্যক্তির পক্ষ হয়ে ক্রয়-বিক্রয় করা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ نَهٰى اَنْ يَّبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ .

حاضر অর্থ শহুরে মানুষ আর باد অর্থ গ্রাম্য মানুষ। ওলামায়ে কিরাম بيع الحاضر لباد-এর দু'টি ব্যাখ্যা করেছেন।

১ম ব্যাখ্যা ঃ গ্রাম্য মানুষ ব্যবসায়ী মালামাল শহরে এনে নিত্যদিনের (ভাও) মূল্য অনুযায়ী বিক্রি করার ইচ্ছাপোষণ করলে শহুরে এক ব্যক্তি বললো, বেচাকেনা সম্পর্কে আমি ভালো অভিজ্ঞ। তুমি এগুলো আমার কাছে রেখে যাও। সময় নিয়ে আমি অধিক মূল্যে বিক্রি করে দেব।

এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী لباد শব্দে لام অক্ষরটি لام توكيل হিসেবে গণ্য হবে। نهى ان يبيع حاضر لباد-এর অর্থ হবে, "হুযূর (সা.) শহুরে ব্যক্তিকে গ্রাম্য ব্যক্তির উকিল হয়ে বেচাকেনা করতে নিষেধ করেছেন।"

حكم ঃ জমহুরের মতে হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী এটা مطلقا (বিনা শর্তে) মাকরূহ। আহনাফের মতে এর দ্বারা শহরবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হলে মাকরূহ, অন্যথায় মাকরূহ নয়, জায়িয। আহনাফ বলেন, হাদীসে নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো, معلول بعلة তথা শহরবাসীর ক্ষতি দূর করার জন্য নিষেধ করা হয়েছে।

হিদায়া প্রণেতা বলেন—মাকরূহ ও নিষেধ হওয়ার মূল কারণ শহরে দুর্ভিক্ষ ও মঙ্গা অবস্থা বিরাজ করা। শহরে যদি স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করে তাহলে এতে কোন দোষ নেই। —হিদায়া খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫১

হযরত জাবের (রা.) এর হাদীস এবং মুজাহিদ (রহ.)-এর বক্তব্য এই মতের সমর্থন যোগায়। যেমন—

(১) এই অধ্যায়েই হযরত জাবের (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যথা ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ـ

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ اِنَّمَا نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لاَنَّهُ اَرَادَ اَنْ يُصِيْبَ الْمُسْلِمُوْنَ غِرَّتَهُمْ فَاَمَّا الْيَوْمَ فَلاَ بَأْسَ ـ

বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের আলোকে একথা বুঝা যায় যে, শহরবাসীর যদি কোন প্রকার ক্ষতি না হয় তাহলে গ্রাম্য ব্যক্তির উপকারার্থে শহুরে ব্যক্তির এই বেচাকেনা "নসীহত এবং কল্যাণকামী'র" মধ্যেই গণ্য হবে। আর রাসূল (সা.) বলেছেন— الدين النصيحة। (দ্বীন অপরের কল্যাণ কামনার নাম)।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা ঃ দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি করেছেন হিদায়া প্রণেতা। ব্যাখ্যাটি হলো لباد-এর ل হরফটি من-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং ان يبيع حاضر لباد ای من باد-এর অর্থ হলো শহুরে ব্যবসায়ী অধিক মুনাফা লাভের আশায় শুধু গ্রাম্য ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে; শহরবাসীর কাছে বিক্রি করে না। শহরবাসী এতে ক্ষতিগ্রস্ত না হলে কোন অসুবিধা নেই। এরূপ করতে পারবে।

বিঃ দ্রঃ হিদায়া প্রণেতা বর্ণিত এই ব্যাখ্যার তুলনায় আগের ব্যাখ্যাটি অধিক বিশুদ্ধ।

এরূপ পদ্ধতিতে সংঘটিত ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম

কোন ব্যক্তি যদি হাদীসের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এ পন্থায় বেচাকেনা করে তাহলে এর হুকুম কী? হানাফী, মালেকী, শাফেঈ এবং আহমদ (রহ.)-এর এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী এ ক্ষেত্রে بيع সহীহ্ হবে তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি গুনাহগার হবে। আর আহমদ (রহ.)-এর দ্বিতীয় রেওয়ায়াত এবং ইবনে হাযম ও কতিপয় আহলে জাহেরের মতে এই بيع মোটেই সহীহ্ হবে না, বাতিল বলে গণ্য হবে।

باب حكم بيع المصراة

অধ্যায় ঃ স্তনে দুধ জমিয়ে রাখা বকরী-উষ্ট্রী বিক্রি করার হুকুম

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ اشْتَرٰى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلِبْهَا فَإِنْ رَضِىَ حَلاَبَهَا أَمْسَكَهَا وَإِلاَّ رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمَرٍ وَفِىْ رِوَايَةِ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيْهَا بِالْخِيَارِ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمَرٍ .

হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি স্তনে দুধ আবদ্ধ বকরি ক্রয় করে অতঃপর (বাড়ি) ফিরে একে দোহন করে কাঙ্ক্ষিত দুধ না পায়) এবং এতেই সন্তুষ্ট হয় তাহলে এটাকে রেখে দিবে অন্যথায় এক সা' খেজুর সহ বকরিটি ফেরৎ দিবে।

অন্য রেওয়ায়াতে এসেছে, যে ব্যক্তি স্তনে দুধ আবদ্ধ বকরি খরিদ করল তার জন্য তিনদিনের خيار থাকবে। ইচ্ছা করলে রেখে দিবে অন্যথায় এক সা' খেজুর সহ ফেরত দিবে।

১। مصراة-এর শাব্দিক বিশ্লেষণ

مصراة শব্দটি تصرية মাসদারের اسم مفعول-এর সীগা। تصرية-এর শাব্দিক অর্থ আবদ্ধ রাখা, আটকে রাখা। বলা হয় صريت الماء اى حبسته আমি পানি আটকে রেখেছি।

المنجد। অভিধান প্রণেতা লেখেন—এর অর্থ প্রতিহত করা, দূরীভূত করা। যেমন আরবীতে বলা হয়— صرى الله عنه الشرى "আল্লাহ্ তা'আলা তার অমঙ্গল দূর করেছেন।"

باب سمع থেকে পানি আটকে রাখার অর্থে এবং باب تفعيل থেকে বকরী, গাভী ইত্যাদি দোহন না করার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

আবূ উবাইদা সহ অধিকাংশ অভিধানবিদ এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ কেউ বলেন, مصراة শব্দটি صَرٌّ (বাঁধা) থেকে গঠিত হয়েছে। باب تفعيل-এ مصدر (مصررفة-এর ওযনে) হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু একই শব্দে তিনটি ر.।

জমা হয়ে যাওয়ায় শেষোক্ত راء-কে ياء দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। যেরূপভাবে تَظَنَّنْتُ-এর মধ্যে তিন نون একত্রিত হওয়ার কারণে শেষোক্ত نون-কে ياء দ্বারা পরিবর্তন করে تَظَنَّيْتُ পড়া হয়।

এখন নিয়মানুসারে مصرية-এর ياء-কে الف দ্বারা পরিবর্তন করে مصراة বানানো হয়েছে।

২। مصراة-এর পারিভাষিক অর্থ

পারিভাষিক অর্থে مصراة বলা হয় এমন দুধালো প্রাণীকে যার দুই তিন দিন যাবত দোহন না করে স্তনে জমা করা হয়, যাতে ক্রেতা অধিক দুধালো মনে করে বেশি দামে ক্রয় করে।

আরববাসী যেহেতু উট ও বকরি পালন করত এজন্য আলোচনায় এ দু'টির নাম এসেছে, অন্যথায় গাভীরও একই হুকুম।

৩। بيع المصراة-এর হুকুম

হাদীসে مصراة বিক্রি করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা এতে ধোঁকা ও প্রতারণার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে জমহুর ওলমায়ে কিরামের মতে شاة مصراة ইত্যাদি বিক্রয় করলে ক্রয়-বিক্রয় কার্যকর হবে। তবে দুধ দোহন করার পর প্রত্যাশিত দুধ না পেয়ে ক্রেতা এক্ষেত্রে কী করবে এ সম্পর্কে ওলামাগণের বিভিন্ন মত পাওয়া যায়।

১। এই অধ্যায়ের হাদীসে ক্রেতাকে এই ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে যে, দুধ দোহন করার পর সে যদি এতেই সন্তুষ্ট থাকে তাহলে প্রাণীটকে (مصراة) কে রেখে দিবে অন্যথায় ফেরত দিবে। তবে প্রাপ্ত ঐ দুধের বদলায় এক সা' পরিমাণ খেজুর দিতে হবে।

হাদীসের বাহ্যিক অর্থের ওপর আমল করে ائمة ثلثة এবং ইমাম কাজী আবূ ইউসুফ (রহ.) বলেন, تصرية মূলতঃ একটি عيب যার কারণে مبيع-কে ফেরত দেয়া যাবে। এ পর্যন্ত উল্লেখিত ইমামগণ একমত পোষণ করেছেন কিন্তু তাফসীলের ক্ষেত্রে মতানৈক্য করেছেন।

✪ ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন—দোহনকৃত ঐ দুধের বদলায় এক সা' পরিমাণ খেজুর পরিশোধ করা ওয়াজিব চাই দুধ কম হোক বা বেশি। আর দুধের বদলায় খেজুরই প্রদান করতে হবে অন্য কিছু আদায় করা যাবে না।

✪ মালেকী মাযহাবের কতিপয় আলিম বলেন, শহরে যে ধরনের খাবারের প্রচলন বেশি (غالب قوة البلد) সেগুলো থেকে এক সা' পরিমাণ আদায় করতে হবে।

✪ ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) বলেন, দুধের মূল্য পরিশোধ করতে হবে, এর মূল্য যতই হোক না কেন, কম হলে কম আর বেশী হলে বেশী।

✪ ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মাদ (রহ.) বলেন— تصرية কোন ত্রুটি নয় যে, এর কারণে مبيع-কে ফেরত দেয়া যাবে। হ্যাঁ, ক্রেতা رجوع بالنقصان করতে পারবে অর্থাৎ বেশি দুধ মনে করে যে পরিমাণ মূল্য বেশি দিয়েছিল সে পরিমাণ মূল্য ফেরত নিয়ে নিবে। কেননা মূল্য নির্ধারিত হয় ذات (সত্ত্বার প্রতি) লক্ষ্য করে, اوصاف-এর প্রতি লক্ষ্য করে নয়। আর প্রাণীটি যদি ফেরত দেয় তাহলে প্রাপ্ত দুধের কোন বদলা দিতে হবে না। কেননা এটি তার যিম্মায় ছিল। সুতরাং নিয়ম অনুযায়ী মুনাফার (দুধের) মালিক হবে ক্রেতা (অতএব এর কোন বদলা দিতে হবে না)।

ইমামদের দলীল

বর্ণিত হাদীসের দু'টি অংশ। (১) ثبوت الخيار للمشترى بعيب التصرية تصرية জনক ত্রুটি (عيب) থাকার কারণে ক্রেতার خيار থাকা (২) رد صاع من التمر مكان ما حلبه من اللبن -অর্থাৎ দোহন করা দুধের বদলায় এক সা' পরিমাণ খেজুর প্রদান করা।

ইমাম শাফেঈ (রহ.) হাদীসের উভয় অংশের বাহ্যিক অর্থের ওপর আমল করেন। ইমাম মালেক (রহ.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) প্রথম অংশে হাদীসের বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী আমল করেন (ফতওয়া দেন) এবং দ্বিতীয় অংশে তাবীল করেন। সুতরাং ইমাম মালেক বলেন—খেজুর যেহেতু ঐ সময়ে শহরের প্রধান খাদ্য (غالب قوة بلد) ছিল এজন্য এর আলোচনা এসেছে অন্যথায় মূলতঃ حكم হলো غالب قوة بلد-এর ওপর। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) বলেন, ক্রেতার ওপর ওয়াজিব হলো দুধের মূল্য পরিশোধ করা। ঐ যুগে সাধারণতঃ এই পরিমাণ দুধ এক সা' খেজুরের সমমূল্য হতো তাই হুযূর (সা.) খেজুরের কথা বলেছেন, অন্যথায় আসল হুকুম তো মূল্যের ওপর। আর ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (রহ.) উভয় অংশে تاويل করেন, বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী আমল করেন না।

আহ্নাফের ওপর প্রশ্ন

এই মাসআলার ব্যাপারে বিরোধীগণ খুব জোরেশোরে এই প্রশ্ন করেন যে, আহনাফ শুধু কিয়াসের ওপর ভিত্তি করে এরকম একটি বিশুদ্ধ হাদীসের ওপর আমল করেন না যার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন নেই। এই হাদীসকে পাত্তাই দেন না তাঁরা।

আহ্নাফের পক্ষ থেকে জবাব

হানাফীগণ শুধুমাত্র কিয়াসের ওপর ভিত্তি করে হাদীসের বাহ্যিক অর্থের ওপর আমল তরক করেন না বরং হাদীসের বাহ্যিক অর্থ কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত اصول عام এবং قاعدة كليات-এর খেলাফ হওয়ার কারণে এরূপ করে থাকেন। তাঁরা হাদীসটির এমন সমন্বিত ব্যাখ্যা প্রদান ও তার ওপর আমল করেন যা আম উসূল ও كليات-এর সম্পূর্ণ موافق আর এটা কোন অযৌক্তিক কথাও নয়। কেননা এমন অনেক হাদীস আছে যার বাহ্যিক অর্থ قواعدكلية-এর খেলাফ হওয়ার কারণে সবাই হাদীসের ظاهری معنٰی-কে পরিত্যাগ করেন। উদাহরণস্বরূপ এখানে কয়েকটি হাদীস পেশ করা হলো ঃ

(১) মদপানকারীর ব্যাপারে হযরত মু'আবিয়া (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। বলা হয়েছে ঃ

عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ فَاِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوْهُ - رواه الترمذى ٢٦٧/١

(চতুর্থবার মদপান করলে তাকে হত্যা কর)। অথচ চতুর্থবার মদ পান করলে কোন ইমাম তাকে হত্যা করার কথা বলেন না।

(২) রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন—

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفْقَتِهِ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَعَلَى الَّذِىْ يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفْقَةُ - رواه البخارى ٣٤١/١

(বন্ধক রাখা প্রাণীর ওপর সওয়ার হওয়া যাবে) সমস্ত ফোকাহায়ে কিরাম এই হাদীসের বাহ্যিক অর্থ তরক করেছেন।

(৩) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কোন প্রকার ওযর ছাড়াই রাসূল (সা.) মদীনাতে جمع بين صلاتين (দুই নামায একসাথে আদায়) করেছেন।

অথচ কোন ফকীহ মুকিম অবস্থায় কোন প্রকার ওযর বা বৃষ্টিজনিত সমস্যা ছাড়া جمع بين صلاتين-এর অনুমতি দেন না। এরকম বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। অতএব حديث مصراة-এর ظاهرى معنى পরিত্যাগ করার কারণে আহনাফের ওপর বিদ্বেষ ছড়ানো, অপবাদ দেয়া কতটুকু ইনসাফ হবে তার বিচার করবেন বিজ্ঞ পাঠক সমাজ!

বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল দেয়ার জওয়াব

(১) حديث مصراة দ্বারা দলীল প্রদানের জবাবে কতক লোক একথা বলেন যে, এই হাদীসের রাবি হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) ফকীহ ছিলেন না। আর কিয়াসের বিপরীত কোন রেওয়ায়াত যদি غير فقيه রাবী বর্ণনা করেন সেটার ওপর আমল করা হয় না। (সুতরাং حديث مصراة দ্বারা যাঁরা নিজেদের মাযহাবের স্বপক্ষে দলীল পেশ করেন তাঁদের দলীল পেশ করাটা সঠিক নয়)।

কিন্তু এই জওয়াবটি সঠিক নয়, এটা আবূ হুরাইরা (রা.)-এর সাথে শিষ্টাচার বহির্ভূত একটি কথা। একথা ইমাম আবূ হানীফাও (রহ.) বলেননি এবং তাঁর উল্লেখযোগ্য কোন শাগরিদও বলেননি।

কেউ কেউ অবশ্য ঈসা ইবনে আবান (রহ.)-কে এর জওয়াবদাতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু এর মধ্যে কথা আছে। কেননা ইমাম ত্বহাভী (রহ.) অন্য এক ব্যক্তি থেকে এরকম জবাব বর্ণনা করেছেন ঈসা (রহ.) থেকে নয়। দ্বিতীয়তঃ ঈসা ইবনে আবানের (রহ) মত এরকম একজন ব্যক্তিত্ব হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) সম্পর্কে এমন কথা বলবেন তা বিশ্বাস করা যায় না। (কেননা তিনি জানতেন) আবূ হুরাইরা (রা.) শুধু ফকীহ-ই নন মুজতাহিদও বটে। হুযূর (সা.)-এর জমানায় ফতওয়া দিতেন। তিনি অন্যতম একজন ফতওয়াবিদ ইমাম ছিলেন। আর আবূ হুরাইরা (রা.) যে এককভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাও নয় বরং সাহাবাদের বিরাট এক জামাত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (ফত্হুল বারীতে তাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে) افقه الناس (সর্বশ্রেষ্ঠ ফকীহ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদও (রা.) এরকম ফতওয়া দিয়েছেন। (كما ذكر البخارى فى صحيحه)। সুতরাং উপরোক্ত জওয়াবটি আদৌ ঠিক নয়।

২। ইমাম ত্বহাভী (রহ.)-এর একটি জওয়াব দিয়েছেন। যার সার সংক্ষেপ হলো ঃ এই হাদীসটি অপর দু'টি হাদীসের সাথে বিরোধপূর্ণ।

যথা ঃ (ক) الخراج بالضمان। অর্থাৎ বস্তু যার যিম্মাদারীতে থাকবে মুনাফা সেই ভোগ করবে।

(খ) نهى عليه السلام عن بيع الكالى بالكالى অর্থাৎ হুযূর (সা.) بيع الكالى بالكلى তথা بيع الدين بالدين-কে নিষেধ করেছেন।

ইমাম ত্বহাভী (রহ.) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো— ماوجب فى الذمة তথা নিজের যিম্মায় কোন কিছু ওয়াজিব হওয়া। আলোচ্য মাসআলায় উক্ত প্রাণীর দুধ ক্রেতার যিম্মায় دين (ঋণ) স্বরূপ। আর এর বদলায় যে গম বা খেজুর পরিশোধ করার কথা বলা হয়েছে সেটাও ক্রেতার যিম্মায় دين (ঋণ) স্বরূপ। অতএব পশুকে دين-এর বদলায় লেনদেন করা হচ্ছে—যা বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী নাজায়িয।

হাদীসের খেলাফ ঃ এক হাদীসে রাসূল (সা.) বাকীতে খাদ্যের বিনিময়ে খাদ্য বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

نهى رسول الله عن بيع الطعام بالطعام نسيئة .

সুতরাং এই হাদীস অনুযায়ী এরূপ লেনদেন করা জায়িয নয়। কেননা এটাও বাকিতে খাদ্যের বিনিময়ে খাদ্য বিক্রির নামান্তর। অর্থাৎ যে বস্তু কোন ব্যক্তির যিম্মায় ওয়াজিব হয়ে আছে সেই বস্তুকে ওই ব্যক্তির কাছেই এমন জিনিসের বদলায় বেচে দেয়া যা তার জিম্মায় ওয়াজিব হয়ে আছে।

উক্ত হাদীসদ্বয়ের সাথে حديث مصراة-এর تعارض হওয়ার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

বিবরণ হলো, ক্রেতা شاة مصراة থেকে যে পরিমাণ দুধ পেয়েছে তার কিছু অংশ আগে থেকেই বিক্রেতার মালিকানায় ছিল আর কিছু অংশ ক্রেতার মালিকানায় আসার পর সৃষ্টি হয়েছে। এখন যদি এক সা' পরিমাণ খেজুর সহ উক্ত প্রাণীটি ফেরত দিতে হয় তাহলে এর দু'টি পদ্ধতি হতে পরে।

(১) হয়ত সম্পূর্ণ দুধের বদলায় এই খেজুর প্রদান করতে হবে অর্থাৎ ক্রয় করার সময় যে দুধ ছিল এবং ক্রয় করার পর তার মালিকানায় এসে যে দুধ পয়দা হয়েছে এসব মিলেই এক সা' খেজুর অথবা (২) ঐ দুধের বদলায় এক সা' খেজুর দিতে হবে যা ক্রয় করার সময় স্তনে মওজুদ ছিল।

প্রথম প্রকারে ক্ষতিপূরণের পদ্ধতিটি الخراج بالضمان। হাদীসের খেলাফ। কেননা হাদীস অনুযায়ী ক্রয় করার পর যেটুকু দুধ সৃষ্টি হয়েছে সেটুকুর মালিক

সে নিজে। সুতরাং তার মালিকানায় প্রাপ্ত দুধের ক্ষতিপূরণ সে বহন করবে কেন? অথচ শাফেঈ মাযহাবের অনুসারীরাই এই হাদীসের ভিত্তিতে বলেন تصرية ছাড়া অন্য কোন দোষে বকরী ফেরত দেয়া হলে প্রাপ্ত এই দুধের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। অন্যান্য দোষের কারণে ফেরত দেয়ার ক্ষেত্রে যদি ক্ষতিপূরণ না দেয়া লাগে তাহলে تصرية-এর ক্ষেত্রে দিতে হবে কেন?

আর দ্বিতীয় প্রকারে অর্থাৎ এক সা' পরিমাণ খেজুর যদি ক্রয়ের সময় স্তনে মওজুদ দুধের বদলায় দিতে হয় তাহলে بيع الكالى بالكالى লাযিম আসে। (অথচ بيع الكالى بالكالى নিষেধ)।

(بيع الكالى بالكالى লাযিম আসার কারণ হলো) এই দুধ ক্রেতার মালিকানায় ছিল না। بيع-এর ভিত্তিতেও না, কেননা بيع فسخ হয়ে গেছে। আবার الخراج بالضمان-এর ভিত্তিতেও না কেননা এই পরিমাণ দুধ তার মালিকানায় আসার আগেই (স্তনে) মওজুদ ছিল। এখন ক্রেতা যেহেতু এই দুধ ব্যবহার করেছে তাই ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি ভঙ্গ হওয়ার কারণে এই পরিমাণ দুধের ক্ষতিপূরণ তার জিম্মায় ওয়াজিব হয়ে গেছে। এখন যদি এই দুধের বদলায় এক সা' পরিমাণ খেজুর ওয়াজিব করা হয় তাহলে এটা بيع اللبن بالصاع دينا (ঋণ হিসেবে দুধকে খেজুরের বদলায় বিক্রি করা) এর পর্যায়ে পড়ে যায়। কেননা নিজের যিম্মায় এক ওয়াজিব (لبن) কে অপর ওয়াজিব (تمر) দ্বারা বিক্রি করা হচ্ছে। আর এটাই بيع الكالى بالكالى, যা নাজায়িয।

মোটকথা, বর্ণিত দু'টি পন্থার যেটিই অবলম্বন করা হোক না কেন এর দ্বারা একটি না একটি হাদীস তরক করা লাযিম আসবেই।

তাই ইমাম ত্বহাভী (রহ.) বাধ্য হয়ে একথা বলেছেন যে, الخراج بالضمان এবং نهى عن بيع الكالى بالكالى এই দু'টি হাদীসের কারণে حديث مصراة মানসূখ হয়ে গেছে। তবে ইমাম ত্বহাভীর মানসূখ হওয়ার দাবি করাটা প্রশ্ন থেকে খালি নয়। কারণ ঃ (১) শুধুমাত্র تعارض-এর কারণে কোন হাদীস মানসূখ হয়ে যাওয়ার দাবি করা ঠিক নয়, মানসূখ হওয়ার দলীল থাকতে হবে।

(২) যদি মানসূখ বলে মেনে নেয়াও হয় তাহলে শুধু হাদীসের দ্বিতীয় অংশ মানসূখ হবে, প্রথম অংশ অর্থাৎ شاه مصراة-কে خيار عيب-এর ভিত্তিতে

ফেরত দেয়া এটা তো মানসূখ হয়নি। অথচ আহনাফ ফেরত দেয়ার কথা বলেন না।

আসল কথা হলো, আহনাফ حديث مصراة-এর জাহিরি অর্থ এ কারণে তরক করেন যে, এটা কুরআন, ইজমা এবং কিয়াস দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত اصول এবং قواعدكلية-এর খেলাফ। কুরআনের خلاف যেমন ঃ (১) فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (২) وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به (৩) وجزاء سيئة سيئة مثلها

কুরআনের এসব আয়াত অকাট্যভাবে একথার প্রমাণ বহন করে যে, জরিমানা, ক্ষতিপূরণ এসব বরাবর হতে হবে আর আলোচ্য হাদীসে তা আদৌ সম্ভব নয়। এর বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে।

হাদীসের ব্যাখ্যা এবং ইমামগণের দলীলের জওয়াব

ইমামগণ যে হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন এর বিভিন্ন জওয়াব দেয়া যেতে পারে। যথা ঃ (১) اضطراب থাকার কারণে হাদীসটি দুর্বল। কেননা নিম্নোক্ত কয়েকটি কারণে হাদীসটি مضطراب । যথা ঃ (১) কোন রেওয়ায়াতে শুধু تمر (খেজুরের) কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (২) এক রেওয়ায়াতে শুধু গমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (৩) কোন রেওয়ায়াতে এসেছে শুধু لبن (দুধের) কথা। (৪) এক রেওয়ায়াতে তিনদিনের মধ্যে খেজুর দিতে বলা হয়েছে, আরেক রেওয়ায়াতে কোন সময় নির্ধারণ করা হয়নি।

(৫) এক রেওয়ায়াতের অর্থ পরস্পর বিরোধপূর্ণ। যেমন ঃ ردمعها صاعامن برلاسمراء এক সা' পরিমাণ গম দেয়ার কথা বলে। سمراء না দেয়ার কথা বলা হয়েছে। অথচ অভিধান অনুযায়ী سمراء গমেরই আরেক নাম।

(৬) এক রেওয়ায়াতে এসেছে مثل لبنها (তথা সমপরিমাণ দুধ) আরেক রেওয়ায়াতে এসেছে مثلى لبنها (দ্বিগুণ দুধ)।

উল্লেখিত কারণে হাদীসটি مضطراب আর সর্বজন স্বীকৃত নিয়ম হলো—যে কারণেই হাদীসে اضطراب পয়দা হোক না কেন হাদীসটি দুর্বল এবং দলিলের অনুপযোগী হয়ে যায়।

(২) علت (ত্রুটি) থাকার কারণে হাদীসটি দুর্বল। উসুলবিদগণের সর্বসম্মত

রায় হলো, خبر واحد যদি কুরআন, হাদীস মশহুর এবং قواعد كليات (মৌলিক আইনের) সাথে সংঘাতপূর্ণ হয় তখন এটি حديث معلول হিসেবে গণ্য হয়। আর আমাদের আলোচ্য হাদীসটিও এরূপ হওয়ায় حديث معلول হিসেবে গণ্য এবং এরূপ হাদীস দলীল হতে পারে না। আহলে জাহেরগণও হাদীসটিকে দলীল অনুপযোগী বলে মনে করে।

(৩) হাদীসটি মানসূখ হয়ে গেছে। আল্লামা ঈছা ইবনে আবান (রহ.) বলেছেন—ইসলামের শুরুলগ্নে লেনদেনের ক্ষেত্রে মাল-সম্পদ দিয়ে ক্ষতিপূরণ (জরিমানা) আদায় করা জায়িয ছিল। সুদের আয়াত নাযিল হওয়ার পর মালের বিনিময়ে ক্ষতিপূরণের পন্থা মান্‌সূখ হওয়ার সাথে সাথে بيع مصراة এর হুকুমও মানসূখ হয়ে যায়।

আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে সুজার বিশ্লেষণ মতে এই হাদীসটি البيعان بالخيار হাদীস দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে।

اجماع-এর খেলাফ ঃ সকল ফকীহ এ কথার ওপর একমত হয়েছেন যে, ضمان ক্ষতিপূরণ দুই প্রকার। (১) مثلى (২) معنوى এখানে দুধের বদলায় যে পরিমাণ খেজুর দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে এটা ضمان مثلى ও নয় ضمان معنوى ও নয়। مثلى নয় এ কারণে যে, দুধ আর খেজুর এক জাতের বস্তু নয়। معنوى নয় এ কারণে যে, হাদীসে নির্দিষ্ট করে এক সা' খেজুর দিতে বলা হয়েছে। চাই দুধ কম হোক বা বেশি হোক দুধের মূল্যের বাছ-বিচার করা হয়নি।

قياس-এর খেলাফ ঃ কিয়াসের তাকাজা হলো, আমরা যদি এই প্রাণীটি ফেরত দেওয়ার অনুমতি দেই তাহলে দুধের কী হবে? এটি একটি জটিল বিষয়। কেননা যে দুধ ক্রেতা ব্যবহার করেছে সেটার কিছু অংশ عقد-এর সময় স্তনে মওজুদ ছিল আর কিছু অংশ ক্রেতার কাছে এসে সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম অংশের হকদার বিক্রেতা। কেননা ঐ পরিমাণ مبيع-এর অংশ, আর দ্বিতীয় অংশের মালিক ক্রেতা। কেননা তার যিম্মাতে থাকা অবস্থাতে এই অংশ সৃষ্টি হয়েছে।

এখন যদি ক্রেতাকে পুরো দুধের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হয় তাহলে তার ওপর জুলুম করা হবে আর যদি একেবারেই কোন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ না করা হয় তাহলে বিক্রেতার ওপর জুলুম হবে। কেননা, এক্ষেত্রে সে নিজের বিক্রিত বস্তুর অংশ ফেরত পাচ্ছে না।

হ্যাঁ, যদি এই পরিমাণ দুধের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয় যা বিক্রি করার সময় স্তনে মওজুদ ছিল তাহলে ক্রেতা-বিক্রেতা কেউ ক্ষতির সম্মুখীন হবে না কিন্তু এই পরিমাণ অংশ নির্ধারণ করবে কিভাবে? বিক্রি করার সময় কতটুকু ছিল পরে কতটুকু জন্ম নিল এটা কি নির্ধারণ করা সম্ভব? এটাতো একেবারেই অসম্ভব।

যেহেতু এইসব পদ্ধতি অবলম্বন করা সম্ভব নয় সেহেতু تصرية-এর ভিত্তিতে এটাকে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না এবং ক্ষতি পূরণ আদায় করা ছাড়া অন্য কোন বৈধ পন্থাও দৃষ্টিগোচর হয় না।

সারকথা, এসবকিছু বিবেচনা করেই আহনাফ হাদীসের বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করেছেন।

আহনাফের মতে হাদীসের আসল অর্থ কী

আহনাফ যেহেতু حديث مصراة-এর ظاهرى معنى (বাহ্যিক অর্থ)-এর ওপর আমল করেন না তাহলে এই হাদীসের ব্যাখ্যা ও প্রকৃত উদ্দেশ্য কী? (এ সম্পর্কে অনেক ব্যাখ্যা ও মত পাওয়া যায়। কয়েকটি চুম্বক অংশ নিম্নে উল্লেখ করা হলো)

১। শামসুল আইম্মা আল্লামা ছারাখসী (রহ.) বলেন, হাদীসে خيار দ্বারা خيارعيب উদ্দেশ্য নয় বরং خيارشرط উদ্দেশ্য।

হাদীসে تصرية উল্লেখ করে ওই خيار-এর سبب داعى-এর দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং হাদীসের ব্যাখ্যা হচ্ছে, ক্রেতা যদি শর্ত করে তাহলে خيارشرط-এর ভিত্তিতে خيار হাসিল হবে خيارعيب হিসেবে নয়।

একথার দলীল হলো ঃ হাদীসে তিন দিনের خيار দেওয়া হয়েছে (যেমন এই অধ্যায়ের ২য় ও ৩য় রেওয়ায়াতে উল্লেখ রয়েছে)।

অথচ خيارعيب-এর দিন-ক্ষণ নির্ধারণ করা হয় না। সময় নির্ধারণ সাধারণতঃ خيارشرط-এর মধ্যেই হয়ে থাকে। আর খেজুর বা খাদ্য দ্বারা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা আপোসের ভিত্তিতে বলা হয়েছে নির্দেশ হিসেবে নয়।

২। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, হাদীসটি দ্বীনদারির ওপর নির্ভরশীল। কেননা تصرية ধোঁকা ও প্রতারণার নামান্তর। অতএব বিক্রেতার উচিত ক্রেতার সাথে চুক্তিভঙ্গ করবে এবং যতদূর সম্ভব তাকে ক্ষতি থেকে বাঁচাবে। (تلقى جلب-এর মধ্যেও এরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে)

আর খাদ্য কিংবা খেজুর দ্বারা ক্ষতিপূরণের নির্দেশটি মূলতঃ আপোস-রফার ভিত্তিতে নির্দেশ বা ফয়সালার ভিত্তিতে নয়।

৩। হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন, হাদীসটি প্রশাসনিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল।

রাসূল (সা.) একজন শাসক হিসেবে ব্যবসায়ীদরে বিরোধ দূর করার জন্য এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। হুযূর (সা.) শরয়ী দৃষ্টিকোণে এরূপ নির্দেশ দেননি বরং প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন।

৪। আল্লামা জা'ফর আহমদ ওসমানী (রহ.) বলেন, ইসলামী রাষ্ট্রনায়ক ব্যবসায়ীদের মধ্যকার বিবাদমান ঝগড়া-ফাসাদ দূর করার জন্য এই হাদীসের ওপর আমল করতে চাইলে করতে পারবে। وهذا اقوى واوجه فى هذاالباب

সারকথা, ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এই হাদীসটির বিরোধিতাও করেননি এবং এর ওপর আমল করাও ছেড়ে দেননি বরং অন্যান্য اصول ও কায়েদার ভিত্তিতে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য নির্ণয় করে সেটার ওপর আমল করেন।

باب بطلان بيع المبيع قبل القبض

অধ্যায় ঃ হস্তগত করার আগেই ক্রয়-বিক্রয় করা

(١) حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاَحْسِبُ كُلَّ شَيْئٍ مِثْلَهُ ـ

مذاهب ঃ ক্রয়কৃত বস্তু হস্তগত করার পূর্বে পুনরায় বিক্রয় করা যাবে কিনা এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়।

১। উসমান আল বাত্তির মতে بيع قبل القبض (হস্তগত করার পূর্বে) বিক্রি করা সব ধরনের বস্তুতে জায়িয। আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (রহ.) বলেন, এই মতামত সম্পূর্ণ অবাস্তব।

হতে পারে উসমানের কাছে এ সম্পর্কীয় নিষেধাজ্ঞার হাদীস পৌছেনি।

২। ইমাম শাফেঈ, ইমাম সুফিয়ান ছাওরী এবং আমাদের ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) বলেন, কোন বস্তুতেই بيع قبل القبض জায়িয নেই। এমনকি জমিতেও নয়।

৩। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের জাহিরি রেওয়ায়াত অনুযায়ী بيع قبل القبض। খাদ্যের মধ্যে জায়িয নেই অন্যান্য বস্তুর মধ্যে জায়িয। আল্লামা ইবনে কুদামা এভাবে তাঁর মাযহাবের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

৪। ইমাম মালেকের মতে খাদ্যের মধ্যে যেগুলো مكيلى ও موزونى (পাত্রও পাথর দ্বারা মাপযোগ্য) সেগুলোতে بيع قبل القبض। নাজায়িয অন্যান্যগুলোতে জায়িয।

৫। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.)-এর মতে হস্তান্তরযোগ্য সকল বস্তুতে بيع قبل القبض নাজায়িয তবে ঐ ভূমিতে জায়িয যার ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

দলীলসমূহ

ইমাম শাফেঈ ও মুহাম্মাদ (রহ.) হাকিম ইবনে হিযাম (রা.)-এর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন ঃ

قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنِّىْ اَبْتَاعُ هٰذِهِ الْبُيُوْعَ ، فَمَا يَحِلُّ لِىْ مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ عَلَىَّ ؟ قَالَ يَا ابْنَ اَخِىْ لاَ تَبِيْعَنَّ شَيْئًا حَتّٰى تَقْبِضَهُ ـ

"...আমি তো এসব জিনিস পত্র বেচাকেনা করি, বলুন, আমার জন্য কোনটা হালাল আর কোনটা হারাম হবে? তিনি বলেন, ভাতিজা! হস্তগত করার আগে কোনকিছুই বিক্রয় করো না।"

এই হাদীসে شيئا বলে সব ধরনের বস্তুকে নিষেধ করা হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) واحسب كل شئ مثله বলে যে ব্যাখ্যা করেছেন এর দ্বারাও হুকুমটা عام বোঝা যায়। ইমাম আহমদ (রহ.) এই অধ্যায়ের বর্ণিত হাদীস দ্বারা এভাবে দলীল পেশ করেন যে, হাদীসে শুধু খাদ্যকে খাস করা হয়েছে সুতরাং নিষেধাজ্ঞা খাদ্যের মধ্যেই সীমিত থাকবে। আর কতক রেওয়ায়াতে যেহেতু من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه-এর স্থলে حتى يكتال له শব্দ এসেছে এজন্য ইমাম মালেক (রহ.) نهى-এর বিধানকে مكيلات وموزونات (খাদ্যের) মধ্যে খাস করেন। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) হুবহু ঐ সব হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন যা দ্বারা ইমাম শাফেঈ ইমাম মুহাম্মাদ প্রমুখ আলিমগণ দলীল পেশ করেছেন। অবশ্য

عموم -এর نهى (ব্যাপকতা) থেকে ভূমিকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কেননা بيع قبل القبض নিষেধ হওয়ার মূল কারণ হলো প্রথম বিক্রেতার হাতে বিক্রিত বস্তু বিনষ্ট হওয়ার আশংকা। আর এই আশংকা যেহেতু হস্তান্তরযোগ্য বস্তুর মধ্যে হয়ে থাকে এজন্য এগুলোতে নিষেধ করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে ভূমির মধ্যে এ ধরনের আশংকা খুবই কম তাই نهى-এর হুকুম থেকে এটা বাদ থাকবে। হ্যাঁ, কোন ভূখণ্ড যদি সমুদ্র বা নদীর পাড়ে হয় তাহলে তাঁদের মতেও এরকম ভূমিতে بيع قبل القبض জায়িয হবে না।

আহনাফের পক্ষ থেকে জওয়াব

ইমাম শাফেঈ ও মুহাম্মাদ (রহ.) হাকিম ইবনে হিযামের যে হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন সে হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে مضطرب, আবার এক রাবী ইবনে ইছমাহ্ জঈফও مجهول, আর হাদীসে شيئا বলে হস্তান্তরযোগ্য বস্তু বোঝানো হয়েছে।

ইমাম আহমদ ও মালেক (রহ.) طعام ও كيل সম্বলিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন সেটা قيد اتفاقى হুকুম মূলতঃ معلل بالعلة (তথা বিশেষ কারণে নিষেধ করা হয়েছে) আর সেই علت বা কারণ হলো ক্ষতি, ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে বাঁচা। আর এই ক্ষতি সমস্ত হস্তান্তরযোগ্য (منقولات) এর মধ্যেই হতে পারে। সুতরাং হুকুম عام খাদ্যের সাথে খাস করার কোন যৌক্তিকতা নেই।

হস্তগত করার পদ্ধতি

ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, হস্তগত (قبض) করার পদ্ধতি হলো ক্রেতা বিক্রেতা থেকে مبيع-কে নিজের কাছে নিয়ে নিবে।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, হাদীসে বিভিন্ন শব্দ এসেছে। কোনটিতে يستوفيه কোনটিতে ينقله আবার কোনটি يكتاله শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এর দ্বারা হস্তগত (قبض) করার বিভিন্ন পদ্ধতির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

কোনটিতে হাত রাখার দ্বারা, কোনটিকে হস্তান্তর করা দ্বারা আবার কোনটি থেকে বিক্রেতার اختيار। উঠিয়ে নেওয়া দ্বারা قبض সাবেত হয়। বোঝা যাচ্ছে

شـوافـع গণ মাত্র একটি পদ্ধতির ওপর আর আহনাফ সকল পদ্ধতির ওপর আমল করেন।

হস্তগত হওয়ার আগে বিক্রি নিষিদ্ধ হওয়ার হিকমত

এর হেকমত নিম্নরূপ ঃ (১) ক্রেতা হস্তগত না করা পর্যন্ত مـبـيـع-এর সাথে বিক্রেতার সম্পর্ক থাকে। এখন যদি ক্রেতা এর দ্বারা লাভবান হতে চায় তাহলে বিক্রেতা একে সহজভাবে মেনে নিতে নাও পারে। সে আকাঙ্ক্ষা করবে কোন বাহানায় বেচাকেনার চুক্তি ভঙ্গ করা যায় কিনা, এতে করে ঝগড়া-বিবাদ বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণেই হস্তগত করার আগে مـبـيـع-এর মধ্যে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

২। بـيـع قـبـل الـقـبـض-এর অনুমতি দেওয়া হলে জিনিসের দাম বহুগুণ বেড়ে যাবে। জাহাজ, সমুদ্রে থাকতেই বারবার বিক্রি হতে থাকবে। একজনের কাছ থেকে অপরজন, তার থেকে আরেকজন, এভাবে দশবার পর্যন্ত লেনদেনের সম্ভাবনা থেকে যায়। এর ফলে জিনিসের দাম কয়েকগুণ বেড়ে যাবে। এর দ্বারা হয়ত গুটি কয়েক লোক লাভবান হবে কিন্তু গোটা সমাজ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (আজকে তো এর ভুড়ি ভুড়ি প্রমাণ প্রত্যক্ষ করছি) এসব কারণে بـيـع قـبـل الـقـبـض নিষেধ করা হয়েছে।

চেক বিক্রি প্রসঙ্গে

حديث أَبِيْ هُرَيْرَةَ : عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبٰوا فَقَالَ مَرْوَانُ مَافَعَلْتَ فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ وَقَدْ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَ فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ فَنَهٰى عَنْ بَيْعِهَا قَالَ سُلَيْمَانُ فَنَظَرْتُ إِلٰى حَرَسٍ يَأْخُذُوْنَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ.

"হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) একবার মারওয়ানকে বললেন, তুমি তো রিবাকে হালাল করছ দেখছি! মারওয়ান বললেন কিভাবে? আবূ হুরাইরা (রা.) বললেন, তুমি চেক বিক্রি করা বৈধ করেছ অথচ রাসূল (রা.) হস্তগত করার আগে খাদ্য বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

অতঃপর মারওয়ান মানুষের মাঝে বক্তৃতা দেয়া শুরু করলেন এবং চেক বিক্রি করতে নিষেধ করলেন। সুলায়মান বলেন, আমি প্রহরীদের লক্ষ্য করে দেখলাম তারা মানুষের হাত থেকে চেকগুলো ফিরিয়ে নিচ্ছে।

চেকের অর্থ

صكاك - صك-এর বহুবচন। শাব্দিক অর্থ এমন দলীল পত্র যাতে কর্জ অথবা মালের ওয়াদা লিপিবদ্ধ থাকে। শব্দটি মূলতঃ ফারসী چك থেকে معرب হয়েছে।

এখানে চেক দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ দলীল পত্র যাতে সরকারের পক্ষ হতে কোন ব্যক্তির জন্য অনুদান (সরকারী ভাতা) প্রদানের কথা উল্লেখ থাকে।

এভাবে যে, এতে লেখা থাকে অমুক ব্যক্তির জন্য এই পরিমাণ খাদ্য বরাদ্দ দেয়া হলো।

চেক প্রদান করা হয় দুইভাবে। সরকারী কর্মকর্তা, চাকুরীজীবী (যেমন কাজী ইত্যাদি)র জন্য এবং বিনামূল্যে অভাবী গরীব জনসাধারণের জন্য।

চেক বিক্রির হুকুম

সরকারী গুদাম থেকে খাদ্য উঠানোর আগে চেক বিক্রি করা যাবে কিনা এ সম্পর্কে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়।

১। আবূ হানীফার (রহ.) মতে চেক বিক্রি নাজায়িয। কেননা আবূ হুরাইরা (রা.) বর্ণিত হাদীস হারাম হওয়ার সুস্পষ্ট দলীল। কারণ এটা হয় بيع قبل القبض। অথবা بيع ماليس عند الانسان। এমনিভাবে চেকওয়ালা ব্যক্তি হস্তগত করার পূর্বে খাদ্যের মালিকই হয় না। সুতরাং মালিকানাধীন নয় এমন খাদ্য বিক্রি করা জায়িয হয় কী করে?

শামী ও অন্যান্য ফিকহী কিতাবসমূহে 'চেক'কে جامكية, براءة প্রভৃতি নামে উল্লেখ করে এর নাজায়িয হওয়ার বিবরণ দেয়া হয়েছে।

২। এ ব্যাপারে شوافع-এর দু'টি মত পাওয়া যায়। একমত আমাদের অনুরূপ। আরেক মতে (যা তাঁদের কাছে প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ) চেক বিক্রি করা জায়িয। অবশ্য চেকের মালিক থেকে চেক নেয়ার পর এতে উল্লেখিত খাদ্য (গুদাম থেকে) উত্তোলন করার আগ পর্যন্ত ক্রেতা দ্বিতীয় বার এটি বিক্রি করতে পারবে না। সুতরাং তাঁদের মতে প্রথমবার বিক্রি করা জায়িয কিন্তু দ্বিতীয় বার বিক্রি করা জায়িয নয়।

আবূ হুরাইরা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের নিষেধাজ্ঞাকে তাঁরা এই দ্বিতীয় بيع -এর জন্য প্রযোজ্য বলে মনে করেন। কিন্তু তাঁদের এই ব্যাখ্যা সঠিক নয়। এইরূপ তাবীল (ব্যাখ্যা) হাদীস থেকে অনেক দূরে।

মুসনাদে আহমদে এভাবে বর্ণিত আছে—

ان صكاك التجار خرجت فاستاذن التجار مروان فاذن لهم مروان بيعها .

এর দ্বারা বুঝা যায় যাদের নামে চেক উঠেছিল তারা এগুলোকে বিক্রি করার জন্য মারওয়ানের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলে মারওয়ান অনুমতি প্রদান করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) মারওয়ানকে প্রশ্ন করে বসেন। যার দ্বারা সর্বাবস্থায় চেক বিক্রি নাজায়িয হওয়া বুঝায়। আহনাফের আমল এরূপই।

৩। ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, যদি চেকের খাদ্য ইত্যাদি কোনরূপ কাজের মজুরী হিসেবে না হয় তাহলে বিক্রি করা জায়িয আর যদি মজুরীর বিনিময়ে হয় তাহলে জায়িয হবে না।

কিন্তু ইমাম মালেক (রহ.)-এর এই تفريق (বিভক্ত করণের) পিছনে কোন দলীল নেই। তাঁর এই মত نهى عَنِ البيع قبل القبض-এর বিপরীত।

অধিকার বিক্রির হুকুম

চেক বিক্রির আলোচনার সাথে সামঞ্জস্যের দরুন بيع الحقوق তথা "অধিকার বিক্রির" হুকুম বর্ণনা করা জরুরী বলে মনে হচ্ছে।

কেননা বর্তমান যুগে অধিকার (حقوق) বিক্রির ব্যাপক প্রচলন ঘটেছে বিধায় এসম্পর্কীয় বিধান জানা থাকা জরুরী।

حق-এর সংজ্ঞা ঃ حقوق হলো এমন কল্যাণকর বিষয়াদী যা শরীয়ত কর্তৃক প্রবর্তিত অথবা এমন ওরফ (সমাজ কর্তৃক) প্রচলিত যা শরীয়তের পরিপন্থী নয়।

অথবা এরূপ বলা যায়, এমন এক বিশেষ সম্পর্ককে হক বলা হয় যার কারণে অধিকারী ব্যক্তি কোন বস্তু বা ব্যক্তির ওপর কর্তৃত্ব লাভ করে। অথবা ঐ ব্যক্তির ওপর বিশেষ দায়িত্ব আবর্তিত হয়।

حق-এর প্রকারভেদ

প্রথমত ঃ حق দুই প্রকার। ১। حقوق مجرده ২। حقوق غير مجرده

যে সব 'হক' এমন কোন মহলের সাথে সম্পৃক্ত না হয় যা অনুভূতি দ্বারা বুঝা সম্ভব সেগুলো حقوق مجردة যেমন ঃ মাশওয়ারা, পরামর্শ ইত্যাদি।

আর যে সব হক এমন কোন মহলের সাথে সম্পৃক্ত হয় যা অনুভবযোগ্য এবং এর অস্তিত্বও বিদ্যমান সেগুলো حقوق غيرمجردة যেমন—কেসাস। এটা হত্যাকারীর সত্তার মধ্যে প্রমাণিত।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ হকের দ্বিতীয় প্রকারের তাকসিম হলো—ফকীহগণ যে সব হকের বিনিময় নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন—সেগুলো প্রথমত দুই প্রকার।

১। حقوق ضرورية ঃ কতক হক এমন আছে যা শুধুমাত্র ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য কাউকে প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রকৃত পক্ষে এই হক না পাওয়ারই কথা ছিল। যেমন শুফ'আ। যেহেতু ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে সন্তুষ্টচিত্তে ক্রয়-বিক্রয় করেছে সেহেতু এখানে তৃতীয় কোন ব্যক্তির হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকার কথা নয়।

কিন্তু دفع ضرر-এর জন্য شريك فى حق المبيع - شريك فى نفس المبيع। এবং جار (প্রতিবেশী)-কে শুফ'আর অধিকার দেয়া হয়েছে।

এমনিভাবে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর হক। এটাও মূলতঃ স্ত্রীকে ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য দেয়া হয়েছে। অন্যথায় স্বামীর ইখতিয়ার আছে সে যখন ইচ্ছা স্ত্রীকে উপভোগ করবে এবং তার সাথে রাত যাপন করবে।

শিশু বাচ্চা প্রতিপালনের হক, ইয়াতীমকে লালন-পালনের হক এবং তালাকগ্রহণের অধিকারপ্রাপ্ত মহিলাদের তালাকের হক ইত্যাদি ও حقوق ضرورية-এর অন্তর্ভুক্ত।

حقوق ضرورية-এর হুকুম

এর হুকুম হলো কখনও এর বদলায় বিনিময় গ্রহণ করা যাবে না। بيع-এর নামেও নয়, صلح-এর নামেও নয়। নাজায়িয হওয়ার কারণ হলো-এসব 'হক' মৌলিক হক নয় বরং জরুরতের কারণে প্রাসঙ্গিকভাবে হক হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ কারণে কোন ব্যক্তি যদি নিজের হক অন্যের কাছে হস্তান্তর করতে চায় তাহলে এটা একথারই প্রমাণ বহন করে যে, তার এই হকের প্রয়োজন নেই। এই 'হক' না পেলে তার কোন ক্ষতি হবে না। অতএব ঐ ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তিকে এসব বস্তুর হকদার বলে গণ্য করা হবে না। এ কারণে এই হকের

عوض (বিনিময়) তলব করা যাবে না। যেমন—শুফ'আর অধিকারী (شفيع) যদি শুফ'আ দাবি করা থেকে হাত গুটিয়ে নেয় তাহলে এ কথাই প্রমাণ হবে যে, যে بيع-এর কারণে তার শুফ'আ হাসিল হয়েছিল সেই بيع সংঘটিত হওয়ায় তার কোন ক্ষতি নেই। সুতরাং بيع খতম হলে তার অধিকারও খতম হবে—মাঝখান থেকে (দাবি ছাড়ার বিনিময়ে) عوض নেয়া যাবে না।

২। حقوق اصلية ঃ ঐ হককে বলা হয় যা মৌলিকভাবেই হক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। دفع ضرر বা ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য এই হক স্থির করা হয়নি। এটা দুই প্রকার। ১। অ-স্থানান্তরযোগ্য, ২। স্থানান্তরযোগ্য।

অ-স্থানান্তরযোগ্য মৌলিক অধিকার

যেমন, কিসাস, বিবাহ বহাল রেখে স্বামী কর্তৃক স্ত্রী থেকে نفع লাভ করার হক, মীরাছের হক ইত্যাদি। এ সমস্ত হক কোনভাবে স্থানান্তরিত হয় না।

এ ধরনের হকের হুকুম হলো, بيع-এর মত এর দ্বারা বিনিময় নেওয়া জায়িয নেই।

সুতরাং নিহত ব্যক্তির ওলির এই অধিকার নেই যে, সে কিসাসের হক অন্যের কাছে বিক্রি করে দেবে এবং ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি কিসাসের অধিকার পেয়ে যাবে।

এমনিভাবে স্বামীর জন্য নিজের হক হস্তান্তর করা জায়িয নেই এবং ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি কর্তৃক ওই মহিলাকে ভোগ করাও জায়িয নেই।

এরকমভাবে حق ميراث বিক্রি করা এবং আসল ওয়ারিস বাদ দিয়ে অন্য কারো ওয়ারিস হওয়া জায়িয নেই। শরীয়ত যেহেতু এসব حقوق এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করার অনুমতি দেয়নি এজন্য ক্রয়-বিক্রয়ের পদ্ধতিতে এগুলোর মাধ্যমে বিনিময় গ্রহণ করা যাবে না। এই حكم-এর উৎস মূল হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته হুযূর (সা.) ولاء ক্রয়-বিক্রয় এবং হেবা-দান করতে নিষেধ করেছেন।

অবশ্য মীমাংসা স্বরূপ এসব حقوق-এর বদলা নেয়া জায়িয আছে। এর পদ্ধতি হলো হক ওয়ালা নিজের হক প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকবে এবং যে ব্যক্তি তার হক নষ্ট করেছে তার কাছ থেকে মাল গ্রহণ করবে। যেমন—নিহত

ব্যক্তির ওলি কিসাসের হক লাভ করেছে। তার জন্য এটা জায়িয যে, হত্যাকারী ব্যক্তি থেকে কিসাসের বদলায় মাল (দিয়্যাত) গ্রহণ করবে। এই মাল মূলতঃ হক ওয়ালা ব্যক্তির হক প্রয়োগ না করার বদলায় এবং হত্যাকারী প্রাণের বিনিময়ে এটা দিয়ে থাকে। কুরআন-হাদীস এবং ইজমা অনুযায়ী হত্যাকারী থেকে মাল নিয়ে আপোস করা জায়িয।

এমনিভাবে স্ত্রীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল রেখে তার থেকে نفع হাসিল করা স্বামীর অধিকার। কিন্তু স্ত্রীর পক্ষ থেকে প্রদত্ত অর্থের কারণে (خلع এর ক্ষেত্রে) স্বামী তার হক গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে পারে। যেমন-মালের শর্তে তালাক দেওয়া অর্থাৎ (خلع-এর সূরত।) কুরআন ও ইজমা দ্বারা এর বৈধতা সুপ্রমাণিত।

তবে আপোসের ভিত্তিতে এই عوض নেওয়া ঐ ক্ষেত্রে জায়িয, যে ক্ষেত্রে হক এই মুহূর্তে মওজুদ ও বিদ্যমান আছে। হকটি যদি ভবিষ্যতে সৃষ্টি হয়, এই মুহূর্তে (فى الحال) না থাকে তাহলে بيع বা صلح কোন পদ্ধতিতেই বিনিময় নেওয়া জায়িয নেই। যেমন مورث-এর জীবদ্দশায় মালের বিনিময়ে মীরাছের হক থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়া জায়িয হবে না। কেননা مورث-এর জীবদ্দশায় حق وراثت মওজুদ ও বিদ্যমানই থাকে না। বরং এটা একটা ভবিষ্যত প্রতিষ্ঠিত 'হক' (حق متوقع)। যা হওয়া না হওয়া উভয়টি সমান। কেননা ঐ ব্যক্তি যদি مورث-এর আগেই মারা যায় তাহলে মীরাছের হক সাবেত হবে না। অবশ্য مورث-এর ইন্তিকালের পর অধিকার ছেড়ে দেয়ার ভিত্তিতে নিজের হক ছেড়ে দেয়া এবং এর বিনিময় নেয়া জায়িয।

মৌলিক অধিকার স্থানান্তরযোগ্য

যে সব হক স্থানান্তরযোগ্য সেগুলো মালের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত এবং সেগুলো ক্রয়-বিক্রয়ের যোগ্য। এটা ভূমিকাস্বরূপ বলা হলো। বিস্তারিত জানতে তাকী ওসমানীর ফেকহী মাকালাত ১ম খণ্ড দেখুন।

অধিকার বিক্রি করার বর্তমান প্রচলিত রীতিসমূহ

বর্তমান সমাজে حق ও نفع বিক্রয়ের নানা রকম পদ্ধতি চালু রয়েছে। হুকুম সহ এর কয়েকটি পদ্ধতি নিচে আলোচনা করা হলো ঃ আল্লাহ্ তৌফিকদাতা।

پگڑی অগ্রিম টাকা গ্রহণ

আজকাল پگڑی সিস্টেমে দোকান-পাট বিক্রয় করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ কোন-দোকান ভাড়া দেয়ার আগে অগ্রিম কিছু টাকা নেয়া হয়। যেমন—এক লাখ, দুই লাখ টাকা ইত্যাদি। একে پگڑی এবং سلامی (সালামী) বলা হয়। আরবী দেশে একে خلو - حلبسه ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হয়। তবে আশ্চর্য কথা হলো এই অগ্রিম টাকা দেয়া সত্ত্বেও মালিকানা সত্ব হাসিল হয় না।

এটা মূলতঃ নাজায়িয এবং হারাম। কেননা এটা হয় ঘুষ না হয় حق مجردة এর বিনিময়, যা নাজায়িয। অবশ্য দু'একজনের ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে যে, তাঁরা এটা জায়িয বলে মনে করেন। সর্বপ্রথম যার ব্যাপারে বলা হয় যে, তিনি بدل خلو জায়িয মনে করেন, তিনি হলেন, দশম হিজরীর মালেকি ফকীহ আল্লামা নাসিরুদ্দীন লাক্কানী (রহ.)। এর পরে এসে অনেক আলিম এটাকে জায়িয বলতে শুরু করেন। মূলতঃ দোকানের মালিক কর্তৃক অগ্রিম কিছু নেয়া এটা ভাড়া (কেরায়ার) মধ্যেই গণ্য ধরতে হবে যে, মালিক কিছু অংশ তাড়াতাড়ি গ্রহণ করেছে আর বাকী অংশ কিস্তি করে ধীরে সুস্থে আদায় করবে। ফোকাহায়ে কিরামের কাছে এর বহু নযীর আছে। আল্লামা শামী (রহ.) লিখেছেন—

نَعَمْ جَرَتِ الْعَادَةُ اَنَّ صَاحِبَ الْخُلُوِّ حِيْنَ يَسْتَاجِرُ الدُّكَّانَ بِالْاُجْرَةِ الْيَسِيْرَةِ يَدْفَعُ النَّاظِرُ دَرَاهِمَ تُسَمّٰى خِدْمَةً فَهِىَ فِى الْحَقِيْقَةِ تَكْمِلَةُ اُجْرَةِ الْمِثْلِ ـ

হ্যাঁ, এই পদ্ধতি চালু আছে যে, অগ্রিম দাতা যখন মামুলী ভাড়া দিয়ে ঘর নেয় তখন দোকানের মালিককে সে অতিরিক্ত কিছু অংশ দেয়, যাকে "খেদমত" বলা হয়। এটা মূলত মূল ভাড়ার পরিপূর্ণতা সাধনকারী। এটা পরিষ্কার থাকা দরকার যে, ঘর ভাড়া হিসেবে অগ্রিম যা নেয়া হয় এটা চুক্তি কৃত নির্দিষ্ট সময়ের আগ পর্যন্ত কেরায়া (ভাড়া) হিসেবেই গণ্য হবে। মাসিক বা বাৎসরিক ভাড়ার মধ্যে এগুলো শামিল হবে না। সুতরাং কোন কারণবশতঃ যদি ইজারা চুক্তি বাতিল হয়ে যায় তাহলে মালিকের ওপর ওয়াজিব হলো, ইজারার যে কয়দিন বাকী থেকে যায় সে কয়দিনের যা ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছিল তা ফেরত দেয়া।

নতুন কিছু আবিষ্কার এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার হক

حق ايجاد (নতুন কিছু আবিষ্কারের হক) এমন "হক" যা عرف এবং قانون অনুযায়ী সে ব্যক্তিই এর হকদার যে তা আবিষ্কার করেছে বা কোন বস্তুকে নতুন আকৃতি দান করেছে।

حق ايجاد-এর অর্থ হলো—ঐ আবিষ্কারক কর্তৃকই কেবল মাত্র সেই জিনিস বানানো এবং এর দ্বারা ব্যবসা করে লাভবান হওয়ার অধিকার রাখা। কোন ক্ষেত্রে অবশ্য আবিষ্কারক حق ايجاد অন্যের কাছে হস্তান্তর করে দেয়। এভাবে দ্বিতীয় ব্যক্তি ঐ জিনিস তৈরি করে নিজে লাভবান হওয়ার অধিকার লাভ করে। এমনিভাবে যে ব্যক্তি কোন কিতাব রচনা কিংবা সংকোলন করে তার জন্য এটার প্রকাশনা এবং এর মাধ্যমে লাভবান হওয়ার অধিকার লাভ হয়। কোন সময় আবার লেখক অন্যের কাছে এই 'হক' বিক্রি করে দেয় যার দরুন ক্রেতা এই হকের মালিক বনে যায়।

এখন প্রশ্ন হলো, حق ايجاد এবং حق نشروطباعت বিক্রি জায়িয কিনা? এ ব্যাপারে আল্লামা তকী উসমানী সাহেবের (দা. বা.) অভিমত প্রদত্ত হলো ঃ

এ ব্যাপারে বুনিয়াদী প্রশ্ন হলো, حق ايجاد এবং حق طباعت শরীয়ত স্বীকৃত হক কিনা?

এর উত্তর এই যে, যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম কোন জিনিস আবিষ্কার করল, চাই সেটা مادى (মৌলিক) কিংবা অমৌলিক (معنوى) হোক, নিঃসন্দেহে সেই ওই বস্তুকে বাজার জাত করা এবং এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার বেশি হকদার। কেননা আবূ দাউদের এক রেওয়ায়াতে আছে—

عَنْ اَسْمَرَبْنِ مُضَرِّسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ فَقَالَ : مَنْ سَبَقَ اِلٰى مَالَمْ يَسْبِقْهُ مُسْلِمٌ فَهُوَلَهٗ ـ اخرجه ابوداؤد فى الخراج قبيل احياء الموات وسكت عليه هو والمنذرى ـ ٤ : ٢٦٤، رقم ٢٩٤٧

হযরত আসমারা ইবনে মুদার্‌রাস (রা.) হুযূর (সা.) থেকে রেওয়ায়াত করেন, একবার আমি হুযূর (সা.)-এর হাতে বাইয়াত হলাম। তিনি বললেন, যে

ব্যক্তি এমন কোন বস্তুর দিকে সর্বাগ্রে অগ্রসর হয় যার দিকে কেউ অগ্রসর হয়নি, তাহলে সেই ঐ বস্তুর মালিক বলে বিবেচিত হবে।

আল্লামা মুনাভী (রহ.) যদিও এ কথা প্রাধান্য দিয়েছেন যে, এই হাদীসটি মৃত (অনাবাদী) (أرض الموات) জমিনকে চাষাবাদযোগ্য করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে কিন্তু একথাও উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটি ঝর্না, কূপ, খনি ইত্যাদি সবকিছুকেই শামিল করে। যে ব্যক্তি সর্বাগ্রে এসব বস্তু হস্তগত করবে সেই এর মালিক হবে। —ফয়যুল কাদীর খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৩৮

যখন একথা প্রমাণিত হলো যে, حق ايجاد এমন এক হক, ইসলামী শরীয়ত যাকে 'হক হিসেবে' স্বীকতি দিয়েছে এই ভিত্তিতে যে, সে সর্বপ্রথম ايجاد। (আবিষ্কার) করেছে। সুতরাং এর ওপর ঐসব বিধান কার্যকর হবে حق سبقيت। (সর্বাগ্রে কবলে প্রাপ্ত হক) এর ওপর যে সব বিধান কার্যকর হয়।

আর আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, কতক বস্তুকে 'মাল' হিসেবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ওরফের (সমাজের প্রচলন) বড় ভূমিকা রয়েছে। এটা সংঘাতপূর্ণ নয়। অনেক বিষয় আছে যা কিয়াসের বিপরীত কিন্তু তার পরেও ওরফের কারণে কিয়াসকে তরক করা হয়। স্ব স্ব স্থানে এর আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্। এসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে এ যুগের একদল আলিম এসব হক (حق ايجاد، حق طباعت) বিক্রি করা জায়িয বলে ফতওয়া দিয়েছেন। এঁদের মধ্য হতে ভারত উপমহাদেশের মাওলানা ফতেহ মুহাম্মাদ লাখনভী (আব্দুল) হাই লাখনভীর শাগরিদ) অন্যতম।

মুফতীয়ে আযম কিফায়াতুল্লাহ (রহ.), মাওলানা মুফতী নিযামুদ্দীন (রহ.) (মুফতী দারুল উলূম দেওবন্দ), মুফতী আব্দুর রহীম লাজপুরী (রহ.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যাঁরা حق ايجاد এবং حق تاليف-এর ক্রয়-বিক্রয় নাজায়িয বলেন, তাঁদের দলীল ঃ

১। এটা حق مجرد، কোন বস্তু নয়। আর আগেই বলা হয়েছে حقوق مجردة-এর বিনিময় গ্রহণ করা নাজায়িয।

জবাব ঃ "বিনিময় গ্রহণ নাজায়িয"—কথাটা এত ব্যাপক নয়। বরং এতে অনেক ব্যাখ্যা আছে। كما مر

২। কিতাব কিংবা অন্য কোন বস্তুর ক্রেতার এতে সব ধরনের হস্তক্ষেপ করার অধিকার আছে এবং সর্বোতভাবে এর দ্বারা সে লাভবান হতে পারে। এই

দলীলের জবাবে আল্লামা তকী উসমানী সাহেব বলেন—"কোন বস্তুর মধ্যে হস্তক্ষেপ করা এবং এর অনুরূপ দ্বিতীয় বস্তু বানানো দু'টি আলাদা জিনিস। কিতাব ক্রয় করে প্রথম প্রকারের تصرف করা তথা পড়ে লাভবান হওয়া, অথবা বিক্রয়, হেবা বা ধার দেয়া এবং এ জাতীয় তছরুফ করা জায়িয। কিন্তু এই কিতাব ক্রয় করার দরুন সে মুদ্রণের "হক" লাভ করে না যে, সে এরূপ আরো পুস্তক ছাপিয়ে বাজারে বিক্রি করবে। এর দৃষ্টান্ত সরকারী পয়সার ন্যায়। কোন ব্যক্তি যদি পয়সা খরিদ করে তাহলে সে এতে সর্বপ্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারে। কিন্তু পয়সা খরিদ করার ফলে সে এই অধিকার লাভ করে না যে, সে এ পয়সার মডেলকে সামনে রেখে অনুরূপ আরো পয়সা বানাবে—এটা নাজায়িয। এ আলোচনা দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, কোন বস্তুর মালিকানা লাভ করার অর্থ এই নয় যে, মালিক এর অনুরূপ অন্য কোন জিনিস বানানোর অধিকার লাভ করবে।

৩। নাজায়িযের পক্ষের লোকের তৃতীয় দলীল হলো ঃ কোন কিতাব মুদ্রণ করতে না দেয়া كتمان علم-এর অন্তর্ভুক্ত। আর كتمان علم নাজায়িয।

জবাব ঃ কিতাবের লিখক তো পড়তে এবং অন্যের কাছে পৌঁছতে বাধা দিচ্ছেন না। তিনি শুধু অনুমতি ছাড়া ছাপিয়ে লাভবান হতে বাধা দিচ্ছেন। আর এটা কখনই كتمان علم-এর আওতায় পড়ে না।

৪। তাঁদের চতুর্থ দলীল হলো, মুহাদ্দিসগণ হাদীস বর্ণনা করে টাকা (اجرة) গ্রহণ করাকে নাজায়িয মনে করেন। আর দ্বীনি কিতাব মুদ্রণ ও প্রকাশ করে টাকা নেয়াও এরূপই।

এর জবাবে বলা হয়ে থাকে—হাদীস বর্ণনা করে টাকা গ্রহণ করা অধিকাংশ সালফে সালেহীনের মতে নাজায়িয হলেও কতক আলিমের মতে টাকা গ্রহণ করা জায়িয। হযরত ইয়া'কূব (রহ.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, لا يبولن احدكم فى الماء الدائم হাদীস বর্ণনা করে এক দিরহাম গ্রহণ করতেন। আবূ নোআইম, আলী ইবনে আব্দুল আযীয, তাউস এবং মুজাহিদ প্রমুখ হাদীস রেওয়ায়াত করে اجرة গ্রহণ করতেন। الكفاية فى علم الرواية—

দ্বিতীয় কথা হলো, বর্তমান জমানার অবস্থা বিবেচনা করে ফকীহগণ তা'লীমে কুরআন, ইমামতী এবং আযান দিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণকে জায়িয বলে

মত দিয়েছেন। আর تصنيف ও تاليف-কে تعليم قران-এর ওপর কিয়াস করাই অধিক যুক্তিসংগত।

৫। তাঁরা একথাও বলেন যে, حق طباعت সংরক্ষণ করার দ্বারা (যেমন লিখা থাকে جملة حقوق محفوظ ہیں বা লিখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত) কিতাবের প্রচার-প্রসারের পথ সংকীর্ণ হয়ে যায়। সবাইকে যদি মুদ্রণের অনুমতি দেয়া হয় তাহলে প্রচার-প্রসার ব্যাপক হবে এবং এর দ্বারা ফায়দাও হবে বেশি।

কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো, যদি ব্যাপারটাকে এত ব্যাপক করে দেয়া হয় তাহলে কেউই تصنيف تاليف-এর প্রতি উদ্বুদ্ধ হবে না। শারীরিক এবং যেহনী কষ্ট বরদাশত করে, বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে, সকল প্রকার আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে কোন কিতাব রচনা কিংবা সংকোলন করে যদি মুদ্রণের অধিকার (হক) টুকুও সে লাভ না করতে পারে এবং যার ইচ্ছা সেই মুদ্রণের অধিকার লাভ করে তাহলে কে একাজে হাত বাড়াতে সাহস করবে? মোদ্দাকথা হলো, حق طباعت সংরক্ষিত (محفوظ) থাকাটাই অধিক যুক্তি সঙ্গত।

মুফতী শফী (রহ.) মুদ্রণের হক বিক্রি করা নাজায়িয বলে ফতওয়া দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে আলাদা একটি পুস্তিকা রচনা করেন তিনি। যা جواهر الفقه-এর অংশ হিসেবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই পুস্তিকা লিখার পর মাসআলাটি নিয়ে আবার গবেষণা করার ইচ্ছা পোষণ করেন কিন্তু তাঁর সুযোগ হচ্ছিল না বলে এর দায়িত্ব দেন সুযোগ্য সন্তান আল্লামা তকী ওসমানীর ওপর।

তবে মাসআলাটির তাহকীক হওয়ার আগেই মুফতী শফী (রহ.) ইন্তিকাল করেন। فقهى مقَالاَت-এর মধ্যে মাওলানা তকী ওসমানী সাহেব এ ব্যাপারে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

(হুন্ডি)-এর হুকুম

হুন্ডি যাকে (Bills of Exchange) বলা হয় এর পদ্ধতি হলো, বিক্রেতা কোন ব্যক্তি, ব্যাংক বা কোম্পানীর কাছে বাকিতে কোন বস্তু বিক্রি করবে। ক্রেতা মূল্যের নিশ্চয়তা স্বরূপ একটি চেক লিখে দিবে যে, এত টাকা অমুক দিন পরিশোধ করা হবে।

পরবর্তীতে উক্ত মূল্য গ্রহণ করার পূর্বেই প্রয়োজন দেখা দেয়ায় অন্যের কাছে চেকটি চেকে উল্লেখিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বিক্রি করে দিল। যেমন ধরা

যাক, যায়েদ কারো কাছ থেকে ১০০ টাকার একটি কম্বিয়ালা (দস্তাবেজ বা চেক) লিখে নিল—যা তিন মাস পরে পাওয়ার কথা। কিন্তু এই মুহূর্তে যায়েদের প্রয়োজন দেখা দেয়ায় সে তা ৮০ টাকায় বিক্রি করে দিল। ক্রেতার লাভ হলো ৩ মাস পরে সে পুরো ১০০ টাকা লাভ করবে। ৮০ টাকায় কেনা এই ক্রেতা চাইলে আবার তা বিক্রি করতে পারে। ৮০ টাকায় কিনে ৯০ টাকায় বিক্রি করে ১০ টাকা লাভ করল। সর্বপ্রথম ক্রেতার নির্দিষ্ট ঐ দিনে ১০ টাকা লাভ হবে। নির্দিষ্ট ঐ দিন যত দূর হবে কম্বিয়ালা (দস্তাবেজ)-এর দাম তত কম হবে আর তারিখ যত ঘনিয়ে আসবে মূল্য ততই বাড়তে থাকবে। এভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে একটি কম্বিয়ালা (দস্তাবেজ) কয়েকবার বিক্রি হয়ে যায়। এ ধরনের কেনাবেচা নাজায়িয। কেননা এটা بيع الدين من غير من عليه الدين (এমন ব্যক্তির কাছে ঋণ বিক্রি করা যে ঋণী নয়)-এর অন্তর্ভুক্ত।

এমনিভাবে এটা مبادلة النقود بالنقود متفاضلة ومؤجلة (বাকি এবং কম বেশিতে টাকা লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত) যা কুরআন-হাদীস অনুযায়ী নাজায়িয এবং সুদের অন্তর্ভুক্ত।

এটা বৈধ হওয়ার পদ্ধতি

এ ধরনের লেনদেন যেহেতু বর্তমান সময়ে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে এজন্য এর পদ্ধতিতে রদবদল করে জায়িয করার সূরত বের করা প্রয়োজন। এর বৈধ সূরত এই হতে পারে যে, কম্বিয়ালা (দস্তাবেজ) উল্লেখিত ঋণ আদায় করার জন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যাংককে উকিল বানিয়ে নিবে এবং এর জন্য ঐ ব্যক্তি বা ব্যাংককে পারিশ্রমিক দিবে। এরূপ চুক্তি সম্পাদন করে ঐ ব্যক্তি উকিল থেকে এই পরিমাণ টাকা ধার নিবে যা দস্তাবেজে উল্লেখ আছে। আর উকিলকে অনুমতি দিয়ে রাখবে যখন ঐ কম্বিয়ালার নির্ধারিত তারিখ এসে যাবে তখন সে টাকা উঠিয়ে নেবে।

লক্ষণীয় যে, এখানে দুই ধরনের লেনদেন হলো।

১। উকিল বানানো, ২। ঋণ গ্রহণ।

.সুতরাং এরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা জায়িয হবে। তবে এটা লক্ষ্য রাখতে হবে যে, একটা (عقد)-কে যেন অন্য عقد-এর জন্য শর্ত না করা হয়। অন্যথায় এটা صفقة فى صفقة-এর কারণে নাজায়িয হবে।

শরীয়তে নোট এর (Currency) অবস্থান

শরীয়তে নোটের তাৎপর্য কী—তা জানা দরকার। এটা ثمن না সনদ?

স্মরণ রাখতে হবে যে, পূর্ব যুগে বস্তুর বিনিময়ে বস্তুর লেনদেন করা হতো। (পরবর্তীতে) স্বর্ণ-রৌপ্যকে পণ্য সামগ্রীর লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে (অঘোষিতভাবে) স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং বাজারে স্বর্ণ চান্দির পয়সা চালু করা হয়, যার দ্বারা নানা রকম দ্রব্য ক্রয় করা যেত।

এরপর ছোট ছোট পণ্য কেনার জন্য প্রয়োজন দেখা দেয় ছোট ছোট মুদ্রার। এর পরিপ্রেক্ষিতে ধাতব পদার্থ দিয়ে তৈরি করা হয় অল্প মূল্যের মুদ্রা। এভাবে জীবন ধারনের নানা রকম পণ্য সামগ্রীর কেনাবেচার তাগিদে স্বর্ণ ও রৌপ্যের নোট বিলুপ্ত হতে থাকে। পরবর্তীতে অন্যান্য ধাতব পদার্থেরও প্রচলন কমতে কমতে কাগজের নোট চালু হয়।

এখন কথা হলো কাগজের এই নোটকে কী ধরা হবে? ثمن (মূল্য), وثيقة (দস্তাবেজ) না-কি সনদ? এ ব্যাপারে আলিমদের বিভিন্ন মত পাওয়া যায়।

১। একদল আলিমের অভিমত হলো নোট এবং পয়সা وثيقة (দলীল-দস্তাবেজ) এর মত, সরাসরি ثمن (মূল্য) নয়। শরীয়তের পরিভাষায় একে 'হাওয়ালা' নোট আদায়কারীকে محيل, উসুলকারীকে محتال এবং ব্যাংককে محتال عليه বলা হয়।

২। আরেক দলের মতে নোট সরাসরি ثمن-এর মর্যাদা রাখে। আগের যুগে দিরহাম-দীনারের যে অবস্থান ছিল আজকে নোট ও পয়সার হুবহু একই অবস্থান।

৩। তবে সবচেয়ে উত্তম মত হলো, আমাদের যুগে প্রচলিত এই নোট পারিভাষিক অর্থে মূল্যের মর্যাদা রাখে (اصطلاحی ثمن)।

ফেকহী বিশ্লেষণ দ্বারা জানা যায় যে, কিছু জিনিস সৃষ্টিগতভাবেই ثمن-এর কাজ দেয় অর্থাৎ এগুলোকে সৃষ্টিই করা হয়েছে ثمن হিসেবে। এগুলো হলো সোনা ও রুপা। আর ثمن হিসেবে আখ্যায়িত হওয়ার দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো اصطلاح। অর্থাৎ আমভাবে ثمن হিসেবে কোন বস্তু বা পদার্থকে মেনে নেয়া। আর নোট এই দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে শামিল। সৃষ্টিগতভাবে এটা ثمن নয় বরং اصطلاحی ثمن। এখন কথা হলো এই নোট সনদ ও দস্তাবেজ কি-না? একথা সুস্পষ্ট যে, আমাদের এই যুগে একে শুধুমাত্র সনদই মনে করা হয় না

(বরং ثمن ও মনে করা হয়)। আজ যদি কোন ব্যক্তি কাউকে নোট পরিশোধ করে তার মনে একথা থাকে না যে, সে একটি চেক প্রদান করল যা ব্যাংক থেকে ভাঙিয়ে নিতে হবে। বরং এটাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি ثمن মনে করে। পক্ষান্তরে ব্যাংকের চেক, ড্রাফ্‌ট, প্রাইজবন্ড ইত্যাদি সরাসরি মূল্য হিসেবে বিবেচিত হয় না, বরং দলীল ও দস্তাবেজ হিসেবে চিহ্নিত হয়।

মোদ্দাকথা হলো, এই নোটগুলো যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে وثيقة (দস্তাবেজ) হিসেবে বিবেচিত হতো কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে এটা اصطلاحی ثمن-এর মর্যাদা লাভ করেছে।

নোট সম্পর্কীয় কতিপয় মাসআলা

বর্তমান যুগে যেহেতু নোট ثمن-এর মর্যাদা লাভ করেছে এজন্য এর ওপর নিম্নোক্ত বিধান প্রবর্তিত হবে।

১। নোটের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে এবং নোট দ্বারাই যাকাত আদায় করা যাবে। চাই গ্রহণকারী একে ব্যবহার করুক বা না করুক।

২। বর্তমান যুগে নোট যদিও স্বর্ণ সংশ্লিষ্ট তথাপি শরীয়তের দৃষ্টিতে রৌপ্যও ثمن-এর মর্যাদা রাখে বিধায় যাকাতের ক্ষেত্রে রৌপ্যকে নিসাব হিসেবে ধরতে হবে এবং এতেই গরীবদের বেশি লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, যাকাতের ক্ষেত্রে যেটার নিসাব ধরলে ফকীরদের লাভ বেশি সেটাকেই নিসাব ধরতে হবে। এজন্য যাকাতের ক্ষেত্রে রৌপ্যকে নোটের মাপকাঠি ধরতে হবে এবং যতটুকু সম্পদ থাকলে রুপার নিসাবের মালিক হয় ততগুলো নোট থাকলে যাকাত দিতে হবে।

৩। একই রাষ্ট্রের নোট সমান সমান করে রদবদল করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয। তবে শর্ত হলো عقد-এর মজলিসে উভয়ের যে কোন একজন (احدالبدلين) নোট হস্তগত করতে হবে। সুতরাং হাত বদলকারী দুই ব্যক্তির কোন একজন যদি ঐ মজলিসে নোট গ্রহণ না করে এমনকি দুইজনেই পৃথক হয়ে যায় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এবং কতিপয় মালেকী ইমামগণের নিকট এই আকদ (عقد) জায়িয হবে না, عقد ফাসিদ বলে বিবেচিত হবে।

বিভিন্ন রকম নোটের হুকুম

দুই রাষ্ট্রের দুই নোট আলাদা "জিনিস" হিসেবে বিবেচিত হবে বিধায় সন্তুষ্ট চিত্তে একই রাষ্ট্রের নোট অপর রাষ্ট্রের নোট দিয়ে কমবেশি করে বিনিময় করা

যাবে। তবে কমপক্ষে চুক্তির মজলিসে টাকা (নোট) গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় افتراق عن دين بدين হওয়ার কারণে নাজায়িয হবে। একটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে, রাষ্ট্র বা ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন নোটের যে মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হয় এর বিপরীত (মূল্যে) হাত বদল করা জায়িয কি-না?

যেহেতু বিভিন্ন রাষ্ট্রের নোট স্বয়ং সম্পূর্ণ ثمن-এর মর্যাদা রাখে এজন্য রাষ্ট্রকর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে কমবেশি করে হাতবদল করা জায়িয হবে এবং এটাকে সুদ হিসেবে গণ্য করা হবে না। তবে রাষ্ট্রের আইন অমান্য করে এরূপ করা নিষেধ। কেননা যদি ইসলামী রাষ্ট্র হয় তাহলে اولوالامر (শাসকের) বিরুদ্ধাচারণ করতে হয় আর যদি ইসলামী রাষ্ট্র না হয় তাহলে কমপক্ষে নিজেকে শাস্তির সম্মুখীন করতে হয়। এজন্য এটা নিষেধ।

باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر

অধ্যায় ঃ অজ্ঞাত পরিমাণ খেজুর নির্ধারিত পরিমাণ খেজুর দ্বারা বিক্রি করা হারাম

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمَرِ لاَ يُعْلَمُ مَكِيْلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمّٰى مِنَ التَّمَرِ ـ

হুযূর (সা.) অজ্ঞাত পরিমাণ খেজুরকে নির্ধারিত পরিমাণ খেজুর দ্বারা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। খেজুরকে খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করতে হলে উভয় খেজুরের পরিমাণ সমান হতে হবে। সুতরাং একদিকে খেজুর যদি নির্ধারিত ও অপর দিকে غيرمعين এবং مجهول الكيل হয় তাহলে কমবেশির সম্ভাবনা থাকে যা সুদ হিসেবে গণ্য। এ কারণে রাসূল (সা.) এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। এর দ্বারা ফকীহগণ একটি কায়েদা তাখরীজ (এস্তেম্বাত) করেছেন যে, الجهل بالمماثلة فى باب الربوا كحقيقة المفاضلة। অর্থাৎ সুদের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যের অজ্ঞতাই প্রকৃত تفاضل-এর স্থলাভিষিক্ত। কথাটির অর্থ হলো اشياء ربوية (সুদজাতীয় বস্তু) হাতবদল করার জন্য যে مماثلت (বরাবর হওয়া) শর্ত এই مماثلت না জানা থাকাই বাস্তবিক পক্ষে مماثلت না থাকার মত। সুতরাং যদি উভয় পক্ষে কিংবা একপক্ষে পরিমাণ অস্পষ্ট-অজানা

হয় তাহলে এর মধ্যে تفاضل-এর হুকুম কার্যকর হবে বিধায় সুদ হিসেবে গণ্য হবে। সুদ থেকে বাঁচতে হলে নিশ্চিতভাবে "বরাবর" (مساوات)-এর জ্ঞান থাকতে হবে। আর এই হুকুম শুধু মাত্র খেজুরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং সকল সুদজাতীয় বস্তুও একই হুকুম ; যখন তা একই জাতীয় বস্তু দ্বারা হাতবদল করা হয়।

باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين

অধ্যায় ঃ খেয়ারে মজলিস সাব্যস্ত হওয়া

عَنْ نافع عَنْ ابن عمر اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْبَيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلٰى صَاحِبِهٖ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا اِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ۔

خيار-এর অর্থ ঃ خيار শব্দটি কাছরার সাথে। এটা اختيار বা طلب خير الامرين من امضاء البيع -এর اسم - خيار বলা হয় تخيير-এর او فسخه -বেচাকেনার চুক্তি বহাল রেখে কিংবা চুক্তি ভঙ্গ করে দু'টি বিষয়ের যেটি কল্যাণকর সেটা তলব করা।

خيار-এর প্রকারভেদ

خيار কয়েক প্রকার। ১। خيارشرط যা আকদের সময় শর্তযুক্ত করা হয়, ২। خيارعيب ক্রয় করার পর খরিদা বস্তুর মধ্যে ত্রুটি পাওয়া গেলে এই خيار ছাবেত হয়। ৩। خياررؤيت না দেখে ক্রয় দেখার পর সেটা রাখা না রাখার خيار-কে خياررؤيت বলে।

৪। خيارقبول ক্রেতা বিক্রেতার কোন একজন ايجاب (প্রস্তাব) দেয়ার পর অপরজনের কবুল করা না করার ইখতিয়ার।

উল্লেখিত চার প্রকার خيار-এর তাফসীল বা ব্যাখ্যার মধ্যে ইমামগণের মতানৈক্য থাকলেও এগুলোর ثبوت (বিশুদ্ধতার) ব্যাপারে সবাই একমত।

৫। خيارغبن ঃ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে (কোন একজন) প্রতারিত হলে যে خيار লাভ হয় তাকে خيارغبن বলে। প্রতারিত হওয়ার তিনটি পদ্ধতি হতে

পারে। (ক) تلقی رکبان (খ) نجش এবং (গ) مسترسل প্রথম দুই প্রকারের আলোচনা করা হয়েছে। خيار مترسل-এর মধ্যে মতবিরোধ আছে। পরবর্তীতে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

৬। خيار مجلس অর্থাৎ ঈজাব-কবুলের মাধ্যমে بيع-কে পূর্ণ করার পর মজলিসে অবস্থান করাকালীন আকেদাইনের কোন একজন অপরজনের সন্তুষ্টি ছাড়াই চুক্তিভঙ্গ (فسخ عقد)-এর ইখতিয়ার লাভ করা। বাস্তবেই এই خيار আছে কি-না এ ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে ইখতিলাফ আছে এবং এই বিষয়টি নিয়েই আমাদের এত আলোচনা। উল্লেখ্য যে, এখানে প্রসিদ্ধ কয়েকটি خيار-এর কথা উল্লেখ করা হলো। অন্যথায় আল্লামা ইবনে কুদামা خيار-এর সংখ্যা ৭টি, আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) ১৩টি এবং দুররে মুখতারের মুসান্নিফ (রহ.)-এর সংখ্যা ১৯টি পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। —বিস্তারিত দেখুন-আওজাযুল মাসালিক খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা ৩১৬-১১৭

খেয়ারে মজলিসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে মতভেদ

১। ইমাম শাফেঈ ও আহমদ (রহ.) خيار مجلس-এর قائل (প্রবক্তা)। অর্থাৎ তারা বলেন, ঈজাব-কবুলের পর মজলিস থেকে পৃথক হওয়ার আগ পর্যন্ত ক্রেতা-বিক্রেতার خيار থাকবে, তারা ইচ্ছা করলে عقد ফস্খ করতে পারবে। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, যুহরী, আতা, তাউস, শুরাইহ্, শা'বী, আওযায়ী, ইবনে আবি যি'ব, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, ইবনে আবি মুলাইকা, হাসান বসরী, হিশাম ইবনে ইউসুফ, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই, আবু ছাওর, আবূ উবাইদ মুহাম্মাদ ইবনে জারীর তাবারী প্রমুখ আলিমসহ আহলে জাহেরগণ এই মত পোষণ করেছেন।

২। আহনাফ ও মালেকী মাযহাব অনুযায়ী কারো জন্য خيار مجلس নেই। তাঁদের মতে ঈজাব-কবুলের পর عقد পুরো হয়ে যায়। কারো জন্য কোন প্রকারের اختيار থাকে না। তবে خيار عيب ، خيار رؤيت এবং خيار شرط-এর কথা ভিন্ন। এটা ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, মালেক ইবনে আনাস সুফিয়ান ছাওরী, ইবরাহীম নখয়ী রবি'আতুর রায় প্রমুখের অভিমত।

ইমাম শাফেঈ ও আহমদের দলীল

ইমাম শাফেঈ (রহ.) ও ইমাম আহমদ (রহ.) প্রমুখ হযরত ইবনে ওমরের (রা.) হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন যাতে মজলিস থেকে পৃথক হওয়ার আগ পর্যন্ত خيار থাকার কথা বলা হয়েছে। البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يتفرقا-এই হাদীসে বর্ণিত تفرق বলতে তাঁরা تفرق ابدان বুঝে থাকেন। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত ক্রেতা-বিক্রেতা দৈহিকভাবে এক অপর থেকে পৃথক না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত خيار থাকবে। আর এটাই خيارمجلس। হ্যাঁ, যদি একে অপর থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং মজলিস শেষ হয়ে যায় তাহলে خيار বাতিল হবে এবং بيع আবশ্যক (لازم) হবে।

আহনাফ ও মালেকীদের দলীল

আহনাফ ও মালেকীগণ নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেন।

(١) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ـ

ঈজাব ও কবুলের নাম আক্‌দ। আলোচ্য আয়াতে عقد পুরা করার কথা বলা হয়েছে। আর عقد خيار পুরা করার বিপরীত। সুতরাং এই আয়াতের বিপরীত হওয়ায় خيارمجلس-এর অস্তিত্ব মানা যাবে না।

(٢) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ـ

আলোচ্য আয়াতে "সন্তুষ্ট চিত্তে ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ খেতে বলা হয়েছে। আর সন্তুষ্ট চিত্তে ব্যবসা (تجارت بالتراضى) ঈজাব কবুলের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে।

অভিধান ও শরয়ী পরিভাষা অনুযায়ী تجارة শব্দটি ঈজাব ও কবুলের অর্থে ব্যবহৃত হয়। اجتماع ও افتراق-এর অর্থের সাথে এর কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। সুতরাং এই আয়াতও خيار مجلس-এর অস্তিত্ব অস্বীকার করে ঈজাব-কবুলের পর ক্রয়-বিক্রয়কে পূর্ণতা দেয়ার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করছে। —তানজিমুল আশতাত খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১১৯। এভাবেই মাল-সম্পদ হালালে পরিণত হয়। সুতরাং

কাউকে এই অধিকার দেয়া যাবে না যার দ্বারা সে অন্যের সন্তুষ্টি ছাড়া عقد-কে فسخ করে পরের মাল ভোগ করে।

(৩) واشهدوا اذاتبايعتم আয়াতে ঈজাব ও কবুলের নাম تبايع আর আয়াতে স্বাক্ষী রেখে একে মজবুত করতে বলা হয়েছে। এখন যদি ঈজাব কবুল দ্বারা بيع পূর্ণতা লাভ না করে এবং خيارمجلس-এর সুযোগ দেয়া হয় তাহলে এই স্বাক্ষী রাখার যৌক্তিকতা কোথায়? এই আয়াত দ্বারা خيارمجلس-এর অবকাশ না থাকাটাই পরিষ্কার বুঝে আসে। এ দলীলগুলো বিস্তারিতভাবে জানতে হলে ইমাম আবূ ইবনুল জাস্সাসের আহ্কামুল কুরআন দেখা যেতে পারে। তিনি ولاتاكلوا اموالكم الايۃ-এর ব্যাখ্যায় এ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

(৪) পূর্বে হযরত ইবনে আব্বাসের একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে—

من ابتاع طعاما فلايبعه حتى يستوفيه ـ

আলোচ্য হাদীসে খাদ্য ক্রয়ের পর একে হস্তগত করার আগে তা পুনরায় বিক্রি করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর দ্বারা একথাই বুঝা যাচ্ছে যে, ক্রেতা যখন সেটা হস্তগত করবে কেবল তখনই বিক্রি করা জায়িয হবে। ক্রেতার এই 'হস্তগত' করাটা تفرق ابدان (দৈহিকভাবে পৃথক হওয়ার) আগেও হতে পারে। তাহলে জানা গেলো যে, تفرق ابدان-এর আগে অর্থাৎ মজলিস বাকি থাকা সত্ত্বেও যদি ক্রেতা مبيع হস্তগত করে তাহলে সে ওটা বিক্রি করতে পারে। যদি خيارمجلس-ই থাকত তাহলে শুধু মাত্র কব্জা (হস্তগত) করার দ্বারা বিক্রি করার অধিকার লাভ করতে পারত না বরং মজলিস শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো। হযরত ইমাম আবূ জা'ফর ত্বহাভী (রহ.) উল্লেখিত হাদীস দ্বারা হানাফীদের মাযহাবের এভাবে দলীল উপস্থাপন করেছেন।

৫। ইমাম বুখারী (রহ.) باب اذااشترى شيئافوهب من ساعته قبل ان يتفرقا অধ্যায়ে হযরত ইবনে ওমর (রা.) এর নিম্নোক্ত রেওয়ায়াতটি উল্লেখ করেছেন—

قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلٰى بِكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ فَكَانَ يَغْلِبُنِيْ فَيَتَقَدَّمُ اَمَامَ الْقَوْمِ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ

وَيَرُدُّهُ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ بِعْنِيْهِ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِعْنِيْهِ فَبَاعَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَكَ يَا ابْنَ عُمَرَ تَصْنَعْ بِهِمَا شِئْتَ.

ঘটনাটি হলো, একবার হযরত রাসূল (সা.) ওমরের (রা.) একটি উট ক্রয় করেন। ক্রয় করার সাথে সাথে ইবনে ওমরকে উটটি দান করে দেন। অথচ تفرق ابدان-এর কোন সুযোগই ছিল না এতে। এখন কথা হলো যদি خيار مجلس-এর অস্তিত্ব থাকত তাহলে রাসূল (সা.) পৃথক (تفرق) হওয়ার আগেই দান করতেন না বরং تفرق ابدان পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। কেননা রাসূলের (সা.) শানে এমন ধারণাই করা যায় না যে, তিনি এমন জিনিস দান করবেন যাতে অন্যের হক (খেয়ার) সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে। এটা প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত জাফর আহমদ ওসমানী (রহ.)-এর দলীল।

৬। আব্দুর রাযযাক, বাইহাকী ও ইবনে আবি শাইবা হযরত ওমরের (রা.) একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন— عن عمر بن الخطاب قَالَ انما البيع عن صفقة او خيار আল্লামা শামসুল আয়িম্মা সারাখসী (রহ.) এ হাদীস দ্বারা خيار مجلس-কে রদ করেছে। তিনি باب الاستبراء من بيوع المبسوط এ উল্লেখ করেন। এখানে صفقة দ্বারা উদ্দেশ্য হলো النافذة اللازمة তথা অবশ্যাম্ভবীভাবে চুক্তি পূর্ণ হওয়া।

তাহলে বোঝা গেলো بيع দুই প্রকার ঃ ১. لازم ২. غيرلازم যার মধ্যে خيار থাকবে। এখন যদি সকল بيع - এর মধ্যে خيار-এর অবকাশ থাকে তাহলে সকল بيع - غيرلازم হয়ে যাবে। কোন بيع-ই لازم থাকবে না। আর ইহা উল্লেখিত রেওয়ায়াতের সুস্পষ্ট বিরোধী (خلاف)। এটা ইমাম সারাখসীর (রহ.) দলীল।

৭। عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَجْزِىْ وَلَدْ وَالِدًا اِلاَّ اَنْ يَجِدَهٗ مَمْلُوْكَا فَيَشْتَرِيْهِ فَيُعْتِقُهُ

رواه مسلم وابوداود والترمذى وابن ماجة.

এই হাদীসের আলোকে ফকীহগণ বলেছেন যে, কোন পিতাকে গোলাম অবস্থায় পেয়ে সন্তান খরিদ করলে সাথে সাথে সে আযাদ হয়ে যাবে। নতুন করে আযাদ করার প্রয়োজন নেই। লক্ষণীয় বিষয় হলো, হুযূর (সা.) আযাদ হওয়ার জন্য تفرق بالابدان-এর শর্ত করেন নি বরং ক্রয় করার সাথে সাথেই আযাদ হয়ে যাবে বলে বলা হয়েছে।

৮। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা.)-এর এক হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন— وَلَا يَحِلُّ لَهٗ اَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهٗ خَشْيَةَ اَنْ يَسْتَقِيْلَ অর্থাৎ ঈজাব-কবুলের পর "ইকালা" বাতিল করার লক্ষ্যে মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া জায়িয নেই।

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় ঈজাব-কবুলের সাথে সাথেই بيع (ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি) পূর্ণতা লাভ করে। যদি তাই না হতো তাহলে চুক্তি ভঙ্গ (ইকালা) করার জন্য বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিত না।

৯। যৌক্তিক দলীল ঃ আল্লামা আবূ বকর জাসসাস (রহ.) বলেন, এটা সর্বজন স্বীকৃত উসূল যে, যখন কোন চুক্তির যাবতীয় রোকন পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যাবে তখন ঐ চুক্তিও পুরোপুরিভাবে কার্যকর হবে। আর এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, ক্রয়-বিক্রয়ের রোকন হলো ঈজাব ও কবুল। সুতরাং এই রোকন পাওয়া যাওয়ার পর بيع-এর চুক্তি পুরো হওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত এবং মজলিসের শেষ পর্যন্ত খেয়ার থাকার প্রশ্নই আসে না।

১০। অন্যান্য লেনদেনের ওপর কিয়াস ঃ সর্বসম্মতিক্রমে অন্য কোন লেনদেনে خيار مجلس-এর অস্তিত্ব নেই। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয়েও خيارمجلس না থাকাই যুক্তিযুক্ত।

১১। تفرق بالابدان একটি অস্পষ্ট বিষয়, যার কারণে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে ঝগড়া বেঁধে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সুতরাং একটি অস্পষ্ট বস্তুর ওপর লেনদেনের ভিত্তি হতে পারে না। উপরন্তু শরীয়ত ঝগড়া সৃষ্টি হয় এমন যে কোন প্রক্রিয়া বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয়ের মত গুরুত্বপূর্ণ এই লেনদেনে উপরোক্ত সমস্যা জিইয়ে রাখার কোন অর্থ আছে?

যদি خيار مجلس-এর অবকাশ থাকত, তাহলে تفرق-এর পূর্বে আযাদ হত না। এটা ইমাম আবূ বকর জাস্‌-সাসের দলীল।

ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসের জবাব

আহনাফ ও মালেকীগণের পক্ষ থেকে ইবনে ওমরের (রা.) হাদীস—

البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يتفرقا .

এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।

১। تفرق দুই প্রকার। تفرق ابدان এবং تفرق اقوال হাদীসে تفرق দ্বারা تفرق بالاقوال উদ্দেশ্য, تفرق بالابدان উদ্দেশ্য নয়। تفرق بالاقوال কথাটির অর্থ হলো— একজন بعت ও অপর জন اشتريت বলা।

(এটাকে خيار قبول বলে পূর্বে এর আলোচনা করা হয়েছে) হাদীসে خيار قبول-এর প্রতি ইঙ্গিত জ্ঞাপন করছে। কেননা একজনের প্রস্তাব (ঈজাব) দেয়ার পর অপর জনের কবুল করা না করার হক আছে। এমনিভাবে প্রস্তাব দাতারও নিজের মত পরিবর্তন করার অবকাশ রয়েছে। সুতরাং ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের خيار থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ব্যক্তি কবুল না করবে। যখন দ্বিতীয় ব্যক্তি কবুল করে ফেলবে তখন تفرق بالاقوال হয়ে যাবে এবং خيار এখানেই শেষ হয়ে যাবে।

এই তাফসীরটি ইবরাহীম নখয়ী (রহ.) থেকে বর্ণিত এবং ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ এই মতের সমর্থন করেছেন। تفرق দ্বারা যে, تفرق بالاقوال উদ্দেশ্য হতে পারে এটা প্রমাণ করার জন্য আহনাফগণ অনেকগুলো দলীল পেশ করেছেন। যেমন—

قوله تعالى : وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا ، وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ، قوله عليه السلام : اِفْتَرَقَتْ بَنُوْا اِسْرَائِيْلَ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَسَتَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلٰثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً .

আলোচ্য আয়াত ও হাদীসে تفرق দ্বারা تفرق بالاقوال-ই উদ্দেশ্য تفرق بالابدان উদ্দেশ্য নয়।

২। হাদীসে تفرق দ্বারা تفرق بالابدانই উদ্দেশ্য تفرق بالاقوال উদ্দেশ্য নয় কিন্তু خيار দ্বারা خيارقبول উদ্দেশ্য خيارمجلس উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং হাদীসটির অর্থ হলো— একজনের ঈজাবের পর মজলিসে থাকা অবস্থাতেই (تفرق بالابدان হওয়ার আগে আগেই) অপরজনের কবুল করা না করার অধিকার আছে। تفرق بالابدان হওয়া মাত্রই ঈজাব বাতিল হয়ে যাবে। দ্বিতীয় জনের ঐ ঈজাব কবুল করার অধিকার বাকি থাকবে না বরং নতুন করে ঈজাবের প্রয়োজন পড়বে।

এই তাফসীরটি ইমাম আবূ জা'ফর ত্বহাভীর থেকে বর্ণিত, যেটা তিনি ইমাম আবূ ইউসুফ ও কাজী ঈসা ইবনে আবান (রহ.) থেকে গ্রহণ করেছেন। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) এই তাফসীরকে তাঁর কিতাব উরফুস সাযীতে ইমাম মুহাম্মাদের তাফসীরের তুলনায় অধিক সূক্ষ্ম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

৩। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেছেন—আমার মতে সবচেয়ে উত্তম ব্যাখ্যা হলো ঃ এখানে تفرق দ্বারা تفرق بالابدان-ই উদ্দেশ্য কিন্তু এর দ্বারা تفرق بالاقوال ও فراغ عَنْ العقد-এর প্রতি সূক্ষ্মভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা عقد তথা ঈজাবও কবুলের পর সাধারণত تفرق بالابدان হয়েই যায়। মজলিস বাকি থাকে না। সুতরাং এখানে تفرق بالابدان مكنى به (যার দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়) এবং تفرق بالاقوال مكنى عَنْه

مكنى عَنْه (যার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়)।

অথবা এও বলা যেতে পারে যে, تفرق بالابدان-এর সূচনা। মোদ্দা কথা হলো হাদীসে تفرق بالابدان উল্লেখ করে تفرق بالاقوال-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উল্লেখিত তিনটি ব্যাখ্যার সার কথা হলো বর্ণিত হাদীসে خيار বলতে خيارقبول বুঝানো হয়েছে خيارمجلس নয়। আলিমগণ এর সমর্থনে দুটি দলীল পেশ করেছেন।

১। হাদীসে البيعان শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। আর এটা صيغه صفت ঈজাব ও কবুল করা কালীন শব্দটি حقيقى (প্রকৃত) অর্থে ক্রেতা-বিক্রেতার ওপর প্রয়োগ হয়। কেননা এই সময়টুকুতেই ক্রেতা ক্রয় করছে আর বিক্রেতা বিক্রি করছে।

কিন্তু ঈজাব কবুল তথা عقد সংঘটিত হওয়ার পর بيعان (ক্রেতা-বিক্রেতা) বলা مجاز তথা রূপক অর্থে বলা যেতে পারে। অর্থাৎ এই কিছুক্ষণ পূর্বে তারা ক্রেতা-বিক্রেতা ছিল এই হিসেবে (مجاز ما كان) بيعان বলা হয়েছে। হাদীসটিকে যদি خيار مجلس-এর ওপর প্রয়োগ করা হয় তাহলে البيعان শব্দটি مجازى রূপক অর্থ প্রদান করবে আর خيار قبول-এর ওপর প্রয়োগ করলে حقيقى অর্থ প্রদান করবে। আর حقيقى অর্থ مجازى অর্থের তুলনায় উত্তম। والحقيقة اولى من المجاز ।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ اَلْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ـ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ اَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ اَنْ يَسْتَقِيْلَهُ ـ (ابو داود ولترمذى)

আলোচ্য হাদীসের শেষাংশে (ولايحل له ان الخ) বলা হয়েছে যে, সাথী ইকালা (فسخ بيع) করবে এই ভয়ে তার থেকে পৃথক হওয়া হালাল নয়। বুঝা যাচ্ছে রাসূল (সা.) মজলিস বিদ্যমান থাকাকালীন فسخ بيع-কে اِقَالَة সাব্যস্থ করছেন। আর اِقَالَة-এর প্রশ্ন আসে بيع পুরো হওয়ার পর। যদি بيع পুরো না হতো তাহলে اِقَالَة-এর প্রশ্নই আসত না। এখন বুঝার বিষয় হলো যদি ঈজাব কবুলের পর خيارمجلس বহাল থাকে এবং بيع পূর্ণতা না পায় তাহলে রাসূল (সা.) একে اِقَالَة হিসেবে আখ্যায়িত করতেন না।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

অবশ্য শাফেঈগণ এই দাবি করে থাকেন যে, হাদীসে خيارمجلس-এর কথাই বলা হয়েছে। কেননা রাসূল (সা.) ইকালার ভয়ে সাথী থেকে পৃথক হতে নিষেধ করেছেন যার দ্বারা বুঝা যায় যে, এই পৃথক হওয়াটা خيار বাতিল করতে

এবং بيع-কে পূর্ণতা দেয়ার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াকারী। অন্যথায় রাসূল (সা.) একে নিষেধ করতেন না।

পরস্পর থেকে পৃথক হওয়ার কারণে خيار বাতিল হওয়া এবং بيع লাযিম হওয়া একথাই বুঝাচ্ছে যে, পৃথক হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রত্যেকের خيار ছিল এবং بيع লাযিম ছিল না। আর এটাকেই তো خيار مجلس বলে।

আহনাফ এর জবাবে বলে থাকেন যে, হুযূর (সা.) মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই হুকুম প্রদান করেছেন। ঈজাব কবুল দ্বারা যদিও بيع পূর্ণতা লাভ করে কিন্তু মজলিস বহাল থাকা অবস্থায় عاقدين-এর মধ্যে কেউ যদি اقالة করতে চায় তাহলে অপরজন মানবতা ও লজ্জার খাতিরে রাজি হয়ে যায়। কিন্তু মজলিস শেষ হয়ে যাওয়ার পর এই সুযোগ আর থাকে না। সুতরাং ইকালার ভয়ে পৃথক হতে নিষেধ করাটা মানবতার দিক বিবেচনায়, ফয়সালা বা নির্দেশ হিসেবে নয়:

৪। ইবনে ওমর (রা.) এর হাদীস البيعان كل .... ما لم يتفرقا الخ-এর চতুর্থ ব্যাখ্যা হলো এখানে خيار দ্বারা خيارمجلس-ই উদ্দেশ্য। কিন্তু এই নির্দেশটা এসেছে দ্বীনদারীর বিবেচনায় এবং মুস্তাহাব হিসেবে (استحبابا ودیانة) নির্দেশ। (حكمًا) হিসেবে নয়।

অর্থাৎ عقد পুরা হওয়ার পর যদিও কারো জন্য فسخ করার অধিকার থাকে না কিন্তু কোন মুসলমান ভাই যদি ক্রয় করে অনুশোচনায় পড়ে যায় তাহলে অপর জনের মানবতার দিক বিবেচনায় فسخ بيع-এর সুযোগ দেয়া উচিত।

শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদুল হাসান (রহ.) এই ব্যাখ্যাকে পছন্দ করেছেন।

সার কথা হলো خيار مجلس সংক্রান্ত আলোচনায় আহনাফ ও মালেকীগণের মতই প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য। এর কারণ নিম্নরূপ ঃ

১। আহনাফের মত কুরআন দ্বারা সমর্থিত ২। আহলে মদীনার আমল (تعامل اهل مدينة) আমাদের মাযহাবের অনুরূপ। তাঁদের পরিভাষায় خيارمجلس বলতে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। আহলে মদীনার আমলও একদিক দিয়ে প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য।

৩। কিয়াস ও যুক্তি অনুযায়ী আহনাফের মাযহাব শক্তিশালী।

৪। আহনাফের দলীল-প্রমাণ محكم (সুস্পষ্ট অর্থবোধক) এতে ভিন্ন ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না। অথচ অন্যান্য ইমামগণের মাযহাবের ভিত্তিই হলো تاويل (ব্যাখ্যার) ওপর।

الا بيع الخيار-এর ব্যাখ্যা

হযরত ইবনে ওমর (রা.) এর হাদীসে الا بيع الخيار বাক্য এসেছে। এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে।

১। مفهوم غايت থেকে استثناء করা হয়েছে। এর অর্থ اِذَا تَفَرَّقَا

سَقَطَ الْخِيَارُ وَلَزِمَ الْعَقْدُ اِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ اَىْ بَيْعٌ شُرِطَ فِيْهِ الْخِيَارُ.

অর্থাৎ خيار-এর শর্ত লাগানোর কারণে পৃথক হওয়ার পরেও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত خيار বাকি থাকে। এই ব্যাখ্যা আহনাফ ও শাফেঈ উভয়ের মাযহাবের ওপর প্রয়োগ হতে পারে।

২। আসল حكم থেকে استثناء করা হয়েছে। আর بيع الخيار-এর মধ্যে مضاف উহ্য রয়েছে। বাক্য হবে এরূপ بيع اسقاط الخيار اى الخيار ثابت ما لم يتفرقا الا اذا شرط عدم الخيار অর্থাৎ تفرق-এর আগ পর্যন্ত خيار বাকি থাকবে কিন্তু যদি خيار থাকবে না এরূপ শর্ত করা হয় তাহলে خيار বাকি থাকবে না।

৩। কথাটির অর্থ হলো ঃ

اِلَّا بَيْعًا يَقُوْلُ اَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ لِلْاٰخَرِ اِخْتَرْ فَيَقُوْلُ اخْتَرْتُ.

এরূপ ক্ষেত্রে خيار বাতিল হয়ে যায়। যদিও تفرق না হয়। শেষোক্ত এই দুই ব্যাখ্যা শাফেঈগণের মতকে সমর্থন করে।

خيار-এর অন্যান্য প্রকার

ফকীহগণ মোট সতের প্রকার خيار এর কথা উল্লেখ করেছেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

১। خيارشرط ঃ চুক্তির সময় ক্রেতা বা বিক্রেতার জন্য নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে চুক্তি বহাল বা বাতিল করার অধিকার থাকা।

২। خيار عيب ঃ কোন পণ্য ক্রয়ের পর এতে ত্রুটি ধরা পড়লে ক্রেতার তা গ্রহণ করা না করার অধিকারকে خيار عيب বলে।

৩। خيار رؤيت ঃ কোন কিছু না দেখে ক্রয় করে দেখার পর এই চুক্তি বহাল রাখা না রাখার অধিকারকে خيار رؤيت বলে।

৪। خيار قبول ঃ একজন প্রস্তাব দেওয়ার পর অপরজন সেই প্রস্তাব গ্রহণ করা বা না করাকে خيار قبول বলে।

৫। خيار تعيين ঃ একাধিক পণ্য সামগ্রী থেকে এ নির্দিষ্ট একটি পণ্য বাছাই করার অধিকার লাভ করাকে خيار تعيين বলে।

৬। خيار ايجاب ঃ উভয় পক্ষের কোন একজন প্রস্তাব দেয়ার পর অপর জন কবুল করার আগে সেই প্রস্তাব বহাল রাখা বা বাতিল করার অধিকারকে خيار ايجاب বলে।

৭। خيار اجازت ঃ ক্রেতা-বিক্রেতার অনুমোদন ছাড়া তৃতীয় পক্ষের কেউ ক্রয়-বিক্রয় করলে সেটা বহাল রাখা না রাখার 'খেয়ার' কে خيار اجازت বলে।

৮। خيار مجلس-এর বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। এ ছাড়াও خيار استحقاق ، خيار كميت ، خيار نقد বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

باب من يخدع فى البيع

অধ্যায় ঃ বিক্রয়ের সময় ধোঁকা দেয়া

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ اَنَّهٗ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ : ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ يُخْدَعُ فِى الْبُيُوْعِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ فَكَانَ اِذَا بَايَعَ يَقُوْلُ لاَخِيَابَةَ

এই লোকটি কে?

হুযূর (সা.)-এর কাছে এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হলো যে, লোকটি ক্রয়-বিক্রয়ের সময় প্রতারিত হয়। রাসূল (সা.) বললেন— তুমি যখন ক্রয়-বিক্রয় করবে তখন বলবে لاخلابة কোন প্রতারণা চলবে না। অর্থাৎ আমাকে প্রতারিত করা তোমার জন্য জায়িয নয় বা তোমার ধোঁকা আমার ঘাড়ে চাপবে না। প্রশ্ন হলো এই লোকটি কে?

লোকটি কে এ ব্যাপারে দু'টি মত পাওয়া যায়।

১। হিব্বান ইবনে মুনকিয ইবনে আমর আনসারী (রা.)। তাঁর দুই ছেলে ইয়াহইয়া এবং ওয়াসি, (রা.) বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

২। কেউ বলেন তিনি হলেন মুনকিয ইবনে আমর। তাঁর বয়স হয়েছিল ১৩০ বছর। হুযূরের (সা.) সাথে কোন এক যুদ্ধে দুশমন কর্তৃক পাথর দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হন এবং তাঁর মাথা ও যবানে ক্ষত সৃষ্টি হয়। এ কারণে তাঁর বুদ্ধি কিছুটা লোপ পায় এবং যবান ভারী হয়ে যায়। তবে ভালো মন্দ যাচাই করার শক্তি হারাননি।

لاخلابة শব্দের ব্যাখ্যা

خلابة শব্দটি خديعة-এর অর্থে আনা হয়েছে। লোকটির যবান ভারী হয়ে যাওয়ার কারণে রাসূল (সা.) তাকে خديعة-এর বদলে خلابة বলার নির্দেশ দেন যাতে উচ্চারণে সহজ হয়। কিন্তু এই সাহাবী لاخلابة শব্দটিও সহীহ্‌ভাবে উচ্চারণ করতে পারতেন না বরং لام কে ياء দ্বারা পরিবর্তন করে لاخيابة বলতেন। কতক রেওয়ায়াতে لاخيانة এবং অন্য কতক রেওয়ায়াতে لاخلابة শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে।

মূলত উল্লেখিত সাহাবীর যবানের এই সমস্যার কারণে একেকজন একেক রকম শুনে সে অনুযায়ী বর্ণনা করে দিয়েছেন।

خيار المسترسل المغبون

مسترسل مغبون বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে পণ্যের মূল্য ভালো করে জানে না এবং সুষ্ঠভাবে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে না। এরূপ ব্যক্তি প্রতারিত হলে فسخ بيع-এর ইখতিয়ার লাভ করবে কিনা এ সম্পর্কে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে।

১। এই হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) এবং কতিপয় মালেকী বলেছেন ঐ ব্যক্তি যদি অস্বাভাবিক ধোঁকা খায় তাহলে তার خيار হাসিল হবে। তাঁরা এর পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন এক-তৃতীয়াংশ মূল্য (ثلث قيمت)। উদাহরণস্বরূপ কোন বস্তুর মূল্য নয় টাকা কিন্তু ক্রয় করেছে ১২ টাকা দিয়ে, তাহলে এই ব্যক্তির خيار হাসিল হবে।

২। আহনাফ, শাফেঈ এবং জমহুর মালেকীর অভিমতে مغبون (প্রতারিত) ব্যক্তির خيار হাসিল হবে না।

চাই সে مسترسل হোক বা مسترسل না হোক। কেননা পরস্পরের সন্তুষ্টি চিত্তে নির্ধারিত মূল্যের (ثمن) ওপর ক্রয়ের عقد সংঘটিত হয়েছে আর তারা উভয়ে عاقل ব্যক্তি। সুতরাং এরূপ লেনদেন تجارة عَنْ تراض منهما-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে কারো জন্য خيار হাসিল হবে না।

হাদীসের জবাব

বর্ণিত হাদীসটির দু'টি জবাব দেয়া হয়েছে।

১। এই হুকুমটি হযরত হিব্বান ইবনে মুনকিয (রা.)-এর সাথে খাস। আমভাবে সকলের ক্ষেত্রে এই হুকুম প্রযোজ্য নয়।

২। তাঁকে যে خيار দেয়া হয়েছিল সেটা خيار مغبون নয় বরং خيارشرط কেননা বিভিন্ন রেওয়ায়াতে এভাবে বলা হয়েছে—

إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ لاَخِلاَبَةَ ثُمَّ أَنْتَ فِىْ كُلِّ سِلْعَةٍ اِبْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلٰثَ لَيَالٍ - رواه ابن ماجه

লক্ষণীয় বিষয় হলো এই হাদীসে ثلث ليال বলে তিন দিনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা -خيار شرط-এর দলীল। কেননা-خيارمغبون-এর প্রবক্তাগণ এই خيار-এর ক্ষেত্রে তিন দিনের শর্তারোপ করেন না। সুতরাং বুঝা গেলো এর দ্বারা দিনের সাথে শর্ত সংশ্লিষ্ট خيارشرط-ই উদ্দেশ্য।

এমনিভাবে لا خلابة শব্দটিও একথা বুঝাচ্ছে যে, خيارمغبون বলতে কোন خيار-এর অস্তিত্ব নেই। কেননা خيار থাকলে لا خلابة বলার প্রয়োজন পড়ত না। যাঁরা خيارمغبون-এর প্রবক্তা তাঁরাও বলেন যে, خيار ছাবেত করার জন্য لا خلابة বলার প্রয়োজন নেই। এতদসত্ত্বেও হিব্বান ইবনে মুনকিয (রা.)-কে যখন لا خلابة বলা হয়েছে তাহলে বুঝা গেলো যে, এর দ্বারা خيار شرط-ই উদ্দেশ্য।

متاخرين احناف -এর ফতওয়া

পরবর্তী যুগের আহনাফ (متاخرين احناف) এই ফতওয়া দিয়েছেন যে, বিক্রেতা কর্তৃক ধোঁকা দেয়ার কারণে যদি ক্রেতা প্রতারিত হয় এবং এই প্রতারণা সীমাতিরিক্ত হয় তাহলে তার خيار হাসিল হবে। পক্ষান্তরে বিক্রেতা

যদি ধোঁকা না দেয় বরং নিজে নিজেই ধোঁকায় পতিত হয় তাহলে ক্রেতার খেয়ার হাসিল হবে না।

সদরুশ শহীদ এরূপই ফতওয়া প্রদান করেছেন। উপরোল্লেখিত পদ্ধতিতে ক্রেতার জন্যও خيار হাসিল হতে পারে।

হ্যাঁ, যদি বাইতুলমাল, ওয়াক্ফ্ অথবা শিশু বাচ্চা, পাগল, নির্বোধ ইত্যাদি প্রকারের মাল হয় তাহলে কারো পক্ষ থেকে ধোঁকা দেয়া ছাড়াই خيار হাসিল হবে।

خيار الشرط

এই অধ্যায়ের হাদীস দ্বারা خيار شرط-এর বৈধতা প্রমাণিত হয়। এর বৈধতার ব্যাপারে ফকীহগণের ইজমা হয়েছে। তবে ইমাম ছাওরী, ইবনে শুব্রুমা, আহলে জাহের প্রমুখ ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে خيارشرط দ্বারা بيع ফাসিদ হয়ে যায়। আসল কথা হলো خيارشرط সম্বলিত হাদীস তাঁদের কাছে পৌঁছেনি, যার ফলে তাঁরা এই মত পোষণ করেছেন।

জমহুর ওলামা খেয়ারের পরিমাণ নিয়ে মতানৈক্য পোষণ করেছেন।

১। আবূ হানীফা (রহ.), শাফেঈ (রহ.) এবং যুফার (রহ.) প্রমুখের মতে খেয়ারের সময় তিন দিন এর বেশি নয়।

২। ইমাম আহমদ ও সাহেবাঈন প্রমুখের মতে خيار-এর নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। ক্রেতা-বিক্রেতা যে কয়দিনের ব্যাপারে ঐক্যমত হবে সে কয়দিনই خيار-এর সময় চাই কম হোক বা বেশি।

৩। ইমাম মালেকের (রহ.) মতে বিক্রিত বস্তু (مبيع)-এর ওপর مدت নির্ভর করে। বাড়ি এবং ভূমি পর্যায়ের হলে ৩৬ দিন, গোলাম পর্যায়ের হলে ১০ দিন, জন্তু পর্যায়ের হলে ২ দিন এবং অন্যান্য পণ্য সামগ্রী হলে ৫ দিন مدت হিসেবে বিবেচিত হবে।

ইমাম মালেক (রহ.) বলেন خيارشرط বৈধই হয়েছে বিষয়টি নিয়ে কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করার জন্য। সুতরাং مبيع এর তারতম্যের কারণে সময়ের মধ্যেও তারতম্য হবে। সকল বস্তুর জন্য একই সময় নির্ধারণ করা হেকমত ও প্রজ্ঞার বিপরীত। ইমাম আহমদ ও সাহেবাঈন (রহ.) বলেন خيارشرط হলো ক্রেতা-বিক্রেতার হক এবং তাদের সন্তুষ্টির ব্যাপার। সুতরাং এর সময় নির্ধারণ ও তাদের সন্তুষ্টির ওপর নির্ভর করবে। চাই কম হোক বা বেশি।

আহনাফ ও শাফেঈগণ বলেন خيارشرط -এর বৈধতা (مشروعيت) খেলাফে কিয়াস বিষয়। কেননা এটা عقد চূড়ান্ত হওয়ার পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী। এতদসত্ত্বেও মুনকিয ইবনে হিব্বান এবং ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস (لا ان يكون بيع الخيار) দ্বারা যেহেতু এর বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায় এবং উল্লেখিত হাদীস দু'টি ছাড়াও অন্যান্য হাদীসে যেহেতু এর পরিমাণ তিন দিন উল্লেখ করা হয়েছে এ জন্য শরীয়ত বর্ণিত পরিমাণই (مدت) চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। এর চেয়ে বেশি করা যাবে না।

যেসব হাদীসে তিন দিনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

(١) عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً اشْتَرٰى عَنْ رَجُلٍ بَعِيْرًا وَاشْتَرَطَ الْخِيَارَ اَرْبَعَةَ اَيَّامٍ فَاَبْطَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْبَيْعَ وَقَالَ اَلْخِيَارُ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ ـ

(٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلْخِيَارُ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ ـ

(٣) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّهُ كَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي الْبُيُوْعِ قَالَ مَا اَجِدُ لَكُمْ شَيْئًا اَوْسَعَ مِمَّا جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِبَّانِ بْنِ مُنْقِذٍ اَنَّهُ كَانَ ضَرِيْرَ الْبَصَرِ فَجَعَلَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُهْدَةَ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ اِنْ رَضِيَ اَخَذَ وَاِنْ سَخَطَ تَرَكَ ـ

৩। হিব্বান ইবনে মুনকিয কে রাসূল (সা.) তিন দিন সময় দিয়েছিলেন অথবা তিনি মা'যুর ছিলেন। যদি তিন দিনের বেশি পরিমাণের অবকাশ থাকত তাহলে রাসূল (সা.) তাকে এ থেকে বঞ্চিত করতেন না।

মোটকথা সময় নির্ধারণের ব্যাপারে আহনাফ ও শাফেঈগণের মতই প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য।

باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع

অধ্যায় ঃ ফল পরিপক্ক হওয়ার আগে কাটার শর্ত করা ছাড়া বিক্রি করা নিষেধ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتّٰى يَبْدُوَ صِلاَ حُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ ـ

"রাসূল (সা.) ফল পরিপক্ক হওয়ার আগে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।" ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কে নিষেধ করেছেন।

এই অধ্যায়ে কয়েকটি আলোচনা রয়েছে। ধারাবাহিকভাবে নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

بدوصلاح -এর ব্যাখ্যা

البدو শব্দটি মাসদার। শাব্দিক অর্থ প্রকাশ পাওয়া। صلاح শব্দটি فساد -এর বিপরীত অর্থ প্রদানকারী অর্থাৎ যোগ্যতা সৃষ্টি হওয়া, পরিপক্ক হওয়া ইত্যাদি। بدو صلاح الثمرة -এর ব্যাখ্যায় ইমামগণের মতানৈক্য রয়েছে।

১। আহনাফের মতে بدوصلاح বলা হয় ان تأمن الثمرة العاهة والفساد, অর্থাৎ ফলের প্রাকৃতিক যাবতীয় দুর্যোগ থেকে মুক্ত হওয়া। আল্লামা ইবনু হুমাম ফতহুল কাদীরে এ কথা উল্লেখ করেছেন।

২। শাফেঈগণের মতে এর অর্থ হলো ظهور مبادى النضج والحلاوة অর্থাৎ ফলে মিষ্টতা ও পাকার আলামত প্রকাশ পাওয়া। যেমন— লাল হলুদ ইত্যাদি রঙ ধারণ করা। শাফেঈগণ নিম্নোক্ত হাদীসগুলো দ্বারা দলীল পেশ করেন— ১। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদের হাদীস قَالَ بدو صلاحه : حمرته وصفرته "ফলের পরিপক্কতা হলো লাল ও হলুদ বর্ণ ধারণ করা।"

৩। জাবের (রা.)-এর হাদীস ঃ نهانا رسول الله عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتّٰى يَطِيْبَ "সুস্বাদু (পাকার) আগে রাসূল (সা.) আমাদেরকে ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

৪। ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস ঃ

نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتّٰى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ ـ

"রাসূল (সা.) খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন, যে যাবত না খাওয়া বা খাওয়ানো যায়।"

আহনাফ বলেন যে, সমস্ত হাদীস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, بدوصلاح এর অর্থ হলো, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং ক্ষতি থেকে ফলের মুক্ত হওয়া।

কয়েকটি দলীল পেশ করা হলো ঃ

১। ইবনে ওমরের (রা.) হাদীস ঃ وَعَنْ السُّنْبُلِ حَتّٰى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ ـ

২। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদের রেওয়ায়াত ـ حَتّٰى يَبْدُوَصِلاَحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الْاٰفَةُ

৩। আব্দুল্লাহই ইবনে দীনার (রহ.) ইবনে ওমর (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন ـ فقيل لابن عمر ما صلاحه قَالَ تذهب عاهته ـ

৪। ত্বহাভী শরীফে বর্ণিত হযরত আয়িশার (রা.) রেওয়ায়াত أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتّٰى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ ।

-উল্লেখিত রেওয়ায়াতগুলোতে عاهة ، افة ইত্যাদি শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে যা প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন পোকা মাকড় এবং ফলের জন্য ক্ষতিকর বিশেষ একটি সময়ের কথা বুঝায়। এসব রেওয়ায়াতগুলো আহনাফের মত জোরালোভাবে সমর্থন করে। তবে একটি কথা হলো, কোন ফল কখন বিপদ ও দুর্যোগমুক্ত হবে এটা নির্ভর করে ফলের অবস্থার ওপর। কোনটার মধ্যে মিষ্টতা আসা ও পাকতে শুরু করা দুর্যোগমুক্ত হওয়া বুঝায়। কোনটা হলুদ ও লাল বর্ণ ধারণ করা দুর্যোগমুক্ত হওয়া বুঝায়। এজন্য বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন অবস্থার কথা বলা হয়েছে। অন্যথায় علت একটাই তথা الامن من العاهة والفساد দুর্যোগ ও বিপদ মুক্ত হওয়া।

ফলের তিন অবস্থা

স্মর্তব্য যে, ফলের অবস্থা তিনটি। ১। قبل الظهور তথা ফল এখনও প্রকাশই পায়নি। ২। بعد الظهور قبل بدوالصلاح -প্রকাশ পেয়েছে বটে

بـدوصـلاح হয়নি এবং ৩। بـعـد بـدوالـصـلاح -ফল প্রকাশ পেয়ে এবং بـدوه হয়েছে।

ফল বিক্রি করার তিন পদ্ধতি

তিন পদ্ধতিতে ফল বিক্রি করা হয়।

১। بـشـرط الـقـطـع কেটে নেওয়ার শর্তে। অর্থাৎ বিক্রেতা ক্রেতাকে এই দিবে যে, এই মুহূর্তেই ফল কেটে নিতে হবে।

২। بـشـرط الـتـرك অর্থাৎ ক্রেতা এই শর্তারোপ করবে যে, ফল গাছে রেখে য়া হবে। এখন কাটা হবে না।

৩। مـطـلـقـا তথা কোন প্রকার শর্ত করা ছাড়া বিক্রয় করা।

এসব ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম

ফল বিক্রির বিভিন্ন পদ্ধতির হুকুম বর্ণনা করা হলো ঃ

قـبـل الـظـهـور ফল বিক্রি করার হুকুম ঃ এই প্রকারের ফল বিক্রি ায়িয। কেননা এটা بـيـع مـعـدوم তথা অস্তিত্বহীন বস্তু বিক্রি করার অন্তর্ভুক্ত। l بـيـع مـعـدوم নাজায়িয।

আর প্রকাশ পাওয়ার পর বিক্রি করার পদ্ধতি তিনটি।

১ম পদ্ধতি ঃ قـبـل بـدوالـصـلاح এই প্রকারের ফল যদি কেটে নেয়ার শর্তে ক্রি করা হয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয। অবশ্য হাফেজ ইবনে হাজার সকালানীর বর্ণনানুযায়ী বুঝা যায় ইমাম ইবনে আবী লায়লা (রহ.) এবং াম ছাওর একে নাজায়িয বলেছেন।

যেহেতু এই ফল তৎক্ষণাৎ কেটে নেয়া হয় এজন্য ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার শংকা থাকে না বলে জমহুর এরূপ ফল বিক্রি করা জায়িয বলে মত য়েছেন।

২য় পদ্ধতি ঃ যদি بـيـع بـشـرط الـتـرك তথা পাকা পর্যন্ত গাছে রেখে দেয়ার র্তে ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে ইহা নাজায়িয। দলীল ল্লখিত হাদীস। দ্বিতীয়ত এখানে بـيـع -এর সাথে সাথে شـرط ও করা হয়েছে। র এটা (بـيـع مـشـروط) নাজায়িয।

অবশ্য ইমাম ইয়াযিদ ইবনে আবী হাবীব একে জায়িয বলেছেন। এমনিভাবে আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার (রহ.) মতে জরুরতের সময় এরূপ ক্রয়-বিক্রয় জায়িয। حديث الباب তাঁদের মতের বিপরীত বলে তাঁরা একে পরামর্শ হিসেবে বলা হয়েছে বলে মনে করেন, হারাম বর্ণনার জন্য নয়।

৩য় পদ্ধতি ঃ البيع مطلقا। তথা কাটা বা গাছে রেখে দেওয়া কোনরূপ শর্ত করা ছাড়া ফল বিক্রি করা। এর বৈধতার ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতানৈক্য (اختلاف) রয়েছে। ইমাম শাফেঈ, মালেক এবং আহমদের মতে ২য় প্রকারের মত এটাও নাজায়িয। দলীল হিসেবে তাঁরা ان رسول الله نهى عن بيع الثمر حتى يبد وصلاحها হাদীসটি পেশ করেন। হাদীসে بدوصلاح-এর পূর্বে বিনা শর্তে (مطلقا) ফল বিক্রি করতে নিষেধ করা হয়েছে। এতে আমাদের আলোচ্য ৩য় পদ্ধতিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে প্রথম পদ্ধতি তথা بشرط القطع হাদীসের আওতায় পড়ে না। কেননা কেটে নেয়ার শর্ত করায় এটা بيع الثمر المقطوعة-এর মধ্যে গণ্য হবে আর হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে بيع الثمر المعلق-কে। এই কারণে নাজায়িযের আওতা থেকে শুধুমাত্র এই প্রথম প্রকার বাদ থাকবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রকার বাদ থাকার কোন কারণ নেই। কিন্তু হানাফী মাযহাব অনুযায়ী এই প্রকারের ফল বিক্রি করা জায়িয। কেননা বিনা শর্তে ক্রয়-বিক্রয় হলেও এটা بيع بشرط القطع -এর অন্তর্ভুক্ত। শুধুমাত্র لفظ (বাক্য বিনিময়) শর্তহীন কিন্তু হুকুমের ক্ষেত্রে শর্তযুক্ত। কেননা বিক্রেতা বললে ক্রেতা ফল কেটে নিতে বাধ্য থাকবে। সুতরাং চূড়ান্ত পর্যায়ে এটা بيع بشرط القطع -এর মতই। হ্যাঁ, যদি বিক্রেতা কেটে নেওয়ার নির্দেশ না দেয় তাহলে ক্রেতার জন্য ফল কেটে নেয়া ওয়াজিব নয়। এটা অবশ্য বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতার জন্য বিশেষ ছাড়! যেমন কেটে নেয়ার শর্তেই ফল বিক্রি করা হয়েছে কিন্তু পরবর্তীতে বিক্রেতা কিছুটা ছাড় দিয়ে দিল এবং ফল কাটার নির্দেশ দেয়া থেকে বিরত থাকল। এই পদ্ধতি কিন্তু (সবার মতেই) জায়িয। সুতরাং প্রথম এবং তৃতীয় প্রকার ফলাফলের দিক বিবেচনায় এক তথা উভয়ের ক্রয়-বিক্রয় জায়িয।

ইমাম ত্বহাভীর (রহ.) দলীল

তৃতীয় এই পদ্ধতি জায়িযের পক্ষে ইমাম ত্বহাভী (রহ.) ইবনে ওমরের রা.) এই হাদীস দ্বারা দলীল দেন ঃ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ্ বুখারীতে উল্লেখ করেছেন।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ اُبِرَّتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ اِلاَّ اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ـ

"রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, কোন ব্যক্তি পরাগযুক্ত খেজুর গাছ বিক্রি করলে সে গাছের ফল বিক্রেতা পাবে, হ্যাঁ যদি ক্রেতা শর্তারোপ করে তাহলে ভিন্ন কথা।"

তা'বীর বলা হয় নর খেজুর গাছের কলির কিছু অংশ মাদী খেজুর গাছের কলিতে স্থাপন করা যে সময় কলি প্রস্ফুটিত হয়। যাতে করে আল্লাহ তা'আলা উত্তম ফল দান করেন। হাদীসটি এভাবে দলীল হতে পারে যে, পরাগযুক্ত করা হয় সাধারণত بدوصلاح-এর আগে। আর এখানে হুযূর (সা.) পরাগযুক্ত করার পর পরই বিক্রি করার অনুমতি দিচ্ছেন। যার দ্বারা বুঝা যায় যে, بدوصلاح-এর পূর্বে ফল বিক্রি করা জায়িয। এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, এখানে আলাদা ও পৃথক করে খেজুর বিক্রির কথা বলা হয়নি বরং গাছের তাবে হিসেবে বিক্রি করার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং বেশির চেয়ে বেশি এতটুকু প্রমাণ পাওয়া যায় যে, بدوصلاح-এর পূর্বে গাছের তাবে হিসেবে ফল বিক্রি করা জায়িয। এর দ্বারা তো পৃথকভাবে بدوصلاح-এর পূর্বে ফল বিক্রি জায়িযের প্রমাণ দেয়া যায় না?

জবাব ঃ শরয়ী একটি আইন হলো, যে জিনিস শর্ত করা ছাড়া অন্য বস্তুর মধ্যে শামিল হয় না সেটা আলাদা ও পৃথক করে বিক্রি করা জায়িয। যেমন ধরুন বকরীর বাচ্চা। বকরী বিক্রি করার সময় যদি বাচ্চার শর্ত না করা হয় তাহলে বাচ্চা মায়ের সাথে বিক্রি হয়ে যাবে না। এ কারণে এই বাচ্চাকে পৃথকভাবে বিক্রি করা জায়িয।

পক্ষান্তরে حمل (গর্ভ) পৃথক করে বিক্রি করা নাজায়িয। কেননা শর্ত করা ছাড়াই ইহা (মায়ের সাথে) বিক্রি হয়ে যায়। আমাদের আলোচ্য হাদীসে রাসূল (সা.) পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, শর্ত করা ছাড়া গাছের সাথে সাথে ফল বিক্রি হয়ে যায় না। এর দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হয় যে, ফল আলাদা ও পৃথকভাবে

বিক্রি করা জায়িয। সুতরাং بدوصلاح-এর পূর্বে ফল বিক্রি করা জায়িয গাছের তাবে হয়ে হোক কিংবা পৃথকভাবে হোক। হাদীসটি একথারই প্রমাণ বহন করে।

حديث الباب -এর ব্যাখ্যা

ইমামগণ নাজায়িযের পক্ষে যে হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন তার বিভিন্ন জবাব দেওয়া হয়।

১। نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها :হাদীসের এই নিষেধাজ্ঞা بشرط الترك-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমরাও তো এই হাদীসের ওপর আমল করে থাকি। (দ্বিতীয় পদ্ধতির আলোচনায় বিস্তারিত বলা হয়েছে)। অন্যান্য ইমামগণও তো হাদীসটিকে আম হিসেবে আমল করেন না। কেননা بشرط القطع-এর ক্ষেত্রে তাঁরাও জায়িযের পক্ষে মত দিয়েছেন। অথচ হাদীসকে عام (ব্যাপক) ধরলে এই পদ্ধতিও হাদীসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকার কথা।

সারকথা তাঁরা হাদীসের نهى-কে খাস করেন مالم يشترط فيه القطع এর সাথে। আর আমরা খাস করি ماشترط فيه الترك-এর সাথে। সুতরাং কেউই হাদীসের عموم (ব্যাপকতার) ওপর আমল করেন না । (আমরা যদি না করি এবং তৃতীয় পদ্ধতিকে نهى থেকে আলাদা করে জায়িয বলি তাহলে দোষ কোথায়?)

২। ইমাম ত্বহাভী (রহ.) বলেন হাদীসের সম্পর্ক সব ধরনের بيع-এর সাথে নয় বরং শুধুমাত্র بيع سلم-এর সাথে সম্পর্ক। হুযূর (সা.) মদীনায় আগমন করার পূর্বে সাহাবাগণ এক বছর, দুই বছর প্রভৃতি সময়ের জন্য بيع سلم করতেন। রাসূল (সা.) এরূপ অনিশ্চিত بيع سلم নিষেধ করেন এবং مسلم فيه-এর পরিমাণ সঠিকভাবে জানা থাকলে এবং চুক্তির মেয়াদ যথার্থভাবে নির্ধারণ করা হলে সেটাকে জায়িয বলে রায় দেন। এমনিভাবে 'বাইয়ে সলম' সহীহ্ হওয়ার জন্য আরেকটি শর্ত হলো চুক্তির শুরু থেকে নিয়ে অর্পণ করা পর্যন্ত مبيع মওজুদ থাকতে হবে।

সুতরাং ফলের মধ্যে সলম সহীহ্ হওয়ার জন্য শর্ত হলো بدوصلاح হওয়া এবং সংকট থেকে মুক্ত হওয়া, যাতে করে চুক্তির সময় এর অস্তিত্ব বিদ্যমান (যা

লমের একটি শর্ত) থাকে। কেননা بدوصلاح-এর পূর্বে ইহা معدوم অস্তিত্বহীন বস্তু) এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত বিধায় এর মধ্যে سلم জায়িয নেই।

মোদ্দাকথা হলো بدوصلاح-এর আগে ফলের মধ্যে بيع سلم করতে াসূল (সা.) নিষেধ করেছেন সব ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেননি।

৩। ইমাম ত্বহাভী (রহ.) কতিপয় আলিম থেকে হাদীসের এই জবাব বর্ণনা রেছেন যে, আমরা স্বীকার করি হাদীসের নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র بيع سلم-এর াথেই নয় বরং সকল প্রকার بيع-এর সাথে এর সম্পর্ক এবং একথাও স্বীকার রি, যে হাদীসে কাটার শর্তে হোক বা গাছে রেখে দেয়ার শর্তে হোক সব রনের ফল বিক্রি করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা تحريم হারাম করার জন্য) নয় বরং উপদেশ ও পরামর্শ হিসেবে এই নিষেধাজ্ঞা াসেছে। বলা হয়ে থাকে, হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) বর্ণনা করেন—

كَانَ النَّاسُ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَايِعُوْنَ الثِّمَارَ فَاذَ وَجَدَالنَّاسُ وَحَضَرَتَقَا ضِيْهِمّ قَالَ الْمُبْتَاعُ اَنَّهُ اَصَابَ الثَّمَرَ الدّمَانُ اَصَابَهُ مرَاض اَصَابَهُ قِشَامٌ عَاهَاتٌ يَحْتَجُّوْنَ بِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّ كَثُرَتْ عِنْدَ الْخُصُوْمَةِ فِىْ ذٰلِكَ اَمَّا لاَ فَلاَ تُبَايِعُوا حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُ الثَّمَ كَالْمَشْوَرَةِ يُشِيْرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُوْمَتِهِمْ -

লোকজন ফল বেচাকেনা করত। পরে ক্রেতা দাবি করে বসত যে, ফলে ্র্যোগ দেখা দিয়েছে যার কারণে সে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এরপর রাসূলের (সা.) াছে ঝগড়া-বিবাদের বিচার আসতে লাগল। অবস্থা দর্শনে হুযূর (সা.) াহাবাগণকে পরামর্শ দিলেন কেউ যেন بدوصلاح (পরিপক্ক) হওয়ার আগে ফল বিক্রি না করে। বুখারী।

যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.) সুস্পষ্ট করে বলে দিলেন যে, রাসূলের (সা.) এই নিষেধাজ্ঞা হারাম বুঝানোর জন্য নয় বরং পরামর্শ সুলভ এই নিষেধাজ্ঞা।

তাত্বীক বা সামঞ্জস্য সাধন

সমস্ত রেওয়ায়াতে দৃষ্টি বুলালে দেখা যায় যে, রাসূল (সা.) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিপক্ক بدوصلاح)-এর পূর্বে ফল বিক্রি করতে

নিষেধ করেছেন। কখনও بشرط الترك (গাছে রেখে দেয়ার শর্তে) বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন, কখনও এরূপ ফলে بيع سلم করতে নিষেধ করেছেন। আবার কখনও بدوصلاح-এর পূর্বে مطلقا চাই কেটে নেয়ার শর্তে হোক বা রেখে দেয়ার শর্তে হোক বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তবে (তৃতীয় এই প্রকার) পরামর্শ ও উপদেশ হিসেবে করেছেন হারাম হিসেবে নয়। এরূপ ব্যাখ্যায় গেলে সমস্ত রেওয়ায়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন হয়। কোন تعارض থাকে না।

উপযোগি হওয়ার পর ফল বিক্রয়

পরিপক্ক (بعد بدو صلاح) হওয়ার পর ফল বিক্রি করার পদ্ধতিও তিনটি। ১. بشرط القطع (কেটে নেয়ার শর্তে) ২। بشرط الترك (গাছে রেখে দেয়ার শর্তে) এবং ৩। مطلق তথা কাটা বা রাখা কোন প্রকার শর্ত ছাড়া বিক্রয় করা।

ইমাম শাফেঈ, আহমদ ও মালেক (রহ.)-এর মতে এই তিন পদ্ধতিই জায়িয। তবে কোন রূপ শর্ত ছাড়া যদি বিক্রয় করা হয় তাহলে ক্রেতা পাকা পর্যন্ত গাছে ফল রাখতে পারবে।

ইমামগণ এই অধ্যায়ের হাদীসের مفهوم مخالف দ্বারা দলীল পেশ করে বলেন যে, যেহেতু হুযূর (সা.) بدوصلاح-এর পূর্বে (ফল) বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন তাই بدوصلاح-এর পর বিক্রি করতে বাধা নেই।

হানাফীগণ বলেন— بدو صلاح-এর পর কাটার শর্তে এবং مطلقا (বিনা শর্তে) ফল বিক্রি করা জায়িয। কিন্তু بشرط الترك (গাছে রেখে দেয়ার শর্তে) বিক্রি করা নাজায়িয। তবে مطلقا বিনা শর্তে বিক্রির ক্ষেত্রে বিক্রেতা চাইলে ক্রেতা ফল কেটে নিতে বাধ্য থাকবে। সুতরাং বুঝা গেলো আহনাফের মতে بشرط الترك সর্বাবস্থায় নিষেধ। চাই بدوصلاح-এর পূর্বে হোক বা بدوصلاح-এর পরে হোক। আহনাফের মতে مفهوم مخالف বিপরীত বোধক অর্থ যেহেতু দলীল হিসেবে গণ্য নয় এজন্য তারা বলেন نهى عن بيع الثمرحتى يبد وصلاحها এই হাদীসটি بعد بدوصلاح-এর ব্যাপারে ساكت (নিশ্চুপ) এবং بعد بدوصلاح-এর হুকুম সম্পর্কে হাদীসটি নীরব।

এদিকে بشرط الترك নাজায়িয হওয়ার ব্যাপারে অন্য একটি হাদীস য়েছে। যথা نهى رسول الله عن بيع وشرط রাসূল (সা.) একই চুক্তিতে ক্রয়-বিক্রয় ও ভিন্ন কোন শর্ত করতে নিষেধ করেছেন।

সুতরাং بشرط الترك বিক্রি করা নাজায়িয একথা বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, এই অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীস দ্বারা নয়।

একটি প্রশ্ন ও তার জওয়াব

আপনাদের (আহনাফ) মতে যেহেতু রেখে দেয়ার শর্তে ক্রয়-বিক্রয় নাজায়িয চাই পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে হোক বা পরে তাহলে হাদীসে বর্ণিত حتى يبدو صلاحه বলে যে শর্তারোপ করা হয়েছে এর কি প্রয়োজন ছিল? আপনাদের কথা মত শর্তটি বেফায়দা নয় কি?

এর জবাব হলো حتى يبد وصلاحها-এর এই শর্তটি قيد احترازى নয়। অর্থাৎ এই قيد দ্বারা বিশেষ কোন অবস্থাকে বাদ দেয়া বা খাস করা হয়নি বরং قيد টা قيد اتفاقى। যেহেতু তাঁরা ব্যাপকভাবে بد وصلاح-এর পূর্বে রেখে দেয়ার শর্তে ফল বিক্রি করতেন এজন্য বাস্তব একটি অবস্থা দর্শনে রাসূল (সা.) يبدو صلاحها-এর শর্ত উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে ফল বিক্রি করা দুই কারণে নিষেধ।

১। بيع وشرط তথা একসাথে بيع এবং شرط-এর সংযোগ ঘটা।

২। انه يتضمن غررا এতে ধোঁকার সম্ভাবনা বিদ্যমান। পক্ষান্তরে পরিপক্ক হওয়ার পর ধোঁকার সম্ভাবনা না থাকলেও بيع مع الشرط হওয়ার কারণে নিষেধ। তাহলে বোঝা গেলো ঐ ধোঁকা থেকে বাঁচানোর জন্য হুযূর (সা.) বিশেষভাবে এই শর্ত উল্লেখ করেছেন। অন্যথায় রেখে দেয়ার শর্তে (بشرط الترك) সর্বাবস্থায় নিষেধ। চাই قبل بد وصلاح হোক বা بعد بد وصلاح।

সার সংক্ষেপ

আলোচনার সারসংক্ষেপ হলো প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে ফল বিক্রি করা সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়িয। কেননা, এটা بيع معدوم আর بعد الظهور قبل بدو صلا যদি কাটার শর্তে বিক্রি করা হয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয এবং

রেখে দেয়ার শর্তে হলে সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়িয। مطلق তথা বিনা শর্তের ক্ষেত্রে আহনাফের মতে জায়িয বাকি ইমামগণের মতে নাজায়িয। আর পরিপক্ক হওয়ার পর ائمه ثلثة-এর মতে তিন পদ্ধতিতেই জায়িয আর আহনাফের মতে গাছে রেখে দেয়ার শর্তে নাজায়িয; বাকি দুই ক্ষেত্রে জায়িয। সুতরাং ফল প্রকাশ হওয়ার পর উল্লেখিত ৬ প্রকার বিক্রির ৪ সুরত আমাদের ও তাঁদের মতে জায়িয আর ২ সুরত নাজায়িয। তবে নির্ধারণ করতে গিয়ে মতবিরোধ হয়েছে। নকশা দ্বারা জিনিসটি পরিষ্কার বুঝে আসবে বলে মনে করি।

নকশা

ফল ক্রয়-বিক্রয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি			ফলের বিভিন্ন অবস্থা
১। কোন প্রকার শর্ত ছাড়া	২। গাছে রেখে দেয়ার শর্তে	৩। কেটে নেয়ার শর্তে	
সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়িয			১। গাছে ফল আসার পূর্বে
আহনাফের মতে জায়িয বাকি তিন ইমা-মের মতে নাজায়িয	সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়িয	সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয	২। গাছে ফল আসার পরে পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে
সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয	তিন ইমামের মতে জায়িয আহনাফের মতে নাজায়িয	সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয	৩। ফল পরিপক্ক হওয়ার পরে

বর্তমান যুগে ফল বিক্রির হুকুম

বর্তমান যুগে গাছে রেখে পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে বরং প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে ফল বিক্রি করা এবং পরবর্তীতে গাছে রেখে দেয়ার এক সাধারণ রেওয়াজ চালু হয়েছে। লোকদেরকে এথেকে বারণ করাও দুষ্কর হয়ে পড়েছে। যদি নাজায়িযের ফতওয়া দেয়া হয় তাহলে বাজারে এমন একটি ফলও পাওয়া যাবে না যা খাওয়া হালাল হতে পারে। এদিকে প্রয়োজনের তাগিদে হুযূর (সা.) بيع سلم-এর অনুমতি দিয়েছেন। অথচ গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় بيع سلم মূলতঃ بيع معدوم-এর আওতায় পড়ে। এসব বিষয় বিবেচনা করে ফকীহগণ ফল বিক্রির কিছু পদ্ধতিকে জায়িয বলে ফতওয়া দিয়েছেন। এই ফতওয়া দয়াবশত দেয়া হয়েছে, কিয়াস অনুযায়ী জায়িয হওয়ার কথা নয়। তাঁদের ফতওয়ার সার নির্যাস নিম্নরূপ ঃ

১। ফল প্রকাশ হওয়ার আগে বিক্রি করা এখনও নাজায়িয যদিও তা মানুষের সাধারণ অভ্যাসে পরিণত হোক না কেন। কেননা হাদীসে সুস্পষ্টভাবে এধরনের বেচাকেনা নিষেধ করা হয়েছে। হাদীসে একে بيع معاومة এবং بيع سنين হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। (এই দুই প্রকারের بيع-এর পরিচয় এবং حكم পরে বর্ণনা করা হবে)। একে بيع سلم ও ধরা যাচ্ছে না। কেননা بيع سلم সহীহ্ হওয়ার জন্য (আহনাফের মত অনুযায়ী) চুক্তির (عقد) সময় থেকে নিয়ে আদায় করা পর্যন্ত চুক্তির বিষয় (مبيع) বাজারে মওজুদ থাকা জরুরী। সেই সাথে مبيع-এর পরিমাণ এবং আদায়ের সময়টাও নির্ধারিত হওয়া জরুরী। অথচ এক্ষেত্রে ফলের পরিমাণ যেমন জানা সম্ভব নয় ঠিক তদ্রূপ কবে ক্রেতা ফলগুলো হস্তগত করবে তাও জানা অসম্ভব। সবচেয়ে বড় কথা হলো (নাজায়িযের) এই পদ্ধতিতেও যদি তাবীল করা শুরু হয় তাহলে بيع معاومة এবং بيع سنين-এর নিষেধ সংক্রান্ত হাদীস অর্থহীন হয়ে পড়বে। العياذبالله।

২। ফলের কিছু অংশ প্রকাশ পাওয়া এবং কিছু অংশ প্রকাশ না হওয়ার ক্ষেত্রে মূল উসূল অনুযায়ী বিক্রয় জায়িয না হওয়ার কথা। কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতির (عموم بلوى) কারণে একে জায়িয করা হয়েছে। যতটুকু ফল প্রকাশ হয়েছে ততটুকুকে 'আসল' এবং বাকি (যা প্রকাশ পায়নি) অংশকে تابع ধরে জায়িয বলতে হবে।

আল্লামা হালওয়ানী (রহ.) বলেছেন—যদি প্রকাশিত অংশের পরিমাণ বেশি হয় তাহলে বিক্রি করা জায়িয ইমাম শামসুল আয়িম্মা (রহ.) ইমাম ফজলীর (রহ.) মত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কম বেশির কোন রূপ শর্তারোপ ছাড়াই এ ধরনের লেনদেকে জায়িয বলেছেন। সামান্য অংশও যদি প্রকাশ পায় সেটাকে আসল এবং বাকি (অপ্রকাশিত অংশ)-কে تابع ধরে তিনি এ ধরনের ফতওয়া প্রদান করেছেন।

আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) লিখেছেন—আল্লামা ফজলী (রহ.) বলেন লোকজন এ ধরনের লেনদেনে অভ্যস্থ হয়ে গেছে তাই এথেকে বিরত রাখা কঠিন। এজন্য অনুগ্রহপূর্বক একে জায়িয করে দেয়া হয়েছে। উল্লেখিত মতের স্বপক্ষে এভাবেও দলীল হতে পারে যে, ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) গাছে বিদ্যমান গোলাপ ফুল বিক্রি করা জায়িয বলেছেন। অথচ গোলাপ ফুল একসাথে প্রকাশ পায় না বরং একের পর এক ধীরগতিতে প্রকাশ পায়। এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনে হুমাম (রহ.) এই তদবীর পেশ করেছেন যে, বেগুন, ক্ষিরা প্রভৃতি সব্জী বিক্রির জায়িয পদ্ধতি এই হতে পারে যে, সব্জী বা ফলের পরিবর্তে মূল চারা গাছটি খরিদ করে নিবে। যাতে করে ফল-সব্জী ইত্যাদি তারই মালিকানায় থেকে জন্ম নেয়। শস্যের মধ্যে এই হীলা হতে পারে যে, নির্ধারিত মূল্যের এক অংশ যে পরিমাণ ফল প্রকাশ পেয়েছে সেটার জন্য ধার্য করা আর বাকি মূল্যকে এতদিনের জন্য জমিনের ভাড়া হিসেবে ধার্য করা যতদিনে নিশ্চিতভাবে ফল জন্ম নেয়।

ফলের মধ্যে এই হীলা (কৌশল) চলতে পারে যে, ক্রেতা মওজুদ ফলকে খরিদ করবে আর বিক্রেতা আগত ফলকে তার জন্য হেবা করে দিবে।

৩। সমস্ত ফল প্রকাশ পেয়েছে বটে কিন্তু এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি (যেমন নিজে খাওয়া কিংবা প্রাণীকে খাওয়ানো) আহনাফের এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত পাওয়া গেলেও সহীহ্ قول অনুযায়ী এগুলো বিক্রি করা জায়িয।

৪। পরিপক্ক হওয়ার পর বিক্রি করলে গাছে রেখে দেয়ার শর্ত করা জায়িয কিন্তু পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে বিক্রি করলে গাছে রাখার শর্ত করা সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়িয। এর দ্বারা بيع ফাসিদ হয়ে যায়। আর যদি مطلق চুক্তি হয়, রাখা না রাখার কোন শর্ত করা হয়নি, এক্ষেত্রে বিক্রেতা যদি গাছে (ফল) রেখে দেয়ার অনুমতি দেয় তাহলে ক্রেতার জন্য সমস্ত مبيع তথা عقد থেকে নিয়ে কাটা পর্যন্ত যত ফল হবে সব জায়িয এবং হালাল। আরি যদি বিক্রেতার অনুমতি ছাড়া গাছে রেখে দেয় তাহলে পরবর্তীতে যে পরিমাণ ফল সৃষ্টি হয়েছে সেই পরিমাণ সদকা করে দিতে হবে।

باب تحريم بيع الرطب بالتمر الا فى العرايا

।ধ্যায় ঃ আরায়া ছাড়া তাজা খেজুরকে শুষ্ক খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করা নাজায়িয হওয়া প্রসঙ্গে

بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمَرِ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلَاحُهٗ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمَرِ

"রাসূল (সা.) খেজুর পরিপক্ক হওয়ার আগে এবং ফলের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।" তাজা খেজুরকে رطب এবং শুকনো খেজুর কে تمر বলে।

بيع الرطب بالتمر-এর দু'টি পদ্ধতি হতে পারে

১। গাছে অবস্থিত তাজা খেজুরকে কর্তিত শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করাকে بيع مزابنه বলা হয়। সর্বসম্মতিক্রমে এটা হারাম। তবে عرايا-এর মধ্যে কিছুটা ছাড় দেয়া হয়েছে। অবশ্য عرايا-এর ব্যাখ্যায় মতানৈক্য রয়েছে। তাফসীলি আলোচনা পরে করা হবে।

২। কর্তিত তাজা খেজুরকে কর্তিত শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করা। এটা জায়িয কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ائمة ثلاثة এবং ইমাম সাহেবাঈনের মতে এরকম বেচাকেনা নাজায়িয চাই সমান সমান হোক বা কমবেশি করে হোক। আর ইমাম আবূ হানীফার মতে যদি সমান সমান হয় এবং নগদ হয় তাহলে জায়িয। আর যদি কমবেশি হয় কিংবা নগদ হয় তাহলেও জায়িয। আর যদি কমবেশি হয় কিংবা বাকিতে লেনদেন করা হয় তাহলে নাজায়িয।

দলীল ঃ ائمة ثلاثة হযরত ইবনে ওমরের (রা.) হাদীস وعن بيع الثمر بالتمر দ্বারা দলীল পেশ করেন। এতে হুযূর (সা.) بيع الثمر بالتمر-কে নাজায়িয বলেছেন। স্মর্তব্য যে, تمر দ্বারা এখানে رطب (তাজা) খেজুর উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় দলীল, হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের (রা.) হাদীস।

قَالَ سَعْدٌ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنِ اشْتَرَاءِ التَّمَرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ قَالُوْا نَعَمْ فَنَهَاهُ عَنْ ذٰلِكَ۔ ابوداؤد ترمذى نسائى ابن ماجه

"হুযূর (সা.)-কে তাজা খেজুরের বিনিময়ে শুকনো খেজুর বিক্রি করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, رطب (তাজা খেজুর) শুকালে কমে যায় কিনা? সাহাবাগণ বললেন— হ্যাঁ, কমে যায়। একথা শুনে রাসূল (সা.) এথেকে বারণ করলেন। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, رطب যেহেতু تمر-এর অন্তর্ভুক্ত এজন্য সুদ সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ হাদীস التمر بالتمر-এর ভিত্তিতে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রি করা জায়িয যদি সমান সমান এবং নগদ হয়।

বর্ণিত আছে যে, একবার ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বাগদাদ নগরীতে আগমন করেন। বাগদাদের লোকজন তাঁর ওপর ক্ষিপ্ত ছিল। তাঁদের ধারণা এই মাসআলার ক্ষেত্রে ইমাম সাহেব হাদীসের বিরোধিতা করেছেন! লোকজন এব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন— رطب দুই অবস্থার কোন এক অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। হয় এটা تمر নতুবা تمر নয়, যদি تمر হয় তাহলে التمر بالتمر-এর হাদীস অনুযায়ী رطب (তাজা খেজুর) কে تمر (শুকনো খেজুরের) বিনিময়ে বিক্রি করা জায়িয হবে।

ইমামগণের বর্ণিত হাদীসের জবাব

তাঁদের প্রথম দলীল نهى ... وعن بيع الثمر بالتمر-এর জবাব হলো ঃ হাদীসে ثمر দ্বারা কর্তিত তাজা খেজুর উদ্দেশ্য নয় বরং গাছে অবস্থিত তাজা খেজুর (رطب) উদ্দেশ্যে। আর গাছে অবস্থিত তাজা খেজুরকে কর্তিত শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করাই مزابنة যা নাজায়িয হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত।

হাদীসে "গাছে অবস্থিত খেজুর" উদ্দেশ্য একথার দলীল নিম্নরূপ ঃ

১। হাদীসে পাকে بيع الثمر بالتمر -কে নিষেধ করে عرايا-কে এ থকে বাদ দেয়া হয়েছে। আর عرايا তথা গাছে থাকা খেজুরের মধ্যেই হয়ে াকে। একদিকে থাকে رطب معلق (গাছে ঝুলন্ত তাজা খেজুর), অপর দিকে াকে ثمر مقطوع (কর্তিত শুষ্ক খেজুর)।

২। স্বয়ং হুযূর পাক (সা.) مزابنة-কে بيع الثمر بالتمر বলে আখ্যায়িত করেছেন।

বুখারীর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে—

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ وَسَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمَرِ اِلاَّ اَصْحَابَ الْعُرَايَا فَاَذِنَ لَهُمْ ـ

"রাসূল (সা.) মুযাবানা— তাজা খেজুরকে শুষ্ক খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তবে আরায়া ওয়ালাদের কথা ভিন্ন, তাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছে।" দেখা যাচ্ছে যে, হুযূর (সা.) مزابنة -এর তাফসীর করেছেন بيع الثمر بالتمر দ্বারা। আর مزابنة বলা হয় গাছে অবস্থিত তাজা খেজুরকে কর্তিত শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করাকে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, আমাদের আলোচ্য হাদীসে ثمر দ্বারা رطب معلق (গাছে অবস্থিত তাজা খেজুরই) উদ্দেশ্য رطب مقطوع উদ্দেশ্য নয়।

তাঁদের দ্বিতীয় দলীল হযরত সা'দ ইবনে ওয়াক্কাস (রা.) এর হাদীসের জবাব হলো ঃ এই হাদীসের মূল রাবী হলেন যায়েদ ইবনে আবূ আইয়্যাশ। আর তিনি راوى مجهول (অজ্ঞাতরাবী)।

বাগদাদ নগরীতে যখন আবূ হানীফার (রহ.) সাথে এই হাদীস নিয়ে বির্তক হচ্ছিল তখন তিনি বললেন—এই হাদীসের ভিত্তি যায়েদ ইবনে আবী আইয়্যাশের ওপর। আর তিনি গ্রহণযোগ্য রাবী নন। অন্য রেওয়ায়াতে আছে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বললেন— انه مجهول

ইমাম বুখারী, মুসলিম, ইবনে জারীর তাবারী, ইমাম ত্বহাভী, ইবনে আবদিল বার প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ যায়েদ ইবনে আবূ আইয়্যাশকে মাজহুল বলে আখ্যায়িত করেছেন। হাদীসটিকে যদি সহীহ্ও ধরা হয় তথাপি এটা তাঁদের

দলীল হতে পারে না। কেননা হাদীসে বাকি বিক্রি করতে নিষেধ করা হয়েছে, নগদ বিক্রি করতে বারণ করা হয়নি। আবূ দাউদ এবং বাইহাকীর রেওয়ায়াতে সুস্পষ্ট করে একথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইয়াহইয়া ইবনে আবী কাসীরের সনদে বর্ণিত হয়েছে—

قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَنَّ اَبَا عَيَّاشٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ اَبِيْ وَقَّاصٍ يَقُوْلُ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمَرِ نَسِيْئَةً -

"রাসূল (সা.) বাকিতে তাজা খেজুর শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন" এখানে একটা প্রশ্ন হতে পারে যে, তাজা খেজুরকে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করা নাজায়িযের কারণ যদি বাকি (نسيئة) হয়ে থাকে তাহলে রাসূল (সা.) উপস্থিত লোকজনকে এ প্রশ্ন করলেন কেন— তাজা খেজুর শুকালে ওজনে কমে যায় কিনা? (اينقص الرطب اذا يبس؟)

অথচ বাকিতে বিক্রি করা সর্বাবস্থায় নাজায়িয। চাই শুকিয়ে যাওয়ার কারণে (رطب) কম হোক বা না হোক।

এর জবাবে বলা হয়ে থাকে যে, রাসূল (সা.) প্রশ্নটি এ কারণে করেন নি যে, হারাম হওয়ার মূল কারণ হলো "কমে যাওয়া" বরং একথা বুঝানোর জন্য প্রশ্নটি করেছিলেন যে, তাজা খেজুরকে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বাকিতে বিক্রি করাতে কোন লাভ নেই। কেননা তাজা খেজুর (رطب) তো শুকিয়ে গেলে ওজনে কম হয়ে যায়।

মুযাবানা এবং মুহাকালা এর ক্রয়-বিক্রয়

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ - وَالْمُزَابَنَةُ اَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بِالتَّمَرِ وَالْمُحَاقَلَةُ اَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بِالْقَمْحِ وَاسْتِكْرَاءُ الْاَرْضِ بِالْقَمْحِ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ اَنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذٰلِكَ فِىْ بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ اَوْ بِالتَّمَرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِىْ غَيْرِ ذٰلِكَ ـ

مزابنة-এর সংজ্ঞা ঃ مزابنة বলা হয় بيع الثمار على رؤوس الاشجار بالتمر المجذوذ خرصًا

অর্থাৎ অনুমানের ভিত্তিতে গাছে অবস্থিত খেজুরকে কর্তিত খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করা।

যেহেতু গাছে থাকা খেজুরকে অনুমান করে বিক্রি করা হয় এজন্য এতে কম বেশি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। আর যেসব বস্তুতে সুদ হয় (اشياء ربوية) সেগুলোতে কমবেশি হওয়ার সম্ভাবনাকেই (احتمال تفاضل) প্রকৃত কম বেশি (عين تفاضل) এর হুকুমে গণ্য করা হয়। সুতরাং সুদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় بيع مزابنة হারাম। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে এটা সর্বাবস্থায় নাজায়িয চাই কমের মধ্যে হোক কিংবা বেশির মধ্যে। ইমাম শাফিঈর (রহ.) মতে ৫ ওয়াসাকের কম হলে জায়িয যাকে তিনি আরায়া বৈধতার প্রমাণ রয়েছে। আমরা বলি আরায়া মূলতঃ দান নয়। বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হবে।

مزابنة শব্দটি زبن ক্রিয়ামূলের باب مفاعلة-এর মাসদার। অর্থ ঃ دفع شديد তথা কঠোরভাবে বাধা দেয়া।

নামকরণের কারণ ঃ যেহেতু এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে এক অপরের হক আদায় করার ব্যাপারে গড়িমসি করে অথবা ক্রেতা-বিক্রেতার কোন একজন যখন এধনের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রতারণা সম্পর্কে অবগত হয় তখন সে একে رفع তথা فسخ করায় জন্য এবং অপর জন বহাল রাখার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। এজন্য একে مزابنة বলে নাম রাখা হয়েছে।

محاقلة-এর পরিচয় ঃ শব্দটির মূলে রয়েছে حقل মাদ্দা।

শাব্দিক অর্থ ঃ শস্য, চাষাবাদ, কৃষি কর্ম ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে কিছুটা মতভেদ রয়েছে।

১। প্রসিদ্ধ تعريف হলো ঃ কর্তিত গমকে শীষে থাকা গমের বিনিময়ে বিক্রি করা। সুতরাং বুঝা গেলো مزابنة হয় গাছের ফলফলাদির মধ্যে, আর محاقلة হয় ক্ষেতের শস্যের মধ্যে। সুদের সম্ভাবনা থাকায় এটা হারাম।

২। কেউ কেউ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন— উৎপাদিত ফসলের একতৃতীয়াংশ বা একচতুর্থাংশের বিনিময়ে জমি বর্গা দেয়াকে محاقلة বলা হয়। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী محاقلة শব্দটি مخابرة (বর্গা চাষ) এর مرادف বা প্রতিশব্দ।

৩। কেউ কেউ محاقلة এবং مخابرة-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন— উৎপাদিত ফসলের جزء شائع (অনির্ধারিত অংশ, যেমন, ربع، ثلث ইত্যাদির) বিনিময়ে বর্গা দেয়াকে مخابرة এবং جزء معين (নির্ধারিত অংশ যেমন— ৫ মণ, ১০ মণ ইত্যাদি)-র বিনিময়ে বর্গা দেয়াকে محاقلة বলে। এদুয়ের বিস্তারিত আলোচনা পররবর্তীতে করা হবে।

৪। কেউ কেউ বলেছেন— পাকার আগে শস্য বিক্রি করাকে محاقلة বলা হয়। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী محاقلة শব্দটি بيع الثمار قبل بدو الصلاح-এর مرادف

عرايا -এর পরিচয়

عرايا-এর শাব্দিক অর্থ ঃ عرايا শব্দটি عرية-এর বহুবচন। باب سمع থেকে عرى يعرى অর্থ, খালি হওয়া, আলাদা হওয়া। কেউ বিবস্ত্র হলে বলা হয়— عرى من ثيابه

যেহেতু আরায়া ওয়ালা খেজুর গাছের হুকুম অন্যান্য খেজুর গাছের হুকুমের তুলনায় একটু আলাদা এজন্য এর নামকরণ করা হয়েছে عرايا বলে। কেউ কেউ বলেছেন— এটি باب نصر থেকে عرا يعرو অর্থ উপস্থিত হওয়া, সামনে আসা।

يقال عراه اذا اتاه যেহেতু আরায়া ওয়ালা খেজুর গাছের কাছে মালিক অথবা موهوب له (দান প্রাপ্ত ব্যক্তি) ঘন ঘন আগমন করে এজন্য একে عرايا বলা হয়। আর যে গাছের কাছে আগমন করা হয় সে গাছকে معروة বলে। এই অর্থ অনুযায়ী عرايا শব্দটি معرو-এর অর্থ প্রদান করবে।

عرايا-এর ব্যাখ্যায় আলিমগণের মতভেদ

বিভিন্ন হাদীসে মুযাবানা করতে বারণ করে عرايا-এর অনুমতি দেয়া হয়েছে। এজন্য ওলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে মুযাবানা হারাম এবং

عـرايـا জায়িয। কিন্তু আরায়ার ব্যাখ্যয় আলিমগণ ইখতিলাফ করেছেন। অনুসন্ধান করে এর পাঁচটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

১। ইমাম শাফেঈর দৃষ্টিতে عـرايـا ঃ হুযূর (সা.) এর জামানায় কিছু দরিদ্র লোক ছিল। যারা ছিল রিক্ত হস্ত। তাজা খেজুরের প্রতি তাদের আকর্ষণ ছিল দুর্বার। অথচ তাদের কাছে তাজা খেজুর থাকত না, থাকত শুকনো খেজুর। তাজা খেজুরের মৌসুম আসলে তারা হুযূর (সা.) এর কাছে নিজেদের মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। রাসূল (সা.) তাদের প্রতি দয়াদ্র হয়ে অনুমানের ওপর ভিত্তি করে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর খরিদ করার অনুমতি প্রদান করেন। যেহেতু পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণ খেজুর দ্বারা এই সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। এজন্য হাদীসে পাঁচ ওয়াসাকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ক্রেতা পাত্র দ্বারা মেপে খেজুর প্রদান করবে আর বিক্রেতা দিবে অনুমান করে। এ কারণে এটা মুযাবানা থেকে ভিন্ন। একথার উদ্দেশ্য হলো ঃ হুযূর (সা.) যখন মুযাবানা করতে বারণ করলেন তখন দরিদ্র লোকদের জন্য বিষয়টি জটিল হয়ে দেখা দিল। অবস্থা দৃষ্টে রাসূল (সা.) তাদেরকে আরায়া করার অনুমতি প্রদান করেন। যেমন সাহল ইবনে সা'দের এক রেওয়ায়াতে এসেছে—

قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ التَّمَرِ بِالتَّمَرِ اِلَّا اَنَّهُ رَخَّصَ فِى الْعَرِيَّةِ اَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا تَمَرًا يَاكُلُهَا اَهْلُهَا رُطَبًا ـ

"রাসূল (সা.) খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি করতে বারণ করলেও আরায়ার ক্ষেত্রে অনুমতি প্রদান করেন। যা অনুমান করে খেজুরের বিনিময়ে প্রদান করা হয়। যাতে করে দরিদ্র লোকেরা তাজা খেজুর খেতে পারে।"

হযরত আবূ হুরাইরার (রা.) রেওয়ায়াতে এর পরিমাণ নির্ণয় করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, এটা পাঁচ ওয়াসাকের কমে হতে হবে।

সার কথা হলো ইমাম শাফেঈর মতে এরূপ লেনদেন যদি পাঁচ ওয়াসাকের বেশি বা পাঁচ ওয়াসাক হয় তাহলে مـرابـنـة হিসেবে বিবেচিত হবে। আর পাঁচ ওয়াসাকের কম হলে আরায়া হবে।

ওয়াসাক কতটুকু ঃ মনে রাখতে হবে যে, ষাট সা'তে এক ওয়াসাক হয়। আর এক সা'র ওজন হয় সাড়ে তিন সের। এই হিসেবে এক ওয়াসাকের পরিমাণ দাঁড়ায় পাঁচ মণ দশ সের।

২। ইমামা মালেক (রহ.)-এর দৃষ্টিতে আরায়ার তাফসীর দুইভাবে হতে পারে।

(ক) যৌথ খেজুর বাগানে একজনের গাছের পরিমাণ বেশি আর অপর জনের গাছ মাত্র দুই-তিনটি। আরবদের অভ্যাস অনুযায়ী খেজুর পাকার সময় হলে বেশি গাছওয়ালা ব্যক্তি পরিবার পরিজন নিয়ে বাগানে এসে অবস্থান করতে থাকে। এদিকে অল্প গাছওয়ালা ব্যক্তিও বাগানে আসা যাওয়া করে। এতে করে বেশি গাছওয়ালা ব্যক্তি বিড়ম্বনার শিকার হয়।

তাই বাধ্য হয়ে সে কম গাছওয়ালা ব্যক্তির গাছে অবস্থিত তাজা খেজুরের বিনিময়ে কর্তিত শুকনো খেজুর দ্বারা চুক্তিবদ্ধ হয়ে বলল—এখন থেকে আর বাগানে আসা যাওয়া করো না।

এই ধরনের ক্রয়-বিক্রয় بيع مزابنة থেকে আলাদা। কিন্তু এটি শুধু তাদের জন্যই বৈধ। দ্বিতীয় কারো জন্য এধরনের লেন-দেন জায়িয নেই। আর তাঁর মতে পাঁচ ওয়াসাকের শর্তটি قيد اتفاقى কেননা ঐ কমগাছে সাধারণত পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণ খেজুর হতো। (এই তাফসীরটি مؤطامالك এ উল্লেখ করা হয়েছে)।

(খ) ইমাম মালেক (রহ.)-এর দ্বিতীয় তাফসীর যা ত্বহাভী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে। তাহলো, এক ব্যক্তির বিশাল এক বাগানের দু'একটি গাছ কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে দান করল। দানসূত্রে প্রাপ্ত এই গাছ দেখা শোনা করার জন্য ঐ লোকটি বাগানে যাতায়াত শুরু করে দিল। অবস্থা বেগতিক দেখে দাতা ব্যক্তি গাছের তাজা খেজুরের বদলায় কর্তিত কিছু খেজুর দিয়ে দিল তার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য।

৩। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে عرايا-এর তাফসীর ওটাই যা মালেক (রহ.) দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় বলেছেন। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, ইমাম মালেকের মতে এটা بيع কেননা তাঁর মতে হেবা (দান) পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য হস্তগত করা জরুরী নয়। এ কারণে গাছে যে পরিমাণ খেজুর আছে অনুদান প্রাপ্ত ব্যক্তি (موهوب له) সেগুলোর মালিক হয়ে গেছে। এর ফলে উক্ত খেজুরের বিনিময়ে কর্তিত যে খেজুর দেয়া হয় সেটা بيع হিসেবেই গণ্য হবে (দান হিসেবে নয়)।

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) মতে হেবা পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য শর্ত হলো "হস্তগত (কব্জা)" করা। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত গাছের খেজুর কেটে موهوب له-কে দেয়া না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সে তার মালিক হয় না বরং দাতাই

মালিক থেকে যায়। পরবর্তীতে দাতা কর্তিত যে খেজুর প্রদান করে এটা একদানের বদলায় আরেক দান স্বরূপ (استبدال موهوب بموهوب اخر)। মূলত এটা بيع নয়। তবে লেন-দেনের পদ্ধতিটা যেহেতু আকারে بيع-এর মত এজন্য হাদীসে একে بيع العرية বলা হয়েছে এবং بيع مزابنة থেকে استثناء করা হয়েছে।

৪। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের (রহ.) মতে আরায়া হলো ঃ জনৈক ব্যক্তিকে কয়েকটি গাছের খেজুর দান করা হয়েছে। এখন ঐ খেজুর অনুদান প্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক দাতা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে দেয়া। তাঁর মতে পাঁচ ওয়াসাকের কমে এই ধরনের লেন-দেন জায়িয।

৫। ইমাম আবূ উবাইদ কাসেম ইবনে সালাম (রহ.) এর দৃষ্টিতে عرايا হলো ঃ বাগানের ফল বিক্রি করার সময় কিছু ফল বাদ রেখে দেয়া। যাতে করে নিজের পরিবার-পরিজন তা খেতে পারে।

অতঃপর হুযূর (সা.) যে সব দরিদ্র লোকের কাছে টাকা পয়সা নেই তাদের কে অনুমতি দিলেন তারা যেন শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের তাজা খেজুরকে অনুমান করে খরিদ করে। সুতরাং দরিদ্র লোকের ওপর অনুগ্রহপূর্বক এই অনুমতি দেয়া হয়েছে।

আরায়া ক্রয়-বিক্রয় না হিবা

ائمة ثلاثة এবং ইমাম আবূ উবাইদ কাসেমের মতে عرايا ক্রয়-বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং হুযূর (সা.) একে مزابنة থেকে استثناء করেছেন।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) মতে এটা بيع নয় বরং (একদানের পরিবর্তে আরেক) দান (استبدال موهوب بموهوب اخر) অবশ্য পদ্ধতিটা بيع-এর মত বলে একে مرابنة থেকে استثنا করা হয়েছে।

তাঁদের মতে এই استثناء হলো استثناء متصل আর আবূ হানীফার (রহ.) মতে استثناء منقطع

আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতের প্রাধান্যতা

لغةً, روايةً এবং درايةً সর্বদিক বিবেচনায় ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মত راجح (প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য)।

অভিধান অনুযায়ী راجع হওয়ার প্রমাণ ঃ সমস্ত অভিধানবিদ একথার ব্যাপারে একমত যে عرية বলা হয় هذا اسم لهبة ثمرة النخيل-কে। তথা খেজুর গাছের ফল দান করাকে আরিয়্যা বলে। আহলে আরব দানের আলাদা আলাদা নামকরণ করেছেন। যেমন—দুধের জন্তু দান করা কে তারা মিন্‌হা (منحة) বলে, খেজুর গাছের ফলদানকে আরিয়্যা বলে।

رواية-এর দৃষ্টিকোণেও আহ্‌নাফের মত প্রাধান্য পায়। কেননা বহু রেওয়ায়াত সুস্পষ্টভাবে আহ্‌নাফের তাফসীরের পরিপূরক। যেমন—

১। এই অধ্যায়ে যায়েদ ইবনে ছাবিতের (রা.) রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে—

ان رسول الله رخص فى العرية ياخذ اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا .

এই রেওয়ায়াতে সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, তাজা খেজুর গ্রহীতা হলো বাগানের মালিক। এরাই মূলত শুকনো খেজুর দিয়ে তাজা খেজুর নিয়ে থাকে। আর এই রেওয়ায়াতের যথার্থতা প্রমাণিত হয় আহ্‌নাফের মতের ওপর। কেননা শাফেঈসহ অন্যান্যদের তাফসীর অনুযায়ী তাজা খেজুর গ্রহণকারী বাগানের মালিক নয় বরং ফকীর-মিসকীন তাজা খেজুর গ্রহণকারী।

ত্বহাভী শরীফে রেওয়ায়াতের শব্দকে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ رَخَّصَ فِى الْعَرَايَا فِى النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ تُوْهَبَانِ لِلرَّجُلِ فَيَبِيْعُهُمَا بِخَرْصِهَا تَمَرًا . قَالَ الطَّحَاوِىْ فَهٰذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُوَ اَحَدٌ مَنْ رَوَىْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّخْصَةَ فِى الْعَرِيَّةِ . فَقَدْ اَخْبَرَ اَنَّهَا الْهِبَةُ .

ইমাম ত্বহাভী (রহ.) বলেন, যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.) সে সব রাবীদের একজন যাঁরা আরায়ার ক্ষেত্রে رخصة (অবকাশের) কথা নবী করীম (সা.) থেকে রেওয়ায়েতে করেছেন। তিনি এও সংবাদ দিয়েছেন যে, এটা মূলত هبة (তথা দান, بيع নয়)।

২। অনেক রেওয়ায়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, বাগানের ফলফলাদিতে অনুমানের ভিত্তিতে যে পরিমাণ সদকা ওয়াজিব হত তার পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য রাসূল (সা.) বিভিন্ন কর্মকর্তা প্রেরণ করে এ মর্মে ফরমান জারী করতেন যে, আরিয়্যাকে এই হিসেবের বাইরে রাখবে এবং এর মধ্যে সদকা ওয়াজিব হবে

না। উল্লেখিত ফরমান থেকে আরায়াকে আলাদা করে রাখার যথার্থতা ঐ সময়ে প্রমাণিত হবে যখন এর ঐ তাফসীর করা হবে যে তাফসীর ইমাম মালেক ও ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) করেছেন। কেননা তাঁদের মতে আরায়া হলো মালিক কর্তৃক ফকীর মিসকীনদের প্রতি অনুদান (হেবা) মাত্র। সুতরাং এ থেকে সদকা উসূল করার প্রয়োজন নেই। কেননা এটা তো স্বস্থানে (ফকীরদের হাতে) পৌঁছে গেছেই।

অথচ লক্ষ্য করুন! শাফেঈর (রহ.) তাফসীর অনুযায়ী একে استثناء করাতে কোন ফায়দাই নেই।

৩। ইমাম মকহুল (রহ.) মুরসাল একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন—রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন—

خففوا فى الصدقات فان فى المال العرية والصدقة - ونحوه مروى عن عمر بن الخطاب -

"রাসূল (সা.) আমিলগণকে বলতেন সদকা উসূল করার সময় তোমরা নমনীয়তা প্রদর্শন করবে। কেননা মালের মধ্যে অনেক সময় আরায়া, ওয়াসিয়্যাত ইত্যাদি প্রকারের মাল থেকে যায়।" হযরত ওমর (রা.) থেকেও এ ধরনের রেওয়ায়াত পাওয়া যায়।

দেখা গেলো যে, আরায়ার কারণে রাসূল (সা.) সদকার মালে নমনীয়তা প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন। যা ইমাম আবূ হানীফা ও মালেকের তাফসীরকে বলিষ্ঠভাবে সমর্থন করে। কেননা তাঁদের মতো এটা হেবা যা মিসকীনদের হাতে পৌঁছে গেছে। সুতরাং এ থেকে ২য় বার সদকা আদায় করার প্রয়োজন নেই। অথচ শাফেঈর (রহ.) তাফসীর অনুযায়ী এই নির্দেশের কোন অর্থই থাকে না।

৪। আরায়া মদীনাবাসীদের একটি রীতি ও লেন-দেনের নাম। আর ইমাম মালেক (রহ.) মদীনাবাসীর রীতিনীতি সম্পর্কে বেশি জ্ঞাত। কেননা প্রবাদ আছে لان صاحب البيت ادرى بما فيه (ঘরওয়ালা ভালো করেই জানে এতে কি আছে)।

সুতরাং ইমাম মালেক (রহ.) عرايا-এর যে তাফসীর করেছেন সেটিই বিশুদ্ধ হওয়ার অধিক নিকটবর্তী।

দু'টি প্রশ্ন ও তার জওয়াব

প্রথম প্রশ্ন ঃ আহনাফের ওপর একটি প্রশ্ন হয় যে, আপনারা যখন মালেকের (রহ.) তাফসীরের সাথে একমত পোষণ করেছেন তখন পূর্ণভাবেই করতেন? তা না করে শুধু মাত্র সংজ্ঞার ক্ষেত্রে একমত পোষণ করে এর حقيقت-এর

ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করলেন কেন? ইমাম মালেক তো একে بيع বলেন, আপনারা بيع না বলে هبة বলেন কেন?

জওয়াব ঃ আমরা তাফসীরের ক্ষেত্রে ইমাম মালেকের সাথে একমত পোষণ করেছি যার সম্পর্ক মদীনাবাসীর রীতিনীতির সাথে। কিন্তু এর বাস্তবতা (حقيقت) নির্ণয়ে তাঁর সাথে একমত হতে পারিনি। (আর এটা দ্বিমুখী নীতিও নয়) কেননা حقيقت নির্ণয় করা হয় ইজতিহাদ দ্বারা। এতে عرف-এর কোন দখল নেই। যেহেতু ইমাম মালেকের (রহ.) মতে দানের ক্ষেত্রে হস্তগত করা জরুরী নয় এজন্য অনুদান প্রাপ্ত ব্যক্তি (موهوب له) ঐ তাজা খেজুরের মালিক হয়ে যায়। এরপর উক্ত তাজা খেজুরের বিনিময়ে শুকনো খেজুর গ্রহণ করা بيع এর আওতায় পড়ে বলে তিনি একে بيع বলেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফার মতে যেহেতু هبة (দানের) ক্ষেত্রে হস্তগত করা জরুরী এজন্য হস্তগত করার পূর্বে موهوب له-এর মালিকই হয়নি, তাহলে এবস্তুর লেন-দেন بيع হবে কী করে? তাই একথা বলতে হবে যে, এটা (একদানের বদলায় আরেক) দান (استبدال موهوب بموهوب آخر)

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ আহনাফের ওপর দ্বিতীয় প্রশ্ন এই হয় যে, আপনারা একে بيع বলা থেকে বিরত থেকেছেন অথচ হাদীসে একে بيع বলা হচ্ছে এবং بيع المزابنة থেকে استثناء করা হয়েছে। এসব কিছুর প্রতি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, আরায়া بيع-ই عطية বা هبة নয়। এর জওয়াব পূর্বেই দেয়া হয়েছে যে, পদ্ধতি ও বাহ্যিকভাবে এ ধরনের লেনদেন بيع-এর মত বলে একে بيع العرية বলা হয়েছে এবং بيع المزابنة থেকে استثناء করা হয়েছে। সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, এটা مستثنى متصل নয় বরং مستثنى منقطع । কেননা عرايا . مستثنى منه তথা بيع مزابنة-এর মধ্যে শামিলই নয়। لعدم دخول العرايا فى المستثنى منه

درايت (রেওয়ায়াতকে যুক্তির নিরিখে পেশ করা) এর দৃষ্টিকোণেও আহনাফের মত প্রাধান্য পায়। কেননা مزابنة রেবারই এক প্রকার বিশেষ। আর রেবা (সুদের অবৈধতা (حرمت) কিতাবুল্লাহ এবং মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা সুপ্রমাণিত। শুধু তাই নয় এর বিরুদ্ধচারীকে আল্লাহ্‌র সাথে যুদ্ধ করার আহ্বান

করা হয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় হলো সুদের ক্ষেত্রে কমবেশির কোন পার্থক্য নেই। (কমও হারাম বেশিও হারাম)। সুতরাং এটা কিভাবে হতে পারে যে, একই লেনদেন পাঁচ ওয়াসাকের কম হলে জায়িয হবে আর বেশি হলে হারাম ও সুদ হবে?

এখন যদি কোন রেওয়ায়াত দ্বারা এর বৈধতার প্রমাণ মেলে তাহলে কুরআন-হাদীস অনুযায়ী এর সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে। আরায়ার ক্ষেত্রে ইমাম মালেক ও আবূ হানীফা (রহ.) যে তাফসীর করেছেন সেটা যাবতীয় রেওয়ায়াতের সাথে চমৎকার মিলে যায়।

শুধু তাই নয়। অভিধান, অসংখ্য রেওয়ায়াত এবং মদীনাবাসীর রীতিনীতি সবকিছুই এই মতের সমর্থন যোগায়। সুতরাং একথা বলতে পারি যে, আবূ হানীফা (রহ.) যে তাফসীর করেছেন সেটাই راجح।

ফায়েদা ঃ যারা عرايا-কে بيع বলেন, তাঁদের মতে بيع عرايا সহীহ্ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। ইমাম শাফেঈর মতে, প্রথম শর্ত হলো, পাঁচ ওয়াসাকের কম হতে হবে। এর চেয়ে বেশি হলে জায়িয হবে না। যদি সমান পাঁচ ওয়াসাক হয় তাহলে কী হবে? সহীহ্ মত অনুযায়ী এটাও নাজায়িয।

দ্বিতীয় শর্ত হলো ঃ গাছের তাজা খেজুর শুকালে কি পরিমাণ হতে পারে এর একটি অনুমান লাগাতে হবে। অনুমান অনুযায়ী তাজা খেজুরের বদলায় শুকনো খেজুর পরিশোধ করতে হবে। এর সাথে সাথে মজলিস থেকে পৃথক হওয়ার আগে আগেই কব্জা করতে হবে। ইমাম শাফেঈর (রহ.) সহীহ্মত অনুযায়ী ধনী-গরীব সবাই عرايا-এর লেনদেন করতে পারবে।

ইমাম আহমদের (রহ.) মতে পাঁচ শর্তে بيع عرايا সহীহ্ হবে।

১। পাঁচ ওয়াসাকের কম হতে হবে।

২। গাছের তাজা খেজুরের পরিমাণ করতে হবে যে, এর পরিমাণ কত হতে পারে?

৩। মজলিস থেকে পৃথক হওয়ার আগেই শুকনো খেজুর কব্জা করতে হবে।

৪। তাজা খেজুর খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা থাকতে হবে।

৫। ক্রেতার কাছে শুকনো খেজুর ছাড়া অন্য কিছু না থাকতে হবে যার দ্বারা তাজা খেজুর ক্রয় করা যায়।

ইমাম মালেকের (রহ.) মতেও শর্ত পাঁচটি।

১। গাছের ফল হেবা করতে হবে।

২। অনুদান প্রাপ্ত ব্যক্তি (موهوب له) কর্তৃক দাতার কাছে ঐ ফল বিক্রি করতে হবে, অন্যের কাছে বিক্রি করা জায়িয নেই।

৩। পাঁচ ওয়াসাক পর্যন্ত জায়িয এর চেয়ে বেশি হলে নাজায়িয।

৪। গাছে তাজা খেজুরের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে এবং

৫। তাৎক্ষণিকভাবে ঐ তাজা খেজুরের বদলায় শুকনো খেজুর না দেয়া, বরং যে সময় তাজা খেজুর কর্তন করবে সে সময় تمر (শুষ্ক খেজুর) অর্পণ করা।

عرايا শুধু খেজুরের সাথে খাস কিনা

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الزَّبِيْبِ بِالْعِنَبِ كَيْلاً وَعَنْ كُلِّ ثَمْرٍ بِخَرْصِهِ ـ

"রাসূল (সা.) মুযাবানা করতে নিষেধ করেছেন। আর মুযাবানা হলো তাজা খেজুর (نخل)-কে تمر (শুষ্ক খেজুর) দ্বারা মেপে বিক্রি করা। কিসমিসকে আঙুর দ্বারা বিক্রি করা। এমনিভাবে প্রত্যেক ফল অনুমান করে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।"

এই হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে জানা গেল যে, মুযাবানা শুধুমাত্র খেজুরের মধ্যেই নয় বরং যাবতীয় ফলের মধ্যেই নিষিদ্ধ। এখন কথা হলো আরায়াও সকল প্রকার ফলে বৈধ হবে নাকি শুধু মাত্র খেজুরের মধ্যেই এর বৈধতা সীমাবদ্ধ? এ সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

ইমাম আহমদ, লাইছ এবং আহলে জাহেরের মতে খেজুর ছাড়া অন্যান্য ফলে আরায়া জায়িয নেই। হ্যাঁ, ফল যদি সুদের বস্তু (اشياء ربوية) না হয় তাহলে তাতে আরায়া জায়িয। কেননা যায়েদ ইবনে ছাবিতের (রা.) হাদীসে বলা হয়েছে ولم يرخص فى غير ذلك শাফেঈ মাযহাবের কতক আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন। তবে প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী ইমাম শাফেঈ (রহ.) খেজুরের সাথে আঙুরকেও শামিল করেছেন। সুতরাং তাঁদের মত অনুযায়ী আঙুর ও খেজুরের মধ্যে আরায়া জায়িয, অন্যান্য ফলে জায়িয নেই। ইমাম মালেক (রহ.) খেজুরের সাথে সে সব ফলও শামিল করেন যা গচ্ছিত রাখা যায়। সুতরাং সেগুলোর মধ্যে আরায়া জায়িয হবে। আহনাফের মতে আরায়া যেহেতু بيع বা মুযাবানা নয় এজন্য সব ধরনের ফলে এটা জায়িয। والله اعلم

باب من باع نخلا عليها تمر

অধ্যায় ঃ খেজুর থাকা অবস্থায় গাছ বিক্রি করা

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ اُبِرَّتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ اِلاَّ اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ـ

"হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি পরাগযুক্ত কোন খেজুর গাছ বিক্রি করে সেই গাছের ফল বিক্রেতারই থেকে যাবে। তবে ক্রেতা যদি ফলের শর্ত করে তাহলে ভিন্ন কথা।"

تابير বলা হয়, নর খেজুর গাছের রেণু মাদী খেজুর গাছের রেণুর সাথে সংযুক্ত করা যাতে ফলন বেশি হয়।

قد ابرت - مجهول-এর সীগা। এ মাদ্দা باب نصر থেকে এবং مزيدفيه তে باب تفعيل থেকে ব্যবহৃত হয়। তবে উভয়ের অর্থ একই।

এই হাদীসের ভিত্তিতে আলিমগণের ইজমা হয়েছে যে যদি পরাগযুক্ত খেজুর গাছ বিক্রি করা হয় তাহলে বিক্রেতা এই ফলের মালিক থাকবে। আর ক্রেতা যদি ফলের শর্ত করে তাহলে সে ফলের মালিক হবে।

পরাগযুক্ত করার আগে বিক্রি করা হলে এর হুকুম সম্পর্কে এই اختلاف। বর্ণনা করা হয় যে, ইমাম শাফেঈর (রহ.) মতে এক্ষেত্রে ফলের মালিক হবে ক্রেতা, তবে বিক্রেতা যদি ফলের শর্ত করে তাহলে সেই মালিক থেকে যাবে। তাঁরা উল্লেখিত হাদীসের مفهوم مخالف (বিপরীত বোধক অর্থ) দ্বারা দলীল প্রদান করে থাকেন। তাঁরা বলেন, পরাগযুক্ত করার 'পর' বিক্রি করলে যেহেতু বিক্রেতা এর মালিক থেকে যায় সুতরাং বিপরীত অর্থে তাবীর করার 'আগে' ক্রেতা এর মালিক হবে। আহনাফ এবং ইমাম আওযায়ী বলেন, এক্ষেত্রেও বিক্রেতাই খেজুরের মালিক থেকে যাবে। আহনাফ مفهوم مخالف-কে দলীল মনে করেন না। তাঁদের দৃষ্টিতে পরাগযুক্ত করার আগে পরের হুকুম একই, বিক্রেতা এর মালিক হবে।

যেমন এক হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন—

مَنِ اشْتَرٰى اَرْضًا فِيْهَا نَخْلٌ فَلِثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ اِلاَّ اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ـ

হাদীসে পরাগযুক্ত করা না করার মধ্যে কোন রূপ পার্থক্য করা ছাড়াই বিক্রেতাকে ফলের মালিক সাব্যস্থ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় কথা হলো, গাছের সাথে ফলের এই সংযুক্ততা সৃষ্টিগত হলেও তা স্থায়ী নয় বরং অস্থায়ী। অতিসত্ত্বর গাছ থেকে ফলকে বিচ্ছিন্ন করা হবে। বিবেচনায় ফল ক্ষেতের শস্যের মত। শর্তবিহীন শস্য বিশিষ্ট ভূমি বিক্রি করলে শস্যের মালিক যেমন বিক্রেতাই থেকে যায় ঠিক তদ্রূপ ফল বিশিষ্ট খেজুর গাছ বিক্রি করলে বিক্রেতাই মালিক থেকে যাবে। হ্যাঁ, ক্রেতা ফলের শর্ত করলে সেটা ভিন্ন কথা।

শাফেঈ (রহ.)-এর দলীলের জবাব

مفهوم مخالف দ্বারা তাঁরা যে দলীল পেশ করেছেন আহনাফের মতে সেটি দলীল হিসেবে বিবেচিত নয়। হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেন— হাদীসে তাবীর (تأبير) দ্বারা ظهور ثمرة-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো—ফল প্রকাশ পাওয়ার আগে গাছ বিক্রি করলে ক্রেতা এর মালিক হবে। আর প্রকাশ পাওয়ার পর বিক্রি করলে বিক্রেতা মালিক হবে। চাই পরাগযুক্ত করা ছাড়া প্রকাশ পাক বা না পাক। আল্লামা তীবী (রহ.) আল্লামা দেহলুবী (রহ.) মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে এবং মাওলানা জা'ফর আহমদ ওসমানী (রহ.) তার বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ اعلاء السنن। এই মতকেই গ্রহণ করেছেন। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী তাঁর ফয়যুল বারীতেও এ রকম উল্লেখ করেছেন। প্রকৃত পক্ষে আহনাফ ও শাফেঈর মতে তেমন কোন বিরোধ নেই। কেননা তাঁরও মত হলো ফল যদি প্রকাশ পেয়ে যায় চাই পরাগযুক্ত করার দ্বারা কিংবা পরাগযুক্ত ছাড়া তাহলে বিক্রেতা এর মালিক থাকবে। তবে ক্রেতা শর্ত করলে সে মালিক হবে।

ইমাম নববী (রহ.), ইবনে হাজার আসকালানী এবং ইমাম বগভী (রহ.) একথাই উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এই মতবিরোধটি বাস্তবিক কোন মতবিরোধ নয় বরং শাব্দিক মতবিরোধ মাত্র। এতে ব্যস্ততার নিরিখে উভয় মাযহাবের মাঝে বিরোধ বাকী থাকে না।

সম্পদের মালিক—এমন গোলাম বিক্রি করা

হযরত ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত অপর হাদীসে বলা হয়েছে وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِيْ بَاعَهُ اِلَّا اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি গোলাম

বিক্রি করল সে তার মালের মালিক হবে। হ্যাঁ, ক্রেতা যদি শর্তারোপ করে তাহলে সে (মালের) মালিক হবে। এখানে দু'টি মাসআলা ঃ

১। ইমাম মালেক, আহলে জাহের এবং ইমাম শাফেঈর قول قديم অনুযায়ী এখানে গোলামের দিকে মালের যে اضافت করা হয়েছে, এটি ملكيت-এর দৃষ্টিকোণেই করা হয়েছে।

অর্থাৎ মালিক যদি অনুমতি দেয় তাহলে গোলামও সম্পদের মালিক হতে পারে।

এমনকি সে কোন বাঁদীর মালিক হয়ে তার সাথে সহবাসও করতে পারবে। কেননা, হযরত ইবনে ওমরের (রা.) এর হাদীসে বলা হয়েছে— عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا اعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَالِهِ - অর্থাৎ মালদার কোন গোলাম আযাদ করলে তার মালের পিছু নেয়া যাবে না।"

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় গোলাম আগেই থেকেই এই সম্পদের মালিক ছিল। সুতরাং এতে বুঝা যায় গোলামও সম্পদের মালিক হতে পারে।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এবং ইমাম শাফেঈর قول جديد অনুযায়ী গোলাম কোন কিছুর মালিক হতে পারে না। কেননা সে নিজেই তো মুনিবের মামলূক (সম্পদ)। সুতরাং তার কাছে যে মাল-সম্পদ থাকবে সেটারও মালিক হবে তার মুনিব।

আহনাফের পক্ষ হতে মালেকের (রহ.) দলীলের জওয়াব ঃ যে সব হাদীসে وله مال বলা হয়েছে সেখানে গোলাম প্রকৃতই মালের মালিক একথা বলা হয়নি বরং সে যেহেতু এই মাল-সম্পদ কজা করে রেখেছে, সেহেতু বাহ্যিকভাবে (আপাত দৃষ্টিতে) সেই এর মালিক একথা বুঝানো হয়েছে।

আর যে রেওয়ায়াতে لم يتعرض لماله বলে মালের পিছু নিতে বারণ করা হয়েছে সেখানে "গোলাম এর মালিক" এজন্য পিছু নিতে বারণ করা হয়নি বরং তার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শনপূর্বক একাজ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

২। এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, বিক্রির সময় গোলামের কাছে যদি কোন সম্পদ থাকে তাহলে বিক্রেতা এর মালিক হবে, তবে ক্রেতা শর্ত করলে সেটা ভিন্ন কথা। তবে ক্রেতার শর্ত কীরূপ হবে এর ব্যাখ্যায় আলিমগণের মধ্যে ইখতিলাফ রয়েছে।

ইমাম মালেক (রহ.) বলেন—মতলকভাবে শর্তারোপ করা যাবে। চাই গোলামের সম্পদ ثمن (মূল্য) জাতীয় হোক বা অন্য কিছু, চাই তার সম্পদ তার দামের চেয়ে কম হোক বা বেশি। কেননা হাদীসে মতলকভাবে শর্তারোপের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ও শাফেঈর (রহ.) মতে শর্ত করা জায়িয যদি সুদের সম্ভাবনা না থাকে। ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, যদি গোলামের কাছে দিরহাম থাকে তাহলে গোলাম ও গোলামের কাছে রক্ষিত সেই দিরহামকে দেরহাম দ্বারা ক্রয় করা যাবে না বরং দীনার দ্বারা ক্রয় করতে হবে। আর যদি দীনার থাকে তাহলে গোলাম কে দীনার সহ স্বর্ণ দ্বারা ক্রয় করা যাবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন—যদি গোলামের কাছে সংরক্ষিত সম্পদ ثمن ছাড়া অন্য কিছু হয় তাহলে মতলক ভাবে শর্ত করা জায়িয। আর যদি সংরক্ষিত সম্পদ ثمن জাতীয় হয় যেমন গোলামের কাছে দিরহাম আছে আর তাকে বিক্রিও করা হচ্ছে দিরহাম দ্বারা তাহলে এক্ষেত্রে কিছু শর্ত আছে। শর্ত হলো সংরক্ষিত ওই সম্পদ তার মূল্যের চেয়ে কম হতে হবে (তথা দাম বেশি ও সম্পদ কম হতে হবে) যাতে করে মূল্যের কিছু অংশ তার সম্পদের বরাবর হয় আর বর্ধিত অংশ তার (গোলামের) মূল্য হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু যদি গোলামের কাছে সংরক্ষিত সম্পদ আর তার মূল্য (দাম) সমান সমান হয় অথবা সম্পদ মূল্যের চেয়ে বেশি হয় তাহলে সুদ হওয়ার কারণে এটা নাজায়িয হবে। যেমন ধরুন গোলামের কাছে আছে পাঁচশ দিরহাম আর তাকে বিক্রি করা হচ্ছে ছয়শ দিরহামে। তাহলে بيع সহীহ্ হবে। সম্পদের রক্ষিত পাঁচশ দিরহাম মূল্যের পাঁচশ দিরহামের বদলায় বাদ যাবে। আর বাকি একশ গোলামের মূল্য হিসেবে ধর্তব্য হবে। পক্ষান্তরে গোলাম কে যদি পাঁচশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করা হয় তাহলে সামঞ্জস্য না হওয়ার কারণে بيع ফাসিদ হয়ে যাবে। (কেননা সম্পদের বদলায় মূল্যের পাঁচশ দিরহাম বাদ দিলে গোলাম বাবদ কোন মূল্যই বাকি থাকে না। যার ফলে এটা সুদের আওতায় পড়ে যায়)

কিন্তু ইমাম মালেক (রহ.) এসব পদ্ধতিকেই জায়িয বলে মনে করেন। কেননা হাদীসে কমবেশির কোন শর্ত করা হয়নি।

باب النهي عن المحاقلة والمزا بنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين

অধ্যায় ঃ মুহাকালা, মুযাবানা প্রভৃতি নিষেধ হওয়া প্রসঙ্গে

১। মুহাকালা, মুযাবানা এবং بيع الثمرة قبل بدو الصلاح-এর আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে।

مخابرة এবং مزارعة প্রতিশব্দ। অর্থাৎ উৎপাদিত ফসলের কিছু অংশের বিনিময়ে জমিন বর্গা দেয়া। কেউ কেউ مخابرة এবং مزارعة-এর মধ্যে এই পার্থক্য করেছেন যে, জমিনের মালিক বীজ সরবরাহ করলে مزارعة আর বর্গাচাষী বীজ সরবরাহ করলে مخابرة; তবে ইমাম নববী (রহ.) এই মত প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন— উভয়টি একই বস্তু, কোন পার্থক্য নেই।

২। مخابرة শব্দটি خبر থেকে মুশতাক হয়েছে। শাব্দিক অর্থ, শস্য রোপনের জন্য জমিন কর্ষণ করা। কেউ বলেন এটি خبار থেকে গঠিত হয়েছে। অর্থ নরম জমিন। কেউ বলেন এর মূলে রয়েছে خبرة; (মাদ্দা)। অর্থ, অংশ نصيب ইত্যাদি।

আল্লামা ইবনুল আরাবী (রহ.) বলেছেন শব্দটিকে خيبر থেকে নেয়া হয়েছে। হুযূর (সা.) খায়বর বিজয় করে এর জমির নির্ধারিত একটি অংশ বাইতুল মালে প্রদান করার শর্তে ইহুদীদেরকে বর্গা দেন। যেহেতু এ ধরনের লেন দেন সর্বপ্রথম খায়বর এলাকায় সংঘটিত হয় এজন্য একে (বর্গাচাষ) مخابرة বলা হয়।

مخابرة ও مزارعة -এর বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা হবে।

৩। معاومة শব্দটি عام থেকে مفاعلة-এর মাসদার। যেমন سنة থেকে مساهنة এবং شهر থেকে مشاهرة-এর মাসদার গঠন করা হয়।

بيع معاومة-এর পরিচয় ঃ এক বছর অথবা দুই বছরের জন্য গাছের ফল বিক্রি করা (যে, এই সময়ে যত ফল ধরবে সব বিক্রি করা হলো) কে بيع معاومة বলা হয়। একে بيع السنين ও বলা হয়।

সর্বসম্মতিক্রমে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নাজায়িয। কেননা এতে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সাথে এটা এমন বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় যাকে আল্লাহ্ তাআলা এখনও সৃষ্টি করেননি।

(সুতরাং ধোঁকার সম্ভাবনা থাকা এবং بيع معدوم হওয়ার কারণে بيع معاومة হারাম)।

ক্রয়-বিক্রয়ের সময় প্রভেদ করা

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ... وَعَنِ الثُّنْيَا ـ

তিরমিযী শরীফের এক রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে— وعن الثنيا الا ان تعلم

ثنيا-এর অর্থ استثناء ـ

উদ্দেশ্য হলো বিক্রিত বস্তু থেকে অনির্ধারিত অংশ বাদ দেয়া। উদাহরণ স্বরূপ এরূপ বলা— بعتك هذه الصبرة الا بعضها অথবা এরূপ বলা بعتك هذه الثياب الا بعضها-এ ধরনের বাক্য বিনিময় দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে بيع ফাসিদ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, যদি বাদ দেয়া অংশ নির্ধারিত হয় এবং বিক্রিত বস্তুও জানা থাকে তাহলে লেনদেন সহীহ্ হবে। কেননা হাদীসে বলা হয়েছে— الا ان تعلم। যেমন এরূপ বলল بعتك هذه الثياب الا هذ المعين

বাদ দেয়া অংশ নির্ধারিত ঠিক কিন্তু (استثناء করা দ্বারা যদি) مبيع-এর পরিমাণ অজ্ঞাত হয়ে যায় তাহলে এর হুকুমের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যেমন কেউ এরূপ বলল— بعتك هذه الصبرة من الطعام الا صاعا واحدا

এক সা’ যদিও নির্ধারিত একটি পরিমাণ কিন্তু পুরো স্তুপ থেকে এক সা’ বাদ দেয়ার পর স্তুপের পরিমাণ অজ্ঞাত হয়ে যায়।

ইমাম আবূ হানীফা, শাফেঈ বরং জমহুরের মতে এরূপ করার দ্বারা بيع ফাসিদ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, যদি বাদ দেয়া অংশ جزء شائع হয়, যেমন অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ তাহলে بيع সহীহ্ হবে। যেমন এরূপ বলল— بعتك هذه الصبرة الا نصفها। কিন্তু ইমাম মালেক (রহ.) বলেন— প্রথম ক্ষেত্রেও بيع সহীহ্ হবে যদি বাদ দেয়া অংশ বিক্রিত বস্তু (مبيع) এর একতৃতীয়াংশের বেশি না হয়।

জমহুরের দলীল الا ان تعلم। কেননা এই হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, بيع এর استثناء নিষেধ করা হয়েছে বিক্রিত বস্তুর পরিমাণ অজ্ঞাত হওয়ার

াগে। সুতরাং যে ক্ষেত্রে এই সমস্যা দেখা দিবে সে ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল া গণ্য হবে।

باب كراء الارض
অধ্যায় ঃ জমি বর্গা দেয়া

একজনের জমি অপরজনের শ্রম বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদনের তিনটি ়তি হতে পারে।

১। ইজারা ঃ জমি একজনের শ্রম অপরজনের। চুক্তি সম্পাদিত হবে على غير ما خرج من الار তথা জমি থেকে উৎপাদিত নয় এমন বস্তুর ওপর। মন—স্বর্ণ, রৌপ্য, টাকা-পয়সা, কাপড় ইত্যাদির বিনিময়ে জমিন বর্গা দেয়া।
চার ইমামসহ জমহুর ওলামা ইজারার বৈধতার ব্যাপারে একমত।
তবে ইমাম তাউস, হাসান বসরী, ইবনে হাযম, আতা, ইকরামা, মুজাহিদ, সরূক, ইবনে সীরিন কাসেম ইবনে মুহাম্মদ প্রমুখ আলিমগণের মতে ইজারা য়িয নয়। তাঁরা نهى عن كراء الارض হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন, যাতে ারাকে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু জমহুর ওলামা এই হাদীসকে বর্গাচাষের ক বিশেষ পদ্ধতির ওপর প্রয়োগ করে থাকেন। ইজারা জায়িয হওয়ার দলীল ঃ

(١) عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ اَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ عَنْ كِرَاءِ الْاَرْ
فَقَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ قَالَ
فَقُلْتُ اَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ؟ فَقَالَ اَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ -

"আমি বললাম—স্বর্ণ-চান্দির বিনিময়েও নিষেধ? তিনি বললেন, স্বর্ণ চান্দির িনিময়ে তথা ইজারা হলে কোন সমস্যা নেই।"

(٢) عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ :كُنَّا نُكْرِى الْاَرْضَ بِمَا عَلَ
السَّوَاقِىْ مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعُدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَنَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّ
للّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ وَاَمَرَنَا اَنْ نُكْرِيْهَا بِذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ -

....আমাদের কে বর্গাচাষ করতে বারণ করলেন এবং সোনা-রূপা দ্বারা তথা জারায় চাষাবাদ করার অনুমতি প্রদান করেন।"

(٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : دَخَلْنَا عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ زَعَمَ ثَابِتٌ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُوَاجَرَةِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا .

উল্লেখিত সকল রেওয়ায়াতে বর্গাচাষ নিষেধ করা হলেও ইজরার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং ইজারার ব্যাপারে জমহুরের অভিমতই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

২। **দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো ঃ** জমিন একজনের শ্রম অপরজনের। চুক্তি করা হয়েছে জমিন থেকে উৎপাদিত নির্ধারিত এক অংশের ওপর। যেমন, এই শর্তে জমির মালিক বর্গাচাষীকে জমি প্রদান করল যে, ক্ষেত থেকে উৎপাদিত শস্যের দশ মণ মালিককে দিবে। অথবা জমিনের এক নির্ধারিত অংশের ফসলের ওপর চুক্তি করা। যেমন একথা বলা যে, জমির অমুক অংশের ফসল আমার, বাদবাকি যা থাকবে সেটা তোমার। সর্বসম্মতিক্রমে এই ধরনের চুক্তি করা হারাম। কেননা এতে ধোঁকা ও প্রতারণার সম্ভাবনা বিদ্যমান। এমন হলো যে, জমিনে কিছুই উৎপাদিত হলো না অথবা যা উৎপাদিত হয়েছে তা নির্ধারিত ঐ পরিমাণের তুলনায় নগণ্য। আর জমির কোন অংশ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে এই সমস্যা হতে পারে যে, নির্ধারিত ঐ অংশে বা বাকি অন্য অংশে কিছুই উৎপন্ন হলো না। (প্রথম ক্ষেত্রে জমি ওয়ালা আর ২য় ক্ষেত্রে চাষী ক্ষতিগ্রস্ত হবে) এজন্য এটা নাজায়িয।

৩। **৩য় পদ্ধতি হলো ঃ** المزارعة بشطر من الخارج .

তথা জমি থেকে উৎপাদিত ফসলের جزء شائع (অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ, এক চতুর্থাংশ) এর ওপর চুক্তি করে বর্গা চাষ করা।

যেমন—জমির মালিক বর্গাচাষীকে একথা বলল যে, আমি তোমাকে জমি চাষ করতে দিলাম এই শর্তে যে, উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক বা ثلث অথবা ربع আমাকে প্রদান করবে। আর বাদবাকি যা থাকবে তা তোমার।

এটা জায়িয কি-না এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে

উল্লেখিত এ তৃতীয় সূরত জায়িয কিনা এ ব্যাপারে চারটি মত রয়েছে।

১। ইমাম আহমদ, আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) প্রমুখের মতে এটা জায়িয। কতক শাফেঈর মত এরূপই। এটা ইবনে হাযমেরও মাযহাব।

২। ইমাম আবূ হানীফা এবং যুফারের (রহ.) মতে এটা নাজায়িয। ইমাম ইবরাহীম নখয়ী থেকে এমন বর্ণিত আছে।

৩। ইমাম শাফেঈর (রহ.) মতে কিছু শর্তসাপেক্ষে জায়িয। যথা—

(ক) مـزارعـة (বর্গাচাষ) مـسـاقـات-এর অধীনে হতে হবে। (مـسـاقـات-এর পরিচয় পরে দেওয়া হবে)

(খ) مسـاقـات এবং مزارعة উভয়ের আমেল একই ব্যক্তি হতে হবে।

(গ) مسـاقـات এবং مـزارعـة-এর عـقـد (চুক্তি) একসাথে হতে হবে। চুক্তির সময় مـزارعـة-কে مـسـاقـات-এর ওপর مقدم না করা।

(ঘ) গাছের দেখা শোনা (مسـاقـات) এবং শস্য উৎপন্ন করা (مزارعة) আলাদা ভাবে করা দুঃসাধ্য হওয়া।

(ঙ) مـزارعـة-এর ক্ষেত্রে জমির মালিক কর্তৃক বীজ সরবরাহ করা। কতিপয় শাফেঈ এই শর্ত করেছেন যে, مـزارعـة-এর জমি مـسـاقـات-এর জমির চেয়ে কম হতে হবে। কিন্তু তাঁদের মতানুযায়ী এই শর্ত না থাকাই অধিক বিশুদ্ধ।

৪। ইমাম মালেকের (রহ.) মতে مـسـاقـات-এর অধীনে হলে مزارعـة জায়িয। তবে শর্ত হলো মুযারাআর জমি মুছাকাতের জমির একতৃতীয়াংশের বেশি না হওয়া।

মাযহাবের সার সংক্ষেপ ঃ আহমদ ও সাহেবাঈনের মতে مزارعة জায়িয। ইমাম আবূ হানীফা, শাফেঈ ও মালেকের মতে নাজায়িয। অবশ্য ইমাম শাফেঈ ও মালেক (রহ.) মুছাকাতের অধীনে হলে জায়িয বলেন। আর আবূ হানীফার (রহ.) মতে মুছাকাতের অধীনে তো দূরের কথা খোদ মুছাকাতই নাজায়িয।

দলীলসমূহ

জায়িযের প্রবক্তাগণ নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন—

(١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ اَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ اَوْ زَرْعٍ -

"রাসূল (সা.) উৎপাদিত ফসল এবং ফলের বিনিময়ে খায়বরের ইহুদীদের কে জমি বর্গা দিয়েছেন।"

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَتِ الْاَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اِخْوَانِنَا النَّخِيْلَ ، قَالَ لاَ ، فَقَالُوْا تَكْفُوْنَا الْمَؤُنَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِى الثَّمَرَةِ فَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا -

নাজায়িযের প্রবক্তাগণের দলীলসমূহ ঃ

(١) عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ـ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَهِىَ الْمُزَارَعَةُ ـ

(٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ـ كُنَّا نُخَابِرُ وَلَمْ نَرٰى بِهٖ بَاْسًا حَتّٰى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْهُ فَتَرَكْنَاهُ ـ

(٣) عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرْفُوْعًا مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيُؤْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ـ (رواه ابوداؤد)

যে ব্যক্তি বর্গাচাষ পরিত্যাগ করে না সে যেন আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে!

উল্লেখ্য যে, এ ধরনের মারাত্মক ধমকী মোট তিন জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র ওলীদের সাথে বিদ্বেষপোষণকারী, সুদখোর এবং বর্গাচাষী। তাহলে বুঝুন এবার বর্গাচাষ কতটুকু বৈধ?!

দ্বিতীয় কথা হলো, ইজারা সহীহ্ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, কাজে নিয়োগ দেওয়ার পূর্বেই মজুরী দিতে সক্ষম হওয়া এবং মজুরী নির্ধারিত থাকা। অথচ এ দু'টি বিষয়ই এখানে অনুপস্থিত। কেননা মজুরী আসছে তার শ্রম বিনিয়োগের পর। আবার খাদ্য-শস্য উৎপন্ন হবে কিনা তাও জানা নাই। হলে কি পরিমাণ হবে তাও অস্পষ্ট।

খায়বরের ঘটনা কে ইমামগণ বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন। ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন— এই চুক্তি (مزارعة) مساقات-এর অধীনে হয়েছিল। ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, মুযারাআর জমি مساقات-এর জমির তুলনায় কম ছিল। আর এরূপ হলে মুযারাআ (তাঁদের মতে) জায়িয। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন— রাসূল (সা.) ট্যাক্স তথা خراج হিসেবে ইহুদীদের সাথে এই লেনদেন করেছেন। মুযারাআ হিসেবে নয়।

خراج দুই প্রকার

১। خراج وظيفة প্রত্যেক বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট অংশ নির্ধারণ করে দেওয়া। যেমন— এই পরিমাণ টাকা, অস্ত্র ইত্যাদি দেয়ার শর্ত করা।

২। خراج مقاسمة তথা জমিন চাষাবাদ করে এর উৎপাদিত ফসলের কিছু অংশ নিজেদের পরিশ্রমের জন্য গ্রহণ করা আর বাকি অংশ ট্যাক্স হিসেবে বাইতুল মালে জমা দেয়া। কিন্তু খায়বরের ব্যাপারে আবূ হানীফা (রহ.)-এর এই তাবীল অচল। কেননা, খেরাজ আদায় করা হয় সেসব জমি থেকে, যার মালিক কাফির। খায়বরের জমির মালিক তো ছিল মুসলমানরা (যাতে খেরাজ চলতে পারে না)।

খায়বর বিজয়ের পর এই জমির মালিক মুসলমানরা হয়েছিল এর স্বপক্ষে বহু প্রমাণ রয়েছে। মুসলিম শরীফে كتاب المساقات-এ ইবনে ওমর (রা.)-এর একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে—

وَكَانَتِ الْأَرْضُ حِيْنَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَالْمُسْلِمِيْنَ فَاَرَادَ اِخْرَاجَ الْيَهُوْدَ مِنْهَا ، فَسَأَلَتِ الْيَهُوْدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلٰى اَنْ يَكْفُوْا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُقِرُّكُمْ عَلٰى ذٰلِكَ مَا شِئْنَاهُ فَقَرُّوْا بِهَا حَتّٰى اَجْلَاهُمْ عُمَرُ اِلٰى تَيْمَاءَ وَاَرِيْحَاءَ ـ

"যখন খায়বর বিজয় করা হয় তখন এর কর্তৃত্ব (মালিকানা) এসে যায় আল্লাহ্র রাসূল (সা.) ও মুমিনদের হাতে.... হানাফী মাযহাবের কেউ কেউ এই জওয়াব দেয়ার চেষ্টা করেছেন যে, খায়বরের ঘটনাটি فعْلىْ আর نهى عن المزارعة-এর হাদীস قولى আর একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, حديث قولى-فعلى-এর ওপর حديث قولى প্রাধান্য পায়। কিন্তু এই জওয়াবটিও যথার্থও নয়। কেননা এখানে حديث قولى রয়েছে। যেমন— نقركم بها على ذلك ما شئنا অন্য রেওয়ায়াতে আছে ولهم الشطر সুতরাং দেখা গেলো যে, এখানে حديث قولى ও রয়েছে। আর এটা কিভাবে হতে পারে যে, রাসূল (সা.) কোন জিনিস নিষেধ করে নিজেই তাতে লিপ্ত হবেন এবং সারা জীবন এর ওপর অটল থেকে যাবেন?

কেউ কেউ এই জওয়াব দিয়েছেন যে, খায়বরের حديث গুলো مبيح আর নিষেধাজ্ঞার হাদীসগুলো محرم আর عارض-এর ক্ষেত্রে محرم . مبيح-এর ওপর প্রাধান্য পায়। এ জওয়াবটিও সঠিক নয়। কেননা এই কায়দা ঐ ক্ষেত্রে চলতে পারে যেখানে محرم . مبيح কোনটার তারিখ জানা না থাকে। জানা থাকলে متأخر (পরবর্তী বর্ণিত) হাদীস ترجيح পায়। খায়বরের ঘটনাটি متأخر এটা নিশ্চিত। কেননা রাসূলের (সা.) ইন্তিকাল পর্যন্ত এই অবস্থা চলতে থাকে এবং খলীফাগণও এর ওপর আমল করে যান।

হানাফী আলিমগণের ফতওয়া

উল্লেখিত রেওয়ায়াতগুলোর প্রতি নজর দিয়ে এবং উম্মত কর্তৃক সক্রিয়ভাবে এই কাজে অংশ গ্রহণ করায় হানাফী আলিমগণ সাহেবাঈনের অভিমত অনুযায়ী ফতওয়া প্রদান করেছেন। আর احاديث نهى-কে مزارعة-এর এক বিশেষ পদ্ধতি (২য় পদ্ধতি) এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মনে করেন। এও সম্ভাবনা রয়েছে যে, উল্লেখিত نهى গুলো (হারাম বুঝানোর জন্য নয়) উম্মতের ওপর করুণাবশত এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মত বিশ্লেষণ

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) একদিকে বর্গাচাষের এই পদ্ধতিকে নাজায়িয বলেন। অন্য দিকে এর বিভিন্ন প্রকারভেদ ও মাসআলা মাসায়েল বর্ণনা করেন। এতে করে একটি প্রশ্ন জাগে যে, বর্গাচাষ যদি নাজায়িযই হয় তাহলে তিনি মাসআলা বর্ণনা করতে যান কেন? আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রহ.) এর কারণ বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আজম (রহ.) অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, মানুষ আমার এই মতের ওপর আমল করতে অপারগ হবে। এজন্য তিনি মাসআলা বর্ণনা করে গেছেন যে, যদি মানুষ বর্গাচাষ করেই তাহলে মাসআলা কী হবে? কিন্তু আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, এই জওয়াবে আমার তৃপ্তি হয়নি। এ কারণে দীর্ঘ দিন যাবত গবেষণা করতেছিলাম। এক পর্যায়ে হানাফী মাযহাবের উল্লেখযোগ্য কিতাব حاوى القدسى অধ্যয়ন করে দেখতে পাই যে, এতে উল্লেখ করা হয়েছে كرهها ابوحنيفة ولم ينه عنها اشد النهى ইমাম আবূ হানীফা (র) একে মাকরূহ মনে করতেন, তবে খুব তাগিদের সাথে মানা করতেন না।

وَحِيْنَئِذٍ نَشَطَتْ مِنَ الْعُقَالِ وَثَلُجَ الصَّدْرُ وَظَهَرَ وَجْهُ التَّفْرِيْعَاتِ مَعَ الْقَوْلِ بِالْبُطْلاَنِ فَانَّهُ قَدْ نَبَّهْنَاكَ فِيْمَامَرَّ اَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يَكُوْنُ بَاطِلاً وَلاَ يَكُوْنُ مَعْصِيَةً فَلاَ بُدَّ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ اَحْكَامٌ عَلٰى تَقْدِيْرِ فَرْضِ وُقُوْعِهِ ...

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামীও (রহ.) এ ধরনের একটি কথা উল্লেখ করেছেন—

قَضٰى اَبُوْ حَنِيْفَةَ بِفَسَادِهَا بِلاَحَدٍّ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا اَشَدَّ النَّهْيِ كَمَا فِى الْحَقَائِقِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ اَنَّهُ فَرَّعَ عَلَيْهَا مَسَائِلُ كَثِيْرَةٌ ـ

"ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) একে ফাসাদ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন (হদ নির্ধারণ করা ছাড়া) তবে কঠোরভাবে নিষেধ করেননি।......

সার কথা হলো, ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) একে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন না শুধু মাত্র মাকরূহ মনে করতেন। সুতরাং এখন আর তত ইখতিলাফ থাকল না।

كتاب المساقات والمزارعة

অধ্যায় ঃ মুছাকাত ও মুযারা'আ সম্পর্কে

প্রথম আলোচনা

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ اَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ اَوْ زَرْعٍ ـ

باب مساقات-এর পরিচয় ঃ مساقات শব্দটি سقى মাদ্দা থেকে مفاعلة-এর মাসদার। শাব্দিক অর্থঃ পান করানো। আর পরিভাষায় নির্ধারিত কিছু অংশ (ربع ثلث) ইত্যাদির বিনিময়ে কাউকে বাগান প্রদান করা যাতে সে পানি ইত্যাদির মাধ্যমে গাছ-গাছালির পরিচর্যা করতে পারে। মুছাকাতকে معامله ও বলা হয়।

مزارعة হয় শস্য ক্ষেতে আর مساقات হয় গাছগাছালিতে। مساقات -এর হুকুম হানাফীদের নিকট مزارعة-এর অনুরূপ। অর্থাৎ সাহেবাঈনের মতে

এটা জায়িয আর ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) মতে নাজায়িয। বিশদ আলোচনা, আহনাফের ফতওয়া এবং আবূ হানীফার মত বিশ্লেষণ একটু পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। অবশ্য জায়িযের প্রবক্তাদের মধ্যে কিছুটা ইখতিলাফ রয়েছে। ইমাম শাফেঈর (রহ.) পরবর্তী মত (قول جديد) অনুযায়ী مساقات শুধুমাত্র খেজুর ও আঙুর বাগানে জায়িয। ইমাম আহমদের (রহ.) এক রেওয়ায়াত এরূপ। দাউদ জাহেরীর মতে এটা শুধুমাত্র খেজুরের মধ্যে জায়িয। ইমাম শাফেঈর (রহ.) পূর্বের মত, ইমাম মালেক, আহমদ সাহেবাঈন এবং জমহুর আলিমগণের মতে এটা সব ধরনের গাছেই জায়িয। নির্দিষ্ট কোন গাছের সাথে খাস নয়। অধিকাংশ শাফেঈগণ শাফেঈ (রহ.)-এর পূর্বের মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

দ্বিতীয় আলোচনা

فى رواية عن ابن عمر ... فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُقِرُّكُمْ فِيْهَا عَلٰى ذٰلِكَ مَا شِئْنَا ....

"অর্থাৎ হুযূর (সা.) খায়বর বিজয় করে ইহুদীদেরকে দেশান্তরিত করার ইচ্ছা করলে তারা হুযূরের (সা.) কাছে এই বলে আবেদন করল যে, তাদেরকে এই শর্তে এখানে থাকার অনুমতি দেওয়া হোক যে, তারা বর্গাচাষ করে উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক বাইতুল মালে প্রদান করবে। তখন হুযূর (সা.) বললেন, আমাদের যতদিন ইচ্ছা ততদিন থাকার অনুমতি দিলাম। অন্য রেওয়ায়াতে আছে— اقركم ما اقركم الله। আল্লাহ যতদিন চান ততদিন থাকার অনুমতি দিলাম। যেহেতু ইহুদীদেরকে আরব ভূখণ্ড থেকে বহিষ্কারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ছিল এজন্য হুযূর (সা.) এরূপ জওয়াব প্রদান করেছেন।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো— হুযূর (সা.) মুছাকাতের লেনদেনে কোন সময় বেধে দেননি। এরই ওপর ভিত্তি করে আহলে জাহের বলেন, مساقات সহীহ্ হওয়ার জন্য সময় নির্ধারণ করা শর্ত নয়। ইমাম আহমদের (রহ.) জাহিরী মাযহাব এটাই। কিন্তু জমহুর আলিমগণের মতে সময় নির্ধারণ করা জরুরী। অন্যথায় জায়িয হবে না। জমহুর এই হাদীসের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে থাকেন।

১। ইমাম নববী (রহ.) বলেন ইসলামের প্রাথমিক যুগে এরূপ করা জায়িয ছিল। পরবর্তীতে এ হুকুম মানসূখ হয়ে গেছে। তবে এই ব্যাখ্যা সহীহ্ নয়। কেননা মানসূখ হওয়ার কোন দলীল পাওয়া যায় না।

২। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) বলেন, এটা হুযূর (সা.) এর বিশেষ বশিষ্ট্য। যেহেতু হুযূরের (সা.) ওপর ওহি নাযিল হত এজন্য আল্লাহ্‌র ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিয়ে عقدالى اجل مجهول (অনির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত চুক্তি করা) তাঁর জন্য জায়িয ছিল। অন্যের জন্য এই হুকুম প্রযোজ্য হবে না। তবে এই জওয়াবও তেমন সুন্দর নয়।

৩। সবচেয়ে বিশুদ্ধ জওয়াব যা ইমাম নববী (রহ.) পরবর্তীতে বর্ণনা করেছেন সেটা হলো ঃ খায়বরের এই চুক্তির সময় অনির্ধারিত ছিল না। বরং হুযূর (সা.) একটি সময় বেধে দিয়েছিলেন এবং اقركم فيها على ذلك ما شئنا-এর উদ্দেশ্য হলো এই মেয়াদ শেষ হলে আমাদের ইচ্ছামত আমরা পুনরায় চুক্তিও করতে পারি অথবা এখান থেকে তোমাদেরকে বহিষ্কারও করতে পারি। বুঝা গেল যে, প্রত্যেক বছর নতুন করে চুক্তি হত। ওমর (রা.) এর খেলাফত কালে তাদেরকে এখান থেকে বহিষ্কার করা হয়।

আহনাফের প্রদত্ত ফতওয়া

আহনাফের ফতওয়া হলো مزارعة এবং مساقات-এর মধ্যে সময় নির্ধারণ করা জরুরী নয়। কেননা প্রাকৃতিকভাবে ফল ও শস্য পাকার একটি নির্ধারিত সময় থাকে। সুতরাং মওসুমে এক বার ফল বা শস্য পাকা পর্যন্ত চুক্তি করবে। এর পর যখন আরেক মওসুম এসে পড়ে এবং কেউই চুক্তি বাতিল করতে তৎপর না হয়, এদিকে চাষী আপন গতিতে চাষ শুরু করে তাহলে এসব কিছু দ্বারা বুঝা যাবে যে, আরেক মওসুমের জন্য চুক্তি করা হয়ে গেছে।

ইজারার ক্ষেত্রে একই মাসআলা। কোন ব্যক্তি যদি একমাসের জন্য ঘর ভাড়া নেয় তাহলে শুধুমাত্র একমাসের জন্যই চুক্তি সম্পাদিত হবে। মাস শেষ হওয়ার পর উভয়েই চুক্তি বাতিল করার অধিকার রাখে। কিন্তু কেউ যদি চুক্তি বাতিল না করে এবং ভাড়াটিয়া ব্যক্তি (মাসের শুরু থেকে আবার বসবাস করতে থাকে তাহলে এই মাসের জন্য নতুন করে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে বলে মনে করা হবে। এভাবে প্রত্যেক মাস চলতে থাকবে।

مزارعة-এর শর্ত উল্লেখ করতে গিয়ে ফতওয়ায়ে শামীতে বলা হয়েছে—

اَىْ مُدَّةٌ مُتَعَارَفَةٌ فَتَفْسُدُبِمَا لاَيَتَمَكَّنُ فِيْهَا مِنْهَا وَمَالاَيَعِيْشُ اِلَيْهَا اَحَدُهُمَاغَالِبًاوَقِيْلَ فِىْ بِلاَدِنَا تَصِحُّ بِلاَمُدَّةٍ وَيَقَعُ عَلٰى اَوَّلِ زَرْعٍ وَاحِدٍ وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى ـ

অর্থাৎ মুযারা'আতের জন্য সময় নির্ধারণের প্রচলিত যে পদ্ধতি রয়েছে এটাই যথেষ্ট। সুতরাং যেখানে প্রচলিত কোন সময় নির্ধারণ করা থাকে না কিংবা এমন সময় নিয়ে চুক্তি করা হয় যাতে সাধারণত কেউ চুক্তি করে না তাহলে এগুলো দ্বারা চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। একথাও বলা হয়েছে যে, আমাদের দেশে সময় নির্ধারণ করা ছাড়াও চুক্তি হতে পারে। তবে চুক্তির মেয়াদ ধরতে হবে প্রথম ফসল উৎপন্ন হওয়া পর্যন্ত। ফতওয়া এরই ওপর।

ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে—সময় নির্ধারণ করা ছাড়াও এসবের চুক্তি করা যেতে পারে। তবে প্রথম যে ফসল উৎপন্ন হবে সে সময় পর্যন্ত চুক্তি হয়েছে বলে মনে করতে হবে। ফকীহ (আবূ লাইছ) এমতকেই সমর্থন করেছেন এবং ফতওয়া এরই ওপর।

مساقات অধ্যায়ে বলা হয়েছে—

بَيَانُ الْمُدَّةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ اِسْتِحْسَانًا لِلْعِلْمِ بِوَقْتِهِ عَادَةً لاَنَّ الثَّمَرَةَ لاِدْرَاكِهَا وَقْتٌ مَعْلُوْمٌ قَلَّمَا يَتَفَاوَتُ.

“মুছাকাতের জন্য সময় নির্ধারণ করা জরুরী নয়। এর স্বাভাবিক একটা সময় সবারই জানা থাকে। কেননা ফল পাকার একটি নির্দিষ্ট সময় আছে খুব কমই এর মধ্যে তারতম্য হয়।

সার কথা হলো ফসল ও ফল পাকার সময় যেহেতু এক প্রকার নির্ধারিতই এজন্য সময় নির্ধারণ করা ছাড়াও মুছাকাত ও মুযারা'আর চুক্তি করা জায়িয।

باب فضل الغرس والزرع

অধ্যায় ঃ ফসল ও বৃক্ষ রোপণের ফযীলত সম্পর্কে

عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اَللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اِلاَّ كَانَ مَا اُكِلَ مِنْهُ صَدَقَةً وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا اَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلاَ يَرْزَؤُهُ اَحَدٌ اِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ.

হাদীসের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা নিম্নরূপ ঃ

১। ما اكل منه صدقة অর্থাৎ কোন মুসলমান যদি বৃক্ষ রোপন করে সেই বৃক্ষের যে ফল খাওয়া হয় এর কারণে সে সদকার সওয়াব লাভ করে।

এই হাদীসের ভিত্তিতে হাকীমুল উম্মাহ আশরাফ আলী থানভী (রহ.) মাসআলা বের করেছেন যে, যে ব্যক্তি কোন নেককাজের 'মাধ্যম' হয় যার দ্বারা অন্যেরা লাভবান হয় সে এর দ্বারা সওয়াবের ভাগী হবে। যদিও সে সওয়াবের নিয়তে করেনি।

হ্যাঁ انما الاعمال بالنيات সে সব আমলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেগুলো اعمال اختيارى, এগুলোতে সওয়াব হাসিল করতে হলে নিয়ত লাগবে। কিন্তু নেক কাজের মাধ্যম হওয়ার জন্য নিয়ত জরুরী নয়। মোট কথা সৃষ্টি জীবের কল্যাণের নিয়তে যে ব্যক্তি বৃক্ষ রোপন করবে সে তাৎক্ষণিকভাবে সওয়াবের অধিকারী হবে। এরপর কোন মাখলুক যখন এর দ্বারা উপকৃত হবে তখন আলাদা সওয়াব লাভ হবে।

যদি মাখলুকের কল্যাণ সাধনের নিয়তে গাছ না লাগায় তাহলে তাৎক্ষনিক সওয়াব পাবে না। তবে যখন মাখলুক এর দ্বারা লাভবান হবে তখন সওয়াব লাভ করবে। কেননা সেই তো এই লাভবান হওয়ার মাধ্যম হয়েছে। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) একথা বলেছেন যে, গাছ লাগালেই রোপনকারী সওয়াবের অধিকারী হবে, যদিও সে সওয়াবের নিয়ত না করে।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেছেন—স্থায়ীভাবে সে এর সওয়াব ও প্রতিদান পেতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত লোকেরা এ থেকে উপকৃত হবে। যদিও রোপনকারী বা ফসল উৎপন্নকারী মারা যায়। এমনিভাবে গাছের মালিকানা হস্তান্তর হলেও পূর্বের মালিক সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে না।

ইমাম নববী (রহ.) বলেছেন, ঐ গাছ ও শস্য থেকে আরেক গাছ ও আরেক শস্য উৎপন্ন হবে। এভাবে সে কেয়ামত পর্যন্ত সওয়াব পেতেই থাকবে।

২। ولا يرزؤه احد الا كان له صدقة "কেউ যদি এ থেকে কমিয়ে দেয় তাহলে সেও সদকার সওয়াব লাভ করবে। يرزؤ শব্দটির মূল ধাতু (مادة) হলো رزء অর্থ, কমিয়ে দেওয়া, ত্রুটি সাধন করা, লোকসান হওয়া। হাদীসের উদ্দেশ্য হলো যদি ফলের ত্রুটি সাধন হয় তথাপি সে সওয়াবের অধিকারী হবে। সম্ভবত এখানে লোকসান বলতে চুরি ছাড়া অন্য কোনভাবে লোকসান হওয়া উদ্দেশ্য। কেননা চুরির কথা তো আলাদা করেই বলা হয়েছে। এটা মূলত تعميم بعد التخصيص। তথা খাসভাবে একটি বিষয় উপস্থাপন করার পর আমভাবে সেটাকে উপস্থাপন করা। মোটকথা যে ভাবেই ফলের ক্ষতিসাধন হোকনা কেন এর দ্বারা সে সওয়াব লাভ করবে।

৩। হাদীসে ما من مسلم يغرس الخ বাক্য উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে مسلم শব্দটি نكرة এবং একে উল্লেখ করা হয়েছে نفی -এর পর। আর نكرة تحت النفی ব্যাপকতার (عموميت)-এর ফায়দা প্রদান করে। এর সাথে من-কে استغراقية হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এদিকে অন্য রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে—فيأكل منه انسان ولا دابة ولا شئ সুতরাং এ রেওয়ায়াতকেও عام হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এসব কিছুর উদ্দেশ্য একটাই। তাহলো, একথা বুঝানো যে, যে কোন মুসলমান চাই সে গোলাম হোক বা আযাদ, নেককার হোক বা বদকার এমন কোন কাজ করে যার দ্বারা সৃষ্টি জীব চাই মানুষ হোক বা অন্য কোন প্রাণী উপকৃত হয় তাহলে সে সওয়াব ও প্রতিদান লাভ করবে।

দ্বিতীয় কথা হলো ঃ হাদীসে مسلم শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। যার দ্বারা বুঝা যায় যে, এই সওয়াব শুধু মাত্র মুসলমানের সাথে খাস। কোন কাফির এই সওয়াবের অধিকারী হবে না। মুসনাদে আহমদের এক রেওয়ায়াতে ما من رجل এবং অন্য আরেক রেওয়ায়াতে ما من عبد শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। যার দ্বারা বাহ্যিকভাবে একথা বুঝা যায় যে, কাফিররাও সওয়াবের অধিকারী হবে। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) এসব مطلق রেওয়ায়াতকে مقيد হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ عبد رجل আম শব্দ উল্লেখ করা হলেও উদ্দেশ্য খাস তথা মুসলমান।

কেননা এই অধ্যায়ে উম্মে মুবাশ্‌শির (রা.) এর আরেক রেওয়ায়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। একদা হুযূর (সা.) তাঁর বাগানে তাশরীফ আনেন এবং একটি খেজুর গাছকে লক্ষ্য করে বলেন, من غرس هذا النخل ؟ امسلم ام كافر ؟ কে এই গাছ রোপণ করেছে? মুসলমান নাকি কাফির? উত্তরে তিনি বললেন—'মুসলমান'। তখন রাসূল (সা.) বললেন— لا يغرس مسلم غرسا الخ। রাসূল (সা.) এর এই প্রশ্ন ভঙ্গি দ্বারা বুঝা যায় যে, সওয়াব পাওয়ার জন্য মুসলমান হওয়া জরুরী।

কিন্তু কতক লোকের ধারণা হাদীসকে ব্যাপকতার ওপরেই বহাল রাখা উচিত। সে হিসেবে মুসলমান কাফির সবাই সওয়াব লাভ করবে। তবে কাফির সওয়াব পাবে মানে দুনিয়াতে তার রুযি রোজগারে প্রাচুর্য্য দেখা দিবে।

বিপদ-আপদ থেকে রেহাই পাবে। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, সওয়াব প্রদানের এই পদ্ধতিরও সম্ভাবনা আছে যে, আখেরাতে জাহান্নামের শাস্তি কিছুটা লাঘব করা হবে। والله اعلم

চাষাবাদের ফযীলত

এই হাদীসে চাষাবাদ করার ফযীলতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য হাদীস দ্বারাও এর ফযীলতের কথা জানা যায়। যেমন—এক হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি নিজের পরিবার পরিজনের হক আদায় করার জন্য চাষাবাদ করবে সে ১৪ তারিখের পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় ঝলমলে চেহারা নিয়ে আল্লাহ্র সাথে মোলাকাত করবে। অন্য রেওয়ায়াতে আছে, তোমাদের কারো হাতে খেজুরের চারা থাকা অবস্থায় যদি কেয়ামত কায়েম হয়ে যায় তাহলে সে যেন চারাটি রোপণ করে যায়।

অবশ্য কতক রেওয়ায়াতে চাষাবাদকারীদের নিন্দাবাদ করা হয়েছে। যেমন—আবূ উমামার (রা.) রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে—

قَالَ سَمِعَتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يَدْخُلُ هٰذَا (يَعْنِىْ اٰلَةَ الْحَرْثِ) بَيْتَ قَوْمٍ اِلاَّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الذُّلَّ ـ

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যে ঘরে কৃষিকাজের সরঞ্জাম প্রবেশ করে, সে ঘরে আল্লাহ পাক লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেন।" পূর্বের হাদীসের সাথে বিরোধপূর্ণ এই হাদীসের দ্বন্দ্ব সমাধানের জন্য আলিমগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

১। চাষাবাদ তো ভালোই। কিন্তু জিহাদের পথে যদি অন্তরায় হয় তাহলে নিন্দাযোগ্য।

২। কিষাণরা সাধারণত বুযদিল ও দুর্বলচিত্তের অধিকারী হয়ে থাকে, যা তাদের লাঞ্ছনার কারণ হয়ে দাড়ায়।

৩। কৃষকদের থেকে সরকারি কর্মকর্তারা হুমকি ধামকি দিয়ে জমিনের হক (উশর ইত্যাদি) আদায় করে থাকে। বাস্তব এই অবস্থার প্রতি হাদীসে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

৪। কৃষি কাজে লিপ্ত থাকার কারণে নিজেদের দুশমন কাফিরের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে পিছে থাকতে হয়। আর জিহাদ থেকে দূরে থাকাই লাঞ্ছনার কারণ।

৫। আল্লামা কুরতবী (রহ.) বলেন—প্রয়োজনের তাগিদে অথবা মুসলমানের কল্যাণ সাধন করে সওয়াব লাভের আশায় কৃষি কাজ করা প্রশংসনীয় বটে কিন্তু

শুধুমাত্র সম্পদ বাড়ানোর জন্য যা দ্বীন থেকে মানুষকে গাফেল করে দেয় তা অবশ্যই নিন্দনীয়। তবে এটা শুধুমাত্র কৃষিকাজের সাথে খাস নয় বরং দুনিয়ার যাবতীয় পেশা ও ধনসম্পদের জন্যই একথা প্রযোজ্য যে, যদি শুধুমাত্র প্রয়োজন পূরণের জন্য কাজে নিয়োজিত হয় তাহলে তা মুবাহ, যদি ইবাদতে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য করে তাহলে انما الاعمال بالنيات-এর ভিত্তিতে সওয়াব ও প্রতিদানের অধিকারী হবে। যদি নিজের প্রয়োজন না থাকে কিন্তু মুসলমানের উপকার করার লক্ষ্যে কাজে আত্মনিয়োগ করে তাহলেও সওয়াব পাবে। পক্ষান্তরে যদি সম্পদের মহব্বত ও একে গুরুত্ব দিতে গিয়ে কাজে মশগুল হয়ে পড়ে অথবা গর্ব-অহংকারের বশবর্তী হয়ে সম্পদ অর্জন করে অথবা সম্পদ অর্জনের পিছনে ওভাবে লিপ্ত থাকে যে, এর কারণে আল্লাহর হুকুম আদায় করা অসম্ভব হয় তাহলে এসব কিছু তার জন্য দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কোন্ পেশা উত্তম

কোন পেশা উত্তম এ ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, কৃষিকাজ সবচেয়ে উত্তম পেশা, কেউ বলেন, শিল্প কর্ম উত্তম পেশা, কেউ বলেন ব্যবসা উত্তম পেশা।

অধিকাংশ হাদীস كسب باليد তথা শিল্পকে উত্তম পেশা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) বলেন—শিল্প ও কারিগরির মাধ্যমে উপার্জিত মালের মধ্যে সন্দেহজনক কোন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটে না বলে এটা সবচেয়ে হালাল উপার্জনের মাধ্যম (পেশা)। অন্যান্য পেশাও জনসাধারণের কল্যাণ বয়ে আনে বলে সেগুলোও উত্তম।

ইমাম নববী (রহ.) বলেন—সবচেয়ে উত্তম পেশা শিল্প একথা ঠিক। কেননা এর সমর্থনে হুযূর (সা.) এর বহু হাদীস রয়েছে। মুস্তাদরাকে হাকিমে আবূ বুরদার (রা.) হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে—

سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ ؛ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهٖ وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبْرُوْرٍ -

"রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো কোন উপার্জন (পেশা) সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন—মানুষের নিজ হাতে উপার্জিত (শিল্পের মাধ্যমে) মাল সবচেয়ে উত্তম এবং প্রত্যেক সহীহ্ بيع-এর উপার্জন উত্তম।"

তবে কোন ব্যক্তি যদি নিজ হাতে কৃষি কাজ করে তাহলে এটা عمل اليد এর মধ্যে গণ্য হবে এবং সবচেয়ে উত্তম পেশা বলে বিবেচিত হবে।

"বিশুদ্ধতম মত সেটাই যার ব্যাপারে রাসূল (সা.) সুস্পষ্টভাবে বলে গিয়েছেন তথা عمل اليد । কৃষিকাজ হাতের কামাই (عمل اليد) হওয়ার কারণে এটিই সবচেয়ে উত্তম পেশা। কেননা এতে তাওয়াক্কুলের ওপর জোর দেওয়া হয়ে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠত্বের এই ভিত্তি নির্ভর করে মানুষের প্রয়োজনের ভিন্নতার ওপর। সুতরাং যেখানে চাষাবাদের বেশি প্রয়োজন সেখানে চাষাবাদ করা উত্তম। যেখানে ব্যবসার প্রয়োজন সেখানে ব্যবসা উত্তম এবং যেখানে শিল্প কর্মের প্রতি মানুষ মুহতাজ সেখানে শিল্পকর্ম উত্তম।

৬। فِىْ رِوَايَةِ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلٰى اُمِّ مُبَشِّرٍ الْاَنْصَارِيَّةِ فِىْ نَخْلٍ لَهَا الخ আলোচ্য রেওয়ায়াতে ام معبد-এর নাম এসেছে। কিন্তু এক রেওয়ায়াতে ام معبد। আবার কিছু রেওয়ায়াতে ام مبشر او ام معبد উল্লেখ করা হয়েছে। কোন রেওয়ায়াতে امرأة زيد بن حارثة শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মহিলা একজনই। তিনি যায়েদ ইবনে হারিছার (রা.) স্ত্রী। তাঁর কুনিয়াত ছিল দু'টি। উম্মে মা'বাদ এবং উম্মে মুবাশ্‌শির। অতএব এখানে কোন ইখতিলাফ নেই।

باب وضع الجوائح

অধ্যায় ঃ ক্ষতিগ্রস্থ ফলের মূল্য

কমানো/মওকুফ করা

جوائح শব্দটি جائحة-এর বহুবচন। ফলের ওপর যে দুর্যোগ এসে ফলকে নষ্ট করে দেয় তাকে جائحة বলে। وضع الجوائح দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বিক্রেতা কর্তৃক দুর্যোগ কবলিত ফলের মূল্য মওকুফ করে দেওয়া। এ ব্যাপারে হুযূরের (সা.) একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন—

عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ بِعْتَ مِنْ اَخِيْكَ ثَمَرًا فَاصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ اَنْ تَاْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا ، بِمَ تَاْخُذُ مَالَ اَخِيْكَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؟

"যদি তুমি তোমার মুসলমান ভাইয়ের কাছে ফল বিক্রি কর, অতঃপর উহা দুর্যোগ কবলিত হয়ে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তোমার জন্য মূল্য গ্রহণ করা হালাল হবে না। কীভাবে তুমি তোমার মুসলমান ভাইয়ের সম্পদকে অবৈধভাবে গ্রহণ করবে?

এখানে মাসআলা হলো ঃ কেউ যদি গাছে থাকা অবস্থায় ফল বিক্রি করে এবং ফল দুর্যোগ কবলিত হয় তাহলে ফলের ক্ষতিপূরণ কে বহন করবে? ক্রেতা না বিক্রেতা? মাসআলা জানতে হলে بيع-এর পদ্ধতিগুলো জানতে হবে। যথা ঃ

১। গাছে রেখে দেওয়ার শর্তে যদি পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে ফল বিক্রি করা হয় এবং এরপর ফল দুর্যোগ কবলিত হয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে বিক্রেতা এই ক্ষতির দায়ভার বহন করবে, ক্রেতার কাছে মূল্য তলব করা যাবে না। কেননা সর্বসম্মতিক্রমে এই بيع ফাসিদ বলে বিবেচিত।

২। কেটে নেওয়ার শর্তে বিক্রয় করা চাই পরিপক্ক হওয়ার পরে হোক কিংবা পূর্বে। কিন্তু বিক্রেতা ক্রেতার হাওলা করে দেয়নি। আর ক্রেতাও তা হস্তগত করেনি এমতাবস্থায় ফল দুর্যোগ কবলিত হয়েছে। এক্ষেত্রেও সর্বসম্মতিক্রমে বিক্রেতার ওপর ক্ষতিপূরণ বর্তাবে।

হ্যাঁ ক্রেতার যিম্মায় দেওয়ার পর যদি দুর্যোগ দেখা দেয় (এবং শর্ত ছিল কেটে নেওয়ার) অথচ সে কেটে নেয়নি, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে ক্রেতা এক্ষেত্রে ক্ষতিভার বহন করতে বাধ্য থাকবে।

৩। পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে বা পরে বিক্রি করা হয়েছে কিন্তু যখন কাটার সময় হয়েছে তখন ফলে আপদ (দুর্যোগ) দেখা দিয়েছে এক্ষেত্রেও সর্বসম্মতিক্রমে ক্রেতার ওপর ক্ষতিপূরণ (ضمان) বর্তাবে, বিক্রেতা ক্রেতার কাছে মূল্য তলব করতে পারবে।

৪। পরিপক্ক হওয়ার পর কাটার শর্ত ছাড়া বিক্রি করা হয়েছে এবং বিক্রেতা ক্রেতার যিম্মায় বুঝিয়ে দিয়েছে, এর পরে ফলে দুর্যোগ দেখা দিয়েছে এক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ কার ওপর বর্তাবে এ নিয়ে আলিমগণের মধ্যে ইখতিলাফ রয়েছে।

১। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এবং ইমাম শাফেঈর قول جديد অনুযায়ী مطلق (বিনাশর্তে) এর ক্ষতিপূরণ আসবে ক্রেতার ওপর। সে পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে।

২। ইমাম মালেক (রহ.) বলেন যদি এক-তৃতীয়াংশের কম নষ্ট হয় তাহলে ক্রেতা এর ক্ষতিপূরণ বহন করবে আর এক-তৃতীয়াংশ বা এরচেয়ে বেশি হলে বিক্রেতাকে এর ক্ষতি বহন করতে হবে।

৩। ইমাম আহমদের (রহ.) মতে যে পরিমাণই ক্ষতিগ্রস্থ হোক না কেন বিক্রেতাকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। হ্যাঁ, ক্ষতির পরিমাণ যদি এত কম হয় যে, আদতে একে ক্ষতি মনে করা হয় না, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা, ক্রেতা এর দায়ভার বহন করবে।

দলীল সমূহ

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) এই অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। যাতে উল্লেখ রয়েছে—

فَاصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَايَحِلُّ لَكَ اَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا ـ

হাদীসে হুযূর (সা.) কম বেশির কোন প্রকার তারতম্য করা ছাড়াই মূল্য গ্রহণ করতে বারণ করেছেন। ইমাম মালেক (রহ.) একই হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। অবশ্য এক-তৃতীয়াংশকে কমের মধ্যে ধরে استثناء করেছেন। কেননা শরীয়তের বহু জায়গায় ثلث-এর اعتبار করা হয়েছে। যেমন— ওয়াসিয়্যাত, অসুস্থ ব্যক্তিকে দান ইত্যাদি।

আহনাফ ও শাওয়াফে'র দলীল

(١) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اُصِيْبَ رَجُلٌ فِىْ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ ثِمَارٍ اَبْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوْا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذٰلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغُرَمَائِهِ خُذُوْا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ اِلاَّ ذٰلِكَ ـ

"হুযূরের (সা.) যুগে এক ব্যক্তি ক্রয়কৃত ফল দুর্যোগ কবলিত হওয়ার কারণে ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ে। রাসূল (সা.) সদকা করতে উদ্বুদ্ধ করলে সাহাবাগণ তাকে সদকা প্রদান করেন। কিন্তু এই সদকা তার ঋণের তুলনায় নগন্য বলে প্রমাণিত হয়। তখন রাসূল (সা.) ঋণদাতাদের বললেন যা হয়েছে তাই গ্রহণ কর এর চেয়ে বেশি পাবে না।"

ইমাম ত্বহাভী (রহ.) এভাবে দলীল পেশ করেন যে, হুযূর (সা.) ঋণদাতাদের অল্প অল্প করে ঋণ পরিশোধ করেন অথচ বিক্রেতার কাছ থেকে

মূল্য ফিরিয়ে নেননি। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, ক্রেতার হাতে কোনকিছু নষ্ট হলে সেই এর দায়ভার বহন করবে বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফিরিয়ে নেয়া যাবে না।

অবশ্য বর্ণিত হাদীসে কোন ধরনের দুর্যোগের কারণে ফল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা জানা যায়নি। আসমানী দুর্যোগ না ফল কাটার পর ব্যবসা করতে গিয়ে ক্ষতির সম্মুখীন তা জানা যায় নি। ব্যবসা করতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হলে হাদীসটি তখন দলীল হবে না।

(٢) عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِبْتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائِطٍ فِيْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَجَهُ وَقَامَ فِيْهِ حَتّٰى تَبَيَّنَ لَهُ النُّقْصَانُ فَسَأَلَ رَبَّ الْحَائِطِ اَنْ يَضَعَ لَهُ اَوْ اَنْ يُّقِيْلَهُ فَحَلَفَ اَنْ لاَ يَفْعَلَ فَذَهَبَتْ اُمُّ الْمُشْتَرِيْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَاَلّٰى اَنْ لاَيَفْعَلَ خَيْرًا وَفِيْ رِوَايَةٍ ـ اَيْنَ الْمُتَاَلِّيْ عَلَى اللّٰهِ لاَ يَفْعَلُ الْمَعْرُوْفَ ـ

আলোচ্য হাদীসে দেখা যাচ্ছে যে, হুযূর (সা.) একটি ভাল কাজ (মূল্য কমানো বা اقالة بيع) না করার প্রতিজ্ঞা করায় তাকে ভর্ৎসনা করেছেন কিন্তু মূল্য কমানো (وضع الجائحة) এর জন্য বাধ্য করেন নি। যদি মূল্য কমানো ওয়াজিব হত তাহলে রাসূল (সা.) তাকে অবশ্যই এ কাজে বাধ্য করতেন।

৩। আহনাফ ও শাওয়াফে'র মত اصول-এর পূর্ণ موافق কেননা বিক্রেতা যখন مبيع ক্রেতার যিম্মায় অর্পণ করে দেয় তখন এর যাবতীয় দায়দায়িত্ব ক্রেতার ওপর বর্তায়। তখন যদি কোন ক্ষতি হয় তাহলে ক্রেতার যাবে। ফল ছাড়া অন্যান্য বস্তু ক্ষতিগ্রস্থ হলে আহমদ ও মালেকীগণ বলেন যে, এ ক্ষেত্রে ক্রেতার ওপরই ক্ষতির দায়ভার চাপবে। যদি তাই হয় তাহলে ফলের হুকুমও এরূপই হওয়া উচিত।

হাদীসের জওয়াব

আহনাফ ও শাওয়াফে'র মতে হাদীসটি ঐ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন ফল প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে বিক্রয় করা হবে, অথবা গাছে রেখে দেওয়ার শর্তে বিক্রি করা

(بيع قبل بدو الصلاح بشرط الترك) হবে অথবা ঐ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে ক্ষেত্রে ক্রেতা হস্তগত করার আগেই ফল নষ্ট হয়ে যায়।

এই অধ্যায়ে হযরত জাবের (রা.) কর্তৃক একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যাতে মতলক ভাবে মূল্য কমানোর নির্দেশ দিয়েছেন। এর তিনটি ব্যাখ্যা হতে পারে।

১। মূল্য বাতিল বা কমানোর নির্দেশটি ওয়াজিব হিসেবে নয় বরং মুস্তাহাব হিসেবে এসেছে।

২। ওয়াজিব হিসেবেই এই নির্দেশ এসেছে ঠিক কিন্তু হুকুমটি ঐ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে ক্ষেত্রে ক্রেতা কর্তৃক ফল কব্জা করার পূর্বেই তা নষ্ট হয়ে যায়।

৩। ইমাম ত্বহাভী (রহ.) বলেন—এখানে وضع جوائح দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ক্ষতিগ্রস্থ ফলের ট্যাক্স আদায় না করা। সুতরাং আমাদের আলোচনার সাথে এর কোন সংশ্লিষ্টতা নেই।

باب استحباب الوضع من الدين

অধ্যায় ঃ ঋণ মওকুফ করা মুস্তাহাব

وضع من الدين তথা ঋণীব্যক্তির পূর্ণ ঋণ অথবা কিছু ঋণ মাফ করে দেয়া মুস্তাহাব।

এই অধ্যায়ের প্রথম রেওয়ায়াতের এক রাবী ابورجال। (অর্থাৎ পুরুষগণের বাপ)। এটি তাঁর উপাধি। তাঁর দশজন পুত্রসন্তান ছিল কোন মেয়ে ছিল না।

তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে হারিছা ইবনে নো'মান। তাঁর দাদা হারিছা (রা.) বদরী সাহাবী ছিলেন। আবূ রিজালের কুনিয়াত আবূ আব্দুর রহমান। তিনি ছেকাহ নির্ভরযোগ্য রাবী।

المتالى على الله। -এর অর্থ কসমের মধ্যে বাড়াবাড়ি করা। শব্দটি اَلِيَّةٌ থেকে উদগত (মুশতাক হয়েছে) এর অর্থ কসম খাওয়া।

باب من ادرك ما باعه عند المشترى وقد افلس

অধ্যায় ঃ নিঃস্ব হয়ে যাওয়া ক্রেতার কাছে প্রাপ্ত বিক্রিত বস্তুর অবশিষ্টাংশের হুকুম

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ اَوْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ اَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ اَفْلَسَ اَوْ اِنْسَانٍ قَدْ اَفْلَسَ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ـ

"যে ব্যক্তি নিঃস্ব হয়ে যাওয়া লোকের কাছে নিজের মাল পেল, সেই এই মাল লাভের ব্যাপারে অন্যের তুলনায় বেশি হকদার।"

১। (افلس ـ فلوس থেকে)। فلوس বলা হয় পয়সাকে। باب افعال থেকে افلاس-এর অর্থ পয়সা না থাকা। همزة ـ سلب مأخذ এ باب افعال (মূল অর্থের পুরো বিপরীত অর্থের) জন্য প্রয়োগ হয়।

আল্লামা যরকানী (রহ.) বলেন—

يُقَالُ : اَفْلَسَ الرَّجُلُ كَاَنَّهُ صَارَ اِلٰى حَالٍ لَيْسَ عِنْدَهُ فُلُوْسٌ ـ

কেউ কেউ বলেন— همزة বর্ণটি "এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়া" বুঝায়। সে হিসেবে مفلس ঐ ব্যক্তি যে দীনার দিরহামের মালিক হওয়ার পর এখন শুধু فلوس তথা পয়সার মালিক রয়ে গেছে। বহুবচন مفاليس। ফকীহগণের পরিভাষায় مفلس বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যার ঋণ সম্পদের চেয়ে বেশি এবং খরচ আমদানীর চেয়ে অধিক।

যেহেতু তার মাল ঋণ পরিশোধের জন্য খরচ করা ওয়াজিব এজন্য সে যেন প্রকৃতই নিঃস্ব (مفلس)।

উদাহরণ স্বরূপ ঃ হুযূর (সা.) বলেন, مفلس ঐ ব্যক্তি যে কেয়ামতের দিন আমলের পাহাড় নিয়ে উঠবে কিন্তু দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় কাউকে চড় দিয়েছিল, কারও প্রতি জুলুম করেছিল, কারও ইজ্জতের ওপর হামলা করেছিল এসব নির্যাতিত লোকেরা তার সওয়াব নিয়ে যাবে, সওয়াব শেষ হলে নিজেদের গুনাহ চাপিয়ে দিবে এভাবে সে নেকির পাহাড় থাকা সত্ত্বেও নিঃস্ব হয়ে যাবে। —মুসলিম

এই হাদীসে নেকির পাহাড় থাকা সত্ত্বেও পরিণামে অসহায় হওয়ার কারণে যেভাবে এই ব্যক্তিকে আখেরাতের مفلس বলা হয়েছে ঠিক তদ্রূপ দুনিয়ার مفلس ঐ ব্যক্তি যার কাছে সম্পদ তো আছে কিন্তু তা ঋণ পরিশোধে ব্যয় করতে হবে (واجب الصرف)। সুতরাং সেও এক প্রকার مفلس (فكانه لا مال له)

২। এখানে মতবিরোধ পূর্ণ একটি মাসআলা রয়েছে। মাসআলাটি হলো ঃ ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে কোন কিছু ক্রয় করে মূল্য পরিশোধ করার আগেই

ـم হয়ে গেছে। এদিকে সে অন্যান্য ব্যক্তির কাছেও ঋণী। مبيع (বিক্রিত ও তার হাতে রয়েছে। এ অবস্থায় কী হবে? শুধু বিক্রেতাই ঐ مبيع-এর ার হবে নাকি অন্যান্য ঋণদাতারাও এতে অংশীদার হবে এ সম্পর্কে মতভেদ হ।

১। ائمة ثلاثة বলেন শুধুমাত্র বিক্রেতা ঐ مبيع-এর হকদার হবে। এ র পক্ষে হযরত উরওয়া, ইমাম আউযাঈ, ইমাম ইসহাক, ইমাম আবূ সাউর, ম ইবনুল মুনযির প্রমুখ ইমামগণ রয়েছেন। আল্লামা ইবনে কুদামা তাঁর ্য গ্রন্থ মুগনীতে كتاب المعلس অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।

২। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে বিক্রেতাসহ সকল ঋণদাতা ব্যক্তি ন অংশীদার হবে। ঐ বস্তু বিক্রি করে পরিমাণ মত সবার ঋণ পরিশোধ তে হবে। শুধুমাত্র বিক্রেতাকে দেয়া যাবে না। এ মতে রয়েছেন ইমাম ন, ইমাম নাখয়ী, ইমাম শা'বী, ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম র প্রমুখ মনীষীগণ। তাঁর এ মাযহাব উমদাতুলকারীতে বর্ণিত আছে।

দলীলসমূহ

প্রথম মাযহাবের অনুসারীগণ حديث الباب দ্বারা দলীল পেশ করে বলেন—

من ادرك ماله بعينه عند رجل قدافلس اوانسان قدافلس فهواحق به من غـ

া বিক্রিত বস্তুর কথা বলা হয়েছে। আবূ হুরাইরা (রা.)-এর এক হাদীসে থার সমর্থন মেলে। এতে রয়েছে انه لصاحبه الذى باعه

আহনাফের দলীল হলো ঃ বিক্রি করে দেয়ার কারণে مبيع বিক্রেতার লকানা থেকে বের হয়ে গেছে। তবে মূল্য পরিশোধ না করা পর্যন্ত একে টকে রাখার অনুমতি ছিল। কিন্তু যখন مبيع-কে সে ক্রেতার হাতে সোপর্দ র দিয়েছে তখন সব ধরনের অধিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে। এখন ক্রেতা এর লক হয়ে যাওয়ায় মূল্য পরিশোধ করা তার ওপর ওয়াজিব হয়ে গেছে। ক্রেতা ক্ষত্রে বিক্রেতার কাছে ঋণী হয়ে থাকল। অতএব ঋণদাতা হিসেবে সে ্যান্যদের বরাবর। হযরত আলী (রা.)-এর আছর (اثر) এই মতের সমর্থক। নি বলেন—

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ هُوَ فِيْهَا اُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ اِذَا وَجَدَ هَابِعَيْنِهَا ـ

"হুবহু সেই জিনিস পেলেও সে অন্যান্য ঋণদাতাদের সমান হকদার হবে।"

এমনিভাবে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) বলেন—

اِنَّ مَنِ اقْتَضٰى مِنْ ثَمَنِ سِلْعَتِهٖ شَيْئًا ثُمَّ اَفْلَسَ الْمُشْتَرِىْ فَهُوَ وَالْغُرَمَاءُ فِيْهِ سَوَاءٌ ـ

"যে ব্যক্তি তার নিজস্ব বিক্রিত বস্তুর মূল্য তলব করার পর দেখতে পায় ক্রেতা মুফলিছ হয়ে গেছে তাহলে বিক্রেতা ও অন্যান্য ঋণদাতারা সেই বস্তুর মধ্যে সমান অংশীদার হবে।"

হাদীসের জওয়াব

আহনাফ ائمه ثلاثه-এর পেশকৃত হাদীসটিকে ছিনতাইকৃত মাল, আমানতস্বরূপ রাখা মাল ধার নেয়া মাল ক্রয়ের ভাও করা হচ্ছে এমন মালের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকেন। এসব মাল এবং ক্রেতা যে মাল ক্রয়ের ভাও করতে গিয়ে গ্রহণ করেছে, এখনও بيع সম্পন্ন করেনি সেসব ক্ষেত্রে অন্যান্য ঋণদাতারা দাবি করতে পারবে না, প্রকৃত মালিক যে সেই এর হকদার হবে। আমাদের এই ব্যাখ্যার স্বপক্ষে দু'টি দলীল রয়েছে।

(١) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا ضَاعَ لِاَحَدِكُمْ مَتَاعٌ اَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ فَوَجَدَهٗ فِىْ يَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهٖ فَهُوَ اَحَقُّ بِهٖ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِىْ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ ـ

এই হাদীসে বলা হয়েছে চুরিকৃত মাল যদি কারো কাছে পাওয়া যায় তাহলে এর প্রকৃত মালিকই এর বেশি হকদার বলে গণ্য হবে। এই হাদীস এবং حديث الباب-এর যোগসূত্র কিন্তু একই। তবে حديث الباب ـ مختصر তথা বিশ্লেষণমুক্ত আর حديث ثمرة বিশ্লেষণ কৃত তথা مفصل । সুতরাং مختصر-কে مفصل-এর ওপর প্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত হবে।

২। حديث الباب-এ বর্ণিত من ادرك ماله بعينه বাক্যটিতে বুঝার বিষয় হলো এখানে ماله শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। এর প্রকৃত অর্থ এটাই যে, সে মালের মালিক রয়ে গেছে। আর এটা غصب ، عاريت ، وديعت ،

مقبوض على سوم الشراء ইত্যাদি মালের মধ্যেই হওয়া সম্ভব (যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি)। بيع-এর মধ্যে এরূপ হতে পারে না। কেননা ক্রেতা হস্তগত করার ফলে বিক্রেতার মালিকানা খতম হয়ে গেছে। সাথে একথাও মনে রাখতে হবে যে, মালিকানা পরিবর্তন হওয়ার দরুন হুকুমের দিক বিবেচনায় মালও পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন— هى لك صدقة ولنا هدية

অবশ্য এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, এই অধ্যায়ের এক রেওয়ায়াতে (حدثنا ابن عمر ... حدثنى ابن ابى حسين) সুস্পষ্টভাবে بيع-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে— انه لصاحبه الذى باعه। এছাড়া অনেক রেওয়ায়াতে بيع-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১। এর জবাবে বলা হয় যে, যে সব হাদীসে بيع-এর কথা উল্লেখ নেই সেগুলো বিশুদ্ধ محوظ রেওয়ায়াত। কেননা আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে ৬ জন রাবী রেওয়ায়াত করেছেন। যথা ঃ (১) আবূ বকর ইবনে আব্দুর রহমান (২) হিশাম মাখযূমী (৩) বাশীর ইবনে নাহয়ান (৪) ইরাক (৫) আবূ সালমা এবং (৬) ওমর ইবনে খালদাহ।

এঁদের মধ্যে প্রথম ৪ জন রাবীর রেওয়ায়াতে بيع-এর কথা উল্লেখ নেই। আর অপর দু'জনের রেওয়ায়াত বিরোধপূর্ণ। এঁদের থেকে রেওয়ায়াতকারী রাবীর অনেকে بيع উল্লেখ করেছেন আবার অনেকে করেননি। অতএব মতবিরোধপূর্ণ রেওয়ায়াত (مختلف فيه) এর ওপর متفق عليه রেওয়ায়াতকে ترجيح দিতে হবে।

২। যদি بيع-এর রেওয়ায়াত সহীহ্ও ধরা হয় তথাপি এটা আমাদের মতের বিপরীত নয়। কেননা তখন بيع-এর অর্থ হবে مقبوض على سوم الشراء। তথা ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদন করার নিমিত্তে যে মালামাল হস্তগত করা হয়েছে সেই মালের এই হুকুম। بيع পূর্ণ হওয়ার আগে শুধুমাত্র খরিদ করার ভাও করার জন্য مفلس ব্যক্তি যে মাল গ্রহণ করে এর হকদার শুধুমাত্র ঐ মালিক-ই। এই পদ্ধতিটিকে, রূপক অর্থে الذى باعه বলা হয়েছে অর্থ হলো, الذى اراد بيعه।

৩। হযরত আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, এই হুকুম যদি বিক্রিত বস্তু (شيئى مبيع) এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তা'তেও অসুবিধা নেই। কেননা হাদীসের امر (নির্দেশক) তখন মানবতা ও দীনদারীর (ديانة) (ومروة) বিবেচনায় (قضاء) ফয়সালার বিবেচনায় নয়। অর্থাৎ মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা খুবই দৃষ্টিকটু যে, অন্যান্য পাওনাদাররা এতে ভাগ বসাবে বরং বিক্রেতাকেই সবটুকু মাল দিয়ে দেওয়া উচিত। কেননা মাল তো তারই ছিল।

মন্তব্য ঃ সার্বিক দিক বিবেচনায় আহনাফের মাযহাবই প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য।

বিঃ দ্রঃ উল্লেখিত মাসআলায় ائمة ثلثة একথায় একমত পোষণ করেছেন যে, বিক্রেতা ঐ বস্তুর হকদার হবে তবে এটা مطلق বা বিনা শর্তে নয় কিছু শর্ত সাপেক্ষে এই হুকুম কার্যকর হবে। তবে শর্তের ব্যাপারে তারা মতবিরোধ করেছেন। যথা ঃ

১। হুবহু ঐ মাল-সামান মওজুদ থাকতে হবে এর কোন কিছু নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্থ হলে চলবে না। যদি সামান্য অংশ নষ্ট হয়ে যায় তাহলে বিক্রেতা ও অন্যান্য ঋণদাতারা সমান অংশীদার হবে। এটা ইমাম আহমদের মত। ইমাম শাফেঈ ও মালেকের (রহ.) মতে যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এতে বিক্রেতা ও অন্যান্য পাওনাদাররা বরাবর বিবেচিত হবে আর যতটুকু অবশিষ্ট আছে তাতে বিক্রেতা অধিক হকদার বলে গণ্য হবে।

২। বিক্রিত বস্তুর সাথে দ্বিতীয় কোন বস্তু সংযোজিত হতে পারবে না। যেমন— مبيع মোটা হওয়া, গোলাম হলে শিল্প বা হস্তলিপি (كتابت) শিক্ষা করা। ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন—এক্ষেত্রে বিক্রেতার রুজু করার অধিকার নাই বরং অন্যান্য পাওনাদারদের সাথে বরাবর হবে সে।

ইমাম শাফেঈ (রহ.) ও মালেক (রহ.) বলেন—সংযোজিত এই অংশ কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। বিক্রেতাই এর হকদার হবে। ইমাম মালেক বলেন—তবে এক্ষেত্রে অন্যান্য পাওনাদারদের ইখতিয়ার থাকবে তারা ইচ্ছা করলে হুবহু ঐ বস্তুটি (مبيع) বিক্রেতাকে ফিরিয়ে দিবে অথবা যে মূল্যে সে বিক্রি করেছিল সেই মূল্য আদায় করে দিবে।

৩। ان لا يكون البائع قبض من ثمنها شيئا তৃতীয় শর্ত হলো,

ক্রতা মূল্যের কিছু অংশ উসূল করতে পারবে না। ইমাম আহমদের (রহ.)
৮ কিছু অংশ উসূল করে থাকলে বিক্রেতার রুজু করার অধিকার বাতিল হয়ে
ব এবং সে অন্যান্য পাওনাদারদের বরাবর হয়ে যাবে। ইমাম শাফেঈ (রহ.)
ান—যে পরিমাণ মূল্য আদায় করা বাদ আছে সে পরিমাণ রুজু (رجوع)
র অধিকার বহাল থাকবে। ইমাম মালেক (রহ.) বলেন—যে পরিমাণ মূল্য
ল করেছে ইচ্ছে করলে তা ফিরিয়ে দিয়ে مبيع নিয়ে নিবে অথবা ইচ্ছা
লে অন্যান্য পাওনাদারদের সাথে বরাবর হয়ে যাবে।

৪। ان لا يكون تعلق بها حق الغير চতুর্থ শর্ত হলো مبيع-এর সাথে
ন্যের 'হক' সংশ্লিষ্ট না হওয়া। যেমন—مبيع-কে রেহেন বা বন্ধক রাখা,
কে দান করে দেয়া অথবা বিক্রি করে দেয়া ইত্যাদি।
এরূপ হলে বিক্রেতার রুজু করার অধিকার বাতিল হয়ে অন্যান্য
নাদারদের সাথে বরাবর হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত।

৫। ان يكون المفلس حيا পঞ্চম শর্ত হলো ঃ নিঃস্ব (مفلس) ঐ ব্যক্তি
ীত থাকতে হবে। মারা গেলে রুজু করার অধিকার থাকবে না। বিক্রেতা ও
ান্য পাওনাদার বরাবর হয়ে যাবে। চাই মৃত্যুর পূর্বে তার নিঃস্বতার প্রকাশ
৮ অথবা মৃত্যুর পর।
ইমাম মালেক (রহ.) ও ইমাম আহমদের (রহ.) মাযহাব এটাই। আর
ম শাফেঈ (রহ.) বলেন— এক্ষেত্রেও বিক্রেতা অধিক হকদার বলে বিবেচিত
।

باب فضل انظار المعسر والتجاوز فى الا قتضاء من الموسر والمعسر

ধ্যায় ঃ অক্ষম ঋণীকে অবকাশ দেয়া এবং পাওনা আদায়ে ধনী গরীব সবার সাথে সদাচারণ প্রসঙ্গে

১। ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে দারিদ্র ব্যক্তিকে অবকাশ দেয়া এবং ধনী-গরীব সব
ের লোক থেকে করজ উসূলের ক্ষেত্রে সদাচারণ করা তথা কিছু কম নেওয়া,
র্ণ অথবা কিছু অংশ (করজ) মাফ করে দেওয়া এসব অতি সওয়াবের কাজ।
ন্ন হাদীসে এর ফযীলতের কথা এসেছে। এই অধ্যায়ের প্রথম হাদীসে উল্লেখ
হয়েছে—

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقت الملئكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملت من الخير شيئا؟ قال : لا قالوا تذكر قال : كنت اداين الناس فامرت فتياني ان ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر ـ قال قال الله عزوجل تجوزوا عنه ـ

অর্থাৎ হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন পূর্ববর্তী যুগের এক ব্যক্তির মৃত্যু সময় ঘনিয়ে এলে ফেরেস্তারা তার রূহ কবজ করতে এলেন এবং লোকটিকে বললেন, জীবনে নেক আমল করেছ কিছু? উত্তরে সে বলল 'না'। ফেরেস্তারা বললেন—স্বরণ করে দেখ তো! সে বলল, আমি মানুষকে ঋণ প্রদান করে গোলামদের নির্দেশ দিতাম তারা যেন দরিদ্র লোকদের অবকাশ দেয় এবং ধনী লোকদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করে। হুযূর (সা.) বলেন, আল্লাহ তাআলা ফেরেস্তাদের বললেন— তোমরাও তার সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ কর অর্থাৎ তাকে মাফ করে দাও।

فتياني : ف বর্ণে কাছরা দিয়ে পড়তে হবে। এটা فتى -এর বহুবচন। অর্থ-খাদেম, চাই গোলাম হোক বা আযাদ।

এই রেওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় সওয়াল-জওয়াব হবে মৃত্যুর সময়। কিন্তু অন্যান্য রেওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় সওয়াল জওয়াব হবে হাশরের মাঠে তথা মৃত্যুর পর।

বিরোধপূর্ণ রেওয়ায়াতের সামঞ্জস্য সাধন এভাবে হতে পারে যে, ঐ ব্যক্তির কিছু হিসাব হবে মৃত্যুর সময় আর কিছু হবে হাশরের মাঠে। فلا تعارض

২। موسر এবং غنى হওয়ার পরিমাণ কতটুকু? কারো মতে যার কাছে নিজের এবং নিজের অধীনস্থদের লালন-পালন পরিমাণ সম্পদ আছে সে غنى। কেউ বলেন, যার কাছে ৫০ দিরহাম (বা এই পরিমাণ সম্পদ) আছে সেই غنى।

কেউ বলেন— যে ব্যক্তি যাকাতের নেসাব পরিমাণ মালের মালিক সে غنى। কেউ বলেন যার কাছে খানাপিনা, কাপড় চোপড়, খাদেম এবং ঘর বাড়ি ছাড়া অতিরিক্ত সম্পদ আছে সে غنى। আহনাফের মতে غنى-এর স্তর তিনটি।

১। ঐ ব্যক্তি যার ওপর যাকাত ওয়াজিব ২। যার ওপর সদকায়ে ফিতর এবং কুরবানী ওয়াজিব এবং ৩। যার জন্য অন্যের কাছে হাতপাতা হারাম। আর এ হলো সেই ব্যক্তি যার কাছে লজ্জা নিবারণের কাপড় এবং আজকের দিনের

খানা মওজুদ আছে। ঠিক তদ্রূপ সেই ফকীরের জন্য ভিক্ষা করা হারাম যার শক্তি আছে এবং উপার্জন করতে সক্ষম। غنى নির্ণয়ের এই তাফসীলী বর্ণনা সদকা খাওয়া এবং ভিক্ষা করা না করার দৃষ্টিকোণে। ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে অবকাশ দেওয়া, কম নেওয়া এগুলোর ভিত্তি عرف (সামাজিক প্রচলনের) ওপর। সমাজ এক্ষেত্রে যাকে ধনী এবং সচ্ছল মনে করবে সেই সচ্ছল হিসেবে গণ্য হবে আর যাকে দরিদ্র হিসেবে চিহ্নিত করবে সে দরিদ্র হিসেবে গণ্য হবে এবং অবকাশ ও ঋণ মাফের সুবিধা ভোগ করবে।

৩। এই অধ্যায়ের চতুর্থ রেওয়ায়াত (حدثنا ابو سعيد الاشج) এর শেষের দিকে বলা হয়েছে فَقَالَ عقبة بن عامر الجهنى وابو مسعود الا نصارى الخ সমস্ত রেওয়ায়াতে এরূপই বলা হয়েছে। কিন্তু এটা রাবীর وهم প্রকৃতপক্ষে আবূ মাসউদ আনসারীর নাম ওকবা ইবনে আমর। এবারত হবে এরূপ - فَقَالَ عقبة بن عمرو ابو مسعود .

রাবীদের মধ্যে আবূ খালেদ আহমারের وهم হয়ে গেছে যার ফলে তিনি এইস্থলে عقبة بن عامرو ابو مسعود বলে দিয়েছেন।

باب تحريم مطل الغنى وصحة الحو الة واستحباب قبولها اذا احيل على ملى

অধ্যায় ঃ ধনী ব্যক্তির টালবাহানা জুলুম, অন্যের ওপর ন্যস্ত করা সহীহ্ এবং "ধনী ব্যক্তির দায়িত্ব গ্রহণ"কে মেনে নেয়া মুস্তাহাব প্রসঙ্গে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَطَلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَاِذَا اُتْبِعَ اَحَدُكُمْ عَلٰى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ -

"হুযূর (সা.) বলেন ধনী ব্যক্তির টালবাহানা করা জুলুম। যখন তোমাদের কাউকে কোন ধনী ব্যক্তির পিছু নিতে বলা হয় তাহলে তার পিছু নেওয়া উচিত।"

১। مطل শব্দের আসল অর্থ مد তথা টানা, লম্বা করা, مطلت الحديد লোহা লম্বা করার জন্য হাতুড়ি দ্বারা পেটানো مطل حقه بحقه টাল বাহানা করা। اتبع শব্দটি باب افعال-এর ماضى مجهول-এর সীগা بروزن اُكْرِمَ

অর্থ, আনুগত্য করা, মিলানো। أُتْبِعَ (باب افتعال) থেকে পড়া গলদ। مَلِيٌّ শব্দটি مَلُؤَ يَمْلُؤُ - باب كرم থেকে মুশতাক হয়েছে। অর্থ, অর্থশালী হওয়া।

২। قوله مطل الغنى ظلم এখানে مطل মাসদারকে নিজের فاعل-এর সাথে اضافت করা হয়েছে। অর্থ ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে ধনী ব্যক্তির টালবাহানা করা জুলুম। ধনী বলতে এখানে ঐ ব্যক্তি উদ্দেশ্য যে ঋণ আদায়ে সক্ষম। যদিও সে বাস্তবে ফকীর হোক না কেন। এই হুকুমে সে সব ব্যক্তিও শামিল হবে যাদের ওপর অন্যের হক রয়েছে এবং এই হক আদায়ে তারা সক্ষমও বটে। যেমন স্বামী (র ওপর স্ত্রীর হক) অভিভাবক (এর ওপর অধীনস্থদের হক) ইত্যাদি। কোন ব্যক্তি টালবাহানা করলে শাসক কর্তৃক তাকে শাস্তি দেওয়া জায়িয হবে। شريد بن سويد ثقفى থেকে মারফূ' এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে— لى الواجد يحل عرضه وعقوبته - (ابوداؤد نسائى - ابن ماجه) অর্থাৎ ধনী ব্যক্তি টালবাহানা করলে তার ইজ্জতের ওপর আঘাত হানা বৈধ হয়ে যায়। (তার ইজ্জত ও সাজা হালাল হয়ে যায়)।

حواله -এর অর্থ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট মাসায়েল

৩। واذا اتبع احدكم على ملى الخ অর্থাৎ যখন তোমাদের কাউকে কোন ধনী ব্যক্তির পিছু করে দেয়া হয় সে যেন তার পিছু নেয়। উদ্দেশ্য হলো ঃ ঋণী ব্যক্তি যদি বলে আমার কাছে পাওনা না চেয়ে অমুক ধনী ব্যক্তির কাছে চাও। তাহলে দাবি মেনে নেয়া উচিত, কেননা সে মালদার এবং তার টালবাহানা করা জুলুম আশা করা যায় সে এ কাজ (জুলুম) করতে যাবে না। যদি করে তাতেও সমস্যা নেই, কেননা এতে তোমাদের হক নষ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কেননা শাসকের সহযোগিতা নিয়ে জবরদস্তি করে তার কাছ থেকে তোমার পাওনা আদায় করতে পারবে। دين (পাওনা) নিজের যিম্মা থেকে সরিয়ে অন্যের যিম্মায় স্থানান্তরিত করাকে শরীয়তের পরিভাষায় حوالة বলা হয়। হাদীসটি ঋণ স্থানান্তরিত (حوالة) জায়িয হওয়ার মৌলিক ভিত্তি। এখানে কয়েকটি মাসআলা উল্লেখ করা হলো ঃ

১। حوالة -এর শাব্দিক অর্থ নকল করা, স্থানান্তরিত করা। مغرب নামক অভিধানে উল্লেখ করা হয়েছে—

تَرْكِيبُ الْحَوَالَةِ يَدُلُّ عَلَى الزَّوَالِ وَالنَّقْلِ وَمِنْهُ التَّحْوِيلُ وَهُوَ نَقْلُ الشَّيْئِ مِنْ مَحَلٍّ اِلَى مَحَلٍّ اٰخَرَ حَوَالَةٌ.

এর বিন্যাস্ততা মালিকানা হাত ছাড়া হওয়া এবং স্থানান্তরিত হওয়া বুঝায়। এ থেকেই تحويل-এর উৎপত্তি। এর অর্থ এক স্থান থেকে অন্যস্থানে কোন বস্তু স্থানান্তরিত করা।"

শরীয়তের পরিভাষায় حوالة বলা হয়, تحويل مطالبة الدين من ذمة المديون الى ذمة مستلزم اخر অর্থাৎ ঋণের যিম্মা ঋণী ব্যক্তি থেকে সরিয়ে অন্য কারো ওপর চাপানো।

১। আসল ঋণী ব্যক্তিকে محيل ও اصيل বলা হয়।

২। পাওনাদারকে محال ، محال له ، محتال ، محتال له এবং কখনও حويل বলা হয়।

৩। তৃতীয় যে ব্যক্তির ওপর ঋণ আদায়ের যিম্মাদারী প্রদান করা হয় তাকে محال عليه এবং محتال عليه বলা হয়।

৪। ঋণ তথা دين-কে محتال به বলা হয়।

মোটকথা, حواله-এর ক্ষেত্রে তিনজন লোকের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ১। محتال عليه এবং محتال (دائن) । ২। محيل (مديون) (তৃতীয় ব্যক্তি)।

২। حواله সহীহ্ হওয়ার জন্য ঋণদাতা কর্তৃক حوالة কবুল করা শর্ত কিনা এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে।

✪ ইমাম আহমদ (রহ.) ইবনে হাযম (রহ.) এবং দাউদ জাহেরীর মতে শর্ত নয়। ঋণদাতা কর্তৃক সর্বাবস্থায় حوالة মেনে নেয়া ওয়াজিব। তবে এটা লক্ষ্য রাখতে হবে যে, (তৃতীয় ব্যক্তি) محتال عليه যেন ঋণ আদায়ে সক্ষম হয়।

ইমামগণ হাদীসের فليتبع আদেশ সূচক (صيغة امر) দ্বারা দলীল পেশ করেন। কেননা তাঁদের মতে امر ওয়াজিবের অর্থ প্রদান করে। এমনিভাবে (তাঁদের মতে) ঋণী ব্যক্তির ইখতিয়ার আছে সে ইচ্ছা করলে নিজে ঋণ পরিশোধ করবে অথবা অন্যের মাধ্যমে করাবে।

জমহুরের মতে حوالة সহীহ্ হওয়ার জন্য ঋণদাতার সন্তুষ্টি জরুরী। দলীল হযরত সামুরা ইবনে জুনদুবের হাদীস على اليد ما اخذت حتى تودى হাত যা গ্রহণ করেছে তা আদায় করা জরুরী। এর দ্বারা বুঝা যায় নিজে ঋণ পরিশোধ করা জরুরী। এজন্য তৃতীয় ব্যক্তির ওপর حوالہ করার জন্য ঋণদাতার রেজামন্দি থাকতে হবে। জমহুর হাদীসকে মুস্তাহাবের জন্য প্রযোজ্য বলে মনে করেন।

এছাড়া একেক ধরনের মানুষ একেক স্বভাবের হয়ে থাকে। কেউ বেশি টালবাহানা করে, কেউ কম করে আবার কেউ মোটেই করে না। এজন্য ঋণদাতার হক সংরক্ষণের জন্য حوالة-এর ক্ষেত্রে তার সন্তুষ্টি থাকা জরুরী। এমনিভাবে যদি বিনা শর্তে ঋণদাতাকে حوالة কবুল করতে বাধ্য করা হয় তাহলে এতে সমস্যা এই হবে যে, ঋণী ব্যক্তি তৃতীয় কাউকে حوالة করার পর সে আবার অন্যের কাছে حوالة করে দিবে সে আবার অন্যের কাছে حوالة করে দিবে। এভাবে চলতেই থাকবে। এসব কিছু ঋণদাতাকে মাথা পেতে মেনে নিতে হবে। এতে করে সে যে ক্ষতিগ্রস্থ হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। অতএব একথা বলতে হচ্ছে যে, حوالة সহীহ্ হওয়ার জন্য ঋণদাতার রেজামন্দি জরুরী।

✪ আহনাফের মতে حوالة সহীহ্ হওয়ার জন্য তৃতীয় ব্যক্তির (محتال عليه) সন্তুষ্টিও পাওয়া যেতে হবে। ইমাম মালেক (রহ.) ও ইমাম আহমদের (রহ.) মতে অবশ্য এটা শর্ত নয়। হ্যাঁ, তৃতীয় ব্যক্তি (محتال) যদি তার শত্রু হয় তাহলে রেজামন্দি জরুরী। ইমাম শাফেঈ (রহ.) থেকে এ ব্যাপারে দু'ধরনের মত পাওয়া যায়। ১. রেজামন্দি শর্ত, আহনাফের মতের মত, ২. শর্ত নয়।

এই ইখতিলাফ ঐ সময়ের জন্য যখন তৃতীয় ব্যক্তির যিম্মায় ঋণী ব্যক্তির (محيل) এর কোন ঋণ থাকবে। যদি তৃতীয় ব্যক্তির ওপর ঋণীর কোন ঋণ না থাকে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তৃতীয় ব্যক্তির সন্তুষ্টি জরুরী।

✪ حوالة কার্যকর হওয়ার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে আসল ঋণীর সন্তুষ্টি জরুরী। কেননা সম্ভ্রান্ত মানুষ কখনও অনুগ্রহের পাত্র হতে চাইবে না যে, তার ঋণ অন্যজন আদায় করে দিক। এজন্য কোন ব্যক্তি স্বউদ্যোগে অন্যের ঋণ নিজের যিম্মায় নিতে চায় তাহলেও ঋণী ব্যক্তির সন্তুষ্টি পেতে হবে।

✪ حوالة-এর পাট চুকে যাওয়ার পর ইমাম আহমদ, মালেক ও শাফেঈর (রহ.) মতে আসল ঋণী সর্বাবস্থার জন্য যিম্মামুক্ত হবে। এজন্য পাওনাদার ব্যক্তি কখনও ঋণীর কাছে পুনরায় পাওনা দাবি করতে পারবে না। অবশ্য ইমাম মালেক (রহ.) বলেছেন যদি তৃতীয় ব্যক্তি নিঃস্ব হয়ে যায় এবং دائن এ সংবাদ না জানে তাহলে রুজু করতে পারবে। কিন্তু তার নিঃস্বতা জানার পরও যদি ঋণদাতা রাজী হয় তাহলে রুজু করতে পারবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে তৃতীয় ব্যক্তি যদি حوالة-এর কথা অস্বীকার করে অথবা নিঃস্ব অবস্থায় মারা যায় তাহলে ঋণদাতা ঋণী ব্যক্তির কাছে রুজু করতে পারবে।

সাহেবাঈন (রহ.) অন্য আরেক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন যে, বিচারক তৃতীয় ব্যক্তির জীবদ্দশায় তাকে নিঃস্ব ঘোষণা করবেন।

মোটকথা এই তিন পদ্ধতিতে ঋণী ব্যক্তিকে ঋণদাতা রুজু করতে পারবে।

ائمة ثلاثة এই অধ্যায়ের হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে বলেন, এতে ঋণদাতাকে তৃতীয় ব্যক্তির পিছু নিতে বলা হয়েছে مطلق ভাবে। সুতরাং حوال-এর কারণে যিম্মাদারী খতম হয়ে যাওয়ার পর ঋণী ব্যক্তি থেকে রুজু করা যাবে না।

আহনাফের স্বপক্ষে অনেক দলীল রয়েছে।

(١) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَيْسَ عَلٰى مَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَوى يَعْنِيْ حَوَالَةٌ - بيهقى ، ترمذى

(٢) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لاَيَرْجِعُ عَلٰى صَاحِبِه اِلاَّ اَ يُّفْلِسَ اَوْ يَمُوْتَ - مصنف عبدالرزاق

(٣) عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لَيْسَ عَلٰى حَقِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ توى - اِنْ لَمْ يَقْبِضْ رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ الَّذِىْ اَحَالَ عَلَيْهِ - وَهُوَ قَوْلُ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِيِّ وَشُرَيْحٍ -

জওয়াব

এই হাদীসটি তাঁদের মাযহাবের দলীল হয় না। কেননা হাদীসে ধনী হওয়ার শর্তে তৃতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে ঋণ তলব করতে বলা হয়েছে। একথা বলা

হয়নি যে, محتال (পাওনাদার) কখনও محيل (ঋণী)-র কাছে রুজু করতে পারবে না।

باب تحريم بيع فضل الماء الذى يكون بالفلاة ويحتاج اليه لرعى الكلاء وتحريم منع بذ له وتحريم بيع ضراب الفحل

অধ্যায় ঃ অতিরিক্ত পানি বিক্রি নিষেধ হওয়া প্রসঙ্গে

(١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰه عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ.

"হুযূর (সা.) অতিরিক্ত পানি বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। নাসায়ী শরীফের এক রেওয়ায়াতে فضل শব্দ উল্লেখ করা ছাড়া نهى عن بيع الماء বলা হয়েছে। যার দ্বারা বোঝা যায় কোন প্রকারের পানি বিক্রিই জায়িয নেই। ইবনে হাযম (রহ.), আল্লামা শাওকানী (রহ.) এমতের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু এটা জমহুরের মতের বিপরীত। কেননা মটকা, পেয়ালা ইত্যাদি পাত্রে সংরক্ষিত পানি সর্বসম্মতিক্রমে মালিকানাধীন পানি হিসেবে গন্য যা বিক্রি করা জায়িয।

২। এক রেওয়ায়াতে এসেছে ঃ

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْاَرْضِ لِتُحْرَثَ فَعَنْ ذٰلِكَ نَهَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخ .

ضراب الجل বলা হয় সংগম করানোর জন্য উটকে উষ্ট্রীর ওপর চড়িয়ে দেয়া। রাসূল (সা.) একে নাজায়িয করেছেন অর্থাৎ সংগম করানোর জন্য উট ভাড়া দিতে নিষেধ করেছেন। জমহুর এবং আহনাফের মতে এটা নাজায়িয। ইমাম মালেক এবং অন্য কতক আলিম থেকে জায়িযের ফতওয়া পাওয়া যায়।

এর দলীল হিসেবে তাঁরা বলেন, যদি সঙ্গম ঘটিয়ে মজুরী না নেয়া হয় তাহলে চতুষ্পদ জন্তুর প্রজনন ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে এবং নানাবিধ সমস্যা দেখা দিবে। সুতরাং এসব বিষয়ে খেয়াল করে এর অনুমোদন দেয়া উচিত। আহনাফ ও জমহুরের পক্ষ থেকে এই জওয়াব দেয়া হয় যে, মালেকীগণের এই দলীলের ভিত্তি নিতান্ত অনুমান নির্ভর এবং সহীহ্ হাদীসের বিপরীত। সুতরাং এটা দলীল হতে পারে না।

وعن بيع الما والارض لتحر দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জমিকে চাষাবাদের জন্য জারা দেয়া। এর বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে।

৩। عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَايُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ.

ব্যাখ্যা ঃ মৃত কোন জমিন কূপ খননের মাধ্যমে কেউ জীবিত (احياء اموات) করে সেই জমিনের মালিক হলো। এরপর সেই কূপের আশেপাশে ঘাস ৎপন্ন হলো। এদিকে ঐ কূপ ব্যতীত সেখানে অন্য কোন পানির ব্যবস্থাও নেই।

এক্ষেত্রে কূপ ওয়ালার জন্য জায়িয হবে না যে, সে অন্যান্য লোকের ানোয়ারকে অতিরিক্ত পানি পান করা থেকে বারণ করবে। কেননা এতে ঘাস থকেই বারণ করা হয়ে যায়। অথচ ঘাস থেকে বারণ করা কারো জন্য জায়িয নই। এমনিভাবে পানি থেকে বারণ করাও নাজায়িয। চাই ওখানে ঘাস থাকুক া না থাকুক। কেননা يمنع به الكلاء-এর মধ্যে لام বর্ণটি (عاقبت) এর র্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

পানি তিন প্রকার

১। ماء الانهار والبحار "নদী ও সমুদ্রের পানি"। এতে সকল মানুষ মান ভাবে অংশীদার। চাই মুসলমান হোক বা কাফির। এ থেকে নিজে পান রা, প্রাণীকে পান করানো, জমিন, বাগান ইত্যাদিতে সরবরাহ করার ক্ষেত্রে বাই সমান হকদার।

২। الماء المحرز অর্থাৎ পাত্র, মটকা, ট্যাংকি ইত্যাদিতে সংরক্ষিত পানি। র্বসম্মতিক্রমে এটা মালিকানাধীন পানি। সেই এর পূর্ণ হর্তাকর্তা। অবশ্য অপারগ' ব্যক্তিকে পান করানো ওয়াজিব। আর যে ব্যক্তি অপারগ (مضطر) নয় স পান করতে চাইলে তাকে বারণ করা ديانة (দ্বীনদারীর তাকাজা অনুযায়ী) রাম।

৩। নিজের মালিকানাধীন কূপ, হাউজ ইত্যাদির পানি। চাই নিজের ালিকানাধীন জমিতে হোক অথবা ارض موات (মৃত জমিতে) হোক।

এই পানির হুকুম সম্পর্কে اختلاف রয়েছে। কতিপয় শাফেঈর মতে এটা ماء محر (সংরক্ষিত পানি) এর মত মালিকানাধীন পানি। তবে অধিকাংশ

শাফেঈর মতে এটা তার হক; সে এর মালিক নয়। এই পানিতে সে অন্যের তুলনায় বেশি হকদার কিন্তু অতিরিক্ত পানি কেউ পান করতে চাইলে তাকে বারণ করা যাবে না। অবশ্য জমি, বাগান ইত্যাদিতে সিঞ্চন করতে চাইলে মালিকের অনুমতি দিতে হবে।

এমনিভাবে মালিকানাহীন জমিতে যে ঘাস উৎপন্ন হয় এতে সবাই শরীক। যদি মালিকানাধীন ভূমিতে এমনিতেই ঘাস উৎপন্ন হয় তাহলে এতেও সবাই শরীক হবে। হ্যাঁ, যদি অন্যত্র ঘাস থাকে তাহলে জমিওয়ালা নিজের ক্ষেতে অন্যকে প্রবেশ করতে বাধা দিতে পারবে। যদি অন্যত্র ঘাস না থাকে এবং মালিক ঘাস নিতে বাধা দেয় তাহলে তাকে বলা হবে হয় তুমি নিজে ঘাস সরবরাহ করে দাও না হলে তাদেরকে নিতে দাও।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِىْ ثَلَاثٍ فِى الْمَاءِ وَالْكِلَاءِ وَالنَّارِ . رواه ابن عباس رَضِىَ اَللّٰهُ عَنْهُ .

"হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন মুসলমান তিন জিনিসে সমান অংশীদার। ঘাস, পানি ও আগুনে।"

باب تحريم ثمن الكلاب وحلوان الكاهن ومهر البغى والنهى عن بيع السنور

অধ্যায় ঃ কুকুরের মূল্য, গণকের উপার্জন, ব্যভিচারী মহিলার উপঢৌকন হারাম হওয়া এবং বিড়াল বিক্রির নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে

عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدِ الاَنْصَارِىِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .

১। শিকারী কুকুর এবং ঘর, ক্ষেত ও জন্তু পাহারা দেয়ার জন্য কুকুর পালন করা সবার ঐক্য মতে জায়িয। তবে মতবিরোধ হলো, কুকুর বিক্রি করে এর মূল্য ভোগ করা জায়িয কিনা? ইমাম শাফেঈ (রহ.) ইমাম আহমদ (রহ.) এবং আহলে জাহেরের মতে সর্বাবস্থায় কুকুর বিক্রি করা নাজায়িয। চাই শিকারী কুকুর হোক বা না হোক। এটা ইমাম মালেকের এক রেওয়ায়াত।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) সাহেবাঈন, ইবরাহীম নখয়ী (রহ.) আতা (রহ.) প্রমুখের অভিমতে যে সব কুকুর দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় সেগুলো বিক্রি করা

জায়িয। এটা ইমাম মালেকের (রহ.) দ্বিতীয় অভিমত (রেওয়ায়াত)। ইমাম শাফেঈ (রহ.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে বলেন, এখানে সর্বপ্রকার কুকুর বিক্রি করতে নিষেধ করা হয়েছে। অন্য রেওয়ায়াতে আছে, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন ঃ ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيْثٌ اَىْ حَرَامٌ ـ

আহনাফের দলীল

(١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ اِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ ـ (نسائى ، طحاوى)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ اِلاَّ كَلْبَ الصَّيْدِ ـ (رواه ترمذى)

(٣) رَوٰى اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِىْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ـ

উল্লেখিত হাদীসসমূহে শিকারী কুকুর বিক্রি করে এর মূল্য ভোগ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কেননা এটা উপকৃত প্রাণী। এর দ্বারা বুঝা গেলো যে, যে সব কুকুর দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় সেসব কুকুর বিক্রি করা জায়িয। এটা مال متقوم (মূল্যযোগ্য মাল)।

হাদীসের জওয়াব

শাফেঈ প্রমুখ যে সব হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন তার জওয়াব হলো, হাদীসে ঐ সব কুকুর উদ্দেশ্য, যেগুলো غير منتفع به তথা যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় না। আর যে সব হাদীসে অনুমতি দেয়া হয়েছে সেখানে ঐসব কুকুর উদ্দেশ্য যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। ইমাম ত্বহাভী (রহ.) বলেন যে, সব হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে উহা সে সময়ের যখন আমভাবে কুকুরকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। পরে হত্যার সাথে সাথে বিক্রির নিষেধের হুকুমও মানসূখ হয়ে গেছে।

কেউ কেউ বলেন, নিষেধাজ্ঞা হারাম বুঝানোর জন্য নয় বরং এটা নিকৃষ্ট সম্পদ একথা বুঝানোর জন্য নিষেধ করা হয়েছে। আর خبيث-এর অর্থ হারাম

নয় বরং এর অর্থ ثمن كلب উত্তম হালাল (حلال طيب) নয়। যেমন, অনেক রেওয়ায়াতে ثمن كلب-এর সাথে সাথে كسب الحجام-কে خبيث বলা হয়েছে অথচ সর্বসম্মতিক্রমে এটা হারাম নয়। এমনিভাবে কতক রেওয়ায়াতে বিড়াল বিক্রি করতে নিষেধ করা হয়েছে। অথচ এর মূল্য ভোগ করা কারো মতেই নাজায়িয নয়। বরং এর উদ্দেশ্য হলো, বিড়ালের মত ইতর প্রাণী বিক্রি করে মূল্য ভোগ করা মানবতার খেলাফ (কারো প্রয়োজন হলে) বিক্রি না করে এমনিতেই দেয়া উচিত। সুতরাং কুকুরের বেলায়ও একথা বলা যায় যে, এর মূল্য ভোগ করা মানবতার খেলাফ হলেও নাজায়িয নয়।

২। مهرالبغى : بَغِيٌّ শব্দটির ب তে فتح ، غ এ কাছরা এবং ى তাশদীদের সাথে। এটা قَوِيٌّ-এর ওজনে। মূলত فُعُولٌ-এর ওজনে بُغُوىٌ ছিল। বলা হয়ে থাকে بغت المراة اى زنت بغاء وبغى-এর অর্থ যেনা, ব্যভিচার করা। যেনা করা যেমন হারাম, যেনার মাধ্যমে অর্থ গ্রহণ করাও হারাম। যেহেতু এটা ملك بضعه (যৌনাঙ্গের) বদলায় গ্রহণ করা হয় এজন্য রূপক অর্থে একে مهر বলা হয়েছে।

৩। وحلوان الكاهن-এর অর্থ গণকের মজুরী। বলা হয় حلوت الكاهن حلوانا اى اعطيته احرته শব্দটির মূল حلاوة، একে মিষ্টি বস্তুর সাথে তাশবিহ দেয়া হয়েছে। কেননা কোনরূপ শ্রম দেয়া ছাড়াই গণক এই মজুরী লাভ করে। كاهن বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে, غيب জানে বলে দাবি করে এবং লোকদেরকে আগাম সংবাদ প্রদান করে। আর عراف বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যে উপস্থিত বস্তুর গোপনীয় অবস্থান জানার দাবি করে। যেমন, চুরি কৃত মাল, হারানো মাল ইত্যাদি (কোথায় আছে তা জানার দাবি করা)।

منجم বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে তারকা দেখে কোন কিছুর অবস্থা বর্ণনা করতে পারে বলে দাবি করে। কখনও عراف এবং منجم-এর অর্থে كاهن শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

গণক (كاهن) এর মজুরী হারাম হওয়ার ব্যাপারে সকল উম্মত একমত।

٤. عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ ـ

"রাসূল (সা.) কুকুর ও বিড়ালের মূল্য (ভোগকারী) কে ভর্ৎসনা করেছেন।"

উল্লেখিত হাদীসের ভিত্তিতে হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) জাবের ইবনে যায়েদ (রা.) তাউস (রহ.), মুজাহিদ (রহ.) প্রমুখ বলেন যে, বিড়াল বিক্রি করা এবং তার মূল্য (ثمن) ভোগ করা হারাম। কিন্তু তাঁরা ছাড়া অন্যান্য সকল ওলামার অভিমতে বিড়াল বিক্রি ও তার ثمن ভোগ করা জায়িয। হাদীসকে তাঁরা نهى تنزيهى-এর ওপর প্রয়োগ করেন। কেউ কেউ হাদীসটিকে ঐ বিড়ালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মনে করেন যে বিড়ালকে বিক্রেতার হস্তগত করে দেয়া সম্ভব নয় (তথা سنور متوحش)। কেউ বলেন ইসলামের প্রাথমিক যুগের কথা এটি। যখন বিড়াল শরয়ী দৃষ্টিকোণে নাপাক ছিল। পরবর্তীতে এর পবিত্রতা এবং بيع সহীহ্ হওয়ার হুকুম আসে এবং পূর্বের নিষেধাজ্ঞা منسوخ হয়ে যায়। তবে প্রথম জবাবই উত্তম।

٥. عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُالْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحِجَامِ.

كسب حجام —শিঙ্গা লাগিয়ে উপার্জন করা জায়িয কিনা এ ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে। পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

باب الامر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتناءها الا لصيداو زرع اوماشية ونحوذلك

অধ্যায় ঃ কুকুর হত্যার নির্দেশ ও তা نسخ হওয়া এবং শিকার, ফসল পাহারা, জন্তু পাহারা ইত্যাদি কাজ ছাড়া অন্য কারণে কুকুর পালন হারাম হওয়া প্রসঙ্গে

(١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ.

"রাসূল (সা.) কুকুর হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেছেন" ইসলামের প্রথম যুগে সব রকমের কুকুর হত্যা করার নির্দেশ ছিল। যাতে করে মানুষ পরিপূর্ণভাবে কুকুর থেকে দূরে থাকে। পরবর্তীতে শুধু কালো কুকুর হত্যা করার হুকুম দিয়ে আম হুকুমকে মানসূখ করা হয়েছে। এরপর মতলকভাবে সব ধরনের কুকুর হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে যদি ক্ষতিকর ও দংশনকারী হয় তাহলে এখনও এরূপ কুকুর হত্যা করার হুকুম বহাল আছে।

সার কথা হলো, কুকুর হত্যার নির্দেশ মানসূখ হয়ে গেছে। অনেক হাদীস এর সমর্থন যোগায়। এ কারণে জমহুরের মতে কুকুর হত্যা জায়িয নেই। তবে كلب عقور (দংশনকারী কুকুর) হত্যা করা যাবে। অবশ্য ইমাম মালেকের (রহ.) মতে হত্যার বিধানটি মানসূখ হয়নি। একারণে তাঁর মতে সবরকম কুকুর হত্যা জায়িয চাই কষ্টদায়ক হোক বা না হোক। তিনি উল্লেখিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন।

জমহুর অন্যান্য হাদীসের মাধ্যমে মানসূখ হওয়ার প্রমাণ পেশ করেছেন। যেমন— হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা.) থেকে বর্ণিত আছে—

٢. اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ فِىْ كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ .

"রাসূল (সা.) কুকুর হত্যা করার আদেশ দিয়ে বলেন, তাদের এবং কুকুরের কী হলো? অতপর শিকারী ও ছাগল পাহারার কুকুরের ব্যাপারে অবকাশ দেন (অর্থাৎ হত্যা না করার আদেশ দেন)। তাঁর থেকে আরেকটি রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে— لولا ان الكلاب امة من الامم لامرت بقتلها "কুকুর যদি অন্যান্য প্রাণীর মত এক জাতীয় প্রাণী না হতো তাহলে আমি এগুলোকে হত্যা করার আদেশ দিতাম।"

٣. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ اِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ اَوْكَلْبَ غَنَمٍ اَوْمَاشِيَةٍ فَقِيْلَ لِاِبْنِ عُمَرَ اَنَّ اَبَاهُرَيْرَةَ يَقُوْلُ اَوْ كَلْبَ زَرْعٍ فَقَالَ اِبْنُ عُمَرَ اِنَّ لِاَبِىْ هُرَيْرَةَ زَرْعًا .

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হুযূর (সা.) শিকারী কুকুর, বকরী ও চতুষ্পদ জন্তু পাহারাদার কুকুর ছাড়া অন্যান্য কুকুর হত্যা করতে আদেশ করেছেন। ইবনে ওমর (রা.)-কে বলা হলো ঃ হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) তো শস্য পাহারাদার কুকুরকেও এ থেকে استثناء করেছেন। একথা শুনে ইবনে ওমর (রা.) বললেন— আবূ হুরাইরার (রা.) ক্ষেত আছে। একথার অর্থ হল, তিনি যেহেতু চাষাবাদ করতেন সেহেতু তিনিই এ ব্যাপারে বেশি অভিজ্ঞ। কেননা যে ব্যক্তি কোন কাজে জড়িত থাকে সে ঐ বিষয়ে বেশি অভিজ্ঞ হয়।

কিন্তু কতক ইসলাম বিদ্বেষী اِنَّ لِاَبِىْ هُرَيْرَةَ زَرْعًا-এর অপব্যাখ্যা করে বলে, ইবনে ওমর (রা.) হযরত আবূ হুরাইরার (রা.) প্রতি সন্দেহ পোষণ করেছেন যে, যেহেতু আবূ হুরাইরা (রা.) চাষাবাদ করতেন এ জন্য তিনি স্বীয় স্বার্থে নিজের পক্ষ থেকে একথা বানিয়ে বলেছেন। এবং একথার ওপর ভিত্তি করে তারা বলে, হযরত সাহাবায়ে কিরাম একে অপরের প্রতি وضع حديث (হাদীস বানানোর) ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতেন। এর দ্বারা সাহাবাদের থেকে বিশ্বস্থতা উঠে যায় এবং হাদীসের حجت ও صحت-এর ব্যাপারে প্রশ্ন দেখা দেয়। অথচ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, একথা দ্বারা হযরত ইবনে ওমর (রা.) এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) এ ব্যাপারে সম্যক জ্ঞাত। কেননা তিনি এ কাজের লোক ছিলেন। তাঁর ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করা কিংবা তাঁকে দোষী সাব্যস্থ করা মোটেই উদ্দেশ্য নয়।

ইমাম মুসলিম (রহ.) ইবনে হাকামের সনদে হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। যাতে كلب زرع.-এর অনুমতি দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে শোনার পর নিজে এই অংশ (اوكلب زرع) রেওয়ায়াত করতেন। যদি আবূ হুরাইরার (রা.) ব্যাপারে তাঁর আস্থা না থাকত তাহলে এই অংশ তিনি কখনও রেওয়ায়াত করতেন না। এছাড়া এই অংশটুকু হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল এবং সুফিয়ান ইবনে আবী যোবায়েরের রেওয়ায়াতেও বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং ইসলাম বিদ্বেষীদের এই সন্দেহ পোষণ নিজেদের কুপ্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ মাত্র; এর মূলে কোন ভিত্তি নেই।

٤. فِىْ رِوَايَةٍ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ثُمَّ نَهَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا وَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالْاَسْوَدِ الْبَهِيْمِ فَاِنَّهُ شَيْطَانٌ -

"অতঃপর রাসূল (সা.) আমভাবে কুকুর মারতে নিষেধ করেন এবং বলেন তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে কালো মিচমিচে কুকুর হত্যা করা কেননা এটা শয়তান। بهيم-এর অর্থ বেশি কালো, কালো মিচমিচে। হাদীসে হুযূর (সা.) বলেছেন, তোমরা কালো কুকুরের পিছু নাও এবং এগুলো হত্যা করো। কেননা এগুলো শয়তান স্বরূপ।

সার কথা হলো, প্রথমে হুযূর (সা.) সবরকম কুকুর হত্যা করার আদেশ দেন। অতঃপর শুধু কালো কুকুরের ব্যাপারে এই হুকুম বহাল থাকে। পরে এই হুকুমও মানসুখ হয়ে যায়। তবে রং যাই হোক না কেন, ক্ষতিকর কুকুর এখনও হত্যা করা জায়িয। তবে কালো কুকুর যেহেতু তুলনামূলক বেশি ক্ষতিকর হয়ে থাকে এজন্য বিশেষ গুরুত্বের সাথে এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একে শয়তান হিসেবে আখ্যায়িত করার অর্থ এই নয় যে, এটা কুকুরের মধ্যে গণ্য নয় এবং প্রকৃতই এটা শয়তান।

সাদা বিন্দু বিশিষ্ট কালো কুকুরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ ঃ

কপালে সাদা দু'টি বিন্দু বিশিষ্ট কালো কুকুরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ ঃ

১। এটা সবচেয়ে ক্ষতিকারক কুকুর,
২। এটা বেশি দংশন করে,
৩। অন্যান্য কুকুরের তুলনায় এটা খুব কম কল্যাণকর হয়,
৪। এর দ্বারা তেমন শিকার করা যায় না,
৫। শয়তান এর ওপর বেশি প্রভাব ফেলে,
৬। এর দৃষ্টিতে বদআছর রয়েছে,
৭। এর লালায় জীবাণু বেশি থাকে এবং
৮। এটা বদ আকৃতির হয়ে থাকে, যা দেখলে মানুষ ভীত হয়।

মোদ্দাকথা হলো রং যাই হোক কষ্টদায়ক কুকুরকে হত্যা করা যাবে।

কালো কুকুর দ্বারা শিকার করানো

ইমাম আহমদ (রহ.) হাসান বছরী (রহ.) ইবরাহীম নখয়ী এবং কতক শাফেঈগণের মতে কালো কুকুর দ্বারা শিকার করা জায়িয নেই। যদি এরূপ কুকুর কোন প্রাণী শিকার করে তাহলে তা খাওয়াও জায়িয নেই। কেননা হাদীসে একে শয়তান বলা হয়েছে। তবে আবূ হানীফা (রহ.), শাফেঈ (রহ.) মালেক (রহ.) বরং জমহুরের মতে কালো কুকুর দ্বারা শিকার করা অন্যান্য কুকুরের মতই জায়িয। শয়তান বলার অর্থ এই নয় যে, এটা কুকুরের জাত থেকে বের হয়ে গেছে। كما مر

কুকুর লালন-পালন করার হুকুম

শিকারী কুকুর, ক্ষেত, বকরী, ক্ষেতসম্পদ এবং জন্তু পাহারা দেয়ার কুকুর পালা সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয। ঘর-বাড়ি পাহারা দেয়া কুকুরকে এর ওপর কিয়াস

করা যাবে কিনা এ ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে। শাফেঈগণের সহীহ্ قول অনুযায়ী ঘর-বাড়ি পাহারাদার কুকুর পালা জায়িয। কিয়াস করা হয়েছে উল্লেখিত তিন প্রকারের ওপর। আর উল্লেখিত তিন প্রকারের মধ্যে যে ইল্লত রয়েছে এখানেও সেই ইল্লত বিদ্যমান। আর ইল্লতটি হলো প্রয়োজনীয়তা। এটাই আহনাফের মাযহাব। ফতওয়ায়ে আলমগিরীর كتاب الكراهية এ উল্লেখ করা হয়েছে, পণ্য দ্রব্যের জন্য কুকুর পালা জায়িয নেই। হ্যাঁ, যদি চোর ইত্যাদির ভয় থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। বাঘ, সিংহ হায়েনা এবং যাবতীয় হিংস্র প্রাণীর একই হুকুম।

এটা ইমাম আবূ ইউসুফের (রহ.) কিয়াস। (كذا فى الخلاصة) জেনে রাখা দরকার যে, পাহারা দেয়ার জন্য কুকুর পালা জায়িয। এমনিভাবে, শিকার করার জন্য ক্ষেত ও জন্তু পাহারা দেয়ার জন্য কুকুর পালা জায়িয। (كذافى الذخيرة)

কুকুর হত্যাকারীর জরিমানার হুকুম

কোন ব্যক্তি অন্যের কুকুর হত্যা করলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কিনা?

ইমাম শাফেঈ, আহমদ (রহ.) প্রমুখ আলিমগণের মতে কুকুর হত্যাকারীর ওপর ক্ষতিপূরণ আসবে না। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর হোক বা না হোক। কেননা এটা মূল্যযোগ্য (مال متقوم) সম্পদ নয়। এজন্যই রাসূল (সা.) বলেছেন, ثمن الكلب خبيث। তবে ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) মতে শিকারী ও পাহারাদার কুকুর হত্যা করলে ক্ষতি পূরণ দিতে হবে। কেননা এই ধরনের কুকুর উপকারী এবং মূল্যযোগ্য সম্পদ (مال متقوم)। হযরত ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন ঃ

اِنَّهُ قَضٰى فِىْ كَلْبِ صَيْدٍ قَتَلَهُ رَجُلٌ بِاَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا وَرُوِىَ اَنَّ عُثْمَانَ اَغْرَمَ رَجُلاً ثَمَنَ كَلْبٍ قَتَلَهُ عِشْرِيْنَ بَعِيْرًا .

কুকুর হত্যা করার কারণে প্রথম হাদীসে চল্লিশ দিরহাম এবং দ্বিতীয় হাদীসে বিশটি উট জরিমানা দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا اِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ اَوْ ضَارٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ ـ

"হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন পাহারাদার বা শিকারী কুকুর ছাড়া অন্য কোন কুকুর পালন করলে প্রতিদিন দুই কীরাত করে আমল নষ্ট হয়ে যাবে।

قيراط-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য

قيراط হলো পাঁচটি ঘরের সমপরিমাণ অথবা দানেকের অর্ধেক পরিমাণ বস্তু। (দানেক বলা হয় ৬ অংশ বিশিষ্ট দেরহামকে)।

কেউ বলেন দীনারের $\frac{৪}{৬}$ অংশ, কেউ বলেন দীনারের $\frac{১}{২০}$ অংশ, আহলে হেজাযের পরিভাষায় $\frac{১}{২৪}$ অংশ।

সুনানে কুবরার মুসান্নিফ (রহ.) বলেন, কীরাত হলো উহুদ পাহাড়ের সমান।

হাদীসে কীরাত বলতে নির্দিষ্ট একটি অংশ উদ্দেশ্য যার পরিমাণ একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন। উদ্দেশ্য হলো, কুকুর পালার কারণে আস্তে আস্তে আমল নিঃশেষ হয়ে যায়।

সন্দেহ নিরসন ঃ ইবনে ওমরের (রা.) এই রেওয়ায়াতে قيراطان (দুই কীরাতের) কথা বলা হয়েছে, আবার অন্য কতক রেওয়ায়াতে قيراط (এক কীরাতের) কথা বলা হয়েছে, এমনিভাবে আবূ হুরাইরার (রা.) এক রেওয়ায়াতে قيراطان এবং অন্য রেওয়ায়াতে قيراط বলা হয়েছে।

✪ قيراط এবং قيراطان-এর ইখতিলাফ সম্পর্কে কেউ কেউ এই মত পেশ করেছেন যে, শহর ও গ্রামের কুকুরের পার্থক্যের কারণে এক কীরাত ও দুই কীরাত বলা হয়েছে। শহুরে কুকুর হলে দুই কীরাত এবং গ্রামের কুকুর হলে এক কীরাত আমল খোয়া যাবে।

✪ কেউ বলেন, মদীনার কুকুর হলে দুই কীরাত আর অন্য জায়গার কুকুর হলে এক কীরাত নষ্ট হবে।

✪ প্রথম অবস্থায় এক কীরাতের কথা বলা হয়েছিল পরবর্তীতে ঘৃণাবৃদ্ধি (ও এর থেকে দূরে থাকার জন্যে) দুই কীরাতের কথা বলা হয়েছে। প্রত্যেকে নিজের শ্রবণ অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন।

✪ যেখানে অতিরিক্ত পরিমাণ বর্ণনা করা হয়েছে সেটি গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা এই রাবী এমন কিছু (زيادة) স্বরণ রেখেছেন যা অন্যেরা পারেন নি। আর ثقة-এর زيادة গ্রহণযোগ্য।

قوله او ضار-এর অর্থ كلب ضار এখানে موصوف-কে صفت-এর দিকে اضافت করা হয়েছে। (اضافة الموضوف الى الصفت)

كلب ضار বলা হয় ঐ কুকুর কে যা শিকারে অভ্যস্ত হয়েছে। বলা হয় ضرى الكلب اذاتعود

সওয়াব কম হওয়ার কারণ

কুকুর পালন করলে সওয়াব কমে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম নববী (রহ.) বলেন "আলিমগণ এর কারণে সওয়াব কমে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিভিন্ন মত পেশ করেছেন। কেউ বলেন, কুকুর থাকার কারণে ফেরেস্তারা ঘরে প্রবেশ করে না ফলে সওয়াব কমে যায়। কেউ বলেন, এর কারণে পথচারীরা কষ্টের সম্মুখীন হয়, কেননা কুকুর পথচারীদের আক্রমণ করে এবং ভীত সন্ত্রস্থ করে। কেউ বলেন, এটা তাদের শাস্তি। কেন সে নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হলো? কেউ বলেন, কুকুর মালিকের অসাবধানতার সুযোগে পাত্র ইত্যাদিতে মুখ দিয়ে বসে, অথচ জানা না থাকার কারণে মাটি-পানি দ্বারা সেগুলো ধোয়া সম্ভব হয় না।

কুকুর পালা নিষিদ্ধ হওয়ার হেকমত

১। কুকুর স্বভাবের দিক দিয়ে শয়তানের মত হয়।

২। শয়তান কর্তৃক এরা ওয়াসওয়াসা গ্রহণ করে।

৩। মানুষকে কষ্ট দেয়।

৪। মৃত এবং নাপাক খায়।

৫। এরা অনেক রোগ বালা ও জীবাণু বহন করে। এর লালা চরম বিষাক্ত, যা মানুষের জন্য চরম ক্ষতিকর।

৬. কুকুর স্বজাতির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, এক কুকুর আরেকটিকে সহ্য করতে পারে না। প্রতিপালনকারীর মধ্যেও এর প্রভাব পড়ে।

এসব কারণে কুকুর পালতে নিষেধ করা হয়েছে। অন্যথায় প্রয়োজন থাকলে সেটা ভিন্ন কথা। এসব কারণ ছাড়াও আরো অনেক কারণ আছে।

باب حل اجرة الحجامة

অধ্যায় ঃ শিঙ্গা লাগানোর মজুরী হালাল হওয়া প্রসঙ্গে

عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْحِجَامَةِ فَقَالَ احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَجَمَهُ اَبُوْطَيْبَةَ فَاَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وكَلَّمَ اَهْلَهُ فَوَضَعُوْا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ وَقَالَ اِنَّ اَفْضَلَ مَاتَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ اَوْ هُوَ مِنْ اَمْثَلِ دَوَائِكُمْ ـ

"আনাস ইবনে মালিক (রা.)-কে শিঙ্গা লাগানোর মজুরী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন হুযূর (সা.) আবূ তাইয়্যিবা (রা.) দ্বারা শিঙ্গা লাগিয়ে তাঁকে (মজুরীস্বরূপ) দুই সা' খাদ্য প্রদানের আদেশ দেন। অতঃপর তার মালিকের সাথে আলোচনা করেন ফলে তাঁরা তার থেকে পরিশ্রমিক কমিয়ে দেন। রাসূল (সা.) এও বলেন তোমরা যা দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ কর শিঙ্গা সেগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম।

(এখানে কয়েকটি আলোচনা)

১। حجم ابو طيبة বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী আবূ তাইয়্যিবার আসল নাম নাফে'। কেউ তাঁর নাম দীনার, কেউ মাইসারা বলেছেন। ১৪৩ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন।

২। فامرله بصاعين হুযূর (সা.) কর্তৃক মজুরী প্রদান করা (শিঙ্গা লাগিয়ে মজুরী নেয়া হালাল হওয়া) প্রমাণ করে। হালাল না হলে হুযূর (সা.) কখনও মজুরী দিতেন না। জাবের (রা.) বলেন ঃ لوكان حراما لم يعطه

ফেকহী উসূল হলো যা নেয়া হারাম সেটা দেয়াও হারাম। যেমন— সুদ, ঘুষ ইত্যাদি। অবশ্য অপারগ কিছু ক্ষেত্রে ঘুষ প্রদান করা জায়িয আছে। হুযূর (সা.) এর জন্য মজুরী দেয়া জরুরী ছিল না। ইচ্ছা করলে তিনি বিনা মজুরীতে কাজ করিয়ে নিতে পারতেন।

অবশ্য (২৫তম অধ্যায়ে) হযরত রাফে'র (রা.) হাদীসে শিঙ্গা লাগানোর মজুরীকে شرالكسب বলা হয়েছে। যার কারণে কতক আলিম একে হারাম বলেছেন। যেমন—

১। কতক আহলে জাহেরের মতে এটা সর্বাবস্থায় হারাম।

২। মুহাদ্দিস, ফকীহগণ এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের (রহ.) মতে গোলামের জন্য এই পেশা জায়িয, স্বাধীন ব্যক্তির জন্য মাকরূহ। স্বাধীন ব্যক্তি নিজের জন্য এই মজুরী খরচ করতে পারবে না। অবশ্য গোলাম, জন্তু ইত্যাদির পিছনে খরচ করতে পারবে। কেননা রাসূল (সা.) বলেন— اعلفه ناضحك ورقيقك "শিঙ্গা লাগানোর মজুরী উটের ঘাস কিনতে ও গোলামের পিছনে ব্যয় করা তবে জমহুরের মতে এটা জায়িয। لحديث الباب কেননা এই অধ্যায়ের হাদীসে একে বৈধ বালা হয়েছে।

হাদীসের জবাব

১। হাদীসে خبيث বলে হারাম বুঝানো হয়নি। বরং "নিকৃষ্ট" একথা বুঝানো হয়েছে। কেননা রক্ত চুষে পয়সা উপার্জন করা কোন মুসলমানের জন্য সাজে না।

২। হযরত আনাসের (রা.) হাদীস দ্বারা এই হাদীস منسوخ হয়ে গেছে। (তৃতীয় আলোচনা) ঃ

قوله: فوضعوا عنه من خراجه

خراج-এর পদ্ধতি হলো মালিক গোলামকে বলবে উপার্জন করে মাসিক বা সাপ্তাহিক নির্দিষ্ট একটি পরিমাণ আমাকে প্রদান কর। নির্দিষ্ট ঐ পরিমাণকে خراج এবং ضريبه বলা হয়। আবু তাইয়্যিবার (রা.) خراج ছিল দুই সা'। হুযূর (সা.) সুপারিশ করে এক সা' কমিয়ে দেন।

৪। **قوله** : ان افضل ما تداويتم به الحجامة

ডাক্তারী মতে গ্রীষ্মপ্রধান এলাকায় শিঙ্গা লাগানো শরীরের জন্য উপকারী। এজন্য افضل ما تداويتم الخ-এর বিষয়টা আরব এবং গরম এলাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা তাদের রক্ত খুব পাতলা হয়ে থাকে। শরীরের বাহির অংশে রক্ত জমা হতে থাকে। এ আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, এ হুকুম বৃদ্ধ নয় এমন লোকদের জন্য। কারণ বৃদ্ধদের শরীরে তাপমাত্রা কম। ইমাম তাবারী সহীহ্ সনদের সাথে ইবনে সীরীন (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন—

قَالَ إِذَا بَلَغَ الرَّجُلُ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً لَمْ يَحْتَجِمْ ـ

অর্থাৎ, কারো চল্লিশ বছর বয়স হয়ে গেলে সে শিঙ্গা লাগাবে না। শ্রেষ্ঠত্বের এই মাপকাঠি শরীয়তভিত্তিক নয়, বরং ডাক্তারী অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করা হয়েছে। কেননা যেসব নির্দেশ শরীয়ত সংশ্লিষ্ট নয় সে সব বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ

اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْئٍ مِنْ دِيْنِكُمْ فَخُذُوْا بِهِ وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْئٍ مِنْ رَأْيِىْ فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ ـ

"আমি একজন মানুষ। শরীয়তের যে সব বিষয়ের নির্দেশ দেই সেগুলো গ্রহণ কর। আর জাগতিক যেসব বিষয়ের নির্দেশ দেই এতে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল নাও হতে পারে। কেননা আমি একজন মানুষ। تابير نخل-এর ঘটনা এর সত্যতা প্রমাণ করে।

وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ اَنَسٌ عَنْ كَسْبِ الْحَجَامِ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ اَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحَجَامَةُ وَالْقَسْطُ الْبَحْرِىُّ وَلاَتُعَذِّبُوْا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ ـ

قسط بحرى একে كست ও বলা হয়। এটা এক প্রকারের সুগন্ধি যা লোবান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আল্লামা মহিউদ্দীন ইবনু আরাবী (রহ.) বলেন, "এটা দুই প্রকার। ১. হিন্দুস্তানী, এর রঙ কালো। ২. সামুদ্রিক এটার রঙ সাদা। قسط هندى-এর মধ্যে তাপের প্রখরতা বেশি। হাদীসে উভয় প্রকার قسط-এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।" এখানে قسط بحرى-এর কথা সুস্পষ্টভাবে'বলা হয়েছে। قسط هندى সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন عليكم بهذا العود الهندى (বুখারী উম্মে কাইস (রা.) থেকে)।

৬। قوله : ولاتعذبوا صبيانكم بالغمز -তোমরা যখম করে শিশুদেরকে কষ্ট দিও না। আরব রমণীরা عذرة (গলার রোগ) হলে বাচ্চাদেরকে গলায় যখম করে দিত।

عذرة গলার এক প্রকার রোগের নাম। কেউ বলেন, কান এবং হলকের মাঝখানে যে ফোঁড়া হয় তাকে عذرة বলা হয়। হুযূর (সা.) عذرة রোগ হলে যখম না করে قسط بحرى দ্বারা চিকিৎসা করার পরামর্শ প্রদান করেন।

باب تحريم بيع الخمر

অধ্যায় ঃ মদ বিক্রয় হারাম হওয়া সম্পর্কে

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطَبُ بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ : يٰاَيُّهَا النَّاسُ ، اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَعْرِضُ بِالْخَمْرِ وَلَعَلَّ اللّٰهَ سَيَنْزِلُ فِيْهَا اَمْرًا فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْئٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ ـ قَالَ فَمَا لَبِثْنَا اِلاَّ يَسِيْرًا حَتّٰى قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى حَرَّمَ الْخَمْرَ فَمَنْ اَدْرَكَتْهُ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْئٌ فَلاَ يَشْرَبُ وَلاَ يَبِيْعُ قَالَ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِىْ طَرِيْقِ الْمَدِيْنَةِ فَسَفَكُوْهَا ـ

خمر-এর শাব্দিক অর্থ ঢাকা, গোপন করা। যেহেতু এটা মানুষের বুদ্ধিকে লোপ করে দেয় এজন্য একে خمر বলা হয়। যাবতীয় বিষয়াদীর সুষ্ঠু পরিচালনা মানবতার ভিত্তি এই عقل। মদ পানের দ্বারা মানুষের মনুষত্ব থাকে না বরং ইতর জানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে পাগলা কুকুরের মত সর্বপ্রকার মন্দ কাজে লিপ্ত হয়। এজন্য শরীয়ত একে হারাম করেছে। কুরআন, হাদীস, ইজমা এবং কিয়াস দ্বারা অকাট্যভাবে এটার হারাম হওয়া সুপ্রমাণিত। কেউ একে হালাল মনে করলে সে কাফির হয়ে যাবে।

মদ হারাম হওয়ার ক্রমবিন্যাস

আবরবাসী আগা গোড়া মদে ডুবে থাকত। এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া ছিল কষ্টকর। এ কারণে যদি প্রথম পর্যায়েই মদ হারাম করা হত তাহলে তাদের জন্য এক মারাত্মক সমস্যা হয়ে দেখা দিত। এ কারণে আস্তে আস্তে মদকে হারাম

করা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মদের ব্যাপারে চারটি আয়াত নাযিল হয়েছে। প্রথম আয়াত মক্কায় নাযিল হয়। যথা—

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا ـ

এই আয়াতে মূলত তাদের রেওয়াজ ও অভ্যাসের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

এরপর হযরত ওমর (রা.) মুয়ায (রা.) এবং কতিপয় আনসারী সাহাবা (রা.) হুযূর (সা.) এর কাছে আগমন করে বলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! মদের ব্যাপারে আমাদেরকে চূড়ান্ত ফয়সালা দিন। কেননা এটা বিবেককে ধ্বংস করে এবং সম্পদ নিঃশেষ করে।

এই ঘটনার পর দ্বিতীয় আয়াত নাযিল হয় ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ـ

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর কেউ কেউ اثم (গুনাহর) দিকে খেয়াল করে মদপান ছেড়ে দেন। আর কেউ কেউ منافع-এর দিকে খেয়াল করে পান করা অব্যাহত রাখেন।

কিন্তু যেই জিনিসে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি সেটাকে কিভাবে হালাল রাখা যায়? স্বয়ং এই আয়াতেই ইরশাদ করা হয়েছে যে, অতিসত্ত্বর একে হারাম করা হবে। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন—

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ يَعْرِضُ بِالْخَمْرِ وَلَعَلَّ اللّٰهَ سَيَنْزِلُ فِيْهَا اَمْرًا الخ

অন্য রেওয়ায়াতে আছে হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন— اِنَّ رَبَّكُمْ مُقَدِّمٌ فِىْ تَحْرِيْمِ الْخَمْرِ "তোমাদের প্রভু মদ হারাম করার ব্যাপারে বেশি অগ্রগামী।

এরই মধ্যে একটি ঘটনা ঘটে যায়। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) কয়েকজন লোককে দাওয়াত করলেন। খাওয়া দাওয়ার পর আরবের রীতি অনুযায়ী মদের আসর বসল। যখন মাগরিবের সময় আসল তখন নেশা নিয়েই সবাই নামাযে দাঁড়ালেন। ইমাম সাহেব قُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ لَآ اَعْبُدُ

مَاتَعْبُدُوْنَ-এর স্থলে اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ পড়লেন। নাজুক এই অবস্থার পর তৃতীয় আয়াত নাযিল হয়। يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى -

এতে শুধু মাত্র নামাযের সময় মদ পান হারাম করে বাকি সময়ের জন্য হালাল রাখা হয়। এরপর হযরত ইতবান ইবনে মালেক (রা.) দাওয়াতের খাবার প্রস্তুত ও উটের গোশত ভুনা করে কয়েজন সাহাবাকে দাওয়াত দেন। যাঁদের মধ্যে হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) উপস্থিত ছিলেন। সাহাবাগণ শরাব পান করার পর নিজেদের গোত্রীয় বন্দনায় মেতে উঠেন এবং হযরত সা'দ (রা.) আনসারী সাহাবাদেরকে কুৎসা ও নিজের কওমের প্রশংসাসূচক একটি কসীদা (কবিতা) আবৃত্তি করেন। এতে আনসারী সাহাবী ক্ষিপ্ত হয়ে হযরত সা'দের (রা.) মাথায় উটের হাড্ডি দিয়ে আঘাত করেন। হযরত সা'দ (রা.) আঘাত পেয়ে হুযূর (সা.) এর কাছে আনসারী ঐ সাহাবীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন এবং বলেন اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِى الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا-এরপর চতুর্থ আয়াত নাযিল হয়ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ... فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ - سوره مائدة - أيت ٩٠-٩١

আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর হযরত ওমর (রা.) উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন انتهينا انتهينا (আমরা বিরত হলাম, বিরত হলাম)

এ সময় সকল সাহাবা মদ পান করা ছেড়ে দেন এবং পাত্রগুলো ভাঙতে শুরু করেন। এমন কি মদীনার ড্রেনগুলোতে পানির ন্যায় শরাব প্রবাহ হতে লাগল। এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত মদ হারাম করা হলো।

২। يسئلونك عن الخمر নাযিল হওয়ার পর রাসূল (সা.) বললেন, "যার কাছে মদ আছে সে যেন, একে বিক্রি করে (বা অন্য কোন পন্থায়) লাভবান হয়। (فمن كان عنده منها شيئ فليبعه ولينتفع به) এর দ্বারা একথা বুঝা যায় যে, শরীয়তের হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে প্রত্যেক বস্তু مباح-এর হুকুম রাখত। ফেকহী উসূল হলো اصل الاشياء الاباحة। প্রত্যেক বস্তুর আসল হলো মুবাহ হওয়া।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন— وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلاً

আয়াতও একথার সমর্থন যোগায়। এমনিভাবে হুযূর (সা.) এর এই কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি যেমন আখেরাতের ব্যাপারে মানুষের কল্যাণ কামী ছিলেন তেমনিভাবে দুনিয়ার ব্যাপারেও ছিলেন কল্যাণকামী। তাই তো তিনি সাহাবাদেরকে বললেন যতক্ষণ হালাল আছে ততক্ষণ এর দ্বারা ফায়দা হাসিল করে নাও।

শরাবের হুকুম সম্পর্কীয় ইখতিলাফ

শরাব হারাম এ ব্যাপারে সবাই একমত। কিন্তু এর আহকামের تفصيل এর ব্যাপারে তিনটি মত পাওয়া যায়।

১. তিন ইমাম, (মালেক, শাফেঈ, আহমদ) ইমাম মুহাম্মাদ এবং জমহুর ইমামগণের মতে সর্বপ্রকার নেশাজাত শরাব হারাম। চাই আঙ্গুর দিয়ে বানানো হোক বা অন্য কিছু দিয়ে, কম-বেশি সব হারাম, চাই মাদকতা আসুক বা না আসুক। পানকারীকে হদ লাগানো হবে। এগুলো নাপাক যা বিক্রি করা নাজায়িয।

২. ইমাম রাবী'আ, দাঊদ জাহেরীর মতে সকল প্রকার মদ হারাম তবে নাপাক নয়।

৩. ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, ইবরাহীম নখয়ী এবং বসরার কতিপয় ইমামের দৃষ্টিকোণে মদ তিন ভাগে বিভক্ত।

১. আঙ্গুরের কাঁচা রস টগবগ করে এবং তীব্র ঝাঁজ সৃষ্টি হয়। তথা ঃ

(اَلنَّيْئُ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ اِنِ اشْتَدَّ وَغَلاَ وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ ـ وَلاَ يَشْتَرِطُ اَبُوْ يُوْسُفَ قَذَفَ الزَّبْدِ)

প্রকৃত মদ এটাই যাতে কোন রূপ সন্দেহ নেই। এর কম বেশি সব হারাম। এক ফোঁটা পান করলেও শাস্তি প্রদান করতে হবে। এটা নাপাক। ক্রয়-বিক্রয় হারাম। নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী চিকিৎসার জন্যও ব্যবহার করা যাবে না।

২. হারাম তিন প্রকার মদ। যথা ঃ (ক) طلاء অর্থাৎ আঙ্গুরের রস জাল দেয়ার পর দুই তৃতীয়াংশের কম শুকিয়ে যাওয়া। (খ) نقيع التمر অর্থাৎ খেজুরের কাঁচা রস। একে سكر ও বলা হয়। (গ) نقيع الزبيب অর্থাৎ ঐ

পানি যাতে কয়েক দিন যাবত কিশমিশ ভিজিয়ে রাখার কারণে এতে তীব্রতা ও ঝাঁজ সৃষ্টি হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) মতে উল্লেখিত এই তিন প্রকার 'মদ' এবং এগুলো নাপাক। এর ক্রয়-বিক্রয় হারাম, কম হোক বা বেশি। অবশ্য এই তিন প্রকারের 'মদ' হওয়াটা প্রথম প্রকারের মত অতোটা অকাট্য নয়। خمر হওয়ার ব্যাপারে এগুলোর মধ্যে কিছুটা সন্দেহ রয়েছে। একারণে এগুলো পান করলে হদ জারী করা যাবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত মাতাল না হয়। মোটকথা অনেক দিক দিয়ে প্রথম প্রকার মদের সাথে এই তিন প্রকার মদের মিল রয়েছে। যার কারণে এগুলো নাপাক এবং কম-বেশি যাই হোক বিক্রি করা নাজায়িয। এদিকে তৃতীয় প্রকার মদের সাথেও (যার বর্ণনা পরে আসছে) এর মিল রয়েছে। একারণে নেশা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত পানকারীর উপর হদ জারী হবে না।

ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) মতে এই প্রকারের মদ ক্রয়-বিক্রয় করা জায়িয তবে মাকরূহ। সাহেবাঈনের মতে প্রথম প্রকারের মত এটাও ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম। ফতওয়া সাহেবাঈনের মতের ওপর।

একটা কথা স্বরণ রাখা উচিত যে, কেউ কেউ মনে করে ইমাম আবূ হানীফার মতে এই তিন প্রকার 'মদ' নয়। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। কেননা তাঁর মতে এগুলো যদি মদই না হত তাহলে সামান্য পরিমাণ পান করা নাজায়িয হত না এবং একে তিনি নাপাক বলতেন না।

বিশুদ্ধ কথা এটাই যে, উল্লেখিত এই তিন প্রকার মদও আবূ হানীফার (রহ.) মতে خمر-এর মধ্যে গণ্য। তবে এর خمر হওয়াটা ظنى এ কারণে অল্প পরিমাণ পান করলে হদ জারী হয়না। কেননা (ظن) সন্দেহ থাকলে হদ মাফ হয়ে যায়। الحدود تندرئ بالشبهات। ই'লাউস্সুনান-খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ২০

তৃতীয় প্রকার মদ হলো ঐ মদ যা, প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার বস্তু ছাড়া অন্য কোন বস্তু দ্বারা বানানো হয়। যেমন, আঙ্গুরের রস, খেজুরের রসকে হালকাভাবে পাকানো। আঙ্গুরের পাকানো রস, যখন এর দুই তৃতীয়াংশ শুকিয়ে যায়। এমনিভাবে, মধু, আঞ্জির ফল, গম, যব, প্রভৃতি বস্তু দ্বারা বানানো মদ।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ও ইমাম আবূ ইউসুফের মতে এই প্রকার মদ যতটুকু পান করলে মাদকতা আসে ততটুকু পান করা নাজায়িয আর যতটুকু পান করলে মাদকতা আসেনা ততটুকু জায়িয। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদের (রহ.) মতে এতটুকু পান করাও হারাম। আহনাফের ফতওয়া এই মতের ওপর। তবে

ক্রয়-বিক্রয় এবং পবিত্রতার ক্ষেত্রে ফতওয়া আবূ হানীফার (রহ.) মতের ওপর। অর্থাৎ এগুলো পাক এবং বিক্রি করা জায়িয তবে মাকরূহ।

উল্লেখ্য যে, ২য় ও ৩য় প্রকার মদ ক্রয়-বিক্রয় ঐ সময় মাকরূহ যখন কোন নাজায়িয উদ্দেশ্য থাকে। যদি জায়িয কোন কারণে বিক্রয় করা হয় তাহলে মাকরূহ হবেনা। —রদ্দুল মুহতার

মদকে রূপান্তর করে সিরকা বানানোর হুকুম

মদকে রূপান্তর করে সিরকা বানানো যাবে কি-না এ সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যথা ঃ

১। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) সাহেবাঈন, ইমাম আওযায়ী ও জমহূর আহলে কুফার মতে মদকে সিরকা বানিয়ে তা ব্যবহার করা জায়িয।

দলীল ঃ ١. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : نِعْمَ الْاِدَامُ الْخَلُّ ـ

হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন, সিরকা অতি উত্তম এক তরকারী। এই হাদীসে সিরকাকে উত্তম বস্তু হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সুতরাং বুঝা যায় সিরকা বানানো জায়িয—চাই যে কোন বস্তু দ্বারা হোক না কেন।

٢. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ خَلِّكُمْ خَلُّ خَمْرِكُمْ ـ

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন—তোমাদের মদকে রূপান্তর করে বানানো সিরকা সর্বোত্তম সিরকা।

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় মদ থেকে বানানো সিরকা যেহেতু সবচেয়ে উত্তম—সেহেতু মদকে সিরকায় রূপান্তর করা জায়িয।

৩। যৌক্তিক দলীল (কিয়াস) ঃ উসূলবিদগণের সর্বসম্মত রায় হলো, বস্তুর মৌলিক অবস্থা পরিবর্তিত হলে এর হুকুমও পরিবর্তন হয়ে যায়। আলোচ্য মাসআলায় এই নিয়ম অনুযায়ী মদকে রূপান্তর করে সিরকা বানানো জায়িয হওয়ারই কথা।

পক্ষান্তরে ইমাম মালেক, শাফেঈ আহমদ প্রমুখের মতে মদকে সিরকায় রূপান্তর করা জায়িয নেই।

দলীল ঃ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ يُتَّخَذُ خَلاًّ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ .

"রাসূল (সা.)-কে মদ রূপান্তর করে সিরকা বানানোর বৈধতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি নেতিবাচক জওয়াব দেন। —মিশকাত

আহনাফের পক্ষ থেকে এর জওয়াব

ওলামায়ে আহনাফ উভয়বিদ হাদীসের সামঞ্জস্য সাধনে বলে থাকেন—নিষেধাজ্ঞার হাদীসটি نهى تنز يهى-এর জন্য। অর্থাৎ এরূপ করা নিষেধ হলেও হারাম নয়। তাছাড়া এই হুকুমটি সে সময়ের যখন সবেমাত্র মদকে হারাম করা হয়েছিল। সুতরাং মানুষের মনমগজ থেকে সম্পূর্ণভাবে মদের অস্তিত্ব দূর করতে এরূপ কড়া আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এর মানে এই নয় যে, এরূপ করা সত্যিই নাজায়িয।

এলকোহেল (ALCOHALS)-এর হুকুম

আজকাল ঔষধ, সেন্ট প্রভৃতি বস্তুর মধ্যে নেশাজাত দ্রব্য এবং এলকোহেল ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এলকোহেল যদি আঙ্গুর বা খেজুর দিয়ে বানানো না হয় তাহলে আবূ হানীফার (রহ.) মতে এটা খরিদ করা, ব্যবহার করা সব জায়িয। তবে শর্ত হলো নেশা সৃষ্টি না হতে হবে। আর যদি আঙ্গুর বা খেজুর দিয়ে বানানো হয় তাহলে ব্যবহার, ক্রয়-বিক্রয় কোনটাই জায়িয নয়।

তবে বর্তমানে এলকোহেল সাধারণতঃ আঙ্গুর বা খেজুর দ্বারা বানানো হয়না বরং মধু, যব, আনারস, পেট্রোল প্রভৃতি বস্তু দিয়ে বানানো হয়।

সুতরাং সামগ্রিকভাবে মানুষ এর ব্যবহারে লিপ্ত হওয়ায় ইমাম আবূ হানীফার মত অনুযায়ী ঔষধের ক্ষেত্রে ব্যবহার এবং বেচাকেনা জায়িয বলে ফতওয়া দেয়া উচিত।

মদপানের শাস্তি

মদপানের শাস্তি (حد خمر) সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। যথা ঃ

১। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.), সাহেবাঈন, ইমাম মালেক, হাসান বসরী, ইমাম শা'বী (রহ.) প্রমুখের মতে মদ পানের শাস্তি ৮০ বেত্রাঘাত।

২। ইমাম শাফেঈ (রহ.) আহমদ (রহ.) এবং আহলে জাহেরের মতে-এর শাস্তি ৪০ বেত্রাঘাত।

প্রথম মাযহাবের দলীল

১। ইজমা। আবূ আমর বর্ণনা করেন ঃ হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে এর শাস্তি ৮০ বেত্রাঘাত-এ ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কেউ এর বিরোধিতা করেননি। —তান্‌জিমুল আশতাত-খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫৪

٢. وَفِىْ رِوَايَةٍ اَنَّ عُمَرَ اِسْتَشَارَعَلِيًّا فَقَالَ : اَرٰى اَنْ يُّجْلَدَ ثَمَانِيْنَ -

"হযরত ওমর (রা.) আলী (রা.)-এর কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে তিনি বললেন, আমার খেয়াল এর শাস্তি ৮০ বেত্রাঘাত।

٣. وَفِىْ رِوَايَةِ الْبُخَارِى مِنْ رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِيٍّ اَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ ثَمَا نِيْنَ

"বুখারী শরীফে ওবাইদুল্লাহ ইবনে আদীর রেওয়ায়াতে বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত আলী (রা.) মদপানের শাস্তি স্বরূপ ৮০টি বেত্রাঘাত করতেন।"

٤. وَقَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِىْ قَلِيْلِ الْخَمْرِ وَكَثِيْرِهَا ثَمَانُوْنَ جَلْدَةً -

"হযরত আলী (রা.) বলেন, মদপানের শাস্তি ৮০টি বেত্রাঘাত। চাই কম বা বেশি পান করুক।

৫। অন্য এক রেওয়ায়াতে বর্ণনা করা হয়েছে—

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ رَجُلًا بِجَرِيْدَ تَيْنِ اَرْبَعِيْنَ -

"হুযূর (সা.) মদপানের শাস্তি স্বরূপ এক ব্যক্তিকে খেজুর গাছের দু'টি ডাল দ্বারা ৪০ বার আঘাত করেন। আর দুই লাকড়ির ৪০ আঘাতের সমষ্টি দাঁড়ায় আশি বেত্রাঘাত।

দ্বিতীয় মাযহাবের দলীল

١. فِىْ رِوَايَةِ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضْرِبُ فِى الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيْدِ اَرْبَعِيْنَ -

"হুযূর (সা.) মদপানের কারণে জুতা বা খেজুর গাছের ডাল দিয়ে ৪০ বার আঘাত করতেন।"

২। جَلَدَ اَبُوْبَكْرٍ اَرْبَعِيْنَ "হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর খেলাফতকালে ৪০ আঘাত করেন।"

আহনাফের পক্ষ হতে ভিন্ন মাযহাবওয়ালাদের দলীলের জওয়াব

১। যে সব রেওয়ায়াতে ৪০ বার আঘাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে ঐ বেত বা লাকড়ি উদ্দেশ্য যার মাথা ছিল দু'টি। সুতরাং এরূপ লাকড়ি দ্বারা ৪০ বার আঘাত করলে চূড়ান্ত ফলাফলে এর সংখ্যা দাঁড়ায় ৮০ বেত্রাঘাত।

২। আসল কথা হলো, হুযূর (সা.) এবং হযরত আবূ বকর (রা.)-এর যমানায় এর শাস্তি ছিল ৪০ বেত্রাঘাত। পরবর্তীতে হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে বিভিন্ন দেশ বিজয়ের ফলে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী হওয়ার ফলে মুসলমানদের মধ্যে এক ধরনের বিলাসিতা প্রকাশ পেতে থাকে এবং নেশার জগতে ব্যস্ততার নিরিখে ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয়। অবস্থাদৃষ্টে হযরত ওমর (রা.) শঙ্কিত হন এবং এ অপরাধ সমূলে উৎপাটনের লক্ষ্যে কঠোর শাস্তি আরোপের ইচ্ছাপোষণ করেন। এ ব্যাপারে অন্যান্য সাহাবীদের কাছে পরামর্শ চাইলে তাঁরাও এর পক্ষে মত দেন এবং এভাবেই এক পর্যায়ে ইজমা সংগঠিত হয়ে যায় ৮০ বেত্রাঘাতের ব্যাপারে।

হিদায়া প্রণেতাও ইজমাকে এর প্রধান দলীল আখ্যায়িত করেছেন। ৪০ আঘাতের প্রবক্তা ইমাম শাফেঈও উপযুক্ততার খাতিরে ৪০-এর বদলায় ৮০ বেত্রাঘাত করা জায়িয বলে মনে করেন।

এর দ্বারা বুঝা যায় ৪০ সংখ্যা এমন নয় যে, এর বেশি আঘাত করা জায়িয নেই। -দ্রষ্টব্য, মেরকাত খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১৭৫, তা'লীক খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৮৩

মদপানকারীকে কতল করা যাবে কি-না ঃ

عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قال : فان عاد فى الرابعة فاقتلوه .

"মদপানকারী যদি চতুর্থবার পান করে তাহলে তাকে হত্যা করো।"

কাজী ইয়াজ (রহ.) এই হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন—নগণ্য সংখ্যক একদল আলিমের মতে কেউ যদি চতুর্থ বারের পর পঞ্চম বার মদ পান করে তবে তাকে কতল করতে হবে। অর্থাৎ এই হাদীসের অর্থ হলো—

يَقْتَلُ بَعْدَ جَلْدِهِ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ لِحَدِيْثِ جَابِرٍ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فَاِنْ عَادَ فِى الرابعة فاقتلوه .

কিন্তু ইমাম নববী (রহ.) ও আল্লামা ইবনে হুমামের (রহ.) মতে, মদপানকারীকে হত্যা না করার ব্যাপারে ইজমা হয়েছে—যদিও সে অসংখ্যবার পান করে। কেননা জাবের (রা.)-এর এক হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে—

ثُمَّ أُتِيَ النَّبِيَّ بَعْدَ ذٰلِكَ رَجُلٌ الخ ـ

“রাসূল (সা.)-এর কাছে এক ব্যক্তিকে পেশ করা হয়, যে চতুর্থ বার মদ পান করেছিল। রাসূল (সা.) তাকে প্রহার করেন, কিন্তু কতল করেননি।

باب تحريم بيع الخمرو الميتة والخنزير والاصنام

অধ্যায় ঃ মদ, মৃত প্রাণী, শুয়োর এবং মূর্তি বিক্রি হারাম হওয়া প্রসঙ্গে

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ الْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ الخ ـ

ميتة -এর পরিচয় ঃ শরীয়ত সম্মত পন্থায় যবেহ করা ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণকারী প্রাণীকে ميتة বলা হয়। সর্বসম্মতিক্রমে মৃত প্রাণীর গোশত বিক্রি করা, খাওয়া বা অন্য কোন পন্থায় এর দ্বারা উপকৃত হওয়া হারাম। তবে মাছও টিড্ডি এই হুকুমের বাইরে।

মৃত প্রাণীর পশম, হাড্ডি, শিং, খুর ইত্যাদিতে প্রাণ বিরাজ করেনা। এসবের হুকুমের ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে।

১। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে প্রাণী মৃত্যুবরণ করায় এসব বস্তু নাপাক হয় না। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয় করা বা অন্য কোন পন্থায় এর দ্বারা লাভবান হওয়া জায়িয।

২। ইমাম শাফেঈ (রহ.) ইমাম আহমদের (রহ.) মতে মৃত প্রাণীর সকল অংশ নাপাক। সুতরাং এটা ক্রয়-বিক্রয় করা এবং অন্য কোনভাবে উপকৃত হওয়া সম্পূর্ণ নাজায়িয।

ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর দলীল

ইমাম শাফেঈ (রহ.) হাদীসের ব্যাপকতা দ্বারা দলীল পেশ করেন। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন ঃ إِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ ـ

আহ্নাফের দলীল

(١) قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ـ

আয়াতে পশম, চুল ইত্যাদি বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

(٢) عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْتَشِطُ مِنْ عَاجٍ ـ

রাসূল (সা.) হাতির দাঁত দ্বারা চিরুনী করতেন। ইমাম বুখারী (রহ.) যুহরী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, পূর্ববর্তী লোকগণ হাতির দাঁত দ্বারা চিরুনী করতেন।

(٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّمَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مِنَ الْمَيْتَةِ لَحْمَهَا فَاَمَّا الْجِلْدُ وَالشَّعْرُ وَالصُّوْفُ فَلَابَأْسَ بِهٖ ـ

রাসূল (সা.) মৃত প্রাণীর গোশত হারাম করেছেন। চামড়া, চুল, পশম, ইত্যাদি ব্যবহার করাতে দোষ নেই। —দারে কুতনী

(٤) عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ تَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : لَا بَأْسَ بِمِسْكِ الْمَيْتَةِ اِذَا دُبِغَ وَلَا بَأْسَ بِصُوْفِهَا وَشَعْرِهَا وَقُرُوْنِهَا اِذَا غُسِلَ بِالْمَاءِ ـ دار قطنى

মৃত প্রাণী দাবাগাত করার পর এর মোশক ব্যবহার করাতে দোষ নেই। এমনিভাবে পানি দিয়ে ধোয়ার পর এর চুল, পশম এবং শিং ব্যবহার করাতে কোন দোষ নেই। —দারে কুতনী

মানুষের লাশের হুকুম

মানুষের লাশ বিক্রয় এবং এর দ্বারা কোনভাবে উপকৃত হওয়া জায়িয নেই। এই হুকুমের ক্ষেত্রে মুসলমান-কাফির এক বরাবর। মুসলমানের লাশ সম্মানিত হওয়ার কারণে এবং কাফিরদের লাশের ব্যাপারে রাসূল (সা.)-এর নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে নিষেধ। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন—মুশরিকরা অপর একজন মুশরিকের লাশ ক্রয়ের ইচ্ছা করলে রাসূল (সা.) বিক্রয় করতে অস্বীকার করেন। এটি খন্দকের ঘটনা। নাওফেল ইবনে আব্দুল্লাহ খন্দক অতিক্রম করার চেষ্টা

করলে মুসলমানরা তাকে হত্যা করে ফেলে। মুশরিকরা তার লাশ ক্রয় করতে চাইলে রাসূল (সা.) অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে বলেন— لاحاجة لنا بجسده ولابثمنه

خنزير ঃ শুয়োর এবং এর যাবতীয় অঙ্গের কোন অঙ্গ দ্বারা উপকৃত হওয়া সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়িয। অবশ্য হানাফী ফকীহগণ কোন একসময় এর পশম দ্বারা জুতা সেলাই করা জায়িয বলে রায় দিয়েছিলেন। কেননা শুয়োরের পশম ছাড়া সে সময় এই কাজ সম্ভব হতনা। আর নিয়ম আছে—"প্রয়োজন অনেক সময় নিষিদ্ধ জিনিসকে জায়িয করে দেয়।" ক্রয় করা ছাড়া যদি এটা হস্তগত করা সম্ভব না হত তাহলে ক্রয় করারও অনুমতি দেয়া হয়েছিল। তবে মুসলমান বিক্রেতার জন্য মূল্যভোগ করা হারাম ছিল।

পরবর্তীতে যখন এই পশমের বিকল্প পাওয়া গেল তখন জরুরত না থাকায় এটা নাজায়িয হয়ে যায়। আল্লামা মুকাদ্দেসী (রহ.) বলেন—"আমাদের যুগে এর প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। সুতরাং জরুরত না থাকায় একে পবিত্রতার হুকুম দেয়া এবং ব্যবহার করা জায়িয হবেনা। —রদ্দুল মুহতার

اصنام - صنم বলা হয় যার মধ্যে ছবি থাকে, চাই جسم থাকুক বা না থাকুক। আর وثن বলে যার মানব দেহের মত আকৃতি রয়েছে। সুতরাং কাগজে বানানো ছবি تصوير-এর মধ্যে শামিল যদিও وثن-এর মধ্যে গণ্য নয়।

اصنام বিক্রি করা সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়িয। হ্যাঁ যদি ভেঙে ফেলা হয় এবং এর টুকরো অংশ দ্বারা উপকৃত হওয়ার ব্যবস্থা থাকে তাহলে কতিপয় হানাফী ও শাফেঈর মতে এই টুকরো অংশ বিক্রি করা জায়িয।

قَوْلُهُ : فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَاِنَّهُ يُطْلٰى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهِ الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ -

হাদীসে মৃতপ্রাণীর চর্বি দ্বারা তিনভাবে উপকৃত হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

১। নৌকার (তলায়) মাখানো (মসৃণ করার জন্য)।

২। মজবুত করার জন্য চামড়ায় মিলানো এবং

৩। বাতি জ্বালানো।

হাদীসের মতলব হলো, মৃত প্রাণীর চর্বি দ্বারা এই তিন পন্থায় উপকৃত হওয়া যায় সুতরাং চর্বি বিক্রি করা জায়িয হবে কিনা? উত্তরে হুযূর (সা.) বলেন 'না', এটা হারাম।

هـو যমিরের مـرجـع নির্ণয়ে আলিমগণ ইখতিলাফ করেছেন। অধিকাংশ শাফেঈগণ বলেন এর مـرجـع হলো بـيـع, সে মতে প্রাণীর চর্বি বিক্রি করা জায়িয নেই তবে অন্যভাবে উপকৃত হওয়া যাবে। আর আহনাফের মতে এর مـرجـع হলো انـتـفـاع। তথা এর দ্বারা কোনভাবেই উপকৃত হওয়া যাবে না। ইবনে মাজার এক রেওয়ায়াতে لا هـن حـرام বলা হয়েছে। যা আহনাফের মতকে সমর্থন করে।

কেননা এক্ষেত্রে هـن-এর مـرجـع, شـحـوم এতে কোন সন্দেহ নেই। অতএব আহনাফের মতে মৃত প্রাণীর চর্বি দ্বারা কোনভাবে উপকৃত হওয়া জায়িয নেই।

قَـوْلُـهُ : قَـاتَـلَ الـلّٰـهُ الْـيَـهُـوْدَ اِنَّ الـلّٰـهَ عَـزَّوَ جَـلَّ لَـمَّـا حَـرَّمَ عَـلَـيْـهِـمْ شُـحُـوْمَـهُـمَـا اَجْـمَـلُـوْهُ ثُـمَّ بَـاعُـوْهُ فَـاَ كَـلُـوْا ثَـمَـنَـهُ .

আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদেরকে ধ্বংস করুন। আল্লাহ তা'আলা যখন চর্বি হারাম করে দিলেন তখন তারা একে গলিয়ে বিক্রি করল, অতঃপর এর মূল্য ভোগ করল।

جـمـل ، تـجـمـيـل ، اجـمـال . চর্বি গলানো। আরবী ভাষায় গলানোর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত চর্বিকে شـحـم বলা হয়। আর গলিয়ে ফেললে একে ودك বলে। চর্বি হারাম হওয়ার পর ইহুদীরা কৌশলে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করে এবং চর্বিকে ওয়াদাক বানিয়ে বিক্রি করা শুরু করে। অপকৌশলে লাভবান হতে চাওয়ায় হুযূর (সা.) তাদের প্রতি বদ দু'আ করেন।

কেননা কোন বস্তুর حـقـيـقـت তথা মৌলিক সত্ত্বা পরিবর্তন না করে শুধু নাম পরিবর্তন করলে হুকুমের মধ্যে কোন পার্থক্য হয়না। সুতরাং شـحـم - ودك উভয়টি হারাম ছিল।

যেসব ইমাম হীলা (حـيـلـة) কে (مـطـلـقـا) হারাম মনে করেন তাঁরা এই হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। কিন্তু আসল কথা হলো যেসব হীলার কারণে শরীয়তের হুকুম বাতিল হয়ে যায় সেসব হীলা হারাম। যেমন যাকাত ইত্যাদি বাতিল করার হীলা।

আর কেউ যদি নিজের অথবা অন্যের ক্ষতি দূর করার চেষ্টা করে এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকে অথবা হালাল কাজে আত্মনিয়োগ করার চেষ্টা করে কোন বৈধ পন্থা অবলম্বন করে তাহলে এই ধরনের হীলা জায়িয হবে। দলীল ঃ

١. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ ۔

"শুষ্ক ঘাস (ছন)-এর আটি দিয়ে আঘাত করুন (তথাপি) কসমভঙ্গকারী হবেন না।"

٢. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِيْ رَحْلِ اَخِيْهِ ۔

তাছাড়া হুযূর (সা.) নিজেও এ ধরনের তদবীর করেছেন। বোখারী ও মুসলিম শরীফের রেওয়ায়াতে হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, খায়বর এলাকার যাকাত উসূলকারী যখন দুই-সা' খারাপ খেজুর দিয়ে এক-সা' উত্তম খেজুর ক্রয় করার ইচ্ছা করলেন—যা একই جنس-এর মধ্যে কমবেশি হওয়ার কারণে সুদ হচ্ছিল—তখন রাসূল (সা.) বললেন—এরূপ করোনা। বরং খারাপ খেজুর বিক্রি করে সেই দিরহাম দিয়ে উত্তম খেজুর ক্রয় কর। এটা কী হীলা নয়?

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَلَغَ عُمَرُ اَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا : فَقَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ سَمُرَةَ

"হযরত ওমরের (রা.) কাছে এই সংবাদ পৌছল যে, সামুরা (রা.) শরাব বিক্রি করছেন। তখন ওমর (রা.) বললেন আল্লাহ তাঁকে ধ্বংস করুন!

হযরত সামুরা (রা.) কোন পদ্ধতিতে শরাব বিক্রি করতেন এসম্পর্কে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়।

১। আহলে কিতাবদের থেকে ট্যাক্স স্বরূপ মদ গ্রহণ করতেন। অতঃপর তাদের কাছেই আবার বিক্রি করে দিতেন। এধরনের ক্রয়-বিক্রয় তিনি জায়িয মনে করতেন।

২। সম্ভবতঃ তিনি আঙ্গুরের রস বিক্রি করতেন আর তারা এ থেকে শরাব তৈরি করত। ভবিষ্যত অবস্থার (مجاز مايول) প্রতি লক্ষ করে রসকেই শরাব বলা হয়েছে।

হযরত সামুরার (রা.) ব্যাপারে সত্যই শরাব বিক্রি করার ধারণা করা অবিশ্বাস্য। কেননা শরাব হারাম হওয়াটা সবার কাছে পরিষ্কার ছিল।

৩। এও সম্ভাবনা আছে যে, তিনি শরাবকে সিরকা বানিয়ে বিক্রি করতেন। তিনি এটাকে জায়িয মনে করতেন। আবূ হানীফার মাযহাব এটাই। ওমর (রা.) একে নাজায়িয মনে করে ভর্ৎসনা করেছেন। এটা ইমাম শাফেঈর মাযহাব।

৪। হযরত সামুরা (রা.) শরাবকে হারাম মনে করতেন ঠিকই কিন্তু বিক্রি করা জায়িয মনে করতেন।

মন্তব্য ঃ প্রথম মতটাই সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত। এক্ষেত্রে তাঁর এই কাজটি হয়নি। এর দৃষ্টান্ত হযরত বারীরা (রা.)-এর ঘটনা। হুযূর (সা.) বলেছিলেন— هُوَعَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَةٌ এই বাক্যটি কখনও কখনও ভর্ৎসনার অর্থে ব্যবহৃত হয়। সেক্ষেত্রে মূল অর্থ (বদ দু'আ) উদ্দেশ্য হয়না। আরবীতে এধরনের বহু শব্দ আছে যেগুলোর মূল অর্থ (বদ দু'আ) উদ্দেশ্য হয়না। যেমন— تربت يداك ، رغم انفك ، ويحك ، ويلك ইত্যাদি। সামুরার ক্ষেত্রে এরূপ অর্থই উদ্দেশ্য।

باب الربا

অধ্যায় ঃ সুদ সম্পর্কে

১। ربوا-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ

ربوا-এর শাব্দিক অর্থ, বৃদ্ধি পাওয়া। বলা হয় رَبَى الْمَالُ اِذَا زَادَ

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ـ

শরীয়তের পরিভাষায় ربوا বলা হয়— فَضْلُ مَالٍ بِلَاعِوَضٍ فِىْ مُعَاوَضَةِ مَالٍ بِمَالٍ তথা মালের বিনিময়ে মালের লেনদেনের ক্ষেত্রে বিনিময় ছাড়া বাড়তি একটি অংশকে।

২। ربوا-এর প্রকারভেদ

ربوا দুই প্রকার। (ক) ربواجلى একে ربوا نسيئة বলা হয়। অর্থাৎ ঋণ দিয়ে চক্রবৃদ্ধিহারে পরিমাণ বাড়ানো। ঋণ পরিশোধ করতে যত বিলম্ব হবে মূলধনের সাথে সুদ তত বাড়তে থাকবে। এভাবে এমনও হয় যে, একশত টাকা ঋণকে বাড়িয়ে এক হাজার পর্যন্ত পৌছানো হয়। এমন কি কোন কোন সময় তার ঋণ যাবতীয় সম্পদকে গ্রাস করে!

এটা জাহিলী যুগের বহুল প্রচলিত একটি প্রথা। এর দ্বারা যেহেতু মানুষ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং সামাজিকভাবে চরম বিপর্যয় সৃষ্টি হয় এজন্য

আল্লাহ একে হারাম ঘোষণা করেছেন। যে সুদ খায়, যে প্রদান করে, যে এর সাক্ষী হয় এবং যে এর লেখক বলে—সবার প্রতি লা'নত করা হয়েছে।

শুধু কী তাই? যারা সুদ ছাড়তে পারে না তাদের সাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। অন্য কোন কবীরা গুনাহর জন্য এতবড় ধমকি দেয়া হয়নি।

(খ) ربوا خفى একে ربوا الفضل বলা হয়। অর্থাৎ মাল একদিকে পরিমাণ বেশি হওয়া অপরদিকে কম হওয়া। যেমন এক দিরহামকে দুই দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করা।

যেহেতু এই প্রকার ربوا প্রথম প্রকার ربوا-এর কারণ হয়ে দাঁড়ায় এজন্য হারাম কাজের পথ বন্ধ করার জন্য একে হারাম করা হয়েছে। কেননা মানুষ বিনা কারণে এক দিরহামের বদলায় দুই দিরহাম দিবে না, নিশ্চয়ই এর কোন একটা অপরটার তুলনায় বিভিন্ন দিক দিয়ে লাভবান হওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এটা নগদ লাভ। আর এভাবেই চূড়ান্ত পর্যায়ে একদিন ربوا نسيئة-এর পথ খুলে যাবে। এজন্য পাপের পথ আগে থেকেই বন্ধ করার জন্য একে হারাম করা হয়েছে। হযূর (সা.) বলেন ঃ

لَاتَبِيْعُوا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ فَاِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمُ الرِّمَّا ـ (يعنى الربوا)

৩। ربا শব্দের প্রয়োগ।

উল্লেখিত দুই অর্থ (ربوا النسيئة ـ ربوا الفضل) ছাড়াও ربا শব্দটি নিম্নোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(১) অতিরিক্ত পাওয়ার আশায় কাউকে হাদিয়া দেওয়া। আল্লাহ বলেন—

وَمَا اٰتَيْتُمْ مِن رِّبًا لِيَرْبُوَا فِىْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْ عِنْدَ اللّٰهِ ـ

একদল মুফাসসির আয়াতের এরূপই তাফসীর করেছেন।

(২) নাজায়িয সকল প্রকার মালই ربا আল্লাহ তা'আলা বলেন— وَاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ একদল মুফাসসির আয়াতের এই অর্থই গ্রহণ করেছেন। দূররে মুখতারে বলা হয়েছে— اَلْبُيُوْعُ الْفَاسِدَةُ كُلُّهَا مِنَ الرِّبٰوا আল্লামা

ইবনুল আরাবী (রহ.) اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰو-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, সকল প্রকার بيع فاسد এই আয়াতের মধ্যে শামিল।

হযরত ওমর (রা.) পাকার আগে ফল বিক্রি করাকে ربا বলেছেন। ইবনে আবী আওফা (রহ.) দালালকে সুদখোর বলেছেন।

(৩) কখনও ربوا শব্দটি নাজায়িয আমলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়। যার মধ্যে কোন না কোনভাবে আধিক্যবোধক অর্থ পাওয়া যায়। যেমন, এক হাদীসে বলা হয়েছে— اِنَّ اَرْبٰى الرِّبَا اِسْتَطَالَةُ الرَّجُلِ فِىْ عَرْضِ اَخِيْهِ ـ

হযরত হাসান বসরী (রহ.)-এর একটি মুরসাল হাদীস—

مَازَادَ مِنَ الدَّعْوَةِ عَلٰى يَوْمَيْنِ فَهُوَ رِبًا ـ

তবে এই তিন অর্থে ربا শব্দের প্রয়োগ খুবই কম এবং সাধারণত مجاز (রূপক) অর্থেই এরূপ প্রয়োগ হয়ে থাকে। মূলতঃ প্রথম দুই অর্থেই ربا শব্দের বহুল প্রয়োগ।

حديث ابى سعيد الخدرى : عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ اِلاَّ مَثَلاً بِمَثَلٍ وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ ـ

"তোমরা স্বর্ণ-রৌপ্যকে সমান সমান করা ছাড়া বিক্রি করো না এবং এক অংশকে অপর অংশের ওপর বৃদ্ধি করোনা। আর এগুলো নগদের বদলায় বাকিতে বিক্রি করো না।"

সুদের علت নিয়ে আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে ঃ لا مثلا بمثل। لاتبيعوا الذهب بالذهب এখানে সোনা ও রুপা দুটি বস্তুর আলোচনা এসেছে। হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেতের (রা.) হাদীসে আরো কয়েকটি বস্তুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ

بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمَرُ بِالتَّمَرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مَثَلاً بِمَثَلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ ـ

আলোচ্য হাদীসে ছয়টি বস্তুর নাম উল্লেখ করে এক জাতীয় লেনদেনের ক্ষেত্রে কমবেশি এবং বাকিকে হারাম করা হয়েছে এবং সমান সমানকে জরুরী সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর যখন جنس পরিবর্তন হবে—যেমন, স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য, খেজুরের বদলায় গম—তখন কমবেশি (تفاضل) জায়িয, نسيئة (বাকি) হারাম। সুতরাং স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিনিময় করলে সমান সমান এবং নগদ হতে হবে। বাকি কিংবা কমবেশি হারাম।

এই ছয়টি বস্তুর মধ্যে ربا সীমাবদ্ধ কিনা

উল্লেখিত এই ছয়টি বস্তুর মধ্যে সুদ হওয়া নিশ্চিত। বাকি অন্য বস্তুর মধ্যেও সুদ হবে কিনা এ ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে।

১। কিয়াস অস্বীকারকারী اهل ظواهر -এর অভিমতে সুদ এই ছয়টি বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ, অন্য কোন বস্তুর মধ্যে সুদ হবে না। আল্লামা তাউস (রহ.) কাতাদা, শা'বী, মাসরুক, ওসমান আলবত্তী প্রমুখ এই মত পোষণ করেন।

২। জমহুর ফোকাহার মতে সুদ এই ছয়টি বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। রাসূল (সা.) নির্দিষ্ট এক علت -এর প্রতি ইশারা করে দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই ছয়টি বস্তু উল্লেখ করেছেন। সুতরাং علت যেখানে পাওয়া যাবে সেখানে সুদ পাওয়া যাবে। শরীয়তের স্বভাবজাত সৌন্দর্য্য হলো দৃষ্টান্তের মাধ্যমে মৌলিক উসূল বর্ণনা করে দেয়া, এখানেও যার ব্যত্যয় ঘটেনি।

তবে এই ছয়টি বস্তুর মধ্যে সুদ হওয়ার علت কী এ ব্যাপারে আলিমগণ মতবিরোধ করেছেন।

১। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.), ইমাম আহমদের এক মত, ছাওরী, নখয়ী, যুহরী, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই প্রমুখের মতে স্বর্ণ এবং রুপার মধ্যে علت হলো وزن مع الجنس এবং অবশিষ্ট চারটির كيل مع الجنس।

كيل ও وزن-কে একসাথে বুঝাতে قدر مع الجنس বলা হয়। قدر দ্বারা এই كيل - وزن উদ্দেশ্য। এইমত অনুযায়ী যে সব বস্তুর جنس এক হওয়ার

সাথে সাথে كيل এবং وزن এক হবে সেখানে সুদ পাওয়া যাবে। যেমন, নানা রকম খাদ্য, লোহা, চুন, তুলা, পশম ইত্যাদি।

২। ইমাম শাফেঈ (রা.) ও ইমাম আহমদের এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী স্বর্ণ ও রুপার علت হলো جنس এক হওয়ার সাথে সাথে ثمنيت (তথা মূল্যমান) হওয়া। আর বাকি চারটির علت হলো جنس এক হওয়ার সাথে সাথে مطعوم (তথা খাদ্য জাত) হওয়া। সুতরাং খাদ্য জাতীয় যাবতীয় বস্তুর মধ্যে সুদ জারী হবে। চাই كيلى হোক বা وزنى ، عددى হোক বা غير عددى

عددى (তথা সংখ্যাজাত)-এর উদাহরণ হলো, ডিম, কলা ইত্যাদি। আর যে সব বস্তু খাদ্যজাত নয় সেগুলোর মধ্যে সুদ জারী হবেনা। দলীল ঃ

عَنْ مَعْمَرَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ اِلاَّ مَثَلاً بِمَثَلٍ -

৩। ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতে স্বর্ণ ও রুপার মধ্যে علت হলো جنس এক হওয়ার সাথে সাথে ثمنيت (তথা মূল্যমান) হওয়া। আর বাকি চারটির মধ্যে جنس এক হওয়ার সাথে সাথে ادخار। তথা গুদামজাত হওয়ার যোগ্য হওয়া। কতিপয় মালেকী মাযহাবীগণ ادخار-এর সাথে সাথে اقتيات। তথা খোরাক যোগ্য হওয়ার শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। সুতরাং যে বস্তু খোরাকের কাজ দেয় এবং গুদামজাত করা যায় সেগুলোর মধ্যে সুদ জারী হবে। আর যে সব বস্তুকে শুধু গুদাম জাত করা যায়, খাদ্যের কাজ দেয় না সেগুলোর মধ্যে কতক মালেকীর মতে সুদ জারী হবে। আর কতক মালেকীর মতে জারী হবে না। মোটকথা তাঁদের মতে সুদের علت হলো গুদামজাত করার যোগ্য হওয়া। গুদামজাত করার অর্থ হলো, প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশি সময় ধরে খাদ্য জমা করে রেখে দিলে নষ্ট না হওয়া।

তাঁদের দলীল হলো, যদি শুধুমাত্র مطعوميت এবং كيلى হওয়া সুদের ইল্লত হত তাহলে রাসূল (সা.) চারটি বস্তু উল্লেখ না করে একটি বস্তু উল্লেখ করতেন।

তা না করে যেহেতু চারটি বস্তু উল্লেখ করেছেন সুতরাং বুঝতে হবে যে, এখানে সামগ্রিক একটি وصف উল্লেখ করা হয়েছে। আর সেটা হলো— গুদামজাত ও খোরাক হওয়ার যোগ্যতা থাকা।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগায় এবং আল্লামা ইবনে কাইয়ুম (রহ.) اعلام الموقعين -এ ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

৪। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব, ইমাম আহমদের এক রেওয়ায়াত এবং ইমাম শাফেঈর পূর্বের মত (قول قديم) অনুযায়ী স্বর্ণ-রৌপ্য ছাড়া অন্যান্য বস্তু খাদ্যজাত হওয়ার সাথে সাথে كيلى অথবা وزنى হওয়া। এক্ষেত্রে কিন্তু جنس এক হতে হবে। সুতরাং যে বস্তু খাদ্য (مطعوم) কিন্তু كيلى বা وزنى নয়, যেমন ডিম, অথবা كيلى বা وزنى কিন্তু খাদ্য নয় যেমন—লোহা, পিতল ইত্যাদি এসব বস্তুর মধ্যে সুদ আসবে না।

বিভিন্ন দিক বিবেচনায় আহনাফের মতের প্রাধান্যতা

রেওয়ায়াত এবং যুক্তি উভয় দিক বিবেচনায় ইমাম আবূ হানীফার মত প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য।

রেওয়ায়াতের দিক বিবেচনায় এ জন্য যে, বহু রেওয়ায়াতে আহনাফের মতকে সমর্থন করা হয়েছে। যেমন—

১। হযরত আবূ হুরাইরা এবং আবূ সাঈদ খুদরীর (রা.) রেওয়ায়াতে উল্লেখ করা হয়েছে—খায়বর এলাকার যাকাত উসূলকারী ব্যক্তি হুযূর (সা.)-কে অবহিত করে বললেন—

اِنَّا لَنَشْتَرِى الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ عَنِ الْجَمْعِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَفْعَلُوْا وَلٰكِنْ مَثَلاً بِمَثَلٍ ، اَوْ بِيْعُوا هٰذَا وَاشْتَرُوْا بِثَمَنِهِ مِنْ هٰذَا وَكَذٰلِكَ الْمِيْزَانُ وَفِى رِوَايَةِ الْبُخَارِىْ وَقَالَ فِى الْمِيْزَانِ مِثْلَ ذٰلِكَ ـ

উদ্দেশ্য হলো, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি করতে হলে বরাবর করতে হবে। সুতরাং দুই-সা' খারাপ খেজুরের বিনিময়ে এক-সা' ভালো খেজুর ক্রয় করা যাবেনা। এরপর রাসূল (সা.) বললেন— وكذلك الميزان-তথা ওজনী

বস্তুর হুকুমও এরূপ। অতএব كيلى বস্তু (খেজুরের) মধ্যে যেমন—বরাবর হওয়া জরুরী কমবেশি (تفاضل) হারাম ঠিক তদ্রূপ ওজনী বস্তু (স্বর্ণ-রৌপ্য)-এর মধ্যে বরাবর হওয়া জরুরী কমবেশি হারাম।

এই রেওয়ায়াত দ্বারা كيل ও وزن-ই রেবার علت হওয়া বুঝায়।

২। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর এক রেওয়ায়াতে সুস্পষ্টভাবে كيل এবং وزن-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন—

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلتَّمَرُ بِالتَّمَرِ ... يَدًا بِيَدٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ مَثَلاً بِمَثَلٍ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ رِبًا ـ ثُمَّ قَالَ كَذَالِكَ مَا يُكَالُ اَوْ يُوْزَنُ اَيْضًا ـ শেষের বাক্যে সুস্পষ্টভাবে كيل ও وزن -এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

(৩) عَنْ عُبَادَةَ وَاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا وُزِنَ مَثَلُ بِمَثَلٍ اِذَا كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا وَمَا كِيْلَ فَمِثْلُ ذٰلِكْ فَاِذَا اخْتَلَفَ النُّوْعَانِ فَلاَ بَأسَ بِهِ ـ

হাদীসে হুযূর (সা.) مكيل এবং موزون-এর ব্যাপারে বলেছেন— مثل بمثل-তথা সমান সমান করে বিক্রি করতে হবে। এর দ্বারা ربوا-এর وزن ـ علت এবং كيل হওয়াই বুঝে আসে।

درَايَةٌ (যুক্তির) আলোকে احناف-এর মতের প্রাধান্যতা

যুক্তির আলোকে আহনাফের قول-ই প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য। কেননা যাবতীয় লেনদেনে ইনসাফের প্রতি খেয়াল রাখা জরুরী। আল্লাহ পাক বলেন—

وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ، اَلَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ، وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ـ

আর লেনদেনের ক্ষেত্রে قرب مساوات (তথা সমান সমান হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছা) ধর্তব্য।

বিভিন্ন প্রকার বস্তু (مختلف الاجناس اشياء)-এর মধ্যে সামঞ্জস্যতা নির্ণয় করা কঠিন বলে মূল্যকে এর মাপকাঠি সাব্যস্থ করা হয়েছে।

যেমন ধরুন—এক ব্যক্তি কাপড়ের বিনিময়ে ঘোড়া কিনল। এক্ষেত্রে عدل ও مساوات ঐ সময় হবে যখন ঘোড়া ও কাপড়ের মূল্য সমান হবে।

ঘোড়ার মূল্য যদি পঞ্চাশ দিরহাম হয় তাহলে কাপড়ের মূল্য হবে পঞ্চাশ দিরহাম। সুতরাং একটি ঘোড়া ও দশ জোড়া কাপড়ের প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা মূল্য হয় পঞ্চাশ দিরহাম তাহলে এখানে (ঘোড়া ও কাপড়ের) সংখ্যার তারতম্য থাকলেও বরাবরী (مساوات) পাওয়া গেছে। এখন দেখতে হবে যে সব বস্তুর جنس এক সেগুলোর ওজন কাছাকাছি হওয়ার কারণে হাত বদলের তেমন প্রয়োজন পড়ে না। যেমন—উভয়ের কাছে খেজুর বা উভয়ের কাছে গম আছে এক্ষেত্রে বিনিময় করার প্রয়োজনটা কী?

হ্যাঁ, অপচয় কিংবা আরাম-আয়েশের জন্য কেউ নিম্নমানের খেজুর দিয়ে উত্তম খেজুর গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রেও তো ইনসাফের দাবি হলো উভয় পক্ষের كيل বা وزن সমান হওয়া। কেননা উভয়ের منافع প্রায় কাছাকাছি। অতএব এখানে مثل معنوى -এর বদলায় مثل صورى তথা قيمت-এর বদলায় وزن বা كيل-এর মধ্যে বরাবর করতে হবে।

এভাবে كيلى বস্তুর মধ্যে যখন কমবেশি (تفاضل) করা নিষেধ হয়ে যাবে তখন এ ধরনের লেনদেন এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে। (কেননা এক-সা' ভালো খেজুর দিয়ে এক-সা' খারাপ খেজুর নিতে যাবে কে?)।

আর এটাই উদ্দেশ্য যে, মানুষকে অতি সুখি ও আরাম-আয়েশের জীবন যাপনে নিরুৎসাহিত করা।

মোটকথা درايةً ও روايةً উভয় দিক দিয়ে আহনাফের মত প্রাধান্য পাওয়ার যোগ। والله اعلم

لاتشفوا بعضها على بعض -এর ব্যাখ্যা

لا تفضلوا অর্থ نهى -এর সীগা মাসদারের اشفاف এটা لا تشفوا তোমরা এক অংশকে অপর অংশের ওপর বৃদ্ধি করোনা।

الشف بالكسر من الاضداد শব্দটি বিপরীত মুখী অর্থ প্রদান করে। زيادت এবং نقصان উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং اشفاف -এর অর্থ, কম ও বেশি কোনটা না করা। এই শব্দ ব্যবহার করে রাসূল (সা.) তাঁর সুউচ্চ বালাগাতের পরিচয় দিয়েছেন। কম-বেশি উভয়টি নিষেধ করা হুযূরের (সা.) একান্ত উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তোমরা স্বর্ণকে স্বর্ণের বদলায় এবং রৌপ্যকে রৌপ্যের বদলায় বিক্রি করলে কমও করবে না আবার বেশিও করবেনা।

ولا تبيعوا منها غائبا بناجز -এর ব্যাখ্যা

ناجز-এর অর্থ হাজির, উপস্থিত। نغائب দ্বারা উদ্দেশ্য বাকি (مر جل)।

সুদজাতীয় বস্তুর ব্যাপারে اختلاف আছে যে, চুক্তির সময় এটা কব্জা করা জরুরী না শুধুমাত্র تعيين নির্ধারণ করলেই চলবে।

১। আহনাফের মতে সুদ থেকে বাঁচতে হলে শুধু تعيين জরুরী কব্জা জরুরী নয়।

অবশ্য দীনার দিরহাম যেহেতু নির্ধারণ করলেও নির্ধারণ হয়না এজন্য এগুলো "মজলিসে আকদে" কব্জা করা জরুরী। কিন্তু গম যব ইত্যাদি যেহেতু নির্ধারণ করলে নির্ধারণ হয়ে যায় এজন্য এগুলো কব্জা করা জরুরী নয়, শুধু নির্ধারণ করলেই চলবে।

২। ائمة ثلاثة-এর মতে সুদজাতীয় বস্তু মজলিসে থাকা অবস্থাতেই কব্জা করতে হবে। তাঁরা يدا بيد বাক্য দ্বারা দলীল দিয়ে বলেন—

মূলত ঃ কব্জা করার প্রতি ইঙ্গিত করেই একথাটি বলা হয়েছে। কেননা يد (হাত) কব্জা করার মাধ্যম (ألة)।

আহ্নাফ বলেন—এ ব্যাপারে তিন ধরনের রেওয়ায়াত এসেছে।

(১) غائبا بناجز ঃ বস্তু এবং মূল্য একটা উপস্থিত আরেকটা অনুপস্থিত এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করোনা। বরং দু'টিই হাজির করে তারপর ক্রয়-বিক্রয় করো। حاضر হওয়ার অর্থ নির্ধারণ (تعيين) করা, কব্জা করা নয়।

২। عينا بعين -অর্থাৎ নির্দিষ্ট বস্তু নির্দিষ্ট বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করো। এর দ্বারাও تعيين -তথা নির্ধারণ করা বুঝায়, কব্জা নয়।

৩। يدا بيد ঃ যেহেতু প্রথম দুই রেওয়ায়াতে নির্ধারণ করা উদ্দেশ্য সুতরাং এখানেও তাই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। যাতে করে তিন রেওয়ায়াতের উদ্দেশ্য এক হয়ে যায়। যদিও يدا بيد দ্বারা বাহ্যিকভাবে 'কব্জা'-র অর্থে বুঝে আসে কিন্তু تعيين-এর অর্থ হওয়াও অসম্ভব নয়। কেননা হাত যেমন قبض -এর মাধ্যম ঠিক তদ্রূপ تعيين-এর মাধ্যমও বটে।

حَدِيْثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ : عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ قَالَ كُنْتُ بِالْقَشَّامِ فِىْ حَلْقَةٍ فِيْهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ فَجَاءَ اَبُو الْاَشْعَثِ قَالَ قَالُوْا اَبُو الْاَشْعَثِ ! اَبُو الْاَشْعَثِ فَجَلَسَ فَقُلْتُ لَهُ حَدِّثْ اَخَانَا حَدِيْثَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ نَعَمْ ! غَزَوْنَا غُزَاةً وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيْرَةً فَكَانَ فِيْهَا غَنَمًا اٰنِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ فَاَمَرَ مُعَاوِيَةُ رُجَلاً اَنْ يَبِيْعَهَا فِىْ اَعْطِيَاتِ النَّاسِ فَتُشَارِعُ النَّاسِ فِىْ ذٰلِكَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ عُبَادَةَ اِبْنِ الصَّامِتِ فَقَامِ فَقَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرَ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمَرَ بِا التَّمَرِ وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ اِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ اَوِازْدَادَ فَقَدْ رَبٰى .

আবূ কেলাবা (রা.) আবুল আশআসকে বললেন—আমাদের ভাইকে উবাদা ইবনে সামেতের (রা.) হাদীস শোনান। اخانا বলতে এখানে মুসলিম ইবনে ইয়াসার উদ্দেশ্য। মু'আবিয়ার (রা.) নেতৃত্বে এঁরা জিহাদে অংশ নিয়ে ছিলেন। গনীমত সূত্রে প্রচুর পরিমাণে রুপার পাত্র হস্তগত হয়। হযরত মু'আবিয়া (রা.) সেগুলো সরকারী অনুদান পাওয়া পর্যন্ত বাকিতে বিক্রি করার নির্দেশ দেন। অর্থাৎ এখন ক্রয় করে যখন সরকারী অনুদান পাবে তখন মূল্য পরিশোধ করবে।

এতে দু'টি সমস্যা দেখা দিলো। একতো বাকি। দ্বিতীয়তঃ দিরহাম এবং রূপার পাত্রের মধ্যে সামঞ্জস্যতার অনুপস্থিতি।

এ কারণে হযরত উবাদা (রা.) এ ধরনের লেনদেন করতে বারণ করেন এবং
ালি স্বরূপ হুযূরের (সা.) হাদীস শুনিয়ে দেন। কিন্তু মু'আবিয়া (রা.) তাঁর
ায় কর্ণপাত না করলে তিনি বললেন—আমি হুযূরের (সা.) কাছ থেকে যা
নছি তা অবশ্যই বর্ণনা করব। চাই এটা মু'আবিয়ার (রা.) ভাল লাগুক বা না
গুক। মু'আবিয়ার (রা.) এ ধরনের ঘটনা হযরত আবূ দারদার (রা.) সামনেও
ঘটিত হয়। মুয়াত্তায়ে মালিকে বর্ণনা করা হয়েছে—হযরত মু'আবিয়া (রা.)
র্ণ ও রৌপ্যের পাত্র এর চেয়ে বেশি ওজনের স্বর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে বিক্রি
রেন। হযরত আবূ দারদা (রা.) এরূপ করতে বারণ করেন এবং বলেন—

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى عَنْ مِثْلِ هٰذَا اِلاَّ مَثَ

بِمَثَ তখন মু'আবিয়া (রা.) বললেন—

২। মু'আবিয়া (রা.) বললেন— ماارايت بمثل هذا باسا এতে আমি
ান সমস্যা দেখি না। একথা বলে তিনি হুযূরের (সা.) হাদীসকে প্রত্যাখ্যান
রেন নি। আর এটা সম্ভব-ই বা হয় কী করে যখন হাদীসটি তিনি দুইজন ফকীহ
াহাবীর মুখ থেকে শ্রবণ করেন?

তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একথা বুঝানো যে, হাদীসটি স্বর্ণ-রৌপ্যের টুকরা,
ানার-দিরহামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এগুলোর মধ্যে কম বেশি হারাম। কিন্তু যে
র্ণ গলিয়ে পাত্র, অলংকার বানানো হয়েছে হাদীসটি সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ক্ষেত্রে কম বেশি জায়িয। কেননা এক্ষেত্রে অতিরিক্ত অংশটুকু পাত্র-অলংকার
ানাতে যে শ্রম দিতে হয়েছে তার মজুরী হিসেবে গণ্য হবে। وهذاكما اباح
الحنفية بيع السيف المحلى بالفض। হযরত মুআবিয়ার (রা.) এই
াসআলাটি আহনাফের بيع السيف المحلى بالفضة মাসআলার অনুরূপ।
কননা তাঁদের মতে রৌপ্য খচিত তলোয়ার রুপার বিনিময়ে বিক্রি করা
ায়িয-যদি রূপার পরিমাণ তলোয়ারের গায়ে বিদ্যমান রুপার চেয়ে পরিমাণে
বশি হয়। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত এই রুপাটুকু তলোয়ারের মূল্য হিসেবে ধর্তব্য
বে।

জমহুরের মতে স্বর্ণ-রৌপ্য যে আকৃতিতে হোকনা কেন এর মধ্যে কম বেশি
হারাম। পাত্র, বরতন, অলংকার, স্বর্ণ টুকরা সব কিছুর হুকুম এক।

হযরত ওমর (রা.) মু'আবিয়ার (রা.) এই ঘটনা শুনে বললেন— ان لا يبيع
مثل ذلك الا مثلا بمثل وو زنا بوزن এই নির্দেশ পেয়ে হযরত মু'আবিয়া

(রা.) পুনরায় এরূপ করেননি। যার দ্বারা বুঝা যায় তিনি নিজের মত পরিহার করেছেন। সকল আলিম একমত হয়েছেন— অলংকার ও সাধারণ স্বর্ণে হুকুম এক। শুধুমাত্র ইবনে কাইয়ুম হযরত মু'আবিয়ার মাযহাবের অনুসরণ করেছেন।

حديث براء بن عازب : عَنْ اَبِى الْمِنْهَالِ قَالَ : بَاعَ شَرِيْكٌ لِىْ وَرِقًا بِنَسِيْئَةٍ اِلَى الْمَوْسِمِ اَوْ اِلَى الْحَجِّ فَجَاءَ اِلَىَّ فَاَخْبَرَنِىْ فَقُلْتُ هٰذَا اَمْرٌ لاَ يَصْلَحُ الخ -

আবুল মিনহাল বলেন—আমার এক শরীক বাকিতে রুপা বিক্রি করল। অতঃপর আমাকে এই ঘটনা জানালে আমি বললাম, এটা তো ঠিক হয়নি। আবুল মিনহাল বলেন—আগে আমি এধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতাম। কিন্তু কেউ আমাকে বারণ করত না। একদিন বারা ইবনে আযেব (রা.)-কে বিষয়টা জানালে তিনি বললেন—আমরা যখন এধরনের লেনদেন করতাম তখন রাসূল (সা.) মদীনায় আগমন করেন। হুযূর (সা.) আমাদেরকে বললেন—

ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا -

অতঃপর ইবনে আযেব (রা.) বললেন—তুমি যায়েদ ইবনে আরকামের কাছে যাও (এবং তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে দেখ) তিনি আমার চেয়ে বড় ব্যবসায়ী।

আবুল মিনহাল বলেন—আমি বারা (রা.)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনিও এরকম জবাব দিলেন। এ ঘটনা দ্বারা জানা যায় যে, সাহাবাগণ ছিলেন খুবই বিনয়ী। একে অপরের মর্যাদার ব্যাপারে সম্যক অবগত ছিলেন। এর দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে, এক আলিম কর্তৃক অপর আলিম থেকে ফতওয়া যাচাই করে নেয়া উচিত।

حديث فضالة بن عبيد على بن رباح اللخمى يَقُوْلُ سَمِعْتُ فُضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ الْاَنْصَارِىَّ يَقُوْلُ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلاَدَةٍ فِيْهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ وَهِىَ مِنَ الْمَغَانِمِ تُبَاعُ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذَّهَبِ الَّذِىْ فِى الْقِلاَدَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ -

রাসূলের (সা.) কাছে খায়বর অবস্থান কালীন বিক্রয়লব্ধ গনীমতের একটি হার আনা হলো যাতে স্বর্ণ ও পুঁতিদানা বিদ্যমান ছিল। রাসূল (সা.) হার থেকে স্বর্ণ আলাদা করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর বললেন—স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ লেনদেন করলে সমান সমান করে করতে হবে।

ফায়দা ঃ ফুযালা ইবনে উবাইদ আনসারী আউসী শুরুর দিকে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বদরের যুদ্ধ ছাড়া বাকী যুদ্ধগুলোতে শরীক ছিলেন। মিসর ও সিরিয়া বিজয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা.) তাঁকে দামেস্কের শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি ৫৩ হিজরী সনে দামেস্কে ইন্তিকাল করেন। আল ইসাবাহ-খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২০১

মাযহাব সমূহ

স্বর্ণ, রৌপ্য যদি অন্য কোন বস্তুর সাথে মিশ্রিত থাকে সেগুলোকে খালেস স্বর্ণ বা রৌপ্যের বদলায় বিক্রি করা, এমনিভাবে সুদজাতীয় অন্যান্য বস্তু (যেমন গম) অন্য কিছুর সাথে মিশ্রিত থাকে তাহলে সেটাকে খালেস গমের বদলায় বিক্রি করা জায়িয আছে কিনা এ সম্পর্কে ইখতিলাফ আছে।

১। ইমাম শাফেঈ ও আহমদের মতে এটা নাজায়িয। বেচতে হলে পৃথক করে বেচতে হবে। সোনা, রুপা, গম সবগুলোর একই হুকুম। এটা শুরাইহ ইবনে সীরীন ও নখয়ীর মাযহাব।

২। ইমাম মালেক (রহ.) বলেছেন— مبيع-এর মধ্যে স্বর্ণ যদি অন্য বস্তুর تابع হয় অথবা ঐ "অন্য বস্তু" স্বর্ণের تابع হয় তাহলে بيع জায়িয। অন্যথায় পৃথক করে বিক্রি করতে হবে।

৩। ইমাম আবূ হানীফা, সাওরী ও হাসান ইবনে সালেহ (রহ.)-এর মতে স্বর্ণের সাথে অন্যান্য বস্তু মিলিয়ে বিক্রি করার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। এর মধ্যে এক পদ্ধতি জায়িয বাকিগুলো নাজায়িয।

পৃথক স্বর্ণ যদি অন্য বস্তুর সাথে মিশ্রিত স্বর্ণের তুলনায় পরিমাণে বেশি হয় তাহলে بيع জায়িয। পৃথক স্বর্ণ মিশ্রিত স্বর্ণের বরাবর হয়ে বাড়তি অংশ সেই বস্তুটির মূল্য হিসেবে গণ্য হবে।

পক্ষান্তরে অন্য বস্তুর সাথে মিশ্রিত স্বর্ণ (ذهب مركب) পৃথক স্বর্ণের (ذهب مفرد) তুলনায় পরিমাণে কম হয় অথবা সমান সমান হয় অথবা পরিমাণ অস্পষ্ট থাকে তাহলে এই তিন পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় নাজায়িয হবে।

কম হলে কম বেশি হওয়ার কারণে, বরাবর হলে স্বর্ণের বদলায় স্বর্ণ বাদযাওয়ার পর ঐ বস্তুটি বিনিময় ছাড়া হওয়ার কারণে এবং পরিমাণ জানা না থাকার ক্ষেত্রে সুদের সম্ভাবনা থাকার কারণে بيع নাজায়িয। মোটকথা সুদের সম্ভাবনা থাকার কারণে এই তিন পদ্ধতি নাজায়িয।

ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফেঈর (রহ.) দলীল

ইমাম আহমদ ও শাফেঈ (রহ.) হযরত ফুযালাহ ইবনে ওবাইদ (রা.)-এর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। যাতে উল্লেখ রয়েছে যে, হুযূর (সা.) হার থেকে স্বর্ণ আলাদা করার আগে একে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। এমনিভাবে এক রেওয়ায়াতে সুস্পষ্টভাবে আলাদা করে তবেই বিক্রি করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। হুযূর (সা.) বলেন, لاتباع حتى تفصل হাদীসে পৃথক করার আগে বিক্রি করতে বারণ করা হয়েছে, চাই মূল্য (ثمن) কম হোক বা বেশি।

হানাফীদের দলীল

১। বিভিন্ন হাদীসে স্বর্ণ-রৌপ্য সমান করে বিক্রি করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং কমবেশিকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

সুতরাং যেক্ষেত্রে কমবেশি হবে অথবা কম বেশির সম্ভাবনা দেখা দিবে সেক্ষেত্রে লেনদেন হারাম হবে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য মাসআলায় ذهب مفرد (পৃথক স্বর্ণ) ذهب مركب (অন্য বস্তুর সাথে মিশ্রিত স্বর্ণ) এর তুলনায় পরিমাণে বেশি হওয়ার কারণে কমবেশি হওয়ার সম্ভাবনা নেই এজন্য এটা নাজায়িয হবেনা।

২। উল্লেখিত পদ্ধতি জায়িয হওয়ার স্বপক্ষে একদল সাহাবা ও তাবেঈনের আমল ও ফতওয়া সমর্থন যোগায়।

عَنِ الْمُغِيْرَ بْنِ حُنَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ وَّهُوَ يَخْطُبُ اِذْ اَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ بِاَرْضِنَا قَوْمًا يَاكُلُوْنَ الرِّبَا قَالَ عَلِىٌّ وَمَا ذٰلِكَ ؟ قَالَ يَبِيْعُوْنَ جَامَاتٍ مَخْلُوْطَةٍ بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ بِوَرِقٍ فَنَكَسَ عَلِىٌّ رَاسَهُ وَ قَالَ لاَ اَىْ لاَ بَاسَ بِهِ ـ

হযরত আলী (রা.) একবার খুতবা দেয়াকালীন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, আমীরুল মুমিনীন! আমাদের এলাকার এক সম্প্রদায় সুদ খায়। হযরত আলী (রা.) বললেন কীভাবে? সে বললো—তারা স্বর্ণ-চান্দি মিশ্রিত পাত্রকে চান্দির বিনিময়ে বিক্রি করে। একথা শুনে হযরত আলী (রা.) মাথা নিচু করে বললেন— لا "না এতে কোন সমস্যা নেই।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে—

عن سعد بن جبير عن ابن عباس قَالَ : اشترى السيف المحلى بالفضة واخرجه ايضاابن ابى شيبة بلفظ لابأس بالسيف المحلى بالدراهم

(স্বর্ণ খচিত তলোয়ার দিরহাম দ্বারা বিক্রি করাতে কোন সমস্যা নেই)।

সাহাবী তারিক ইবনে শিহবা (রা.) বলেন—

كنا نبيع السيف المحلى بالفضة ونشتريه .

এমনিভাবে ইবরাহীম নখয়ী, কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ, সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ, হাসান বসরী, মুহাম্মাদ ইবনে সীরিন, কাতাদা (রহ.) প্রমুখ তাবেঈ থেকে এ ধরনের ফতওয়া বর্ণিত রয়েছে।

তাঁদের বর্ণিত হাদীসের জবাব

আহনাফ হযরত ফুজালাহ (রা.)-এর হাদীসকে ঐ পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন যেখানে পৃথক স্বর্ণ (ذهب مفرد) মিশ্রিত স্বর্ণ (ذهب مركب) এর তুলনায় পরিমাণে কম বা বরাবর হয়। আর ফুযালার (রা.) রেওয়ায়াত দ্বারা বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি যে হারটি ক্রয় করেছিলেন এর মধ্যে বার দীনারের চেয়ে বেশি স্বর্ণ ছিল। আর তিনি এটাকে মাত্র বার দীনার দিয়ে ক্রয় করেছিলেন। এ কারণে হুযূর (সা.) নিষেধ করেছিলেন।

আর হুযূরের (সা.) বাণী لا تباع حتى تفصل-এর نهى ارشادى . نهى তথা হুযূর (সা.) কমবেশির تفاضل-এর আশংকা থাকায় এ কাজ করতে বারণ করেছেন। কেননা আমজনতা এতটুকু বাচ বিছার করার সুযোগ খুব কমই পায়।

এদেরকে যদি পৃথক করা ছাড়া বিক্রি করার অনুমতি দেয়া হয় তাহলে সুদের মধ্যে নিপতিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণে নসীহত মূলক রাসূল

(সা.) এ কাজ থেকে বারণ করেছেন। এ কারণে রাসূল (সা.) পৃথক করার পর বিক্রি করার অনুমতি দিয়ে বলেছেন— الذهب بالذهب وزنا بوزن। মতলব হলো—নিশ্চিতভাবে সামঞ্জস্য-বরাবরি পাওয়ার পর লেনদেন করবে।

সুতরাং পৃথক করা ছাড়াই যদি সমান সমান করা সম্ভব হয় তাহলে بيع সহীহ্ হবে।

এমনিভাবে حتى تفصل-এর মধ্যে পৃথককরণটা عام, বাস্তব পৃথকীকরণ হতে পারে আবার مساوات পাওয়া যায় এরকম যেকোন কিছু (معنوى فصل) উদ্দেশ্য হতে পারে। সামগ্রিক দিক বিবেচনায় আহনাফের قول প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য।

حديث معمر بن عبد الله : عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ...فَإِنِّى كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُوْلُ : اَلطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مَثَلاً بِمَثَلٍ .

খাদ্যকে খাদ্যের বিনিময়ে বরাবর করে বিক্রি করার অর্থ হলো— খাদ্যকে যদি একই জাতের খাদ্যের বিনিময়ে বিক্রি করা হয় তাহলে সমান সমান হওয়া জরুরী। যেমন—গমকে গমের বিনিময়ে কিংবা যবকে যবের বিনিময়ে বিক্রি করা। আর جنس ভিন্ন হলে সর্বসম্মতিক্রমে تفاضل জায়িয। সুতরাং যদি যবকে খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করা হয় তাহলে কমবেশি করা যাবে। কেননা হুযূর (সা.) বলেন—

فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هٰذِهِ الْاَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ .

সুতরাং গম ও যব দু'টি ভিন্ন জাতের খাদ্য হওয়ায় কমবেশি করা জায়িয হবে।

অবশ্য ইমাম মালেক (রহ.) কাছাকাছি বস্তু হওয়ার কারণে গম ও যবকে এক جنس-এর হুকুমে গণ্য করেন। সে হিসেবে এ দুটির মধ্যে কমবেশি জায়িয হবেনা। ইমাম মালেক (রহ.) হযরত মা'মার ইবনে আব্দুল্লাহর (রা.) রেওয়ায়াত দ্বারা দলীল পেশ করেন যে, তিনি স্বীয় গোলামকে গমের বদলায় যব খরিদ করার জন্য বাজারে প্রেরণ করেন। গোলাম বেশি পরিমাণ যব নিয়ে ফিরে আসলে তিনি তাকে ধমক দেন এবং ফিরিয়ে দিয়ে বলেন—لاتاخذن الا

مثلابمثل সমান সমান করে নিয়ে আস। অতঃপর الطعام بالطعام-এর হাদীস শুনিয়ে দেন।

কিন্তু ইমাম মালেকের এই দলীল সহীহ্ নয়। কেননা তাঁকে যখন বলা হলো—এটা তো যব, গমের جنس থেকে নয়। তখন তিনি বললেন— انى اخاف ان يضارع-তথা তারপরেও আমি এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়কে সুদের ক্রয়-বিক্রয় হবে বলে আশংকা করি। এর দ্বারা সাফ একথা বুঝা যায় যে, তিনি তাকওয়া ও বুযুর্গীর কারণে এরূপ করেছেন–হারাম হওয়ার কারণে নয়।

আর الطعام بالطعام বলতে সব ধরনের খাদ্য উদ্দেশ্য নয়। কেননা খেজুর ও গম طعام হওয়া সত্ত্বেও সর্বসম্মতিক্রমে এর মধ্যে تفاضل জায়িয। বরং হাদীসের অর্থ হলো, যখন এক জাতীয় খাদ্যকে ঐ একই জাতের খাদ্যের সাথে বিনিময় করা হবে তখন বরাবর হওয়া জরুরী।

حديث ابى هريرة وابى سعيد : ان ابا هريرة وابا سعيد حدثاه ان رسول الله بعث اخا بنى عدى الا نصارى فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا ؟ قال لا والله يارسول الله انا لنشترى الصاع بالصاعين من الجمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل او بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذالك الميزان.

বনী আদী কবিলার ঐ ভাইয়ের নাম সাওয়াদ ইবনে গাযিয়্যা। তিনি দুই সা' খারাপ খেজুর দিয়ে এক সা' উত্তম খেজুর গ্রহণ করতেন। হুযূর (সা.) একথা শুনে বললেন— لا تفعلوا এরূপ করো না। যেহেতু তিনি মাসআলা জানতেন না এজন্য রাসূল (সা.) তাঁকে ভর্ৎসনা না করে শুধুমাত্র ভবিষ্যতে এরূপ না করার জন্য সতর্ক করে দেন।

কিন্তু হুকুম সম্পর্কে অজ্ঞতা দুনিয়াবী হুকুমের ক্ষেত্রে মা'যূরের আওতায় পড়ে না বলে রাসূল (সা.) চুক্তি ভঙ্গের নির্দেশ দেন।

قوله عليه السلام : بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا

جنيب بروزن حبيب অর্থ উত্তম খেজুর। الجمع। অর্থ হলো ঃ ভালো-মন্দ মিশানো খেজুর। হুযূর (সা.) খায়বরের যাকাত উসূলকারীকে সুদ থেকে বাঁচানোর এক কৌশল শিক্ষা দেন যে, মিশ্রিত ওই খেজুর বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে ভাল খেজুর ক্রয় করবে। উদ্দেশ্যও হাসিল হলো, সুদ থেকেও বাঁচা গেল।

শরয়ী হীলা

শরয়ী হীলা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—

قَصْدُ التَّوَصّلِ اِلٰى تَحْوِيْلِ حُكْمِ الْاٰخَرِ بِوَاسِطَةٍ مَشْرُوْعَةٍ فِى الْاَصْلِ -

"বৈধ কোন পন্থা অবলম্বন করে এক হুকুম বদল করে অন্য হুকুম গ্রহণ করা।"

যদি সেই واسطة (পন্থাই) অবৈধ হয় তাহলে হীলা জায়িয হবে না। কোন আলিম এর অনুমতি দেন নি। য়েমন–স্বামীর হাত থেকে বাঁচতে স্ত্রী মুরতাদ হয়ে গেলো–যাতে বিবাহ বাতিল হয়ে যায়। বনী ইসরাঈল এ ধরনের হীলা করত। শনিবার দিনে তাদের শরীয়তে মাছ শিকার করা নিষেধ ছিল। তারা দরিয়ার কিনারে হাউজ বানিয়ে দরিয়া থেকে হাউজ পর্যন্ত নালা সংযোগ করত। শনিবার ছাড়া অন্য কোন দিনে মাছ দেখা যেতনা। এদিনে সমুদ্রের ঢেউয়ে মাছ ঐ নালা দিয়ে হাউজে গিয়ে পড়ত। কিন্তু পানি কম ও হাউজ গভীর হওয়ার কারণে মাছ বের হতে পারত না। এরপর রবিবারে তারা মাছ ধরত। যদিও তারা রবিবারে মাছ ধরত কিন্তু মাছ ধরার মূল সূচনা হতো ঐ শনিবারই। এ কারণে হারাম হওয়ার হুকুমের মধ্যে কোন পরিবর্তন আসত না। এমনিভাবে চর্বি হারাম হলে তারা একে গলিয়ে ওদাক নাম দিয়ে ব্যবহার করত। কিন্তু শুধু নাম পরিবর্তন হওয়ায় যেহেতু মূল বস্তু (حقيقت) পরিবর্তন হয়না এজন্য একে হালাল বলা যায়না। মোট কথা তারা জায়িয পন্থা (واسطة) পরিহার করে অবৈধ পন্থায় হীলা করত। এ কারণে এই হীলা হারাম বলে গণ্য হত।

খায়বরের আলিম কর্তৃক দুই-সা' খেজুরের বিনিময়ে এক সা' খেজুর কেনা কমবেশি হওয়ার কারণে সুদ হয়ে যেত। এ কারণে রাসূল (সা.) উল্লেখিত পন্থায় হীলা করার তদবীর শিখিয়ে দেন। আর এই পন্থা ছিল সম্পূর্ণ শরীয়তের

অনুকূলে। কেননা দিরহাম দিয়ে খেজুর ক্রয় ও বিক্রয় উভয়টি জায়িয এতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং সুদ থেকে বাঁচতে এই হীলা অবশ্যই জায়িয ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ বলে বিবেচিত হবে।

মোটকথা হীলা করার জন্য যে, পন্থা অবলম্বন করা হবে সেই পন্থা যদি জায়িয হয় তাহলে হীলা জায়িয হবে। আর পন্থা নাজায়িয হলে হীলা নাজায়িয হবে।

হুযূরের (সা.) পক্ষ থেকে এই কর্ম পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া দ্বারা বুঝা যায় যে, মুফতীর উচিত তার কাছে যারা ফতওয়া তলব করবে তাদেরকে এমন ফতওয়া দেয়া যার দ্বারা মাকসাদ হাসেল হয় আবার হারাম কাজও না হয়। এটা খারাপ কিছু নয় বরং প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

صرف-এর ব্যাপারে ইবনে আব্বাস ও ইবনে ওমরের মাযহাব বিশ্লেষণ

عَنْ اَبِیْ نَضْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ اِبْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ فِی الصَّرْفِ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا .

আবূ নযরাহ বলেন–আমি ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাসকে صرف-এর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা জানালেন এতে কোন সমস্যা নেই।

صرف বলা হয় নগদ টাকাকে নগদ টাকার বদলায় লেনদেন করা চাই সমান সমান হোক বা কমবেশি। এই দুইজনের কাছে ربوا الفضل ওয়ালা হাদীসের সংবাদ পৌঁছেনি বলে তারা ربوا الفضل-কে জায়িয বলে ফতওয়া দিয়েছেন যে, স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময়ে এবং রৌপ্যকে রৌপ্যের বিনিময়ে কমবেশি করে বেচাকেনা জায়িয। হ্যাঁ, বাকি বেচা নাজায়িয। তাঁদের ধারনা ছিল ربوا শুধু বাকির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

কিন্তু তাঁরা যখন শুনলেন ربوا الفضل তথা একই جنس-এর বস্তুর মধ্যে কমবেশি করাও সুদের অন্তর্ভুক্ত তখন তারা নিজেদের মত পরিহার করেন। আবূ নযরাহ ইবনে ওমরের কাছে আবূ সাঈদ (রা.)-এর হাদীস পেশ করলে তিনি নিজের আগের মত ত্যাগ করেন এবং ইবনে আব্বাস অন্যভাবে শুনে নিজের মত পরিহার করেন।

আবূ সাহবা বলেন—মক্কা শরীফে একবার ইবনে আব্বাসকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি এটাকে অপছন্দ করলেন (তথা হারাম বললেন)।

আবুল জাওযা (রা.) বলেন—একবার আমি ইবনে আব্বাসকে بيع الدرهم بالدرهم يدابيد-এর ব্যাপারে জিজ্ঞেষ করলে তিনি একে জায়িয বললেন। অন্য একদিন জিজ্ঞেস করলে হারাম বললেন। আবূ শা'শা বলেন—

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَتُوْبُ اِلَيْكَ مِنَ الصَّرْفِ اِنَّمَا هٰذَا مِنْ رَائِىْ ـ

আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন—আমি ইবনে আব্বাসকে বললাম তুমি যে ফতওয়া দিয়েছ এটা কি হুযূর (সা.) থেকে শুনেছ না কুরানের কোথাও পেয়েছ? উত্তরে তিনি বললেন— انما الربوافى النسيئة (মুসলিম)

মুস্তাদরাকে হাকিমে উল্লেখ করা হয়েছে—হযরত আবূ সাঈদ (রা.) ইবনে আব্বাসকে বললেন, তুমি আল্লাহকে ভয় করনা? কতদিন যাবত তুমি মানুষকে সুদ খাওয়াবে? তারপর তিনি হুযূর (সা.)-এর হাদীস শোনালেন। এসব শুনে ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন—

جَزَاكَ اللّٰهُ يَا اَبَاسَعِيْدِ الْجَنَّةَ فَاِنَّكَ ذَكَّرْتَنِىْ اَمْرًا كُنْتُ نَسِيْتُهُ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ـ

এরপর তিনি কঠোরভাবে এ ধরনের লেনদেন করতে বারণ করেন।

মোটকথা ইবনে আব্বাস ও ইবনে ওমর (রা.) নিজেদের পূর্বের মত পরিহার (رجوع) করেছেন।

সুতরাং এ ব্যাপারে ইজমা হয়েছে যে, ربوا الفضل -তথা বর্ধিত অংশ হারাম।

انما الربو افى النسيئة -এর ব্যাখ্যা

لاَ رِبٰوا فِيْمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ـ اِنَّمَا الرِّبَا فِى النَّسِيْئَةِ ـ

এই তিনটি বাক্য হযরত ওসামার (রা.) হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এতে বুঝা যায় ربوا শুধু তথা বাকির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ওদিকে ربوا الفضل হারাম হওয়ার হাদীস প্রায় বিশজন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। বুখারী, মুসলিমে আবূ সাঈদ

(রা.) ও আবূ বকর (রা.)-এর রেওয়ায়াত, শুধু মুসলিমে হযরত ওসমান (রা.) আবূ হুরাইরা (রা.) ফুযালাহ (রা.)ও উবাদা (রা.)-এর রেওয়ায়াত এবং অন্যান্য কিতাবে অবশিষ্ট সাহাবীদের রেওয়ায়াত উল্লেখ করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে, হযরত ওসামার (রা.) বর্ণিত হাদীসটি এই বিশজন সাহাবীর বর্ণিত রেওয়ায়াতের সাথে সাংঘর্ষিক হচ্ছে। উল্লেখিত এই দ্বন্দ্ব দূর করতে আলিমগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। যথা ঃ

১। نسخ ঃ ইসলাম শুরু যুগে শুধু মাত্র বাকি প্রদানকে হারাম করা হয়েছিল, কমবেশি করা তখনও হারাম ছিলনা। পরবর্তীতে খায়বর যুদ্ধে এটাকে হারাম করা হয়। হযরত ওবাদা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ। সুতরাং ওসামা (রা.)-এর হাদীস انما الربوا فى النسيئة মানসূখ হয়ে গেছে।

২। ترجيح : انما الربوا فى النسيئة হাদীসটি মাত্র একজন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে আর কমবেশি সংক্রান্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে বিশ জন সাহাবী থেকে। সুতরাং বিশ জনের রেওয়ায়াতকে প্রাধান্য দেয়া উচিত।

৩। تطبيق ঃ তাতবীকই উত্তম। অবশ্য আলিমগণ এর বিভিন্ন পদ্ধতি বাতলিয়েছেন। যথা ঃ

(ক) রাসূল (সা.) পরিপূর্ণ (مستقل) ভাবে বাক্যটি বলেননি বরং একজন প্রশ্নকারীর প্রশ্নের জবাবে কথাটি বলেছেন। প্রশ্নকারী ভিন্ন জাতের দু'টি বস্তু যেমন–গমকে যবের বদলায়, সোনাকে রুপার বদলায় ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে রাসূল (সা.) বলেছিলেন— انما الربوا فى النسيئة অর্থাৎ এসব বস্তু যদি বাকিতে লেনদেন করা হয় তাহলে সুদ হবে। হতে পারে হযরত ওসামা (রা.) প্রশ্নকারীর প্রশ্ন শোনেননি অথবা শুনেছেন কিন্তু তিনি ধারণা করেছেন সর্বক্ষেত্রে এই হুকুম প্রযোজ্য এজন্য অন্যভাবে তিনি একথা বলেছেন।

(খ) হুযূর (সা.) كيلى এবং وزنى বস্তুর মধ্যে ربوانسيئة-কে সীমাবদ্ধ করেছেন—যা আম্মার ইবনে ইয়াসারের ফতওয়া। যেমন রাসূল (সা.) বলেন— مَاكَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأسَ بِهِ اِنَّمَا الرِّبٰوا فِى النَّسِيْئَةِ اِلاَّ مَا كِيْلَ اَوْ وَزِنَ অর্থাৎ যদি وزنى বা كيلى বস্তু না হয় তাহলে এর মধ্যে কমবেশি (تفاضل)

জায়িয। যেমন, এক গোলামের বদলায় দুই গোলাম বিনিময় করা। এসবের মধ্যে কমবেশি জায়িয বটে কিন্তু 'বাকি' নাজায়িয।

মোটকথা انما الربوا فى النسيئة-এর সম্পর্ক غير كيلى এবং غير وزنى বস্তুর সাথে কিন্তু রাবী একে সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন।

(গ) انما الربوا فى النسيئة বলে যে حصر করা হয়েছে এটা মূলত ঃ حصرادعائى অর্থাৎ একথা বুঝানো হয়েছে যে, কুরআন-হাদীসে যে সুদকে হারাম করা হয়েছে এবং পরিহার না করলে যুদ্ধের ঘোষণা করা হয়েছে এটা মূলত ঃ ربوا النسيئة তথা বাকিতে সুদ আদান প্রদান করা বিভিন্ন হাদীসে যে ربوا الفضل-কে হারাম করা হয়েছে এর গুনাহ তুলনামূলক প্রথম প্রকার সুদের চেয়ে হালকা। সুতরাং انما الربوا فى النسيئة-এর অর্থ ربا اغلظ، ربا جلى، ربا كامل، ربا حقيقى، এবং ربا شديد বলতে যে ربوا বুঝায় সেটা হলো ربوا نسيئة (ফতহুলবারী)।

সুদী ব্যাংকে চাকরী করার হুকুম

عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰكِلَ الرِّبٰوا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَ قَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

হুযূর (সা.) সুদখোর, সুদ প্রদানকারী, লেখক এবং সাক্ষীদের ওপর লা'নত করেছেন এবং বলেছেন তারা সবাই সমান। সুদ লেখকের জন্য লা'নত করার কারণ হলো—এর কারণে সুদী কারবারে নির্ভরতা এসে যায়। এর দ্বারা বুঝা যায়, সুদী ব্যাংকে চাকুরী করা নাজায়িয। চাকুরীর মধ্যে যদি এমন দায়িত্ব বর্তায় যার দ্বারা সুদের সহযোগিতা করা হয় তাহলে এটা দুই কারণে হারাম। যথা ঃ (১) গুনাহের সহযোগিতা করা হয়, (২) হারাম উপার্জন দ্বারা মজুরী গ্রহণ করা। চাকরীর অবস্থায় যদি সুদের সাথে কোনরূপ সংশ্লিষ্টতা নাও থাকে তথাপি হারাম মাল থেকে মজুরী গ্রহণ করায় তা হারাম হবে। হ্যাঁ যদি এ ধরনের কোন ব্যাংক পাওয়া যায় যার অধিকাংশ আয় হালাল, তাহলে ঐ ব্যাংকে এমন চাকরী করা যাবে যাতে সুদের সাথে সংশ্লিষ্টতা হয় না।

باب اخذ الحلال وترك الشبهات

অধ্যায় ঃ হালাল বস্তু গ্রহণ ও সন্দেহজনক বস্তু পরিহার করা সম্পর্কে

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَاَهْوٰى النُّعْمَانُ بِاِصْبَعَيْهِ اِلٰى اُذُنَيْهِ ا
اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَاِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْ
مِنَ النَّاسِ ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اِسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِ
الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ ـ

হুযূর (সা.) বলেন–হালাল বস্তুর হুকুম সুস্পষ্ট, হারাম বস্তুর হুকুমও সুস্পষ্ট। । দু'য়ের মাঝখানে অনেকগুলো বিষয় আছে যা সন্দেহজনক। বহু মানুষ এর কুম সম্পর্কে অজ্ঞ। যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বস্তু এড়িয়ে চলবে সে নিজের দ্বীন ও জ্জত হেফাযত করতে পারবে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বস্তুতে নিপতিত হবে স হারামে জড়িয়ে যাবে।

এই হাদীসের গুরুত্ব

এই হাদীসের গুরুত্ব অপরসীম। যে কয়টি হাদীসের ওপর ইসলামের ভিত্তি ়টি সেগুলোর অন্যতম। কেউ কেউ তো বলেই দিয়েছেন এটি ইসলামের এক তৃতীয়াংশ।

مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالَا يَعْنِيْهِ ۔ ٢ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ۔ ١
اِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَاِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ الخ ۔ ٣

ইমাম দাঊদ জাহেরী বলেন, এ হাদীস ইসলামের এক-চতুর্থাংশ। এ তাকরীর অনুযায়ী চতুর্থ হাদীসটি হল ঃ

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ۔

এই হাদীসে খানাপিনা থেকে শুরু করে ইসলামের যাবতীয় বিধানের ব্যাপারে সচেতন করা হয়েছে। বলা হয়েছে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপের প্রত্যেক কাজ হালাল হওয়া এবং সকল সন্দেহজনক বস্তু থেকে বিরত থাকা চাই। তাহলেই কেবল নিজের দ্বীন ও ইজ্জত হেফাযত করা সম্ভব।

مشتبهات-এর ব্যাখ্যায় আলিমদের বিভিন্ন মত

مشتبهات বলতে এখানে কী বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে আলিমগণের বিভিন্ন মত রয়েছে।

১। আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলেন—প্রকৃত অর্থে কোন বস্তু সন্দেহজনক নয়। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা সব বস্তুর হুকুম বর্ণনা করেছেন, কোন বস্তু এমন নেই যার হুকুম বর্ণনা করেননি। অবশ্য এই বর্ণনা দুই প্রকারের।

(ক) بيان جلى অর্থাৎ অত্যন্ত সুস্পষ্ট বর্ণনা, যার হুকুম সম্পর্কে সবাই অবগত।

(খ) بيان خفى কিছুটা অস্পষ্ট বর্ণনা। যার হুকুম সম্পর্কে শুধু মাত্র খাস খাস আলিমগণ অবগত। যারা শরীয়তের উসূল এবং মাসআলা استنباط করার যোগ্যতা রাখেন। মোটকথা مشتبهات বলতে সে সব বিষয় উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষ যার হুকুম সম্পর্কে সন্দিহান।

আর এ থেকে বাঁচার অর্থ হলো ঃ হুকুম না জানা পর্যন্ত এ কাজে লিপ্ত না হওয়া। হুকুম জানার পর এ কাজে অংশ গ্রহণ করাতে দোষ নেই।

২। ইমাম নববী (রহ.) বলেন— مشتبهات হলো ঐসব বিষয় যার ব্যাপারে হালাল ও হারামের দলীল বিরোধপূর্ণ। মুজতাহিদ যদি কোন দলীলের ভিত্তিতে হালালের দিক প্রাধান্য দেয় তাহলে এই হালাল হওয়াটা সন্দেহ যুক্ত থেকে যায়।

এক্ষেত্রে তাকওয়ার দাবি হলো এ থেকে বিরত থাকা। কেননা ইজতেহাদের মধ্যে ভুল হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক।

৩। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) ইমাম মাযুরী প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেন, এখানে مشتبهات বলতে মাকরূহ বিষয় উদ্দেশ্য।

হাদীসে মাকরূহ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। কেননা বহু মানুষ নির্বিঘ্নে মাকরূহ কাজে জড়িয়ে পড়ে। তাই হাদীসে সতর্কবাণী এসেছে যে, মাকরূহ কাজই একসময় হারাম কাজের পথ উন্মুক্ত করে।

৪। কতিপয় আলিমের মতে এখানে مشتبهات বলতে ঐসব মুবাহ কাজ উদ্দেশ্য যা থেকে বিরত থাকাই উত্তম। যেমন, হুযূর (সা.) খোলাফায়ে রাশেদা

এবং অধিকাংশ সাহাবী উত্তম খাবার গ্রহণ করা এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দের জীবন ধারণ করা থেকে বিরত থাকতেন।

মন্তব্য ঃ মাকরূহ ও মুবাহ কাজ সন্দেহজনক কিছু নয় বলে ৩য় ও ৪র্থ মত দুর্বল। প্রথম দুই মতই হাদীসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, সমস্ত সন্দেহজনক বস্তুই উদ্দেশ্য।

সন্দেহজনক বস্তুর প্রকারভেদ এবং এর হুকুম

সন্দেহজনক বস্তু দুই প্রকার।

১। সাধারণ জনগণকে সন্দেহের মধ্যে নিপতিত কারী مشتبهات

২। মুজতাহিদের জন্য সন্দেহ সৃষ্টিকারী مشتبهات

প্রথম প্রকার আবার দুই অবস্থা থেকে খালি নয়। হয়ত সাধারণ লোক হুকুম না জানার কারণে সন্দেহ সৃষ্টি হয় এবং কোন মুজতাহিদকেও এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেনি। এক্ষেত্রে সন্দেহজনক এই বস্তু থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব।

অথবা মুফতী সাহেবদের ইখতিলাফের কারণে সাধারণ জনগণ সন্দেহে পতিত হয় এবং কোন মুফতীকে অপর মুফতীর ওপর তাকওয়া ইল্‌ম কোন দিক বিবেচনায় প্রাধান্য দেয়া না যায় তাহলে এক্ষেত্রে مشتبهات থেকে বেঁচে থাকা মুস্তাহাব।

এমনিভাবে যদি মুজতাহিদের জন্য সন্দেহজনক অবস্থা সৃষ্টি হয় তাহলেও এর দুই সূরত। হয়ত ইজতেহাদ না করার কারণে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে অথবা দলীলসমূহের বৈপরিত্যের (تعارض ادلة) কারণে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। এক দলীলকে অপর দলীলের ওপর ترجيح দেয়া যাচ্ছেনা। বর্ণিত দু'টি ক্ষেত্রেই সন্দেহজনক এসব বস্তু থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব।

لان المحرم راجح على المبيح عند استواء الادلة ـ

হ্যাঁ, যদি হালাল হওয়ার দলীল হারাম হওয়ার দলীলের ওপর প্রাধান্য পায় তাহলে এক্ষেত্রে বিষয়টা কিছু হালকা হবে এবং এথেকে বিরত থাকা মুস্তাহাব হবে, ওয়াজিব নয়।

من وقع فى المشبهات وقع فى الحرام-এর ব্যাখ্যা

যে ব্যক্তি সন্দেহের মধ্যে পতিত হবে সে নিশ্চিতভাবে হারামে লিপ্ত হয়ে যাবে। কারণ ঃ

১। মানুষ যখন সন্দেহজনক বস্তুতে লিপ্ত হয় তখন সে একে হালকা মনে করে। এতে করে দ্বীনের ব্যাপারে সে বেপরোয়া হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত হারামকে হারাম জানা সত্ত্বেও নির্দ্বিধায় এতে মশগুল হয়ে যায়।

২। যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বস্তুতে লিপ্ত হয় তার অন্তর অন্ধ হয়ে যায়। এতে সে হারাম কাজে লিপ্ত হয় এবং এ ব্যাপারে সে কোন ভ্রুক্ষেপও করেনা।

كالراعى يرعى حول الحمى-এর ব্যাখ্যা

حمى بالكسر বলা হয় ঐ জায়গাকে যা বাদশার জন্য সংরক্ষিত। এতে অন্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকে। সাধারণত ঃ শব্দটি চারণ ভূমির অর্থে প্রয়োগ হয়। আরব বাদশাদের অভ্যাস ছিল তারা বিশেষ কোন চারণ ভূমিকে নিজেদের জন্য খাস করে নিত। অন্য কেউ এতে প্রবেশ করলে তাকে কঠোর শাস্তি দিত। এজন্য রাখালরা এ থেকে নিরাপদ দূরত্বে নিজেদের বকরী চরাত। কেননা তারা আশংকা করত যদি সামান্য অসতর্কতার সুযোগে বকরী, ভেড়া এতে মুখ দেয় তাহলে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

রাসূল (সা.) সর্বজন পরিচিত حمى শব্দ দ্বারা দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন এভাবে যে, আল্লাহর حمى হলো হারাম বস্তুসমূহ, সন্দেহজনক বস্তু এর আশেপাশে বিদ্যমান। সুতরাং হারাম থেকে বাঁচতে হলে এগুলো থেকে বাঁচতে হবে।

হযরত হাসসান ইবনে সিনান (রহ.) বলেন, তাক্ওয়া এবং বুযর্গীর চেয়ে সহজ কোন বিষয় নেই। সন্দেহজনক যাবতীয় বস্তু পরিহার কর, সন্দেহমুক্ত বস্তু পালন কর, সহজেই তাক্ওয়া হাসিল করতে পারবে।

ইমাম বুখারী (রহ.) تفسير المشبهات অধ্যায়ে সন্দেহজনক বস্তু পরিহার করার গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষামূলক কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরেছেন।

যেমন ঃ (১) হযরত ওকবা ইবনে হারিছ (রা.) এক মহিলাকে বিয়ে করলে এক বৃদ্ধা এসে বললো—তোমাদের দুইজন (স্বামী-স্ত্রী)-কে আমি দুধপান করিয়েছি। কিন্তু এর স্বপক্ষে দলীল দাঁড় করাতে ব্যর্থ হয় সে। রাসূল (সা.)-কে এ বিষয়ে অবগত করার জন্য হযরত ওকবা (রা.) সুদূর মক্কা হতে মদীনায় আগমন করেন। আইন অনুযায়ী যদিও মহিলার দাবি যথার্থ ছিল না তথাপি সন্দেহমুক্ত থাকতে রাসূল (সা.) তাঁকে বলেন—كيف وقد قيل؟

যখন একটা কথা উঠছেই তখন তাকে নিয়ে ঘর করবে কিভাবে?

২। উম্মুল মুমিনীন হযরত সাওদা (রা.)-এর পিতার বাঁদীর গর্ভে জন্ম নেয়া
ক পুত্র সন্তানের জন্ম ঘটিত ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিলে হুযূর (সা.) তাঁকে পর্দা
ার আদেশ দেন। যদিও শরীয়ত অনুযায়ী অকাট্যভাবে পর্দা করা ফরয ছিল
।

৩ হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা.)-কে হুযূর (সা.) আদেশ দেন যে,
ামার কুকুরের সাথে অন্য কুকুর শিকারে অংশ নিলে শিকারকৃত সেই প্রাণী
ক্ষণ করো না, কেননা এতে সন্দেহ-সংশয়ের উদ্রেক হয়। —বুখারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭৫-২৭৬

باب بيع البعيرو استثناء ركوبه

অধ্যায় ঃ উট বিক্রি এবং এর আরোহণ (প্রভেদ) استثناء করার হুকুম সম্পর্কে

عَنْ عَامِرٍ حَدَّثَنِى جَابِرُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ كَانَ يَسِيْرُ عَلٰى جَمَلٍ ا
قَدْ اَعْيَا فَاَرَادَ اَنْ يُسَيِّبَهُ قَالَ فَلَحِقَنِى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْ
وَسَلَّمَ فَدَعَا لِىْ وَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ الخ -

হযরত জাবেরের (রা.) উটের ঘটনা

মুসনাদে আহমদে ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত
াবেরের উটটি হারিয়ে গিয়েছিল। তিনি হুযূর (সা.)-এর কাছ দিয়ে অতিক্রম
রা কালীন হুযূর (সা.) বললেন—জাবের। কী হয়েছে তোমার? তিনি বললেন,
ামার উট হারিয়ে গেছে। হুযূর (সা.) বললেন—অমুক জায়গায় উটটি রয়েছে,
াও গিয়ে। হুযূর (সা.) যেদিকে ইশারা করেছিলেন সেদিকে খোঁজা হলো কিন্তু
াওয়া গেলো না। হুযূরের (সা.) কাছে একথা বলা হলে তিনি আবার ঐ
ায়গার দিকে ইশারা করলেন। কিন্তু এবারও পাওয়া গেলো না। তিনি সেখান
থকে ফিরে আসলেন। হুযূর (সা.) কাজে ব্যস্ত ছিলেন। জাবের (রা.)-কে
ললেন, একটু অপেক্ষা কর। অতঃপর জাবেরের (রা.) হাত ধরে হুযূর (সা.)
যদিকে উট ছিল সেদিকে গেলেন। উটটি নিয়ে হযরত জাবেরের (রা.) হাতে
িরিয়ে দিলেন। তিনি উটের ওপর আরোহণ করলেন কিন্তু উটটি নেহায়েত দুর্বল
ছল, চলতে পারছিলনা। হুযূর (সা.) অবস্থা দেখে দু'আ করলেন এবং লাঠি দ্বারা
মাঘাত করলেন। এখন খুব দ্রুত চলতে লাগল সেটি এবং এত দ্রুত চলতে
াগল যে, হুযূরের (সা.) উটকেও অতিক্রম করে যেতে লাগল।

জাবের (রা.) হুযূরের (সা.) কথা শোনার জন্য লাগাম টেনে ধরলেন। হুযূর (সা.) এ সময় বললেন— بعنى جملك هذا তোমার এ উটটি আমার কাছে বিক্রি কর। জাবের (রা.) বললেন—বিক্রি কেন? আপনাকে এটি হাদিয়া দিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিন্তু হুযূর (সা.) বেচার জন্য তাগিদ দিলেন (হাদিয়া হিসেবে নিতে রাজি হলেন না)। ফলে জাবের (রা.) বিক্রি করে দিলেন এবং বাড়ি পৌঁছা পর্যন্ত আরোহণকে استثناء করলেন। মদীনায় পৌঁছে হুযূরের (সা.) কাছে উটটি সোপর্দ করলে তিনি নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে এক কীরাত পরিমাণ বেশি দিলেন। জাবের (রা.) বরকতময় এই কীরাতটি সবসময় থলের মধ্যে রেখে দিতেন। হাররা যুদ্ধে শামবাসীরা এটি তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। জাবের (রা.) মূল্য নিয়ে ফিরে আসছিলেন। হুযূর (সা.) লোক পাঠিয়ে তাঁকে আবার ডেকে নিলেন এবং বললেন—তোমার কি এই ধারণা হয় যে, আমি মূল্য কম দিয়েছি?

তুমি মূল্য ও উট সব নিয়ে যাও। সবই তোমার জন্য। এই ঘটনায় দেখা যায় যে, হযরত জাবের (রা.) বাড়ি পৌঁছা পর্যন্ত সওয়ার হওয়ার শর্তারোপ করেছিলেন। এর ফলে شرط فى البيع-এর মাসআলা এসে যায়। বিস্তারিত দেখুন।

شرط فى البيع-এর বিস্তারিত বিবরণ

মনে রাখতে হবে যে, এখানে শর্ত দ্বারা ঐ শর্ত উদ্দেশ্য যা عقد بيع-এর সাথে সংযুক্ত (مقترن) হয় এবং এতে এমন শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে যে, عقد-এর সাথে যার কোনরূপ সংশ্লিষ্টতা নেই।

এই শর্তটা যদি হারাম হয় অথবা এতে প্রতারণার সম্ভাবনা থাকে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে এরূপ শর্ত করা হারাম।

কিন্তু শর্তটি যদি হারাম না হয় অথবা এতে প্রতারণার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে এর হুকুম সম্পর্কে আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

আহলে জাহের এবং ইবনে হাযম একে নাজায়িয বলেছেন এবং বলেছেন এর দ্বারা بيع বাতিল হয়ে যাবে। ইবনে শুবরুমা জায়িয বলেছেন তার মতে بيع এবং شرط উভয়টি সহীহ্।

ইবনে আবীলায়লা এবং ইবরাহীম নখয়ী بيع-কে জায়িয এবং شرط-কে বাতিল বলেছেন।

আর আমাদের চার ইমামের মতে এর মধ্যে বহু তাফসীল রয়েছে এবং সে
নুযায়ীই হুকুম আরোপিত হবে।

১। হানাফী মাযহাব

নিম্নোক্ত কিছু শর্ত করে ক্রয়-বিক্রয় করলে ক্রয়-বিক্রয় সহীহ্ হবে এবং শর্ত
ারোপে কোন সমস্যা হবে না। শর্তগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। عقد-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শর্ত ২। عقد-এর উপযোগী কোন শর্ত ৩।
হরহ যেসব শর্ত করতে মানুষ অভ্যস্ত সেসব শর্ত (تعامل الناس)।

প্রথম প্রকার শর্তের উদাহরণ হলো, এই শর্তে বিক্রি করা যে, মূল্য অর্পন
রার পূর্ব পর্যন্ত مبيع বিক্রেতার কাছে আবদ্ধ থাকবে। অথবা কোন বাহন এই
র্তে খরিদ করবে যে, ক্রেতা এর ওপর সওয়ার হবে। যেহেতু শর্ত করা ছাড়াই
সব হুকুম কার্যকর হয় এজন্য শর্ত করায় নতুন করে কোন হুকুম আরোপিত
না বরং পূর্বের হুকুমই কিছুটা শক্তিশালী ও মজবুত হয়। অতএব এসব
র্তকরা দ্বারা بيع ফাসিদ হবেনা।

দ্বিতীয় প্রকার শর্তের উদাহরণ, যেমন—বাকি লেনদেনের ক্ষেত্রে এই শর্ত
রা যে, ক্রেতা মূল্যের বদলায় কোন বস্তু বন্ধক রাখবে অথবা কোন
মানতদার বানাবে। এই শর্ত দ্বারা বিক্রেতার হক ثمن তথা মূল্য পাওয়াটাকে
শ্চিত করা হচ্ছে মাত্র।

তৃতীয় প্রকারের শর্তের উদাহরণ হলো, যেমন এই শর্তে জুতা খরিদ করা
, বিক্রেতা এটাকে পরিয়ে দেবে অথবা চামড়া ক্রয় করল এই শর্তে যে, এর
রা মোজা বানিয়ে দেবে। এসব শর্ত জায়িয।

لِاَنَّ الثَّابِتَ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيْلٍ شَرْعِيٍّ وَلِاَنَّ فِى النَّزْعِ عَنِ الْعَا
الظَّاهِرَةِ حَرْجًا بَيِّنًا ـ

আর যেসব শর্ত উল্লেখিত তিন প্রকার শর্তের কোনটার মধ্যে শামিল নয়
টা আবার দুই প্রকার।

১। এমন শর্ত যা ক্রেতা, বিক্রেতা বা বিক্রিত বস্তুর জন্য লাভজনক (যদি
ক্রিত বস্তু গোলাম বাঁদী হয়)। এই শর্ত দ্বারা بيع ফাসিদ হয়ে যায়। যেমন

এই শর্তে গম খরিদ করল যে, বিক্রেতা এটা পিষে দিবে অথবা কাপড় খরিদ করল এই শর্তে যে, বিক্রেতা সেলাই করে দিবে। এ ধরনের শর্তায়ন দ্বারা بيع ফাসিদ হয়ে যায়।

২। এমন শর্ত যা ক্রেতা-বিক্রেতা বা বিক্রিত বস্তু (مبيع) কারো জন্য লাভজনক নয়। যেমন এরূপ শর্তে জন্তু ক্রয় করল যে, এর ওপর সওয়ার হবেনা। এক্ষেত্রে শর্ত বাতিল হয়ে যাবে এবং بيع সহীহ্ হবে।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা জানা গেলো যে, شرط দুই প্রকার। এক. এমন শর্ত যা عقد-কে ফাসিদ করে দেয়। দুই. এমন শর্ত যা নিজেই বাতিল, بيع-কে ফাসিদ করতে পারেনা।

৩। আরেক প্রকার শর্ত আছে যা لازم হয়ে যায় এবং بيع ও সহীহ্ হয়। এটা ঐ সমস্ত শর্ত শরীয়তের পক্ষ থেকে যা প্রদান করা হয়েছে। যেমন— خيار عيب ، خيارشرط ، خيار رؤيت ইত্যাদি।

২। শাফেঈ মাযহাব

যে সব শর্ত عقد-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং عقد-এর উপযোগী শাফেঈর মতে সে সব শর্ত সহীহ্ বলে গণ্য। অবশ্য ইমাম শাফেঈ (রহ.) عقد-এর উপযোগী শর্তসমূহ (ما يلائم العقد)-কে মানুষের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও عقد-এর জন্য লাভজনক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন— اَلشَّرْطُ الَّذِىْ فِيْهِ مَصْلَحَةُ الْعَقْدِ اَوِ الشَّرْطُ الَّذِىْ تَدْعُوْ اِلَيْهِ الْحَاجَةُ .

কোন শর্ত যদি এই প্রকারের না হয় তাহলে সেই শর্ত গ্রহণযোগ্য নয় যদিও এর ওপর মানুষের ব্যাপক রীতি হয়ে যায়।

সুতরাং এরূপ শর্ত করায় যদি ক্রেতা-বিক্রেতার লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে بيع ফাসিদ হয়ে যাবে। আর লাভবান না হলে শর্ত বাতিল এবং ক্রয়-বিক্রয় সহীহ্ হবে।

আহনাফ ও শাফেঈদের মধ্যে পার্থক্য এতটুকু যে, যেসব শর্তের ওপর মানুষের تعامل (ব্যাপক অংশ গ্রহণ) হয় সেগুলো আহনাফের মতে জায়িয আর شوافع-এর মতে নাজায়িয।

৩। মালেকী মাযহাব

এই মাসআলার ব্যাপারে ইমাম মালেক (রহ.)-এর মাযহাব অত্যান্ত সূক্ষ্ম এবং ব্যাখ্যাও অতি বিস্তর। আহনাফ ও শাফেঈ মাযহাব এবং মালেকী মাযহাবের মধ্যে পার্থক্য হলো—আহনাফ ও শাফেঈর মতে শর্ত নাজায়িয হওয়া আসল তবে বিশেষ কয়েক কারণে শর্ত করা যায় (যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে) আর মালিকী মাযহাব অনুযায়ী শর্ত জায়িয হওয়াই আসল। তবে কয়েক ক্ষেত্রে শর্ত করা নাজায়িয (فعدم جواز الشرط عند نا اصل وعنده شرط الجواز اصل)

ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতে মাত্র দুই ক্ষেত্রে শর্ত করা নাজায়িয।

১। এমন শর্ত করা যা عقد-এর উদ্দেশ্যই বাতিল করে দেয়। যেমন—এই শর্ত করল যে, ক্রেতা مبيع-এর মধ্যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারবেনা।

২। এমন শর্ত করা যার দ্বারা ثمن আদায়ে বিঘ্ন ঘটে। যেমন এই শর্ত করল যে, بيع সংঘটিত হতে হলে ঋণ দিতে হবে অথবা ক্রেতা এই শর্ত জুড়ে দিল যে, সে মূল্য পরিশোধ করলে মূল্য তারই থেকে যাবে!

তাঁর মতে এসব শর্ত বাতিল হিসেবে গণ্য। তবে عقد-এর মধ্যে তিনভাবে এর কার্যকারিতা প্রকাশ পাবে।

১। ফাসিদ শর্তের কারণে عقد বাতিল হয়ে যাবে। এটা ঐ ক্ষেত্রে যখন শর্তটা عقد-এর উদ্দেশ্যকে বাতিল করে দেয়। যেমন এই শর্ত করা যে, ক্রেতা عقد-এর মধ্যে কোন রূপ হস্তক্ষেপ করতে পারবেনা। এক্ষেত্রে শর্ত ও আকদ উভয়টি বাতিল হয়ে যাবে।

২। شرط বাতিল হবে বটে কিন্তু عقد সহীহ্ হবে। এটা ঐ ক্ষেত্রে যখন শর্তটি عقد-এর উদ্দেশ্যের প্রতিবন্ধক হলেও এই অনুযায়ী আমল করাতে কোন সমস্যা নেই। যেমন স্ত্রী এই শর্তে বিয়ে করল যে তার উপস্থিতিতে স্বামী অন্য কোন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবেনা। অথবা এই শর্ত করল যে, স্বামী তাকে কখনো তালাক দিতে পারবেনা। এক্ষেত্রে শর্ত বাতিল হবে কিন্তু عقد সহীহ্ হবে।

৩। شرط فاسد-এর কারণে عقد বাতিল হবে ঠিক কিন্তু শর্তকারী ব্যক্তি যদি শর্ত প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে عقد সহীহ্ হবে। এটা ঐ সময় হবে যখন

শর্তটি ثمن আদায়-পাওনার ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটাবে। উপরোল্লিখিত তিনটি শর্ত ছাড়া বাকি সব শর্ত ইমাম মালেকের (রহ.) মতে বৈধ। যেমন—বিক্রেতা এই শর্ত করল যে, ক্রেতা খরিদ গোলামকে আযাদ করে দিবে অথবা খরিদ জমিন ওয়াকফ করে দিবে অথবা এই শর্ত করল যে, বিক্রেতা বিক্রিত বাড়িতে কিছু দিন অবস্থান করবে। অথবা এই শর্তে জন্তু বিক্রয় করল যে, বিক্রেতা কিছুদিন এতে আরোহণ করবে ইত্যাদি। মোটকথা ক্রেতা-বিক্রেতার যারই ফায়দা হোকনা কেন শর্ত করা জায়িয।

মালেকীগণ নিজেদের মাযহাবকে সর্বশ্রেষ্ঠ মাযহাব মনে করেন। কেননা এতে সব হাদীসের ওপর আমল হয়ে যায়। আর এক হাদীসকে অন্য হাদীসের ওপর ترجيح দেয়ার চেয়ে সব হাদীসের ওপর আমল করাই উত্তম।

৪। হাম্বলী মাযহাব

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের (রহ.) মতে যদি একাধিক শর্ত করা হয় তাহলে شرط এবং عقد উভয়টি বাতিল হয়ে যাবে। যেমন, এই শর্তে কাপড় ক্রয় করল যে, বিক্রেতা সেলাই এবং ধৌত করে দিবে। এখানে দু'টি শর্ত পাওয়া যাওয়ার কারণে عقد ফাসিদ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, একাধিক শর্তও যদি عقد-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং عقد-এর উদ্দেশ্যের সহায়ক হয় তাহলে عقد সহীহ্ হবে। যেমন একই সাথে "রেহেন" ও مبيع অর্পনের শর্ত করা। "এক শর্ত" হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম আহমদের মাযহাব ইমাম মালেকের মাযহাবের প্রায় কাছাকাছি, যদিও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।

ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ হওয়ার কারণ

মতবিরোধ হওয়ার কারণ হলো, এ অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসগুলো বিরোধ পূর্ণ। যথা ঃ

১। হযরত জাবেরের (রা.) হাদীসে বলা হয়েছে যে, তিনি উট বিক্রি করে মদীনা পর্যন্ত এর পিঠে আরোহণ করার শর্ত করেছিলেন। যার দ্বারা বুঝা যায় بيع بالشرط-তথা একই আকদে بيع এবং شرط উভয়টি সহীহ্।

২। বারীরা সম্পর্কে হযরত আয়িশার (রা.) হাদীস। হযরত আয়িশার (রা.) কাছে বারীরাকে তাঁর মালিকরা এই শর্তে বিক্রি করে যে, তারা ولاء-এর মালিক

হবে। আর তিনিও এই শর্ত মেনে নেন। রাসূলের (সা.) কানে এই সংবাদ পৌঁছলে, তিনি এটা অস্বীকার করেন এবং বলেন—মানুষেরা এ ধরনের শর্ত করে কেন? অতঃপর তিনি بيع-কে বহাল রেখে শর্ত বাতিল করে দেন। এর দ্বারা বুঝা যায় بيع সহীহ্ হবে আর شرط অনর্থক (বাতিল) হবে।

৩। আমর ইবনে শোআইবের হাদীস نهى عن بيع وشرط এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় بيع এবং شرط উভয়টি বাতিল।

একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা

আব্দুল ওয়ারিছ ইবনে সা'দ বলেন—আমি একবার মক্কায় আগমন করলাম। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ইবনে আবী লায়লা (রহ.) এবং ইবনে শুবরুমা সে সময় মক্কায় অবস্থান করছিলেন। আমি আবূ হানীফাকে بيع مع الشرط-এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন بيع এবং شرط উভয়টি বাতিল হয়ে যাবে। এরপর ইবনে আবী লায়লাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন— بيع জায়িয তবে شرط বাতিল।

অতঃপর ইবনে শুবরুমাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন— بيع এবং شرط উভয়টি জায়িয।

আব্দুল ওয়ারিছ বলেন—এরপর আমি আবূ হানীফার কাছে গিয়ে অপর দুইজনের মন্তব্য শোনালাম। তিনি বললেন—

لاَ اَدْرِىْ مَا قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ ـ اَلْبَيْعُ بَاطِلٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ ـ

এরপর ইবনে আবী লায়লার কাছে অপর দু'জনের কথা শোনালে তিনি বললেন—

لاَ اَدْرِىْ مَا قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ

اَلْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اشْتَرِى بَرِيْرَةَ وَالشْتَرِطِى لَهُمُ الْوَلَاءَ اَلْبَيْعُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ۔

এরপর ইবনে শুবরুমার কাছে বাকি দু'জনের কথা শোনালে তিনি বললেন—

لَا اَدْرِىْ مَا قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعُرُ بْنُ كُدَامٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ بَاعَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَلًا وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ اَلْبَيْعُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ جَائِزٌ۔

মোটকথা উল্লেখিত তিন হাদীসের ওপর মাসআলার ভিত্তি। ইমামগণ ইজতিহাদ অনুযায়ী হাদীসগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন অথবা একটাকে অপরটার ওপর তারজীহ দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

হানাফীগণ نهى عن بيع وشرط-এর ওপর আমল করেছেন। তবে শর্তকে ঐ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছে— যে ক্ষেত্রে শর্ত করার দ্বারা ক্রেতা-বিক্রেতা অথবা مبيع-এর উপকার হয় এবং এর ওপর মানুষের تعامل না হয়।

আর হযরত আয়িশা ও জাবের (রা.)-এর হাদীসের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। এই ঘটনা দু'টিতে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। এক. মতবিরোধের ক্ষেত্রে শিষ্টাচার বা আদব। ইমামগণ মতবিরোধের ক্ষেত্রে একে অপরের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। কেউ কারো প্রতি কখনও আক্রমণাত্মক ছিলেন না। শ্রদ্ধার সাথে শুধু নিজের মত জানিয়ে দিতেন। ঘটনাটি তারই প্রমাণ। দুই. ইখতিলাফের ভিত্তি যে হাদীস ও কুরআন এ ঘটনাটি তার প্রমাণ। কেননা তিন ইমামই হাদীসের ভিত্তিতেই তিন রকমের মত পেশ করেছেন। নিজের মনগড়া নয়। এ দু'টি বিষয় জানতে আগ্রহী পাঠক محمد عوامة-এর লিখিত أدب الاختلاف فى مسائل العلم والدين এবং أثر الحديث الشريف فى اختلاف الائمة الفقهاء رضى الله عنهم কিতাব দু'টি পাঠ করতে পারেন।

হযরত জাবেরের (রা.) হাদীসের জবাব

এই হাদীসটি বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে। কোন রেওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় মূল আকদে শর্ত করা হয়েছিল। যেমন— اِسْتَثْنَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلاَنَهُ اِلَى اَهْلِي

কিন্তু অন্য রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় মূল আকদে শর্ত করা হয়নি। বিনা শর্তেই বিক্রয় করা হয়েছিল। তবে রাসূল (সা.) অনুগ্রহপূর্বক সওয়ার হওয়ার সুযোগ দেন। মুসনাদে আহমদে সুস্পষ্ট ভাবে একথাই বলা হয়েছে। হযরত জাবের (রা.) বলেন—

فَنَزَلْتُ مِنَ الرَّحْلِ اِلَى الْاَرْضِ قَالَ : مَا شَأْنُكَ قَالَ : قُلْتُ جَمَلُكَ ! قَالَ : قَالَ لِيْ اِرْكَبْ جَمَلَكَ قَالَ : قُلْتُ مَا هُوَ بِجَمَلِيْ وَلٰكِنَّهُ جَمَلُكَ ، قَالَ : كُنَّا نُرَاجِعُهُ مَرَّتَيْنِ فِى الْاَمْرِ اِذَا اَمَرَنَا بِهِ فَاِذَا اَمَرَنَا بِهِ الثَّالِثَةَ لَمْ نُرَاجِعْهُ قَالَ : فَرَكِبْتُ الْجَمَلَ ـ

এই রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় জাবের (রা.) উট হস্তান্তর করে দিয়েছিলেন। পরে রাসূল (সা.) অনুগ্রহ পূর্বক তাঁকে সওয়ার হওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। তিনি প্রথম প্রথম সওয়ার হতে চাচ্ছিলেন না। কিন্তু হুযূর (সা.)-এর বার বার তাগিদের কারণে তিনি সওয়ার হন। এই রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় আকদের মূলে শর্ত করা হয়নি।

তাছাড়া রাসূলের (সা.) অনুগ্রহের প্রতি সাহাবাদের পূর্ণ আস্থা ছিল। এরূপ ধারণাই করা যায় না যে, হযরত জাবের (রা.) এই আশংকা করছিলেন যে, হুযূর (সা.) তাঁকে ময়দানে ফেলে যাবেন!

মোটকথা রেওয়ায়াতগুলো পরস্পর বিরোধ পূর্ণ হলেও আকদের সময় শর্ত করা হয়নি—এটাই সুস্পষ্ট। সুতরাং হাদীসটি শর্ত জায়িয হওয়ার দলীল হতে পারে না।

ইমাম ত্বহাভী (রহ.) বলেন, ক্রয়-বিক্রয় করা রাসূলের (সা.) উদ্দেশ্য ছিলনা। বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল হযরত জাবেরের (রা.) প্রতি এহসান করা। তার প্রতি এহসান করা দেখে অন্যরাও যেন আশাবাদী হতে পারে এজন্য রাসূল (সা.) বাহ্যিকভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের পন্থা অবলম্বন করেছেন।

তাইতো রাসূল (সা.) বলেছেন—"তুমি কি দারণা কর যে, কম মূল্য দিয়ে তোমার উট নিয়ে নিব? উট এবং দিরহাম সব তোমার। এগুলো নিয়ে নাও তুমি।"

আয়িশা (রা.)-এর হাদীসের জওয়াব

আয়িশা (রা.)-কে হুযূর (সা.) বললেন—اشتريها واعتقيها
واشترطى لهم الولاء-এর দ্বারা شرط এবং بيع উভয়টি জায়িয হওয়া বুঝায়। আলিমগণ এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। যথা ঃ

১। হুযূর (সা.) হযরত আয়িশা (রা.)-কে শুধুমাত্র بيع-এর অনুমতি দিয়েছিলেন। বারিরার মালিকদের জন্য ولاء-এর শর্ত করার অনুমতি দেননি।

ত্বহাভীর এক রেওয়ায়াত এ মতের সমর্থন যোগায়। হুযূর (সা.) আয়িশাকে বললেন— لاَيَمْنَعُكِ ذٰلِكَ مِنْهَا اِشْتَرِيْهَا فَاعْتَقِيْهَا فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ। যে সব রেওয়ায়াতে واشترطى لهم الولاء-এর লফ্য উল্লেখ করা হয়েছে ইমাম ত্বহাভী ও ইমাম মুযানী (রহ.)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন—যদি এসব রেওয়ায়াত সহীহ্ ধরা হয় তাহলে لهم শব্দের لام-এর অর্থ হবে على অর্থাৎ واشترطى عليهم الولاء তথা বারিরার মালিকের ওপর এই শর্ত কর যে, তারা ولاء পাবেনা ولاء পাব আমি।.

তবে ইমাম খাত্তাবী, নববী, ইবনে দাকীকুল ঈদ এই জওয়াব ও ব্যাখ্যাকে রদ করার চেষ্টা করেছেন।

২। ইমাম নববী (রহ.) বলেন—শর্ত করার এই হুকুমটি শুধু মাত্র এই ঘটনার সাথে খাস, এর দ্বারা আমভাবে হুকুম সাবেত করা উদ্দেশ্য নয়।

হুযূর (সা.) প্রথমে শর্ত করার অনুমতি দিলেও পরবর্তীতে শর্ত বাতিল করে দেন! যাতে করে মানুষ বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে নেয় এবং এথেকে বিরত থাকে। যেমন—আরবরা হজ্জের মাসে ওমরা করা দোষণীয় মনে করত। এই ধারণা দূর করার জন্য হুযূর (সা.) বিদায় হজ্জে হজ্জের ইহরাম বাধার পর এই হুকুম বাতিল করে দেন এবং ওমরা করার হুকুম দেন।

বারীরার ব্যাপারে রাসূল (সা.) এই পন্থাই অবলম্বন করেছিলেন।

৩। এক রেওয়ায়াতে এই শব্দ এসেছে اِشْتَرِيْهَا وَدَعِيْهِمْ يَشْتَرِطُوْا مَاشَاءُوْا (বুখারী)। এর দ্বারা বুঝা যায়, যে সব রেওয়ায়াতে اشترطى বলা হয়েছে সেখানে امر তার আসল অর্থে ব্যবহৃত হয়নি এবং শর্ত করা না করা উভয়টার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাদের জন্য ولاء-এর শর্ত করা না করা

এক বরাবর। আযাদকারীই ولاء পাবে। কুরআনে এ ধরনের বহু আয়াত রয়েছে— اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ . اِصْبِرُوْا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا .

৪। কেউ কেউ এ জওয়াবও দিয়েছেন যে, اشترطى لهم الولاء-এর অর্থ হলো— হে আয়িশা! তুমি ওদের শর্ত মেনে নাও, ঝগড়া করতে যেওনা।

সুতরাং اشترطى-এর অর্থ হচ্ছে اسكتى। অর্থাৎ (রূপক অর্থ) مجاز হিসেবে এই অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে।

৫। আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন—হাদীসে একথা বলা হয়নি যে, আকদের সাথে ولاء-এর শর্ত করতে হবে। হতে পারে আকদের পূর্বেই শর্ত করা হয়েছিল—যা একটি ওয়াদা ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং اشترطى-এর অর্থ হলো—তুমি ولاء -এর ব্যাপারে তাদের সাথে ওয়াদা কর, অবশ্য ওয়াদা পূর্ণ করা জরুরী নয়।

ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) এই জওয়াব প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, এই ব্যাখ্যার কোন যৌক্তিকতা নেই। কেননা হুযূর (সা.) এমন কোন ওয়াদা করার নির্দেশ দিবেন না যা পুরো করার কোন ইচ্ছা নেই।

৬। আল্লামা ইবনে হাযম (রহ.) বলেন—প্রাথমিক অবস্থায় আযাদকারী ছাড়া অন্য ব্যক্তির জন্য ولاء-এর শর্তকরার অনুমতি ছিল। আর এই সময়েই হুযূর (সা.) এরূপ শর্ত করার অনুমতি দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে انما الولاء لمن اعتق হাদীস দ্বারা আগের হুকুম মানসূখ হয়ে গেছে। ইবনে হাজার এই জওয়াবও প্রত্যাখ্যান করেছেন।

উল্লেখিত ব্যাখ্যার কোনটিই প্রশ্নমুক্ত নয়। তাই সবচেয়ে উত্তম ব্যাখ্যা হলো:

৭। এটা একটা ফাসিদ শর্ত যার দ্বারা بيع ফাসিদ হয়ে যায়। এই শর্ত পুরো করা না করা ক্রেতার ইচ্ছাধীন।

আর যে সব শর্ত পুরো করা বান্দার ইখতিয়ার বহির্ভূত সে সব শর্ত করার দ্বারা بيع বাতিল হয়না। যেমন—এই শর্তে গোলাম বাঁদী বিক্রি করা যে, ক্রেতা আযাদ করলেও এরা আযাদ হবেনা।

বিক্রেতার জন্য ولاء-এর শর্ত করাও এই প্রকার শর্তের মধ্যে শামিল। কেননা শরীয়তের বিধান হলো, আযাদকারী ولاء-এর মালিক হবে। সুতরাং

অন্যের জন্য ولاء-এর শর্ত করা প্রত্যাখ্যান যোগ্য হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। بيع-এর মধ্যে এর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবেনা— بيع সহীহ্ হবে।

তাফসীরে মাযহারীতে একথাই বলা হয়েছে। লক্ষ্য করুন—

فَمِنْهَا شَرْطٌ لاَ يُمْكِنُ لِلْمَشْرُوْطِ عَلَيْهِ اِتْيَانُهُ مِثْلُ اَنْ لاَ يَقَعَ الْعِتْقُ بِاعِتَاقِ الْمُشْتَرِى وَاَنْ يَكُوْنَ وَلاَءُهُ لِلْبَائِعِ وَمِثْلُ هٰذَا الشَّرْطِ بَاطِلٌ لَغْوٌ وَاِنْ كَانَ مِائَةُ شَرْطٍ وَيُعْتَبَرُ كَاَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ـ

ফায়েদা ঃ আহনাফের মতে যে সব শর্ত আকদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বা আকদের উপযোগী অথবা এর কোনটাই নয় কিন্তু মানুষ অহরহ এ ধরনের শর্ত করে (تعامل الناس এরূপ) তাহলে তা জায়িয। যেসব শর্ত এগুলোর কোনটাই নয় সে সব শর্ত করার দ্বারা بيع ফাসিদ হয়ে যাবে। মনে রাখতে হবে ফাসিদ হওয়ার মূল কারণ مفضى الى النزاع তথা ঝগড়া সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। بيع ফাসিদ হওয়ার ব্যাপারে সুদের কোন হাত নেই। কেননা সুদ যদি بيع ফাসিদ হওয়ার علت (কারণ) হতো তাহলে আহনাফ تعامل الناس এবং عرف-এর কারণে এ ধরনের শর্ত করার অনুমতি দিতেন না। বর্তমান যুগে بيع مع الشرط-এর ব্যাপক প্রচলন ঘটেছে। ব্যবসায়ীকে সুবিধার্থে যে সব শর্তে সুদ বা ঝগড়া সৃষ্টির সম্ভাবনা নেই সেগুলোকে জায়িয ফতওয়া দেয়াই উত্তম হবে।

باب جواز اقتراض الحيوان واستحباب توفيته خيرا مما عليه

অধ্যায় ঃ জন্তু ধার নেয়া এবং তুলনামূলক ভালো জন্তু দিয়ে ধার পরিশোধ করা মুস্তাহাব হওয়া প্রসঙ্গে

عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ اِبِلٌ مِنْ اِبِلِ الصَّدَقَةِ فَاَمَرَ اَبَا رَافِعٍ اَنْ يَقْضِىَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ اِلَيْهِ اَبُوْ رَافِعٍ فَقَالَ : لَمْ اَجِدْ فِيْهَا اِلاَّ خِيَارًا رَبَاعِيًا فَقَالَ اَعْطِهِ اِيَّاهُ اِنَّ خِيَارَ النَّاسِ اَحْسَنُهُمْ قَضَاءً ـ

হুযূর (সা.)-এর গোলাম আবূ রাফে' (রা.) বলেন, একবার হুযূর (সা.) একব্যক্তি থেকে অল্প বয়সী একটি উট ধার নেন। কিছুদিন পর বাইতুল মালে সদকার উট আসলে আবূ রাফে'কে ঐ লোকের উট পরিশোধের নির্দেশ দেন। আবূ রাফে' হুযূর (সা.)-কে জানালেন উত্তম মানের রবায়ী উট ছাড়া অন্য কোন উট পাওয়া যাচ্ছে না।

হুযূর (সা.) বললেন, এগুলোই দিয়ে দাও। নিশ্চয়ই সেই শ্রেষ্ঠ যে ঋণ পরিশোধে শ্রেষ্ঠ।

بكر অর্থ, ছোট, অল্প বয়সী উট। ছয় বছর পেরিয়ে উট যখন সপ্তম বছরে পা দেয় এবং সামনের চার পাশের চার দাঁত গজায় তখন উটকে رباعى এবং উষ্ট্রীকে رباعية বলা হয়।

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় জন্তু ধার নেয়া জায়িয। এটাই ائمة ثلثة -এর মাযহাব। তাঁদের মতে সর্বপ্রকার জন্তুর ধার নেয়া এবং بيع سلم-এর পণ্য বানানো জায়িয। তবে আহনাফের মতে জন্তু ধার দেয়া-নেয়া জায়িয নেই। কেউ নিলে সেটা ফিরিয়ে দেয়া ওয়াজিব। এর দ্বারা উপকৃত হওয়া জায়িয নেই।

কেননা قرض (ধার) এর হাকীকত হলো, কাউকে এমন কিছু ধার দেয়া যার مثل দেয়া সম্ভব। আর এটা ঐসব বস্তুতে হতে পারে যার مثل আছে। যেমন— مكيلات ، موزونات ও عدديات বস্তু। আর জন্তু যেহেতু مثلى বস্তু নয় বরং ذوات القيم-এর অন্তর্ভুক্ত এজন্য এগুলো ধার নেয়া জায়িয নেই। এর স্বপক্ষে বহু হাদীস ও আছার রয়েছে। যথা ঃ

(١) عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْحَيْوَانِ بِالْحَيْوَانِ نَسِيْئَةً -

রাসূল (সা.) বাকিতে প্রাণীর বদলায় প্রাণী বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

আল্লামা সিন্ধী (রহ.) বলেছেন, প্রাণী ধার নেয়াও بيع-এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু টাকা পয়সার বিষয়টা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেননা নির্ধারণ করলেও এগুলো নির্ধারিত হয়না। সুতরাং সমপরিমাণ টাকা পয়সা পরিশোধ করা رد العين, তথা আসল যেটা ধার নিয়েছিল সেটাই পরিশোধ করার নামান্তর। পক্ষান্তরে জন্তু-জানোয়ার নির্ধারণ করার দ্বারা নির্ধারিত হয়। সুতরাং এক প্রাণীর

বদলায় অপর প্রাণী ফিরিয়ে না দিলে একে ردالعين বলেনা, ردالبدل বলে। আর এটাইতো بيع! সুতরাং এই হাদীস প্রাণী ধার নেয়া নাজায়িয একথাই প্রমাণ করে।

২। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হুযাইফা, আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা প্রমুখ সাহাবাগণ একে নাজায়িয মনে করতেন। হযরত ওমর (রা.) বলতেন— "এটা এমন বিষয় যা কারো জন্যই সহজ নয়।"

أُمُوْرٌ لم يَكُنْ يَخْفِيْنَ عَلٰى اَحَدٍ.

এর দ্বারা বুঝা যায় সাহাবাগণ একে নাজায়িয বলেই মনে করতেন।

بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

ইমামদের বর্ণিত হাদীসের জবাব

১। হাদীসটি মানসূখ হয়ে গেছে। প্রথমে জায়িয ছিল। পরে মানসূখ হয়ে গেছে। আর এটা মানসূখ হওয়ার ফলে জন্তু ধার নেয়া (اقتراض الحيوان) ও মানসূখ হয়ে গেছে। কেননা উভয়ের علت একই, তথা مثل ও وصف-এর দিক দিয়ে দু'টি প্রাণী এক না হওয়া।

২। হুযূর (সা.) নিজের প্রয়োজনে উট ধার নেননি বরং নিয়েছিলেন বাইতুল মালের প্রয়োজনে। আর বাইতুল মালে حق مجهول (অজ্ঞাত হক) ছাবেত হয়।

৩। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেন—সম্ভবতঃ হুযূর (সা.) বাকিতে উটটি ক্রয় করেছিয়েন। অতঃপর সেই মূল্যের বদলায় অন্য একটি উট হস্তান্তর করেন। আমাদের যুগে অহরহ এধরনের ক্রয়-বিক্রয়, লেনদেন হচ্ছে।

মোটকথা, হাদীসে বিভিন্ন অর্থের সম্ভাবনা আছে। এদিকে ফকীহ সাহাবীগণও নাজায়িযের পক্ষে, তাঁরা তো আর না শুনে এরূপ ফতওয়া দেননি। এ ছাড়া এই ফতওয়া অনুযায়ী চললে সতর্কতার (احتياط) দিকটা প্রাধান্য পায় এবং ফেকহী উসূলের অনুকূল হয়। অতএব সার্বিক দিক বিবেচনায় নাজায়িয হওয়ার মতটাই অধিক শক্তিশালী।

ফায়েদা ঃ হাদীস দ্বারা জানা যায় হুযূর (সা.) সদকার উট দিয়ে কর্জ পরিশোধ করেন। সদকার উট দিয়ে কর্জ পরিশোধ করলেন কীভাবে? এই প্রশ্নের অনেক উত্তর রয়েছে। যথা ঃ

১। রাসূল (সা.) নিজের জন্য ধার নেননি। নিয়েছিলেন জেহাদের জন্য। এজন্য বাইতুল মালের উট দিয়ে কর্জ পরিশোধ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন জাগে যে, হুযূর (সা.) ধার নেয়া কম মানের উটের বদলায় বাইতুল মালের উত্তম মানের উট প্রদান করলেন কেন? বাইতুল মালের রক্ষনাবেক্ষণ কারীর জন্য তো এধরনের এহসান করা জায়িয নেই।

এর জবাব হলো, রেওয়াজ অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণকারী বাইতুল মাল সরকারী প্রয়োজনে খরচ করতে পারে। সম্ভবতঃ সেসময় কর্জ পরিশোধের বেলায় উত্তম প্রকার দেয়ার রেওয়াজ ছিল। সুতরাং এই অধিকার বলে রাসূল (সা.) উত্তম উট প্রদান করেন।

২। বিশুদ্ধ কথা হলো, রাসূল (সা.) নিজের প্রয়োজনে উট ধার নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে সদকার উট কিনে কর্জ পরিশোধ করেন। আবূ হুরাইরা (রা.)-এর এক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে—

اِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً ـ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرُوْا لَهٗ سَنًّا ـ

হাদীসের শেষাংশে খরিদ করার কথা বলা হয়েছে। বুঝা গেলো হুযূর (সা.) নিজের উট প্রদান করেছেন, বাইতুল মাল থেকে নয়।

باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنه متفاضلا

অধ্যায় ঃ একই জাতের প্রাণী হলে কমবেশি করে বিক্রি করা জায়িয হওয়া প্রসঙ্গে

عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ اِنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيْدُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعْنِيْهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ اَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ اَحَدًا حَتَّى يَسْاَلَهُ اَعَبْدٌ هُوَ ؟

হযরত জাবের (রা.) বলেন—একজন গোলাম মুসলমান হয়ে রাসূলের (সা.) কাছে এসে হিজরতের জন্য বাইয়াত করে। হুযূর (সা.) জানতেন না যে, সে গোলাম। এরপর মুনিব এসে লোকটাকে ফিরিয়ে নিতে চাইল। রাসূল (সা.) দুইজন হাবশী গোলামের বিনিময়ে তাকে খরিদ করে রেখে দিলেন। এরপর

থেকে গোলাম কিনা তা যাচাই না করা পর্যন্ত হুযূর (সা.) কারো বাইয়াত নিতেন না।

১। হরবী কোন গোলাম মুসলমান হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রে আগমন করলে সে আযাদ হয়ে যায়।

সুলহে হুদাইবিয়া এবং তায়িফ যুদ্ধে এরকম ঘটনাই ঘটেছে। যেসব গোলাম মুসলমান হয়ে হুযূর (সা.)-এর কাছে আগমন করে তাদেরকে তিনি هم عتقاء الله। (আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাদ) বলে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করেন।

দেখা যাচ্ছে যে, حديث باب এবং এই ঘটনা (হাদীসের সাথে تعارض হচ্ছে। এর জবাব এই হতে পারে যে, হতে পারে এই গোলামের মুনিব মুসলমান ছিল।

অথবা এও হতে পারে যে, মুনিব কাফিরই ছিল কিন্তু গোলামকে তো আর এমনি আযাদ করা হয়নি বরং দু'টি হাবশী গোলাম দিয়ে তারপর আযাদ করা হয়েছে। যাতে হিজরতের ওপর কৃত বাইয়াত বহাল থাকে। এটা হুযূরের (সা.) অনুপম আখলাকের বহিঃপ্রকাশ।

২। অথবা হাদীস দ্বারা একথা বুঝা যাচ্ছে যে, জন্তুকে জন্তুর বদলায় কমবেশি করে বিক্রি করা যায় যদি নগদ হয়। আর এ ব্যাপারে সকল ফকীহ একমত। ইখতিলাফ হলো বাকিতে বিক্রি করা নিয়ে। আহনাফের মতে নাজায়িয আর বাকি ইমামদের মতে জায়িয। (আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে)।

আহনাফের মতে সুদ হারাম হওয়ার কারণ হলো ঃ قدر مع الجنس তথা পরিমাণ সমান হওয়ার সাথে সাথে جنس (জাতও) এক হওয়া। যদি উভয়টি একসাথে পাওয়া যায় তাহলে تفاضل এবং نسيئة (বাকি ও কমবেশি) উভয়টি হারাম।

আর যদি একটি পাওয়া যায় তাহলে تفاضل জায়িয نسيئة হারাম।

আর এক গোলামকে দুই গোলামের বিনিময়ে বিক্রি করার ক্ষেত্রে একটি শর্ত (اتحادجنس) পাওয়া যাচ্ছে মাত্র। এ কারণে تفاضل জায়িয তবে বাকিতে লেনদেন নাজায়িয।

শাফেঈ ও মালেকীর মতে যেহেতু সুদের علت হলো ثمنيت অথবা مطعم يت আর بيع الحيوان بالحيوان-এর কোন প্রকারেই পড়ে না এজন্য এতে কমবেশি ও বাকি (تفاضل ونسيئة) উভয়টি জায়িয।

আহনাফের দলীল হযরত সামুরার (রা.) হাদীস—

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْحَيْوَانِ بِالْحَيْوَانِ نَسِيْئَةً ـ

ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) বলেছেন—"এ ধরনের লেনদেন (بيع الحيوان بالحيوان) নাজায়িয হওয়ার স্বপক্ষে অনেক হাদীস রয়েছে, কিয়াস বা যুক্তির কোন প্রয়োজন নেই।"

শাফেঈগণ আব্দুল্লাহ ইবনে আমরের (রা.) হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন—

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهُ اَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الْاِبِلُ فَاَمَرَهُ اَنْ يَاْخُذَ فِىْ قَلَاصِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَ يَاْخُذُ الْبَعِيْرَ بِالْبَعِيْرَيْنَ اِلٰى اِبِلِ الصَّدَقَةِ ـ رواه ابوداود

দেখা যাচ্ছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) দুই উটের বদলায় এক উট গ্রহণ করতেন। الى ابل الصدقة তথা সদকার উট আসা পর্যন্ত। অর্থাৎ যখন সদকার উট আসবে তখন ওয়াদাকৃত সেই দুই উট প্রদান করা হবে।

এই রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় বাকিতে জন্তুর বদলায় জন্তু বিক্রি করা জায়িয।

আহনাফ এর জবাবে বলেন—খরিদ সূত্রে তিনি এরূপ লেনদেন করতেন না বরং বাইতুল মালের জন্য ধার হিসেবে নিতেন। আর বাইতুল মালের জন্য এরূপ কর্জ নেয়া আমাদের মতেও জায়িয। অবশ্য কোন কোন রেওয়ায়াতে انه ابتاع بعيرًا الخ শব্দ এসেছে, যাতে তাঁদের মত পাকাপোক্ত হয়। আমরা বলি روايت بالمعنى করতে গিয়ে এই শব্দটি সংযোজন করেছেন, এর দ্বারা প্রকৃতই ক্রয়-বিক্রয় উদ্দেশ্য নয়।

তাছাড়া এই রেওয়ায়াতের সনদে اضطراب রয়েছে। এর রাবী আমর ইবনে হুরাইশ এবং মুসলিম ইবনে জোবায়ের মজহুল রাবী। তাছাড়া তৃতীয় রাবী আবূ সুফিয়ান متكلم فيه (ন্যায় পরায়ণতার ব্যাপারে প্রশ্নইবদ্ধ) রাবী। সুতরাং ان رسول الله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة-এর মোকাবেলায়

এই হাদীস দলীল হতে পারেনা। আমাদের দলীল এই হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। এর সনদ সম্পর্কে আল্লামা বাযযার বলেছেন—এই অধ্যায়ে এরচেয়ে শক্তিশালী কোন সনদ নেই। তাছাড়া হযরত সামুরাও (রা.) এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহ.) এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন—হাদীসটি حسن صحيح আল্লামা ইবনে জারুদ একে সহীহ্ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

باب الرهن وجوازه فى الحضر كالسفر

অধ্যায় ঃ সফর ও মুকিম অবস্থায় রেহেন রাখা জায়িয হওয়া প্রসঙ্গে

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اِشْتَرٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيْئَةٍ فَاَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ .

হযরত আয়িশা (রা.) বলেন—হুযূর (সা.) জনৈক ইহুদী থেকে বাকিতে কিছু খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করেন এবং তার কাছে একটি লৌহবর্ম বন্ধক রাখেন।

১। ইহুদী লোকটির নাম আবূ শাহাম আজ-জাফরী। তার থেকে খরিদকৃত খাদ্যের মূল্য ছিল এক দিরহাম পরিমাণ এবং মূল্য পরিশোধ করার সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল এক বছর। কিন্তু হুযূর (সা.) এটা ছাড়াতে পারেন নি এর আগেই ইন্তিকাল করেন তিরমিযীও নাসায়ীর রেওয়ায়াতে এর পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে ২০ সা’। ইবনে হাজার (রা.) উভয় রেওয়ায়াতের মধ্যে সামাঞ্জস্য সাধন কারণার্থে বলেছেন—মূলতঃ ৩০ সায়ের কম এবং ২০ সায়ের বেশি ছিল। কোন আংশিক অংশ বাদ দিয়ে ২০ সা’ আবার কোন সময় আংশিক অংশ ধরে ৩০ সা’ বলা হয়েছে।

২। এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, মুসলমানের কাছ থেকে খরিদ না করে হুযূর (সা.) ইহুদীর কাছ থেকে খরিদ করতে গেলেন কেন?

এর বিভিন্ন জবাব দেয়া যেতে পারে। যথা ঃ

ক। অমুসলিমের সাথে লেনদেন করা বৈধ, একথা বুঝানোর জন্য।

খ। ঐ সময় সাহাবগণের কাছে অতিরিক্ত খাবার ছিল না।

গ। মুসলমানরা হাদিয়া দেয়ার চেষ্টা করছিল (অথচ তিনি হাদিয়া কবুল করা পছন্দ করছিলেন না) এজন্য ইহুদীর কাছ থেকে খরিদ সূত্রে খাদ্য গ্রহণ করেন।

৩। এই হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, যুদ্ধাস্ত্র যিম্মি কাফিরের কাছে বন্ধক রাখা জায়িয, শর্ত হলো এই যিম্মি "নিরাপত্তা প্রাপ্ত" (مامون) হতে হবে। কিন্তু হরবী কাফিরের কাছে যুদ্ধাস্ত্র বিক্রি করা এবং বন্ধক রাখা কোনটাই জায়িয নেই।

৪। رهن-এর শাব্দিক অর্থ حَبْسُ الشَّيْئِ بِاَيِّ سَبَبٍ كَانَ যেকোন কারণে কোন বস্তু আটকে রাখা। শরীয়তের পরিভাষায় رهن বলা হয় جَعْلُ الشَّيْئِ مَحْبُوْسًا بِحَقٍّ يُمْكِنُ اِسْتِيْفَاءٌ مِنْهُ অধিকার আদায়ের জন্য কোন বস্তু আটকে রাখা।

রেহেন প্রদানকারীকে راهن গ্রহীতাকে مرتهن এবং বন্ধকের বস্তুকে مرهون বলা হয়।

বর্ণিত এই হাদীস মুকীম অবস্থায় রেহেন রাখা জায়িয–একথার সাক্ষ্য বহন করে। এটাই জমহুর আলিমের অভিমত। তবে আহলে জাহের, মুজাহিদ, দাউদ প্রমুখ আলিমের মতে শুধু মাত্র মুসাফির অবস্থায় রেহেন রাখা জায়িয, মুকীম অবস্থায় জায়িয নয়। দলীল ঃ

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوْضَةٌ۔

জমহুর ওলামা আয়াতের জবাবে বলেছেন—আয়াতে সফরের শর্ত قيد احترازى নয়, বরং قيد اتفاقى সুতরাং এটা তাদের দলীল হতে পারেনা।

৫। বন্ধক রাখা বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া জায়িয কিনা এ ব্যাপারে আলিমদের ইখতিলাফ রয়েছে। যথা ঃ ইমাম আহমদ (রহ.) ও ইসহাকের মতে উপকৃত হওয়া জায়িয আর বাকি ইমামদের মতে নাজায়িয। আহমদের দলীল হযরত আবূ হুরাইরা (রা.)-এর হাদীস الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا বাকি ইমামগণ হযরত ইবনে মুসাইয়্যাবের মুরসাল হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন— لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ الرهن مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِىْ رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় রেহেন রাখা বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়ার অধিকার একমাত্র راهن-এর। এছাড়া সর্বসম্মতিক্রমে এই বস্তুর মালিকানা যেহেতু তার তাই উপকৃত হওয়ার অধিকারও তার হবে। কথা এখানেই শেষ নয়, হাদীসে আছে كل قرض جر نفعا فهو ربا "যেই ঋণে মুনাফা টেনে আনে সেটাই সুদ" এই

হাদীসের আলোকে বলা যায় مرتهن যদি এর দ্বারা উপকৃত হয় তাহলে সুদ খাওয়ার মধ্যে গণ্য হবে সে। ইমাম আহমদ, ইসহাকের দলীলের জবাব এই যে, حرمت ربوا-এর হাদীস দ্বারা এটা منسوخ হয়ে গেছে। অথবা ঐ হাদীসে منيحة (দুগ্ধজাত উট) বোঝানো হয়েছে। আর রেহেন শব্দ এই অর্থে প্রয়োগ হওয়া বিচিত্র নয়।

باب السلم

অধ্যায় ঃ সলম সম্পর্কে

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ فِى الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ اَسْلَفَ فِىْ ثَمَرٍ فَلْيُسْلِفْ فِىْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَ وَزْنٍ مَعْلُوْمٍ اِلٰى اَجَلٍ مَعْلُوْمٍ ـ

"হুযূর (সা.) যখন মদীনায় আগমন করেন সেসময় মদীনাবাসী একবছর বা দুই বছরের জন্য ফলফলাদিতে بيع سلم করত। হুযূর (সা.) বললেন—যারা সলম করতে চায় তারা যেন নির্দিষ্ট সময় করে নির্দিষ্ট পাত্র বা ওজনে সলম করে।"

سلم-এর অর্থ এবং শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি

سلم-এর শাব্দিক অর্থ অর্পণ করা। سلم-কে سلف ও বলা হয়। سلف এর অর্থ কর্জ, ঋণ, ধার ইত্যাদি। শরয়ী পরিভাষায় سلم বলা হয়— بيع الاجل بالعاجل অর্থাৎ নগদ মূল্যে বাকিতে পণ্য খরিদ করা।

এর ركن হলো, ঈজাব ও কবুল। যেমন—এরূপ বলা,

اسلمت اليك عشرة دراهم فى كذاحنطة ف قَالَ البائع قبلت ـ

ক্রেতাকে رب السلم বিক্রেতাকে مسلم اليه পণ্য (গম ইত্যাদিকে) مسلم فيه এবং ثمن মূল্যকে رأس المال বলে।

যদিও بيع سلم অস্তত্বহীন বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় (بيع معدوم) তথাপি জরুরতের কারণে শরীয়ত এর অনুমোদন দিয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কসম করে বলেন— اشهد ان الله احل السلف المضمون وانزل فيه

يا ايها الذين أمنوا اطول أية। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন— اذا تد اينتم بدين الى اجل مسمى الخ। তাছাড়া রাসূল (সা.) হাদীসেও এর অনুমতি প্রদান করেছেন।

نَهٰى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْاِنْسَانِ وَرَخَصَ فِى السَّلَمِ -

তবে بيع سلم সহীহ্ হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্তারোপ করা হয়েছে যাতে معدوم বস্তু موجود বস্তুর স্তরে এসে যায়।

بيع سلم-এর শর্তসমূহ

بيع سلم সহীহ্ হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে।

১। مسلم فيه-এর পরিমাণ নির্ধারিত থাকা,

২। পণ্য অর্পণের সময় নির্ধারিত থাকা,

তবে এই মতটি সর্বসম্মতিক্রমে নয়। কেননা ইমাম শাফেঈ, ইমাম আতা, আবূ ছাওর প্রমুখের মতে, بيع سلم-এর সময় নির্ধারিত হওয়া জরুরী নয়।

এর দলীল হিসেবে তাঁরা বলেন—হাদীসে কোনরূপ শর্ত করা ছাড়াই بيع سلم-এর অনুমতি দেয়া হয়েছে।

হাদীসে এসেছে— نَهٰى عَنْ بَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْاِنْسَانِ وَرَخَّصَ فِى السَّلَمِ

সুতরাং বুঝা যায়, সময় নির্ধারণ করা আদৌ কোন জরুরী বিষয় নয়। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ সহ অধিকাংশ ইমামগণের মতে সময় নির্ধারণ করা জরুরী। কেননা হযরত ইবনে আব্বাসের (রা.) এক হাদীসে বলা হয়েছে—

مَنْ اَسْلَفَ اَىْ اَسْلَمَ فِىْ شَيْئٍ فَلْيُسْلِفْ فِىْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَ وَزْنٍ مَعْلُوْمٍ اِلٰى اَجَلٍ مَعْلُوْمٍ - متفق عليه

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় সময় নির্ধারণ করা ছাড়া بيع سلم জায়িয নেই। সুতরাং بيع سلم-এর হাদীস (مطلق) শর্তহীন দাবি করা সঠিক নয়।

এ দু'টি শর্ত সরাসরি হাদীস (فى كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم) দ্বারা সুপ্রমাণিত। আলিমগণ دلالة النص দ্বারা আরো কয়েকটি শর্ত সংযোজন করেছেন। যথা ঃ

৩। مسلم فيه (পণ্যের) جنس বা জাত জানা থাকা,

৪। نوع (প্রকরণ) জানা থাকা,

৫। صفت তথা পণ্যের গুনাগুণ জানা থাকা।

এই পাঁচ শর্তের ব্যাপারে সকল ইমামগণ একমত। ইমাম আবূ হানীফার মতে এসব শর্ত ছাড়াও আরো কয়েকটি শর্ত রয়েছে। যথা—

৬। تعيين مكان الايفاء তথা مسلم فيه অর্পণের স্থান নির্ধারিত থাকা। ইমাম শাফেঈর (রহ.) একমত অনুরূপ। ইমাম সাহেবাঈন এবং ইমাম আহমদ এ ধরনের শর্তের পক্ষপাতী নন। তাঁদের মতে যেখানে চুক্তি সংঘটিত হয়েছে সেখানেই পণ্য অর্পণ করতে হবে। এটা ইমাম শাফেঈর (রহ.) দ্বিতীয় অভিমত।

৭। চুক্তির সময় থেকে অর্পণ করা পর্যন্ত সময়ে مسلم فيه বাজারে মওজুদ থাকা। ইমাম ছাওরী, আওযায়ী এবং যুক্তিবিদগণ এইমতের অনুসারী। তবে জমহুর ইমাম এই শর্ত জরুরী নয় বলে মনে করেন। সুতরাং তাঁদের মত অনুযায়ী মওসুম আসার আগেই ফলের মধ্যে بيع سلم-এর চুক্তি করা যাবে। মূলত ঃ মানুষের প্রতি সহজ করার লক্ষ্যে بيع سلم জায়িয করা হয়েছে। আর এই সহজতার পূর্ণ বিকাশ ঘটে জমহুরদের মাযহাব অনুযায়ী, বিশেষ করে এই জামানায়। অতএব সার্বিক দিক বিবেচনায় এই মাসআলার ক্ষেত্রে জমহুরের মাযহাব অনুযায়ী আমল করা জায়িয হবে।

باب تحريم الاحتكار فى الاقوات

অধ্যায় ঃ খাদ্যদ্রব্য গুদাম জাত করা হারাম হওয়া প্রসঙ্গে

كَانَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ اَنَّ مَعْمَرًا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ. فَقِيْلَ لِسَعِيْدٍ فَاِنَّكَ تَحْتَكِرُ ؟ قَالَ سَعِيْدٌ : اِنَّ مَعْمَرًا اَلَّذِىْ كَانَ يُحَدِّثُ هٰذَا الْحَدِيْثَ كَانَ يَحْتَكِرُ.

এখানে কয়েকটি আলোচনা

১। احتكار-এর মূল ধাতু حكر অর্থ জমা করা, আটকে রাখা। শরীয়তের পরিভাষায় احتكار বলা হয়—বেশি মূল্য লাভের আশায় খাদ্যদ্রব্য গুদাম জাত করা। মনে রাখতে হবে যে, নিজের উৎপাদিত শস্য, ফল অথবা দূর-দূরান্ত থেকে এনে খাদ্যশস্য গুদাম জাত করলে একে احتكار বলা হয়না। কেননা এর সাথে মানুষের স্বার্থের কোন সংঘাত নেই। অবশ্য ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) সব ধরনের শস্য গুদামজাত করাকে احتكار-এর মধ্যে শামিল করেছেন। কেননা হাদীসে ব্যাপকভাবে সকল গুদামজাতকারীকে লা'নত করা হয়েছে। যেমন— المحتكر ملعون। ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) বলেন সাধারণতঃ যে সব পণ্য সামগ্রী অন্য শহর থেকে আমাদের শহরে আমদানী করা হয় সেটাও احتكار এর মধ্যে শামিল।

২। অধিকাংশ ফকীহর মতে শুধুমাত্র খাদ্য জাতীয় বস্তুর মধ্যে احتكار (طعام) নিষেধ যদি শহরবাসী এর দ্বারা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সুতরাং তাঁদের মতে খাদ্য ছাড়া অন্য বস্তু গুদামজাত করা যাবে।

ইমাম আবূ হানীফা, মালেক, শাফেঈ প্রমুখ এই মত পোষণ করেন। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) জীব জন্তুর খাদ্যকেও طعام-এর মধ্যে শামিল করেন। সুতরাং এগুলো গুদামজাত করা নাজায়িয।

ইমাম আবূ ইউসুফের মতে আবদ্ধ রাখার কারণে মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয় এরকম যেকোন বস্তু আবদ্ধ রাখা احتكار-এর মধ্যে শামিল। (كُلُّ مَا اَضَرَّ بِالْعَامَّةِ حَبْسُهُ فَهُوَ اِحْتِكَارٌ) মোটকথা ইমামগণ নিজেদের ইজতেহাদ অনুযায়ী মতপেশ করেছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) "ক্ষতির" দিকটা লক্ষ্য করেছেন।

সুতরাং মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয় এরূপ যে কোন বস্তু গুদামজাত করা নিষেধ।

আর জমহুর আলিম ضرر معهود তথা খাদ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষতির দিকটা আমলে এনেছেন। হাদীসের রাবী মা'মার এবং সাঈদ (রা.) এর আমল এই মতের সমর্থন যোগায়। কেননা তারা যয়তুন গুদাম জাত করতেন। এটা খাদ্যজাত বস্তু গুদামজাত করা হারাম হওয়ার স্বপক্ষে মজবুত এক দলীল।

৩। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাবকে বলা হলো, فانك تحتكر (আপনিও তো ইহতিকার করেন।) এর জওয়াবে তিনি বলেন—হাদীসের রাবী معمر ইহতিকার করতেন। এ কারণে আমিও احتكار করি। এর দ্বারা বুঝা যায় হাদীসের অর্থ ব্যাখ্যা বুঝতে রাবীর বিরাট দখল রয়েছে। রাবী যদি নিজের বর্ণিত হাদীসের বিপরীত আমল করেন তখন বুঝতে হবে হাদীসটি মানসূখ হয়ে গেছে। অথবা হাদীসের ভিন্ন ব্যাখ্যা বা তাবীল রয়েছে।

৪। مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَخَاطِئٌ : خاطى-এর অর্থ গুনাহগার, পাপী। তবে مخطئ-এর অর্থ ভিন্ন। কেননা خاطى বলা হয়, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন দৃষ্টিকটু বা পাপ কাজে লিপ্ত হয়। আর مخطئ বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে ভালো নিয়তে কোন কাজে লিপ্ত হয় কিন্তু ঘটনাচক্রে ভুলের মধ্যে পড়ে যায়। এ কারণে ইজতেহাদ করতে গিয়ে ভুল করে বসলে মুজতাহিদকে مخطئ বলা হয়, خاطئ বলা হয় না।

باب النهى عن الحلف فى البيع

অধ্যায় ঃ ক্রয়-বিক্রয়ে হলফ করা নিষেধ হওয়া প্রসঙ্গে

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : اَلْحَلْفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ .

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) বলেন–আমি হুযূর (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন—কসম করায় পণ্য সামগ্রীর ব্যাপক প্রচলন ঘটে বটে কিন্তু এতে বরকত উঠে যায়।

কয়েকটি আলোচনা

১। منفقة শব্দটি نفاق মূলের مصدر ميمى অর্থ প্রচলন ঘটানো, রেওয়াজ দেয়া। مصدر উল্লেখ করে এখানে مبالغة-এর অর্থ বুঝাতে فاعل অর্থ নেয়া হয়েছে। এমনিভাবে ممحقة শব্দটি محق মূলের مصدرميمى অর্থ কমিয়ে দেয়া, বাতিল করে দেয়া।

কারো মতে এটা باب تفعيل-এর اسم فاعل-এর সীগা। মুদ্দা تمحيق ও تنفيق

তবে প্রথম মতটাই বিশুদ্ধ।

২। দু'টি হাদীস দ্বারা বুঝা যায় ক্রয়-বিক্রয়ে কসম খাওয়া নিষেধ। (ক) এই অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীস।

(খ) إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ثُمَّ يَمْحَقُ رواه ابن ابى شيبة فى مصنفه ٥/ ٢٦٠। "ক্রয়-বিক্রয়ে বেশি বেশি কসম করা থেকে বিরত থাকবে। কেননা এতে দৃশ্যতঃ কিছু লাভ থাকলেও পরিণামে ক্ষতিগ্রস্থই হতে হবে।"

যদি মিথ্যা কসম হয় তাহলে হারাম এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আর যদি সত্যও হয় তথাপি (অন্যায় কাজের পথ রুদ্ধ করতে) মাকরূহ হবে। কেননা মানুষ কসম খাওয়া শুরু করলে তার থেকে মিথ্যা কসম প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব নয়।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলবী (রহ.) বলেন—দুই কারণে ক্রয়-বিক্রয়ে কসম খাওয়া মাকরূহ। (১) অনেক সময় এতে ক্রেতা প্রতারিত হয় (২) আল্লাহর নামের মর্যাদাহানী হয়।

তাছাড়া ব্যবসার বরকত লাভের প্রধান উপায় হলো ফেরেস্তাদের দু'আ লাভ করা। এইগুনার কারণে ফেরেস্তারা নেক দু'আর বদলায় বদ দু'আ করতে থাকে। যার কারণে বরকত উঠে যায়।

কতিপয় নাজায়িয ক্রয়-বিক্রয়

এতক্ষণ পর্যন্ত بيوع বা ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত কিংবা এতদসংশ্লিষ্ট আলোচনা করা হচ্ছিল। সামনে শুফ'আ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। এর আগে বর্তমান প্রচলিত আরো কিছু ক্রয়-বিক্রয়ের পরিচয় তুলে ধরা হলো। যার অনেকগুলোই হারাম, মাকরূহ বা অনুচিত। এগুলোর পরিচয় ও হুকুম জানলে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা সহজ হবে।

(১) জন্তুর বিনিময়ে গোশ্ত বিক্রি করা (بيع اللحم بالحيوان)

فِي حَدِيثِ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ .

"রাসূল (সা.) জীবিত জন্তুর বদলায় গোশ্ত বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।"

আলোচ্য হাদীসের ভিত্তিতে আলোচ্য মাসআলায় আলিমগণ মতবিরোধ করেছেন।

১। ইমাম মালেক, শাফেঈ, আহমদ প্রমুখের মতে কোন অবস্থাতেই জন্তুর বদলায় গোশ্‌ত বিক্রি করা জায়িয নেই।

ইমামগণ বর্ণিত হাদীসটি নিজেদের মতের সমর্থক বলে মনে করেন।

২। ইমাম মুহাম্মদের (রহ.) মতে মাসআলাটি বিশ্লেষণধর্মী। তাঁর মতে ঐ গোশ্‌ত যদি ভিন্ন জাতের জন্তুর বদলায় লেনদেন হয়, যেমন-বকরীর গোশ্‌তের বদলায় গরুর ক্রয়-বিক্রয় তাহলে তা জায়িয হবে। আর যদি এক জাতীয় জন্তু হয় তাহলে জায়িয হওয়ার জন্য শর্ত হলো, গোশ্‌তের পরিমাণ প্রাণীর গায়ের গোশ্‌তের চেয়ে বেশি হতে হবে। যাতে প্রাণীর চামড়া, ভুড়ি ইত্যাদির বদলায় বর্ধিত এই গোশ্‌ত বদল স্বরূপ হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে গোশ্‌তের পরিমাণ যদি কম বা সমান হয় তাহলে সুদের সম্ভাবনা হওয়ার কারণে তা জায়িয হবে না।

৩। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.), আবূ ইউসুফ (রহ.) প্রমুখের মতে-বাকিতে গোশ্‌তের বদলায় প্রাণী বিক্রি করা জায়িয নেই। তবে যদি নগদ হয় তাহলে জায়িয। চাই এক জাতীয় প্রাণীর গোশ্‌ত হোক বা না হোক, গোশ্‌তের তুলনায় প্রাণীর গায়ের গোশ্‌ত সমান বা বেশি হোক।

বাকিতে বাকির লেনদেন

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ نَهٰى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْكَالِئْ بِالْكَالِئْ.

كالى শব্দের অর্থ এবং এর ধরন

كالى শব্দের অর্থ نسيئة, دين (ঋণ) ইত্যাদি। এর দু'টি পদ্ধতি হতে পারে। যথা ঃ

১। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন বস্তু বাকিতে খরিদ করার পর মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় পুনরায় সেই বস্তু আগের চেয়ে বেশি মূল্যে ক্রয় করা।

এতে দেখা যায় যে, বিক্রেতা বস্তুটি হস্তগত করার পূর্বেই আবার তা বিক্রি করে দিচ্ছে। আর এটা بيع مالم يقبض-এর আওতায় পড়ে-যা নিষেধ এবং হারাম।

২। কেউ কেউ বলেন এর পদ্ধতি হলো এমন যেমন, যায়েদ ওমরের কাছে একটি কাপড় পায়। এদিকে রাশেদ ওমরের কাছে পায় দশ টাকা। এখন যায়েদ রাশেদকে বলল—আমি ওমরের কাছে যে কাপড় পাই সেটি তোমার কাছে ঐ দশ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দিলাম যা তুমি ওমরের কাছে পাও। আর রাশেদও এতে সায় দিয়ে দিল।

বর্ণিত এই পদ্ধতির লেনদেনই নাজায়িয। —তা'লীক খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩২৫, আশিয়্যা, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৪)

بيع عربان নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ -

"রাসূল (সা.) بيع عربان করতে নিষেধ করেছেন।"

بيع عربان-এর ব্যাখ্যা ঃ এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, কোন বস্তু ক্রয় করে আংশিক মূল্য পরিশোধ করা এবং বাকি মূল্য পরিশোধ করার আগে চুক্তি বহাল রাখা না রাখার জন্য সময় নেয়া এবং এরূপ শর্তায়ন করা যে, যদি চুক্তি পূর্ণ করে ফেলি তাহলে অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধ করব অন্যথায় এটি ফেরত দিব এবং যে টাকা দিয়েছি তাও ফেরত নেব না।

আল্লামা খাত্তাবী ও তীবী (রহ.) বলেন—আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) এই হাদীসকে منقطع বলে بيع عربان-কে জায়িয বললেও জমহুর ওলামাগণের মতে এটা নাজায়িয। কেননা এটি এই হাদীসের নিষেধাজ্ঞা এবং বাতিল শর্তের আওতায় পড়ে। সেই সাথে এটি অবৈধভাবে অন্যের মাল গ্রাস করার শামিল। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন—وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ "তোমরা অন্যায়ভাবে অন্যের মাল গ্রাস করো না।" সুতরাং بيع عربان জায়িয হওয়ার প্রশ্নই থাকতে পারে না।

(৪) ক্রয়-বিক্রয়ে বাধ্য করা নিষেধ।

فِىْ حَدِيْثِ عَلِيٍّ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ -

"হযরত আলী (রা.) বলেন, হুযূর (সা.) কাউকে বাধ্য করে লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন।"

এর (بيع المضطر) দু'টি পদ্ধতি হতে পারে।

১। কাউকে এমন অবস্থার সম্মুখীন করা যে, সে বিক্রয় করতে না চাইলেও বাধ্য হয়ে বিক্রয় করে। এটা নাজায়িয এবং এই প্রক্রিয়ায় কৃত লেনদেন বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

২। কেউ অত্যন্ত অভাবগ্রস্থ হয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র বিক্রি করতে চাইলে তাকে কোনরূপ হেবা বা ঋণ না দিয়ে সেই বস্তুটি ক্রয় করে নেয়া। যদিও এই লেনদেন জায়িয কিন্তু মানবতা ও ইনসানিয়্যাতের দাবি এরূপ নয়। এজন্য আলিমগণ একে মাকরূহ বলেছেন। —বযলুল মাজহুদ খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৫২ তা'লীক খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩২৫

باب الشفعة

অধ্যায় ঃ শুফ্'আ সম্পর্কে

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيْكٌ فِيْ رَبْعَةٍ اَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَبِيْعَ حَتّٰى يُؤْذَنَ شَرِيْكٌ فَاِنْ رَضِيَ اَخَذَ وَاِنْ كَرِهَ تَرَكَ ـ

হযরত জাবের (রা.) বলেন—হুযূর আকরাম (সা.) ইরশাদ করেন, শরীকানা বাড়ি বা বাগান অপর শরীকের অনুমতি ছাড়া বিক্রি করা জায়িয নয়। সে চাইলে নিয়ে নিবে না চাইলে পরিত্যাগ করবে।

شفعة-এর শাব্দিক ও পরিভাষিক অর্থ

شفعة শব্দটির মূল (مادة) شفع অর্থ মিলানো। আরবী রীতি অনুযায়ী ব— হয় شفعت الشئ اذا ضممته শুফ'আর মধ্যে অন্যের অংশ যেহেতু নিজের অংশের সাথে সংযুক্ত করা হয় এজন্য একে شفعة নামকরণ করা হয়েছে। আর পরিভাষায় শুফ'আ বলা হয় حَقُّ تَمَلُّكِ الْبُقْعَةِ جَبْرًا عَلَى الْمُشْتَرِىْ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ ـ ক্রেতার সমপরিমাণ মূল্য দিয়ে (মালিককে বাধ্য করে) কোন ভূখন্ডের মালিক হওয়া।

হাদীসের ব্যাখ্যা

قوله : فى ربعة – ربعة শব্দটির ب কালিমায় فتح এবং ر কালিমায় كسره দিয়ে পড়তে হবে। এর অর্থ হল, ঘর, মঞ্জিল। শব্দটির মূলে রয়েছে ربعة ربع ، অর্থাৎ ঐ ঘর যাতে বসন্তকালে মানুষ বসবাস করে। পরবর্তীতে শব্দটির মধ্যে ব্যাপকতা এসেছে। এখন সব ঘরকেই ربعة বলা যায়।

قوله : فان رضى اخذ وان كره ترك বাক্য দ্বারা বুঝা যায়, শুফ'আ দাবি কারী (شفيع) যদি بيع-এর চুক্তির আগে অনুমতি দিয়ে দেয় (শুফ'আ দাবি না করে এবং নিজের হক ছেড়ে দেয় তাহলে শুফ'আর হক বাতিল হয়ে যায়, عقدبيع-এর পর পুনরায় শুফ'আ দাবি করতে পারবে না। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের (রা.) এক قول এরূপ।

কিন্তু জমহুরের মতে আকদের পূর্বে এজাযত দেয়ার কারণে حق شفعة বাতিল হয়না, কেননা حق شفعة সাবেত হয় عقد بيع-এরপর। সুতরাং হক সাবেত হওয়ার আগে ইজাযত দেয়া ধর্তব্য হবেনা। যেমন, বিবাহের পূর্বে মহর ছেড়ে দিলে এটা ধর্তব্য হয়না, বরং মহর দিতেই হয় এখানেও ব্যাপারটা এমনই।

প্রশ্ন আসতে পারে, হাদীসে তাহলে কী বোঝানো হয়েছে? উত্তরে বলা হবে, হাদীসের উদ্দেশ্য হলো বিক্রি করার আগে ভূমির অন্য শরীককে অবগত করা, বিক্রির বিষয়টি তার কাছে অস্পষ্ট না রাখা।

অস্পষ্টতা রাখায় কোন ফায়দা নেই। অপর শরীক যখনই অবগত হবে তখনই শুফ'আর দাবি করতে পারবে। অবগত করার পর شفيع-এর পক্ষ থেকে অনুমতি দেয়ার পর حق شفعة বাতিল হবে কিনা এ ব্যাপারে হাদীস নিশ্চুপ। সুতরাং এই হাদীস দ্বারা দলীল দেয়ার কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারেনা। তাছাড়া কোন মুসলমান একবার হক ছেড়ে দিলে পুনরায় তা দাবি করে না, এটাই স্বাভাবিক। তারপরেও কেউ যদি দাবি করেই বসে তাহলে তার হক তাকে ফিরিয়ে দেয়াই উচিত।

যেসব বস্তুতে শুফ'আ সাবেত হয়

১। জমহুর আলিমের মতে কেবলমাত্র অস্থানান্তর যোগ্য বস্তুর মধ্যে শুফ'আ দাবি করা যায়। যেমন, ভূমি, বাড়ি, বাগান ইত্যাদি।

২। আল্লামা ইবনে হাযম এবং কতিপয় আহলে জাহেরের মতে সব ধরনের বস্তুতে শুফ'আ দাবি করা যেতে পারে। হাসান বসরী, ইবনে সীরিন, আব্দুল মালেক ইবনে ইয়ালা, উসমান আল বিত্তি প্রমুখ আলিমগণও অনুরূপ মত পোষণ করে থাকেন। ইমামগণ হযরত জাবেরের (রা.) নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন—

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ان النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَضٰى بِالشُّفْعَةِ فِيْ كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصَرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ ـ

হাদীসে كل ما আম ভাবে সব কিছু শামিল করে নির্দিষ্ট কিছুর সাথে খাস নয়।

জমহুর দলীল পেশ করেন নিম্নোক্ত হাদীস ঃ

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لاَ شُفْعَةَ اِلاَّ فِيْ رَبْعٍ اَوْ حَائِطٍ ـ

"বাগান বা বাড়ি ছাড়া অন্য কিছুতে শুফ'আ নেই।"

তাদের দলীলের জবাব হলো ঃ হাদীসে كل ما বলে عقار তথা জমিন বুঝানো হয়েছে। হাদীসের পরবর্তী শব্দই এর প্রমাণ বহন করে। কেননা পরবর্তীতে বলা হয়েছে فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق সীমা নির্ধারিত হওয়া, রাস্তা ভিন্ন হওয়া, সাধারণতঃ জমিতেই হয়ে থাকে, সব বস্তুতে নয়।

শুফ'আ সাবেত হওয়ার কারণসমূহ

اسباب شفعة-এর ব্যাপারে আলিমগণ মতবিরোধ করেছেন। ইমাম শাফেঈ, আহমদ, মালেক প্রমুখের মতে কারণ মাত্র ১টি। আর তা হল ঃ نفس مبيع-এর মধ্যে শরীক থাকা। সুতরাং এই প্রকার শরীক ছাড়া অন্য কেউ শুফ'আর দাবি করতে পারবে না।

আহনাফের মতে শুফ'আ সাব্যস্ত হওয়ার কারণ তিনটি। (১) شريك فى نفس مبيع যেমন এক জমিনে দুই ভাই শরীক। (২) شريك فى حق مبيع যেমন রাস্তা, নালা এক হওয়া এবং (৩) جوار তথা প্রতিবেশি হওয়া। তারতীব

অনুযায়ী শুফ'আর দাবি সাবেত হবে। প্রথমে نفس مبيع তারপর حق مبيع এবং সর্বশেষ جوار ।

দলীলসমূহ

জমহুর আলিমগণ নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা তাদের দাবির স্বপক্ষে দলীল পেশ করেন। যথা ঃ

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰى بِالشُّفْعَةِ فِىْ كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ ـ

হাদীসে বলা হয়েছে রাসূল (সা.) জমিন বণ্টন দ্বারা পূর্বক্ষণ পর্যন্ত শুফ'আর বিধান কার্যকর করেছেন। বণ্টন হয়ে গেলে অথবা রাস্তা ভিন্ন হয়ে গেলে শুফ'আ কার্যকর করতেন না। আর যতক্ষণ পর্যন্ত বণ্টন না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত نفس مبيع থাকে, এরপর نفس مبيع থাকে না।

আহনাফ হুবহু এই হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে বলেন—হাদীসে صرفت الطرق বলে شريك فى نفس مبيع-এর মত شريك فى حق مبيع এর জন্যও শুফ'আ সাবেত করা হয়েছে। যদি তাই না হতো তাহলে এই বাক্যটুকু বলার দরকার পড়ত না।

প্রতিবেশি শুফ'আর অধিকারী হবে এর দলীল

(١) عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْجَارُ اَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهٖ يُنْتَظَرُ بِهَا وَاِنْ كَانَ غَائِبًا اِذَا كَانَ طَرِيْقُهُمَا وَاحِدًا ـ

(٢) عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ ... اَلْجَارُاَحَقُّ بِسَقَبِهٖ (يَعْنِىْ شُفْعَتَهُ)

(٣) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ... جَارَ الدَّارِ اَحَقُّ بِدَارِ الْجَارِ ـ

উল্লেখিত তিনটি রেওয়ায়াতে الجاراحق الخ বলে সুস্পষ্টভাবে প্রতিবেশির জন্য শুফ'আ সাবেত করা হয়েছে। দ্বিতীয় কথা হলো, شريك فى نفس مبيع শুফ'আ পায় اتصال ملك তথা বিক্রিত জমির সাথে তার জমির সংযুক্তি থাকার কারণে। আর এই اتصال প্রতিবেশি এবং شريك فى حق مبيع-এর ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। অতএব তারাও শুফ'আ পাবে।

ইমামের বর্ণিত হাদীসের জবাব

হাদীসে বণ্টন করার পর فلا شفعة বলে মতলক ভাবে সব ধরনের শুফ'আ বাতিল করা হয়নি। বরং شريك فى نفس مبيع হলে যে ধরনের শক্তিশালী শুফ'আর অধিকারী হত সেই শুফ'আ বাতিল (نفى) করা হয়েছে। অতএব شريك فى نفس مبيع ছাড়া অন্য কোন সবব পাওয়া গেলে সেই ভিত্তিতে শুফ'আ পাবে। এই ব্যাখ্যা এজন্য করতে হলো যে, না করলে আমাদের বর্ণিত হাদীসের সাথে এর দ্বন্দ্ব تعارض থেকে যাবে।

আল্লামা জা'ফর আহমদ ওসমানী (রহ.) বলেন—ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة বাক্যে তাবীল করেছেন আর ইমাম শাফেঈ (রহ.) الجار احق بسقبه বাক্যে তাবীল করেছেন। কিন্তু শুফ'আ বৈধ হওয়ার মূল কারণের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় আহনাফের মত বরাবরের ন্যায় এক্ষেত্রেও অধিক যুক্তিসঙ্গত। কেননা এর মূল কারণ হলো دفع ضرر তথা অন্যকে ক্ষতি থেকে বাঁচানো। আর শরীকের কারণে যেমনিভাবে মানুষ ক্ষতির সম্মুখীন হয় তেমনিভাবে প্রতিবেশির কারণেও ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অতএব প্রতিবেশিও শুফ'আ পাওয়ার অধিকার রাখে। —ইলাউস্ সুনান

باب غرزالخشب و جدار الجار

অধ্যায় ঃ প্রতিবেশির দেয়ালে কাঠ সংস্থাপন সম্পর্কে

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِىْ جِدَارِهِ قَالَ : ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ: مَالِىْ أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ؟ وَاللّٰهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَعْقَابِكُمْ.

"হুযূর (সা.) বলেন—তোমাদের কেউ যেন নিজেদের দেয়ালে কোন প্রতিবেশি কাঠ ইত্যাদি রাখতে চাইলে বাধা না দেয়। রাবী বলেন এরপর হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) বললেন—তোমাদের কী হলো যে, এ বিষয়টি তোমরা এড়িয়ে চলছ? আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের উভয় কাঁধে একে নিক্ষেপ করব।

১। দেয়ালে কাঠ স্থাপন করার অর্থ এই নয় যে, প্রতিবেশি ওখানে ঘর বানাবে। কেননা এতে দেয়ালের ক্ষতি হবে। হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, দেয়ালে শুধুমাত্র ছাদের কাঠ রাখার অনুমতি দেয়া, এতটুকু অনুগ্রহ করা থেকে বিরত না থাকা।

ইমাম তাবারী (রহ.) তাহযীবুল আছারে আবুয্-যিনাদের সনদে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন, যা আমাদের এই ব্যাখ্যার সমর্থন যোগায়। যথা ঃ اِذَاسَأَلَ اَحَدُكُمْ اَخُوْهُ اَنْ يَلْزَقَ بِجِدَارِهٖ خَشَبَاتٍ فَلْيَدَعْهُ "তোমাদের দেয়ালে কেউ কাঠ স্থাপন করতে চাইলে তাকে সেই সুযোগ দেয়া উচিত।

২। হাদীসে কাঠ স্থাপন করতে মানা করাকে নিষেধ করা হয়েছে। ইমাম আহমদ, ইসহাক এবং ইমাম শাফেঈর قول قديم অনুযায়ী এই নির্দেশ ওয়াজিব সূচক (তথা امر وجوبى) সুতরাং প্রতিবেশিকে এই সুযোগ দিতে দেয়াল ওয়ালা বাধ্য থাকবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) মালিক ও ইমাম শাফেঈর قول جديد অনুযায়ী এটা امر استحبابى। তথা প্রতিবেশিকে সুযোগ দেয়া মুস্তাহাব ওয়াজিব নয়। ইমাম আহমদ (রহ.) হাদীসের বাহ্যিক অর্থ (ظاهرى معنى) কে কেন্দ্র করে নিজের মতের স্বপক্ষে দলীল পেশ করেন। তাছাড়া আবূ হুরাইরা (রা.) নিজেও একে ওয়াজিব বলেই মনে করেন। কেননা মারওয়ানের পক্ষ থেকে তিনি মদীনার গভর্নর থাকাকালীন এই হাদীস শুনিয়ে লোকদের একাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন এবং প্রায় ধমকের সুরে বলতেন— "যদি তোমরা এই হুকুম কবুল না কর তাহলে জবরদস্তি করে আমি তোমাদেরকে একাজে বাধ্য করব। (مالى أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ؟ وَاللّٰهِ لَاَرْمِيَنَّ الخ) হযরত ওমরের আমল দ্বারাও ওয়াজিব সাবেত হয়। তিনি খলীফা থাকাকালীন যাহ্হাক ইবনে খলীফার অভিযোগের ভিত্তিতে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামার ভূখন্ডে জবরদস্তিমূলক নহর খনন করেছিলেন।

জমহুরের দলীল

(١) لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ اِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ ـ

(٢) مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللّٰهُ اِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ ـ

(٣) اِنَّ دِمَائَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ـ

এসব হাদীস দ্বারা জানা যায় অনুমতি ছাড়া অন্যের সম্পদে কোন রূপ হস্তক্ষেপ করা জায়িয নেই। তাছাড়া হাদীসই ইঙ্গিত করে যে, একাজটি মুস্তাহাব। কেননা আবূ দাউদ শরীফের এক রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে— اِذَا اسْتَأْذَنَ اَحَدُكُمْ اَخُوهُ اَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِيْ جِدَارِهِ فَلاَ يَمْنَعُهُ হাদীসে অনুমতি নেয়ার কথা বলা হয়েছে। এটা যদি প্রতিবেশির অকাট্য অধিকার হতো তাহলে অনুমতি নেয়ার কথা বলা হতো না এবং দেয়ালের মালিকও বাধা দিতে পারত না। এতে বোঝা যায় মালিকের বাধা দেয়াতে প্রতিক্রিয়া রয়েছে, কেননা প্রতিক্রিয়া না থাকলে বাধা দেয়া না দেয়া সমান বলে গণ্য হতো।

মোট কথা সার্বিক দিক বিবেচনায় জমহুরের মাযহাব অধিক শক্তিশালী।

باب تحريم الظلم وغصب الارض وغيرها

অধ্যায় ঃ জুলুম-অত্যাচার ও জমিন ইত্যাদি জবর দখল হারাম হওয়া প্রসঙ্গে

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِوبْنِ نُفَيْلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللّٰهُ اِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ ـ

"হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন—যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি জবর দখল করবে কেয়ামতের দিন আল্লাহপাক সাত তবক পরিমাণ জমি বেড়ি বানিয়ে তার গলায় ঝুলিয়ে দিবেন।

এরপরের এক রেওয়ায়াতে আছে—আরওয়া নামক জনৈকা মহিলা হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদের (রা.) বিরুদ্ধে জমি আত্মসাতের অভিযোগ করে বলে আমার ক্ষেতের আইল তিনি তাঁর জমিতে ঢুকিয়ে নিয়েছেন। অভিযোগ শুনে হযরত সাঈদ (রা.) তাজ্জব হয়ে বলেন—এটা কী করে সম্ভব? অথচ আমি এই হাদীস শুনেছি— مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْاَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ فِيْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ এরপর ঐ জমিটুকু মহিলাকে দিয়ে দেন এবং এই বলে

বদদু'আ করেন যে, হে আল্লাহ্! মহিলা যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তাকে অন্ধ বানিয়ে দিও এবং তার ঘরকে তার কবর বানিয়ে দিও।

এর কিছুদিন পর প্রবল বর্ষণে মহিলার ক্ষেতের পুরাতন আইল প্রকাশ পেয়ে যায়। এতে তার অভিযোগের অসারতা সবার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং সবাই বুঝতে পারে যে, হযরত সাঈদ (রা.) তার জমি দখল করেননি।

আল্লাহ তা'আলা মহিলাকে অন্ধ করে দেন। এক পর্যায়ে সে তার বাড়িতে পায়চারি করছিল। এমতাবস্থায় তার নিজ বাড়ির এ অন্ধকার কূপে পতিত হয় আর সেখানেই তার কবর হয়। ঘটনাটি হলো ঃ তার ঘরে একটি কুয়া ছিল। একদিন কুয়াতে পড়ে যায় সে। এতে ওখানে মৃত্যু ঘটে তার এবং তাকে সেখানেই দাফন করা হয়।

এই ঘটনার পর মদীনাবাসী কাউকে বদদু'আ করলে এরূপ বলত—

اعمى اللّٰهُ كعمى اروىٰ

জমিনকে বেড়ি বানানোর অর্থ

এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন আলিম বিভিন্ন মত পেশ করেছেন। কয়েকটি মত নিচে তুলে ধরা হলো ঃ

১। যে পরিমাণ জমি জবর দখল করেছিল কেয়ামতের দিন সে পরিমাণ জমি হাজির করতে বলা হবে। কিন্তু সে সক্ষম হবে না। অক্ষমতার এই শাস্তি তার জন্য গলার বেড়ির আকার ধারণ করবে। প্রকৃত বেড়ি উদ্দেশ্য নয়। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তাঁর মুসনাদ কিতাবে ইয়ালা ইবনে মুররা সূত্রে একটি মারফূ' হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন। উক্ত হাদীস এ ব্যাখ্যার সমর্থক, হাদীসটি হল— من اخذ ارضا بغير حقها كلف ان يحمل ترابها الى المحشر ـ

২। সাত তবক পর্যন্ত (সমপরিমাণ) জমি খনন করতে বলা হবে। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা একে বেড়ির আকার আকৃতি প্রদান করে তার গলায় ঝুলিয়ে দিবেন। এসময় তার গলা অনেক বড় করে দেয়া হবে।

৩। তাকে সাত তবক জমিন পর্যন্ত ধ্বসে যেতে বলা হবে। এতে পুরোমাটি তার জন্য বেড়ি হয়ে যাবে। হযরত ওমর (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে—

من اخذ من الارض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة الى سبع ارضين ـ

৪। এই পরিমাণ জমি বেড়ি বানিয়ে গলায় ঝুলাতে বলা হবে কিন্তু এই নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হওয়ায় তাকে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে। যেমন—মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করার কারণে যবের ওপর গিড়া দিতে বলা হবে কিন্তু এতে সক্ষম না হওয়ায় কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে।

৫। ঐ পরিমাণ জমি জবর দখলের পাপ তার জন্য অনিবার্য হয়ে যাবে। যেমন গুনাহ করলে ঐ গুনাহ গুনাহগারের জন্য অনিবার্য হয়ে যায়।

এরূপ রূপক অর্থের একটি দৃষ্টান্ত হলো কুরআনের এই আয়াত—

اَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهٗ فِىْ عُنُقِهٖ ـ

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) উপরোক্ত ব্যাখ্যাগুলো পেশ করার পর বলেন, প্রথম ব্যাখ্যাটি আল্লামা আবূ ফাতাহ্ কোশায়রী এবং আল্লামা বাগাভী (রহ.) উত্তম বলেছেন। এও সম্ভাবনা আছে যে, জবরদখলের স্তর ও ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন পদের শাস্তি হবে।

ফায়েদা ঃ ইবনে হাজার আসকালানী এবং ইমাম নববী (রহ.) طوقه الله الى سبع ارضين ... হাদীসের ভিত্তিতে বলেন কোন ভূখণ্ডের মালিক হলে মানুষ সাত তবকা তথা মাটির (একেবারে শেষ পর্যন্ত) সমস্ত অংশের মালিক হয়ে যায়। সুতরাং এর নিচের অংশ কেউ খনন করলে কিংবা ঐ অংশে রাস্তা নির্মাণ করতে চাইলে মালিক বাধা দিতে পারবে।

কিন্তু এরূপ দলীল প্রদান প্রশ্ন মুক্ত নয়। কেননা হাদীসে শুধু শাস্তির কথা বলা হয়েছে জমির মালিকানা বা জমির সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে কোন আলোচনা করা হয়নি। এ কারণে এই যুগে পাতাল ট্রেনের যে পদ্ধতি রয়েছে সে অনুযায়ী রাষ্ট্রপক্ষ যদি মালিকের ক্ষতি না করে মাটির নিচ দিয়ে লাইন নিতে চায় তাহলে বাধা দেয়া যাবেনা। এমনিভাবে মাটির নিচে মার্কেট বানানো যাবে। তবে সরকারীভাবে জমির পরিমাণ নির্ধারণ করে দিবে যাতে ওপর ওয়ালারা ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।

জমিনের সাত স্তর

হাদীস দ্বারা বুঝা যায় জমিনের স্তর সাতটি। সূরা তালাকের শেষ আয়াতেও এদিকে ইশারা করা হয়েছে—

اَللّٰهُ الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ـ

"আল্লাহ ঐ মহান সত্ত্বা যিনি সাত আসমান ও সাত জমিন সৃষ্টি করেছেন" আয়াতে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আসমানের স্তর বা তবকা যেমন সাতটি ঠিক তদ্রূপ জমিনের সংখ্যা সাতটি। কিন্তু এই সাত জমিনের স্তর বিন্যাস কিরূপ, একটা আরেকটার সাথে সংযুক্ত না, একটি আরেকটি থেকে দূরে, আসমানের মত যদি একটি আরেকটি থেকে দূরে হয় তাহলে প্রতিটি জমিন আসমানের ন্যায় দূরত্ব কি-না কিংবা এতে কেউ বসবাস করে কি-না—এসব ব্যাপারে কুরআনে কোন কিছু বর্ণনা করা হয়নি। এ সম্পর্কে যেসব হাদীস পাওয়া যায় এ ব্যাপারে আলিমগণ বিভিন্ন মত পেশ করেছেন। কেউ একে সহীহ্ আবার কেউ মওজু' বলেছেন।

যুক্তির দৃষ্টিকোণে এসব কিছুই হতে পারে। দ্বীন অথবা দুনিয়া লাভের সাথে এর কোন যোগসূত্র নেই। এ সম্পর্কে কবর, হাশর কোথাও আমাদের জিজ্ঞাসিত হতে হবেনা।

এজন্য সবচেয়ে নিরাপদ পন্থা এটাই যে, একথার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা রাখা যে, আসমানের মত জমিনের স্তরও সাতটি এবং আল্লাহই এর সৃষ্টিকর্তা এর প্রকৃত অবস্থা, হাল-হাকীকত তিনিই ভালো জানেন। কুরআনের বর্ণনার উদ্দেশ্য এতটুকুই। এরচেয়ে বেশি গভীরে যাওয়ার ব্যাপারে আমরা আদিষ্ট নই। কুরআনে যা বর্ণনা করার প্রয়োজন বোধ করেনি, সেখানে মাথা ঘামানোর কোন অর্থ নেই। সালফে সালেহিন এসব ক্ষেত্রে এরূপ কর্মপন্থাই অবলম্বন করেছেন। তাঁরা বলেছেন— ابهموا ما ابهمه الله। আল্লাহপাক যে জিনিস গোপন রেখেছেন তোমরাও সেগুলো গোপন রাখো—যদি এতে দ্বীনের কোন কল্যাণ না থাকে। (মা'আরেফুল কুরআন-খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৪৯৪)

باب قدر الطريق اذا اختلفوا فيه

অধ্যায় ঃ বিরোধ দেখা দিলে রাস্তার পরিমাণ নির্ণয় সম্পর্কে করণীয়

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِى الطَّرِيْقِ جَعَلَ عَرْضَهُ سَبْعَ اَذْرُعٍ ـ

"হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন—রাস্তার পরিমাণ নির্ণয়ে তোমাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে একে সাত হাত প্রশস্ত করবে।"

ইমাম নববী (রহ.) বলেন—রাস্তা বলতে এখানে আগে থেকে চলে আসা রাস্তা উদ্দেশ্য নয়। কেননা ঐ রাস্তা আগে থেকে যদি সাত হাত বা এরচেয়ে বেশি প্রশস্ত থাকে তাহলে বিরোধের কারণে প্রশস্ততা কমিয়ে দেয়া যাবেনা।

এমনিভাবে কোন ব্যক্তি যদি নিজের মালিকানাধীন ভূমি দিয়ে রাস্তা বানিয়ে দিতে চায় সেক্ষেত্রেও এই হাদীস প্রযোজ্য নয়। কেননা পরিমাণ নির্ণয়ের অধিকার সম্পূর্ণ মালিকের। অবশ্য যতদূর সম্ভব রাস্তা প্রশস্ত রাখাই উত্তম। বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যায় আলিমগণ বিভিন্ন মত পেশ করেছেন।

১। রাস্তার উভয় পাশ খালি ময়দান হলে সেখানে বাড়ি বানাতে চাইলে রাস্তার জন্য সাত হাত রেখে দিতে হবে।

২। ইমাম ত্বহাভী (রহ.) বলেন—এর দ্বারা উদ্দেশ্য নয়া রাস্তা বানানো। রাষ্ট্র প্রধান কর্তৃক গনীমত প্রাপ্তদের মধ্যে বণ্টিত জমিনে রাস্তা বানাতে চাইলে সবার সন্তুষ্টিতে যতটুকু পরিমাণ স্থির করা হবে ততটুকু পরিমাণ রাস্তা বানাবে। কিন্তু বিরোধ দেখা দিলে পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে সাত হাত।

৩। ইমাম তাবারী (রহ.) বলেন—যারা শরীকানা জমি ভাগ করতে চায় হাদীসটি তাদের জন্য প্রযোজ্য। শরীকানা রাস্তার পরিমাণ নির্ণয়ে সবাই একমত হতে পারলে ভালো কথা, অন্যথায় হাদীসের ভিত্তিতে সাত হাত পরিমাণ প্রশস্ত করতে হবে।

৪। আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন—হাদীসটি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা রাস্তায় কেনাবেচা করে। রাস্তা প্রশস্ততায় সাত হাতের বেশি হয় তাহলে দোকান-পাঠ বসাতে বাধা দেয়া যাবেনা। আর সাত হাতের কম হলে বাধা দেয়া যাবে যাতে চলাফেরা করতে কষ্ট না হয়। মোটকথা হাদীসটি কঠোরভাবে সীমা নির্ধারণের জন্য বলা হয়নি বরং পরামর্শের আঙ্গিকে কথাটি বলা হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক যুগের মানুষের প্রয়োজনের ওপর নির্ভর করে রাস্তার পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে।

كتاب الفرائض

অধ্যায় ঃ ফারায়েয্ সম্পর্কে

فرائض-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ

فرائض শব্দটি فريضة-এর বহুবচন। যেমন حدائق ও عجائب যথাক্রমে حديقة ও عجيبة-এর বহুবচন। فريضة শব্দটি مفروضة-এর

ক্রিয়ামূল (মাসদার) فرض-এর শাব্দিক অর্থ একাধিক। যথা ঃ (১) বিনিময় ছাড়া কোন কিছু দান করা (২) تقدير নির্ধারণ করা (৩) নির্ধারিত অংশ (৪) অবতীর্ণ করা। যেমন اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ (اَنْزَلَ) عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ (৫) বয়ান করা। যেমন قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ (৬) হালাল করা। যেমন مَا كَانَ عَلَى النَّبِىِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهٗ (৭) শরহুস সুন্নাতে বলা হয়েছে فرض অর্থ قطع (কর্তন করা)। এখানে فرائض দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মৃত ব্যক্তির ছেড়ে যাওয়া অর্থের মধ্যে শরীয়ত নির্ধারিত একটি বিশেষ অংশ। কুরআনে نصيب مفروض-কে ميراث বলা হয়েছে। (যেমন— نَصِيْبًا مَفْرُوْضًا اَىْ (مِقْدَارًا اَوْ مَعْلُوْمًا اَوْ مَقْطُوْعًا عَنْ غَيْرِهِمْ.

একারণে একে فرائض বলা হয়। এই ইলম সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ফরায়েযী বলা হয়।

হাদীসে বলা হয়েছে— تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا النَّاسَ فَاِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ আরো বলা হয়েছে افرضكم زيد (তোমাদের মধ্যে ফারায়েয সম্পর্কে সবচেয়ে বিজ্ঞ হলেন যায়েদ (রা.)।

فرائض-এর পারিভাষিক অর্থ ঃ هُوَ عِلْمٌ بِاُصُوْلٍ مِنْ فِقْهٍ وَحِسَابٍ تُعْرَفُ بِهٖ كَيْفِيَّةُ تَقْسِيْمِ التَّرِكَةِ بَيْنَ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ অর্থাৎ ইলমে ফারায়েয এমন কতক ফেকহী ও হিসাবের মৌলিক (اصول) এর নাম যার সাহায্যে মৃত ব্যক্তির ছেড়ে যাওয়া সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করা যায়।

قوله : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

হুযূর (সা.) বলেন, মুসলমান কাফিরের এবং কাফির মুসলমানের মীরাছ পাবে না। মুসলমান কাফিরের মীরাছ পাবেনা এ ব্যাপারে সকল ওলামা একমত। তবে হযরত মা'আয ইবনে জাবাল (রা.) মু'আবিয়া (রা.) সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব এবং মাসরুক্ প্রমুখের মতে মুসলমান কাফিরের মীরাছ পাবে।

তাঁরা প্রসিদ্ধ হাদীস اَلْاِسْلَامُ يَعْلُوْ وَلَا يُعْلٰى عَلَيْهِ —ইসলাম বিজয়ী ও উঁচু হয়ে থাকে পরাজিত ও নিচু হয়ে থাকেনা—দ্বারা দলীল পেশ করেন। সুতরাং বিজয়ীর নিদর্শন হলো—মুসলমান কাফিরের মীরাছ লাভ করবে।

কিন্তু আসল কথা হলো—এই হাদীসে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইসলাম সকল ধর্মের চেয়ে উত্তম ميراث বর্ণনা করা হাদীসের উদ্দেশ্য নয়।

হযরত মা'আয ইবনে জাবাল (রা.) এসব সহীহ্ হাদীস সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। অবহিত হলে অবশ্য এই মত পেশ করতেন না। পরবর্তীতে মুসলমান কাফিরের মীরাছ পাবেনা—একথার ওপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অবশ্য বিভিন্ন ধর্ম যেমন ইহুদী, নাসারা, অগ্নিপূজক এরা একে অপরের মীরাছ পাবে কিনা এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন এরা একে অপরের মীরাছ পাবেনা। তিনি لايتوارث اهل ملتين شتى হাদীস খানা দলীল হিসেবে পেশ করেন।

কিন্তু আহনাফের মতে বিধর্মীরা একে অপরের মীরাছ পাবে। কেননা রাসূল (সা.) বলেন ঃ اَلْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ

তাঁরা দলীল হিসেবে যে হাদীস পেশ করেন সেটা মূলতঃ মুসলমান কাফির একে অপরের মীরাছ পাবেনা একথা বলা হয়েছে। কাফিররা একে অপরের মীরাছ পাবেনা একথা বলা হয়নি।

মুরতাদ অবস্থায় কেউ মারা গেলে মুসলমান (ওয়ারিছ) তার মীরাছ পাবে কিনা এ ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে। ইমাম মালেক ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদের এক قول অনুযায়ী মীরাছ পাবেনা সমুদয় সম্পদ বাইতুল মালে জমা করতে হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এবং ইমাম আহমদের অপর قول অনুযায়ী মুরতাদ হওয়ার আগে যে সব সম্পদ উপার্জন করেছে মুসলমান ওয়ারিছ সেগুলোর ميراث পাবে কিন্তু মুরতাদ হওয়ার পর যেগুলো উপার্জন করেছে সেগুলোর মীরাছ পাবেনা। রাসূল (সা.)-এর বাণী কাফির মুসলমানের মীরাছ পাবেনা এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। তবে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলেন মীরাছ বন্টন হওয়ার আগে যদি কাফির ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে সে মুসলমানের মীরাছ পাবে।

কিন্তু জমহূর ওলামায়ে কিরামের মতে (مورث-এর) মৃত্যু বরণ করা কালীন যে ব্যক্তি কাফির ছিল সে মীরাছ থেকে বঞ্চিত হবে। যদিও সে মীরাছ বন্টন হওয়ার আগে ইসলাম গ্রহণ করে।

এটা ইমাম আবূ হানীফা ইমাম মালেক ইমাম শাফেঈ এবং জমহূর ওলামায়ে কিরামের অভিমত।

قوله : اَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِاَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَهُوَ لِوَلِيٍّ رَجُلٍ ذَكَرٍ -

"হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন—তোমরা মীরাছকে হকদারের সাথে মিলিয়ে দাও। অর্থাৎ নির্ধারিত অংশ প্রাপ্তদের মাঝে বণ্টন করো। এরপর অবশিষ্ট অংশ মৃত ব্যক্তির নিকটবর্তী পুরুষ পাওয়ায় বেশি হকদার।"

এর উদ্দেশ্য হলো ঃ اصحاب فرائض। এরা অংশ নেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে সেগুলো عصبة হিসেবে ঐ পুরুষের ভাগে পড়বে যে মৃত ব্যক্তির অধিক নিকটবর্তী। হাদীসে اَوْلى শব্দের মূল হলো ولى بسكون اللام بمعنى القرب সুতরাং اولى-এর অর্থ اقرب। আর ফারায়েযের নিয়মানুযায়ী اقرب থাকাকালীন ابعد মীরাছ পায়না। এদেরকে عصبة بنفسه বলা হয় অর্থাৎ ঐ পুরুষ ব্যক্তি যাকে মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক যুক্ত করতে কোন মহিলার সাহায্যের প্রয়োজন পড়েনা। এভাবে যে, মৃত ব্যক্তি এবং ঐ ব্যক্তির মাঝখানে কোন واسطة 'মাধ্যম' নেই। যেমন পিতাপুত্র, অথবা মাধ্যম আছে কিন্তু মাধ্যমটি মহিলা না। যেমন ابن الابن (ছেলের ঘরের নাতি)

উল্লেখ্য যে, عصبة بنفسه হওয়ার اسباب চারটি।

১। بلا واسطة بنوت তথা সন্তানের মাধ্যম ছাড়া। যেমন ছেলে অথবা সন্তানের মাধ্যমে عصبة যেমন নাতি।

২। بلا واسطة ابوت পিতৃত্বের মাধ্যম ছাড়া عصبة যেমন পিতা অথবা পিতৃত্বের মাধ্যমে عصبة যেমন দাদা, পর দাদা।

৩। ভাই-বেরাদার এবং তাদের শাখা।

৪। চাচা এবং তাদের শাখা।

উল্লেখিত চার প্রকার اسباب-এর মধ্যে সর্বাগ্রে بنوت তথা ছেলে। অতঃপর ابوت। (পিতা) অথঃপর اخوت। এবং সর্বশেষ عمومت (চাচা ও তাদের শাখা) عصبة হিসেবে স্থান পাবে।

কেননা عصبة-এর মধ্যে যারা মৃত ব্যক্তির বেশি নিকটে তারা অন্যের ওপর مقدم হয় অর্থাৎ এদের উপস্থিতিতে অন্যান্য عصبة রা মীরাছ থেকে বঞ্চিত হয়।

যেমন ছেলে মৃত ব্যক্তির সবচেয়ে নিকটে। সুতরাং ছেলে জীবিত থাকলে মৃত ব্যক্তির নাতি, পর নাতি, ভাই, চাচা, বাপ, দাদা কেউই আসাবা হতে পারবে না। ছেলে জীবিত না থাকলে নাতি, নাতি না থাকলে পরনাতি (প্রোপৌত্র) আসাবা হবে। এভাবে অনেক নিচ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে। মৃতব্যক্তির ঔরসজাত কেউই বেঁচে না থাকলে পিতা আসাবা হবে। এভাবে অনেক ওপর পর্যন্ত ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে।

মৃত ব্যক্তির বাপ, দাদা অথবা ওপরের কেউ জীবিত না থাকে তাহলে ভাই আসাবা হবে। ভাই বেঁচে না থাকলে ভাইয়ের পুত্র সন্তান (ভাতিজা) আসাবা হবে। ভাতিজা না থাকলে চাচা এবং চাচা না থাকলে চাচাতো ভাই আসাবা হবে। সার কথা মৃত ব্যক্তির যে যত নিকটবর্তী হবে মীরাছ পাওয়ার ক্ষেত্রে সে তত হকদার হবে। فمابقى فهو لاولى رجل ذكر দ্বারা এটা উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন ঃ رجل তো পুরুষই হয়। এতদসত্ত্বেও ذكر শব্দকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হলো কেন? এর সহজ উত্তর হলো رجل শব্দ কোন সময় شخص (ব্যক্তি) এর অর্থে ব্যবহার হয়, যার মধ্যে নারী-পুরুষ উভয়েই শামিল। তাই অস্পষ্টতা দূর করতে ذكر শব্দকে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য এর দ্বারা সূক্ষ্মভাবে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে হকদার হওয়ার কারণ হলো مذكر (পুরুষ) হওয়া। সুতরাং কোন মহিলা عصبة بنفسه হতে পারবে না।

মনে রাখতে হবে যে, عصبة-এর আরো দু'টি শ্রেণী রয়েছে।

১। عصبة بغيره ২। عصبة مع غيره । এরা সাধারণত ঃ মেয়েদের থেকেই হয়ে থাকে।

عصبة بغيره বলা হয় ঐ মহিলাকে যে নিজে عصبة হতে অন্যের মুখাপেক্ষী এবং সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজেও আসাবা হয়ে এই মহিলার সাথে শরীক হবে।

চার শ্রেণীর মহিলা এরূপ আসাবা হয়ে থাকে।

১। মৃত ব্যক্তির কন্যা ২। নাতনী ৩। সহোদর বোন এবং (৪) বৈমাত্রেয় (علاتی) বোন। এরা নিজেদের ভাইয়ের সাথে মিলে আসাবা হয় এবং للذكرمثل حظ الانثيين-এর নিয়মে মীরাছ প্রাপ্ত হয়।

عصبة مع غيره হলো ঐ মহিলা, যে নিজে আসাবা হওয়ার জন্য দ্বিতীয় (অন্য) ব্যক্তির মুহতাজ কিন্তু ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি এই মহিলার সাথে عصبة হিসেবে শরীক হবেনা। এরা হলো মৃত ব্যক্তির حقيقى (সহোদর) এবং علاتی (বৈমাত্রেয়) বোন। এদের সাথে ভাই না থাকা কালে মৃত ব্যক্তির কন্যা অথবা নাতনীর সহায়তায় আসাবা হয়ে যাবে।

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন— اِجْعَلُوْا الْاَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً

"মৃত ব্যক্তির কন্যা সন্তানের উপস্থিতিতে বোনদেরকে আসাবা বানাও।"

কিন্তু এক্ষেত্রে কন্যা অথবা নাতনীরা আসাবা হবেনা বরং اصحاب الفرائض হিসেবে নিজেদের অংশ পাবে। অবশিষ্ট সম্পদ বোনেরা পাবে।

সুতরাং হাদীসের মধ্যে عصبة بنفسه বোঝানোর জন্য ذكر শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। এরাই প্রকৃত আসাবা। আর বাকি দুই প্রকার আসাবা مجاز (রূপক) অর্থে হাকীকী অর্থে নয়। এরা অন্যান্য نص দ্বারা মীরাছ লাভ করে, অত্র نص (হাদীস) দ্বারা নয়। فافهم

পুত্রের উপস্থিতিতে নাতির (পৌত্র) মীরাছ

হাদীসে বর্ণিত فما بقى فهو لاولى رجل ذكر ("যে মৃত ব্যক্তির অধিক নিকটবর্তী সে তত বেশি হক দার" তথা اقرب থাকা অবস্থায় ابعد মীরাছ পাবে না (الاقرب فالاقرب)

নির্দেশটি এ কথার সুস্পষ্ট দলীল যে, পিতা জীবিত থাকা অবস্থায় যদি ছেলে মারা যায় এবং পিতার অন্যান্য ছেলে জীবিত তাকে তাহলে নাতি-নাতনী মীরাছ পাবেনা। কেননা অন্যান্য ছেলেরা اولى رجل তথা اقرب। সুতরাং তারা সমুদয় সম্পদ নিয়ে নিবে আর নাতি নাতনী ابعد। হওয়ার কারণে সম্পূর্ণভাবে মাহরুম হবে।

এই মাসআলার ব্যাপারে সবাই একমত কোন ইখতিলাফ নেই। কিন্তু এখানে একটি সন্দেহ জাগে যে, শরীয়ত নাতিকে ধন-সম্পদ থেকে এভাবে বঞ্চিত করতে পারল কীভাবে? অথচ এই শিশুই (নাতি) অনুগ্রহ পাওয়ার বেশি হকদার।

এই সন্দেহ নিরসনে আল্লামা ইউসুফ শহীদ লুধিয়ানভী (রহ.) "আপ কে মাসায়েল আওর উনকা হল" নামক কিতাবে লিখেছেন এখানে দু'টি উসূল মনে রাখতে হবে।

১। میراث-এর ভিত্তি قرابت -এর ওপর। কোন ওয়ারিশ মালদার হওয়া না হওয়া কিংবা অনুগ্রহের পাত্র হওয়া না হওয়ার ওপর এর ভিত্তি নয়।

২। শরয়ী ও আকলী দৃষ্টিকোণে মীরাছের ক্ষেত্রে الاقرب فالاقرب-এর বিধান প্রযোজ্য। যার মতলব হচ্ছে মৃত ব্যক্তির নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজন থাকাকালীন দূরবর্তী রেস্তাদার মীরাছ পাবেনা।

এই দু'টি উসূলকে সামনে রেখে চিন্তা করলে দেখা যায়—কোন ব্যক্তির যদি চারজন পুত্র সন্তান থাকে এবং প্রত্যেকের আবার চারজন করে ছেলে থাকে তাহলে মীরাছ ওই ছেলেরাই পাবে নাতিরা পাবেনা। আমার ধারণা এই মাসআলায় কেউ মতানৈক্য করবেন না। এর দ্বারা বোঝা গেল, ছেলের বিদ্যমানতায় নাতি-নাতনী মীরাছ পাবেনা। এখন ধরে নেয়া যাক পিতা জীবিত থাকা অবস্থাতেই চার ছেলের একজন মারা গেল।

নিয়ম অনুযায়ী দাদার দৃষ্টিতে মরে যাওয়া এই ছেলের চার সন্তান এবং অপর তিন ছেলের (১২) সন্তানের অবস্থান একই, কমবেশি হওয়ার কথা নয়। الاقرب فالاقرب-এর নিয়মানুযায়ী অপর নাতিরা যেহেতু দাদার ওয়ারিশ হবেনা সুতরাং মরহুম এই ছেলের পুত্ররাও ওয়ারিশ না হওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত বিধান।

একথা বলা ঠিক হবেনা যে, মৃত এই ছেলে যদি জীবিত থাকত তাহলে তো একচতুর্থাংশ মীরাছ লাভ করত, এই একচতুর্থাংশ নাতিদের দিলে দোষ কি?

একথা বলা ঠিক হবেনা এজন্য যে, এক্ষেত্রে পিতার জীবদ্দশায় মৃত এই ছেলেকে পিতার মৃত্যুর পূর্বেই ওয়ারিশ বানানো অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে।

অথচ যুক্তি ও শরীয়ত কোন কানুন অনুযায়ীই مورث (পিতা) মারা যাওয়ার পূর্বে মীরাছ জারি হয় না।

সারকথা, যদি নাতিদেরকে (যাদের বাপ মারা গেছে) নাতি হওয়ার কারণে দাদার মীরাছ দেয়া হয় তবে তা একারণে ভুল যে, নাতিরা এমতাবস্থায় দাদার

মীরাছ পাচ্ছে যে অবস্থায় ميت (দাদা)-র সন্তান (তাদের পিতা) জীবিত নেই। এতদসত্ত্বেও যদি তাদেরকে মীরাছ দেয়া হয় তাহলে অন্যান্য নাতিদেরকেও দিতে হবে।

আর যদি তাদেরকে তাদের পিতার অংশ হিসেবে মীরাছ প্রদান করা হয় তাহলে তা একারণে ভুল যে, তাদের পিতা মৃত্যুর আগে তো মীরাছের অধিকারীই হয়নি (কেননা ওই সময় তার পিতা জীবিত ছিল)। (সুতরাং পিতা যে জিনিসের মালিক হয়নি তারা কি করে সেগুলোর ওয়ারিশ হবে?)

এখন যদি এই প্রশ্ন করা হয় যে, ইয়াতীম এই নাতি-নাতনীরা অনুগ্রহের পাত্র নয় কী? দাদার ছেড়ে যাওয়া কিছু সম্পদ তাদের পাওয়া উচিত নয় কি?

আবেগ মিশ্রিত এসব কথা এজন্য বাতিল যে, মীরাছের ক্ষেত্রে কে অনুগ্রহের পাত্র কে অনুগ্রহের পাত্র নয় এদিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করা হয় না।

মীরাছের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো— قرابت সুতরাং قرابت-এর ভিত্তিতেই মীরাছ লাভ হবে।

অন্যথায় ধনাঢ্য কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার পোষ্য সন্তানাদি ওয়ারিশ না হওয়ার কথা বরং গরীব, নিঃস্ব পাড়া-প্রতিবেশি ওয়ারিশ হওয়ার কথা। কেননা তারাই যে অনুগ্রহ লাভের বেশি হকদার।

এছাড়া কোন ব্যক্তি ইয়াতীম নাতি-নাতনীকে যদি অনুগ্রহ করতে চায় তাহলে শরীয়ত তো এর অনুমতি দিয়েই রেখেছে। মালের এক তৃতীয়াংশ ওদের জন্য ওসীয়াত করে যাবে। এভাবে তাদের দুঃখ ঘোচানোর একটি সুন্দর ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

পিতা জীবিত থাকলে এরা একচতুর্থাংশ লাভ করত, কিন্তু এই পন্থায় তো একতৃতীয়াংশ লাভ করতে পারছে। দাদা যদি ওসীয়াত নাই করে যায় তাহলে ইয়াতীমের চাচাগণের উচিত ভ্রাতুষ্পুত্রদেরকে নিজেদের সাথে শরীক করে নেয়া।

নিষ্ঠুর হৃদয়ের দাদা যদি ওসীয়াত না করে এবং আত্মপূজারী চাচারাও দয়া না করে তাহলে বলুন এখানে শরীয়তের কী করার আছে? শুধু আবেগের কথা দিয়ে তো আর শরীয়তের হুকুম পরিবর্তন করা যায়না।

শরীয়তের এই বিধান থাকার পরেও যদি কারো ইয়াতীমের প্রতি সহানুভূতি জাগে এবং তাদেরকে অসহায় দেখতে না চায় তাহলে সে যেন এই সব সম্পদ তাদের নামে লিখে দিয়ে যায়। কেননা অসহায় লোকদের সাথে উত্তম আচরণ

করতে শরীয়ত জোরালোভাবে নির্দেশ প্রদান করেছে। এর দ্বারা এও প্রমাণিত হবে যে, অসহায় লোকদের প্রতি কে কত অনুকম্পা প্রদর্শন করতে সক্ষম তা প্রমাণ করা। আল্লামা লুধিয়ানভী (রহ.) উক্ত কিতাবের অন্য জায়গায় (খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৩৩৪) লিখেছেন "দাদা যদি নাতির প্রতি দয়া দেখাতে চায় এবং নিজের সম্পদে তাকে অংশীদার করতে চায় তাহলে তার জন্য শরীয়ত দু'টি পথ খোলা রেখেছে।"

১। মৃত্যুর অপেক্ষা না করে সুস্থ থাকা অবস্থাতেই তাকে যতটুকু দেয়ার ইচ্ছা করেছে তা দিয়ে দিবে এবং নিজের জীবদ্দশাতেই এ পরিমাণ সম্পদ তাদের কব্জায় দিয়ে দিবে।

২। মৃত্যুর আগে ওসীয়াত করে যাবে যাতে করে ইয়াতীম নাতিদেরকে নিজের রেখে যাওয়া সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের পরিমাণ অংশ তাদের প্রদান করা হয়।

দাদা যদি নাতির প্রতি এতটুকু দয়া না দেখায় যে, জীবদ্দশায় কিছু দিয়ে গেল না আবার মৃত্যুর পরও দেয়ার ওসীয়াত করে গেল না তাহলে ইনসাফ করুন। এতে কার দোষ। শরীয়তের কানুনের নাকি নিষ্ঠুর এই দাদার?

কালালার মীরাছ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : مَرِضْتُ فَاَتَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبُوْبَكْرٍ يَعُوْدَانِىْ مَاشِيَيْنِ فَاُغْمِىَ عَلَىَّ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَبَّ عَلَىَّ مِنْ وَضُوْئِهِ فَاَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! كَيْفَ اَقْضِىْ فِىْ مَالِىْ ؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتّٰى نَزَلَتْ اٰيَةُ الْمِيْرَاثِ : يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلَالَةِ -

"হযরত জাবের (রা.) বলেন–আমি অসুস্থ হলে হুযূর (সা.) এবং আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) পদব্রজে আমাকে দেখতে আসলেন। আমার ওপর বেহুঁশী চড়াও হলো। হুযূর (সা.) অযু করে এর কিছু পানি আমার গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। আমার হুঁশ ফিরে আসল। হুযূর (সা.) কে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) আমার ধনসম্পদ কী করে যাব? হুযূর (সা.) কোন উত্তর দিলেন না। এরই মধ্যে يستفتونك الخ আয়াত নাযিল হলো।

উল্লেখিত ঘটনায় মীরাছ বর্ণনায় নাযিলকৃত আয়াত কোনটি এ ব্যাপারে কিছুটা ইখতিলাফ রয়েছে।

এখানে বলা হয়েছে সূরা নিসার শেষ আয়াত يستفتونك الخ আর অন্যান্য রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে এটি হলো সূরা নিসার প্রথম দিকের আয়াত ঃ

يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ـ

এই تعارض (বৈপরিত্যের) সম্পর্কে আল্লামা ইবনে হাজার এবং আল্লামা সিন্ধী (রহ.) বলেন—এই تعارض হযরত জাবেরের (রা.) রেওয়ায়াতের কারণে সৃষ্টি হয়নি। তাঁর বর্ণিত হাদীসে শুধু মাত্র মীরাছের আয়াতের কথা বলা হয়েছে। নির্ধারণ করতে গিয়ে হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রা.) এবং ইবনে জুরাইজের (রা.) মধ্যে ইখতিলাফ সৃষ্টি হয়েছে।

ইবনে উয়াইনা বলেন আয়াতটি হলো يستفتونك الخ আর ইবনে জুরাইজ (রা.) বলেন يوصيكم الله فى اولادكم الخ অবশ্য সূরা নিসার শেষোক্ত আয়াত يستفتونك নাযিল হওয়াটাই বাস্তবতার কাছাকাছি। যেহেতু উভয় আয়াতে كلالة-এর হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে এজন্য নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে ابن جريج-এর সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে এবং তিনি বলেছেন, এটি হলো— يوصيكم الله

অন্য দিকে আবূ দাউদের রেওয়ায়াত অনুযায়ী বুঝা যায় হযরত জাবির (রা.) নিজেই আয়াত নির্ধারণ করে গেছেন। ঐ রেওয়ায়াতের শেষের দিকে বলা হয়েছে—

وَكَانَ جَابِرٌ يَقُوْلُ : اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلَالَةِ ـ

সুতরাং এই রেওয়ায়াত অনুযায়ী মীরাছের আয়াত সূরা নিসার শেষ আয়াত।

كلالة-এর পরিচয়

كلالة-এর সংজ্ঞায় নানা মুখী মতামত পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা হলো, যে মৃত ব্যক্তির اصول (বাপ, দাদা) এবং فروع (ছেলে, নাতি) নেই তাকে كلالة বলে। রুহুল মা'আনী প্রণেতা আল্লামা আলূসী (রহ.) বলেন— كلالة

শব্দটি আসলে মাসদার। كلال-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। كلال অর্থ ক্লান্ত হয়ে যাওয়া, দুর্বল হয়ে যাওয়া। বাপ এবং ছেলে ভিন্ন অন্যান্য রেস্তাদারকে كلالة বলা হয়। কেননা বাপ এবং ছেলের তুলনায় তাদের قرابت দুর্বল।

বাপ এবং ছেলে ছাড়া মৃত ব্যক্তিকে যেমন كلالة বলা হয় ঠিক তদ্রুপ ঐ ওয়ারিশগণকেও كلالة বলা হয় যারা মৃত ব্যক্তির ছেলে বা বাপ নয়।

ওপরে বর্ণিত كلالة-এর اشتقاق (ক্রিয়ামূল নির্ণয়) অনুযায়ী এখানে ذو শব্দ উহ্য মানতে হবে।

সুতরাং كلالة অর্থ ذو كلالة অর্থ দুর্বল আত্মীয়তার সম্পর্ক ওয়ালা।

শব্দটি ওই مال موروث-এর ওপরেও প্রয়োগ হয় যা এমন ব্যক্তি রেখে গেছে যার পিতা বা ছেলে নেই।

সারকথা হলো, বাপ-দাদা এবং সন্তান ছাড়া যে ব্যক্তি (মহিলা বা পুরুষ যেই হোক) মারা যায় এবং ওয়ারিশ হিসেবে ভাই কিংবা বোন অথবা উভয়কে রেখে গেল সেই كلالة

كلالة -এর মীরাছ বণ্টনের পদ্ধতি নিম্নরূপ

كلالة -এর ভাই-বোন দুই অবস্থা থেকে খলি নয়।

১। اخيافى তথা শুধু মা শরীক (বৈপিতৃয়) ভাই-বোন।

২। عينى - حقيقى তথা সহোদর ভাই-বোন অথবা علاتى তথা বাপ শরীক (বৈমাতৃয়) ভাই-বোন।

১। প্রথম প্রকার অর্থাৎ اخيافى ভাই-বোন একজন হলে ছয় ভাগের এক ভাগ (سدس) পাবে। আর একাধিক হলে যেমন দুই ভাই বোন, অথবা দুই ভাই কিংবা দুই বোন তাহলে মৃত ব্যক্তির যাবতীয় সম্পদের একতৃতীয়াংশ (ثلث) লাভ করবে।

এক্ষেত্রে مذكر (পুরুষ) مؤنث (নারী)র দ্বিগুণ পাবেনা। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন—মাত্র একটি স্থান ছাড়া কোথাও নারী ও পুরুষ ميراث-এর ক্ষেত্রে সমান অংশীদার হয়না।

সেটি হলো كلالة-এর ক্ষেত্রে মা শরীক ভাই বোন। (কেননা তারা সমান মীরাছ পাবে)।

২। হাকীকী (সহোদর) অথবা علاتى (বৈমাতৃয়) ভাইবোনের হুকুম হলো–ভাই হলে সমুদয় অর্থের মালিক হবে আর বোন হলে অর্ধেক সম্পদের মালিক হবে। দুই অথবা দুইয়ের অধিক বোন হলে দুই তৃতীয়াংশ (ثلثان) সম্পদের ওয়ারিশ হবে। ভাই-বোন একাধিক হলে للذكر مثل-এর নিয়ম অনুযায়ী পুরুষ (ভাই) নারী (বোনের চেয়ে দ্বিগুণ মীরাছ পাবে।

هٰذَا هُوَ التَّفْصِيْلُ لِتَقْسِيْمِ مِيْرَاثِ الْكَلَالَةِ ـ

اخر ما نزل من القران কুরআনের সর্বশেষ আয়াত

عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُوْلُ : اٰخِرَ اٰيَةٍ اُنْزِلَتْ اٰيَةُ الْكَلَالَةِ وَاٰخِرُ سُوْرَةٍ اُنْزِلَتْ بَرَاءَةٌ ـ

কুরআনের নাযিল হওয়া সর্বশেষ আয়াত কোনটি এ ব্যাপার হুযূর (সা.)-এর সুস্পষ্ট কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি। শুধুমাত্র সাহাবাদের বক্তব্য পাওয়া যায়। হযরত বারা ইবনে আযেবের (রা.) রেওয়ায়াত অনুযায়ী সর্বশেষ নাযিল হওয়া আয়াতটি হলো, ايت كلالة তথা يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلَالَةِ الخ। ইবনে আব্বাসের (রা.) বর্ণনা অনুযায়ী সর্বশেষ আয়াত সূরা বাকারার وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ আয়াত। এই আয়াত নাযিল হওয়ার একাশি দিন অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী নব্বই দিন পর রাসূল (সা.)-এর ওফাত হয়।

ইবনে আব্বাসের অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী সর্বশেষ আয়াত হলো وذروا مابقى من الربوا (তথা সুদের আলোচনা সম্বলিত এই আয়াত)।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের (রা.) বর্ণনা অনুযায়ী সর্বশেষ আয়াত হলো دين (কর্জ সম্পর্কীয়) اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى আয়াত।

উল্লেখিত তিন রেওয়ায়াত (তথা واتقوا يوماالخ وذروا ما ما بقى الخ ، এবং اذا تداينتم) এর মধ্যে মূলতঃ কোন تعارض নেই।

আসল কথা হলো সবগুলি আয়াত একই সাথে একই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়।

কেউ প্রথম অংশ, কেউ দ্বিতীয় অংশ আবার কেউ তৃতীয় কে প্রথম আয়াত বলে মত দিয়েছেন।

তবে اجح, গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী সর্বদিক বিবেচনায় নাযিল হওয়া শেষ আয়াত হলো وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ

يَسْتَفْتُوْنَكُ قُلِ اللّٰهُ يفتيكم فى الكلالة الخ আয়াত সর্বদিক বিবেচনায় শেষ আয়াত নয় বরং মীরাছের হুকুম সম্বলিত সর্বশেষ আয়াত।

এক রেওয়ায়াতে فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّى لاَ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ (آل عمران) আয়াত কে সর্বশেষ আয়াত বলা হয়েছে। এটাও على الاطلاق। (সর্বদিক বিবেচনায়) শেষ আয়াত নয়। বরং মহিলাদের ব্যাপারে যে তিনটি বিষয়ের বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়েছে এটি সেগুলোর শেষ আয়াত। এমনিভাবে এক রেওয়ায়াতে وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا-কে শেষ আয়াত বলা হয়েছে। এখানেও একই কথা প্রযোজ্য। কতলের হুকুম সম্পর্কীয় যাবতীয় আয়াতের শেষ আয়াত এটি। সামগ্রিক বিশ্লেষণ করে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো ঃ সর্বদিক বিবেচনায় নাযিলকৃত শেষ আয়াত হলো وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ। এরপর আর কোন আয়াত নাযিল হয়নি। এর নব্বই দিন পর রাসূল (সা.) ইন্তিকাল করেন। سُبْحَانَ الَّذِىْ لاَ يَمُوْتُ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

এসব اقوال مختلفة-এর প্রতি ইঙ্গিত করে কাজী আবূ বকর রাযী (রহ.) ফরমান— মতবিরোধপূর্ণ এসব বক্তব্যের কোনটিই সরাসরী রাসূল (সা.) কর্তৃক নির্ধারিত নয়।

প্রত্যেকে নিজস্ব ইজতেহাদ অথবা প্রবল ধারণার ভিত্তিতে মত পেশ করেছেন। এতে এই সম্ভবনা রয়ে গেছে যে, রাসূল (সা.) ইন্তিকালের দিন অথবা ইন্তিকালের সামান্য পূর্বে যারা তাঁর থেকে যে আয়াত শুনেছেন সেটাকেই সর্বশেষ আয়াত বলে ধারণা করেছেন।

আর অপরজন অন্য আয়াত শ্রবণ করেছেন আগের জন যা শুনেছেন তিনি সেটা শোনেন নি।

অথবা এও হতে পারে যে, সর্বশেষ যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে রাসূল (সা.) সেগুলোকে তার আগের অবতীর্ণ আয়াতের সাথে তেলাওয়াত করেছেন। অতঃপর আগেরগুলো লিখার পর পরেরগুলোকে লিখে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। পরবর্তীতে ধারণা সৃষ্টি হয় যে, এগুলোই অবতীর্ণ হওয়া শেষ আয়াত।

কুরআনের নাযিল হওয়া সর্বশেষ সূরা হলো সূরায়ে তাওবা। বারা ইবনে আযেবের (রা.) রেওয়ায়াতে একথাই বলা হয়েছে।

এমনিভাবে হোসাইন ইবনে ওয়াকিদের সনদে আল্লামা ওয়াহেদী বর্ণনা করেন—আলী ইবনে হোসাইন বলেন, মক্কায় নাযিল হওয়া সর্বপ্রথম সূরা হলোঃ اقرأ باسم ربك। আর সর্বশেষ সূরা সূরায়ে মুমিনূন অথবা সূরা আন্‌কাবূত।

আর মদীনায় অবতীর্ণ হওয়া সর্বপ্রথম সূরা মুতাফ্‌ফিফীন আর সর্বশেষ নাযিল হওয়া সূরা সূরা বারা'আত (তাওবা)।

আর মক্কায় রাসূল (সা.) সর্বপ্রথম যে সূরা প্রচার করেছেন সেটি হলো "সূরা নযম"। (আল-ইতকান)

كتاب الهبات

باب كراهية شراء الانسان ماتصدق به ممن تصدق عليه

অধ্যায়ঃ কোন বস্তু দান করে গ্রহীতার নিকট থেকে পুনরায় তা ক্রয় করা নিষেধ হওয়া প্রসঙ্গে

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : حَمَلْتُ عَلٰى فَرَسٍ عَتِيْقٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَضَاعَهُ صَاحِبُهُ : فَظَنَنْتُ اَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخَصٍ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ : لاَ تَبْتَعْهُ وَلاَ تَعُدْ فِىْ صَدْقَتِكَ فَاِنَّ الْعَائِدَ فِىْ صَدْقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِىْ قَيْئِهِ -

"হযরত ওমর (রা.) বলেন—আমি একটি উত্তম ঘোড়া (ঘোড়াটির নাম ওয়ার্‌দ, তামীম দারী (রা.) এটি হুযূর (সা.)-কে হাদিয়া হিসেবে প্রদান করেন এবং হুযূর (সা.) হযরত ওমরকে দান করেন) আল্লাহ্‌র রাস্তায় অর্থাৎ জিহাদের জন্য দান করলাম। ঘোড়া প্রাপ্ত ওই মুজাহিদ ঠিক মত ঘোড়ার যত্ন করতে পারল না। (যার ফলে সে ওটা বিক্রি করার ইচ্ছা করল।")

আমার ধারণা হলো, সে আমাকে ওটি কম মূল্য দিয়ে দিবে। আমি ব্যাপারটি হুযূর (সা.)-এর কাছে উপস্থাপন করলে তিনি বললেন—সাবধান! এটি

খরিদ করোনা, নিজের সদকাকে ফেরত নিও না! কেননা সদকা ফেরত নেয়া ব্যক্তি ঐ কুকুরের ন্যায় যে বমি করে আবার গিলে খায়।

হেবার শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ

هبة - باب فتح-এর মাসদার। ماده (মূল) وهب

هبة-এর শাব্দিক অর্থ, المنحه والدفع والاعطاء واعطاء شيئ بغير عوض অনুদান, উপহার, অর্পণ করা, দেয়া, বিনিময় ছাড়া তথা কোন কিছু প্রদান করা, আর পরিভাষায়—

هِيَ تَمْلِيْكُ الْمَالِ بِغَيْرِ عِوَضٍ اَوْ يُقَالُ هِيَ تَمْلِيْكُ الْعَيْنِ لِلْمَالِ بِلاَ شَرْطِ عِوَضٍ -

অর্থাৎ কোন রকম বিনিময় ছাড়া মালের মালিক হওয়া অথবা বলা যেতে পারে, (ভবিষ্যতে কোন রকম বিনিময়ের শর্ত করা ছাড়া) নগদ কোন কিছুর মালিক বানানো।

সদকা ও হেবার মধ্যে পার্থক্য

সদকা এবং হেবা উভয়টি تمليك بلاعوض তথা বিনিময় ছাড়া মালিক বানানোকে বলে।

তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো, যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং একমাত্র তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য দান করা হয় সেটি সদকা। আর কাউকে মহব্বত করে এবং তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য যা কিছু দেয়া হয় সেটা হাদিয়া। রাসূল (সা.) হাদিয়া কবুল করতেন কিন্তু সদকা কবুল করতেন না।

لا تعد في صدقتك ঃ হুযূর (সা.) হযরত ওমরকে ওই ঘোড়া কিনতে নিষেধ করেন এবং বলেন "নিজের সদকা পুনরায় ফেরত নিও না।"

কথাটির উদ্দেশ্য হলো, সাধারণতঃ এক্ষেত্রে বিক্রেতা প্রকৃত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বিক্রি করবে। আর যতটুকু কম নিবে ততটুকু সদকা বলে বিবেচিত হবে। فافهم

নিজের প্রদত্ত সদকা ক্রয় করার বিধান

জমহুর ওলামায়ে কিরামের মতে—নিজের প্রদত্ত সদকা ক্রয় করা মাকরুহে তানযীহী। আর কম দেয়ার লালসায় ক্রয় করলে তা হবে মাকরুহে তাহরীমী। তবে উভয় ক্ষেত্রে عقد بيع সহীহ্ হবে।

হ্যাঁ সদকাকৃত মাল যদি সদকাকারীর মালিকানায় অনিচ্ছায় এসে যায় (যেমন মীরাছ) তাহলে এতে দোষের কিছু নেই। রাসূল (সা.)-এর যুগে এক মহিলা নিজের মাকে একটি বাঁদী প্রদান করে। কিছুদিন পর মা মারা গেলে পুনরায় মীরাছ হিসেবে পাওয়া এই বাঁদী সম্পর্কে রাসূল (সা.) কে বলেন— وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ "আমল নামায় সওয়াব লেখা হয়ে গেছে এখন মীরাছ হিসেবে তোমার মালিকানায় এসে গেল।"

باب تحريم الرجوع فى الصدقة بعد القبض الا ما وهبه لولده وان سفل

অধ্যায় ঃ সদকা ফেরত নেয়া সম্পর্কে

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَثَلُ الَّذِيْ يَرْجِعُ فِيْ صَدْقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيْئُ ثُمَّ يَعُوْدُ فِيْ قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : اَلْعَائِدُ فِيْ هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِيْ قَيْئِهِ ـ

সদকা ফেরত নেয়া নাজায়িয এ ব্যাপারে সবাই একমত। তবে হিবা ফেরত নেয়া যাবে কিনা। এ ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে।

ائمة ثلثة-এর অভিমত হলো হেবা করার পর শুধু মাত্র পিতা ছেলে থেকে ফেরত নিতে পারবে অন্য কেউ পারবেনা।

দলীল ঃ উল্লেখিত হাদীস এবং "সুনানে আরবাআয়" হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে ওমরের (রা.) বর্ণিত আরেকটি মারফূ' হাদীস ঃ

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبُ هِبَةً فَيَرْجِعُ فِيْهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيْمَا يُعْطِيْ وَلَدَهٗ ـ

ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) মতে কোন নিকটাত্মীয়কে হেবা করে ফেরত নেয়া জায়িয নেই। চাই সে বাপ বা অন্য কেউ হোক। হ্যাঁ অপরিচিত কাউকে হেবা করে ফেরত নেয়া জায়িয আছে। শর্ত হলো مانع رجوع না থাকতে হবে।

তবে ফেরত নিতে হলে কাজীর ফয়সালা লাগবে অথবা প্রাপকের সন্তুষ্টি থাকতে হবে।

কিন্তু যে পদ্ধতিতেই ফেরত নেয়া হোকনা কেন দ্বীনের দৃষ্টিকোণে এটা মাকরূহে তাহরীমী বলে বিবেচিত হবে। ইমাম কারখী (রহ.) তো একে হারামই বলে ফেলেছেন।

مانع رجوع (ফেরত পাওয়ার প্রতিবন্ধক) ৭টি। নিম্নের সাতটি হরফে সবগুলো জমা করা হয়েছে—

شعر : موانع الرجوع فى فصل الهبة * يا صاحبى ! حروف دمع خزقة .

دال দ্বারা زيادة متصلة উদ্দেশ্য। যার কারণে হেবাকৃত বস্তুর মূল্য বেড়ে যায়। যেমন (হেবাকৃত জমিতে) চারা রোপণ করা, বাগান করা। ميم দ্বারা موت احد العاقدين উদ্দেশ্য। অর্থাৎ দাতা বা গ্রহীতার কেউ মারা যাওয়া। عين দ্বারা গ্রহীতা কর্তৃক দাতাকে عوض প্রদান করা উদ্দেশ্য। خاء দ্বারা خروج عن الملك মালিকানা থেকে হাত ছাড়া হওয়া উদ্দেশ্য। زاء দ্বারা احد الزوجين উদ্দেশ্য। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে হেবা করলে ফেরত নেয়া যাবে না। قاف দ্বারা قرابت ذى رحم এবং ها দ্বারা هلك الموهوب হেবাকৃত বস্তু ধ্বংস হওয়া উদ্দেশ্য।

ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) দলীল

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ اَنَّهُمْ قَالَ : اَلْوَاهِبُ اَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَالَمْ يَثْبُتْ مِنْهَا اَىْ لَمْ يُعَوِّضْ مِنْهَا ـ اخرجه ابن ماجة والدار قطنى ـ

"হেবাকারী ব্যক্তি হেবার বেশি হকদার। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিদান গ্রহণ না করে।"

(٢) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِىْ رَحْمٍ مَحْرَمٍ لَمْ يُرْجَعْ فِيْهَا .

"হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন—নিকটাত্মীয় কোন ব্যক্তিকে প্রদত্ত হেবা ফেরত নেয়া যাবেনা।"

পিতা কর্তৃক পুত্র থেকে হেবাকৃত মাল ফেরত নেয়া জায়িয না হওয়াটা এই হাদীস দ্বারা সুপ্রমাণিত কেননা সে ذى رحم محرم।

বিপক্ষ মাযহাবের দলীলের জওয়াব

তাঁদের দলীল ঃ كمثل الكلب يقيئ ثم يعود فى قيئه فياكله الخ হাদীসের জওয়াব হলো ঃ হাদীসে عود فى الهبة (হেবা ফেরত নেয়া) কে عود فى القئ (বমি গিলে ফেলার) সাথে তাশবীহ দেয়া হয়েছে। رجوع (ফেরত নেয়া) হারাম বোঝানোর জন্য তাশবীহ দেয়া হয়নি বরং নিকৃষ্টতা ও ইতর সুলভ স্বভাবের সাথে তাশবীহ দেয়া হয়েছে। কেননা কুকুর غيرمكلف (শরীয়তের হুকুমের আওতা বহির্ভূত) প্রাণী।

বমি গিলে ফেলা মানে হারাম হওয়া নয়। যদি হারাম হতো তাহলে রাসূল (সা.) মানুষ কর্তৃক বমি গিলে ফেলার সাথে তাশবীহ দিতেন কুকুরের সাথে না।

সারকথা হলো, এরূপ করা ঘৃণ্য স্বভাবের পরিচয় বহন করে নিশ্চয়। আমরা আহনাফগণও একথা অকপটে স্বীকার করি।

তাদের দ্বিতীয় দলীলের জবাব হলো

এখানে استثناء টা متصل নয়, বরং শুধু একথা বলা হয়েছে—

পিতা প্রয়োজনের সময় সন্তানের মাল ভোগ করতে পারে। রাসূল (সা.) বলেন— انت ومالك لابيك "তুমি এবং তোমার সম্পদ সবই তো তোমার পিতার।"

باب كراهية تفضيل بعض الاولاد فى الهبة

অধ্যায় ঃ হেবার ক্ষেত্রে এক ছেলেকে অন্য ছেলের ওপর প্রাধান্য দেয়া

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّهُ قَالَ : اِنَّ اَبَاهُ اَتٰى بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اِنِّى نَحَلْتُ اِبْنِىْ هٰذَا غُلَامًا كَانَ لِى فَقَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكُلَّ وَلَدٍ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هٰذَا ؟ فَقَالَ لَا : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْجِعْهُ :

ঘটনার বিবরণ ঃ নো'মান ইবনে বাশীরের মা আমরাহ্ বিনতে রাওয়াহা নো'মানের জন্মের পর স্বামী বাশীরকে বললেন—নো'মানকে হাদিয়া স্বরূপ কিছু প্রদান করুন অন্যথায় আমি তাকে প্রতিপালন করতে পারব না। নো'মানের পিতা দুই বছর টাল-বাহানা করে কাটালেন। এরপর একটি গোলাম আযাদ করার ইচ্ছা করেন।

কিন্তু তাঁর স্ত্রী বললেন, রাসূল (সা.)-কে সাক্ষী না বানালে এটা গ্রহণযোগ্য হবে না, তাঁকে সাক্ষী বানান। স্ত্রীর কথা মত তিনি ছেলেকে নিয়ে হুযূর (সা.)-এর দরবারে হাজির হলেন। হুযূর (সা.) বললেন—তোমার আরো সন্তান আছে কিনা? উত্তরে তিনি বললেন—হ্যাঁ, আরো সন্তান সন্তুতি আছে। হুযূর (সা.) বললেন—অন্যদেরকেও এরূপ দিয়েছ কিনা? তিনি বললেন না। হুযূর (সা.) বললেন—তুমি কি চাও না যে, তোমার সব ছেলেরা তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করুক? তিনি বললেন—কেন নয়? অবশ্যই এই কামনা করব আমি।

রাসূল (সা.) বললেন—আল্লাহকে ভয় কর এবং সন্তানদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা কর।

এক রেওয়ায়াতে আছে—হুযূর (সা.) বললেন—"ফিরিয়ে নাও"। অন্য রেওয়ায়াতে আছে হুযূর (সা.) বললেন—আমাকে সাক্ষী বানিও না। আমি অন্যায়ের ব্যাপারে সাক্ষী হতে পারিনা। অন্যকে সাক্ষী বানাও।

অধিকাংশ রেওয়ায়াতে গোলাম দান করার কথা থাকলেও ইবনে হিব্বান এবং তাবারানির রেওয়ায়াতে বাগান দানের কথা বলা হয়েছে।

ইবনে হিব্বান (রহ.) একে একাধিক ঘটনা বলে মত দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই মত ঠিক নয়। কেননা বাশীর ইবনে সা'দের (রা.) পক্ষে এটা অসম্ভব যে, হুযূর (সা.) একবার না করার পর ভুলে গিয়ে আবার হাদিয়া দেয়ার মাসআলা নিয়ে হুযূর (সা.) এর দরবারে আগমণ করবেন। এ ধরনের কল্পনা তাঁর মত ব্যক্তিত্বের সাথে বেমানান।

হযরত ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) এ ব্যাপারে অনেকগুলো জবাব বর্ণনা করেছেন। পরিশেষে তাঁর তরফ থেকে একটি জবাব প্রদান করেছেন। সব কটি জবাবের মধ্যে এটাই উত্তম। জবাবটি হলো— হযরত আমরাহ্ (রা.) যখন ছেলেকে কিছু না দিলে তাকে প্রতিপালন করতে অস্বীকৃত জানালেন তখন বাশীর

(রা.) স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে একটি বাগান হেবা করলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি বাগানটি ফেরত নেন কেননা এটি তখন পর্যন্ত কারো অধীনে ছিলনা।

এতদ্দর্শনে আমরাহ আবার পিড়াপীড়ি শুরু করে দিলেন। এক-দুই বছর এভাবে কাটানোর পর হযরত বাশীর বাগানের স্থলে একটি গোলাম দান করার ইচ্ছা করেন। আমরাহ (রা.) এটা মেনে নিলেও আবার ফিরিয়ে নেয়ার আশংকায় শঙ্কিত হয়ে বললেন—হুযূর (সা.)-কে সাক্ষী বানিয়ে হেব করুন। স্ত্রীর কথা মত হযরত বাশীর (রা.) হুযূর পাক (সা.)-এর দরবারে আগমন করেন। সুতরাং হুযূর (সা.)-কে সাক্ষী বানানোর ঘটনা একবারই ঘটেছে।

হেবার ক্ষেত্রে সন্তানদের মধ্যে কমবেশি করার বিধান

ائمة اربعة-এর সর্বসম্মত অভিমত হলো, যদি দ্বীনের স্বার্থে কাউকে অন্যের ওপর প্রাধান্য দেয়া হয় তাহলে এটা জায়িয। যেমন সন্তানদের কেউ অভাবী বা মা'যূর। অথবা বিকলাঙ্গ বা অন্ধ। অথবা একজন দ্বীনি ইলমে মশগুল, তাকে অতিরিক্ত কিছু দেয়া। এমনিভাবে যদি পিতা কোন ছেলেকে বদআমলে লিপ্ত দেখে এবং তার মৃত্যুর পর ধনসম্পদ অবৈধ কাজে ব্যয় হবার আশংকা করে অপর দিকে অন্য ছেলেকে দ্বীনদার সৎ মনে করে তাহলে দ্বীনদার ছেলেকে সম্পূর্ণ অংশ দিয়ে দেয়াও সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয হবে।

ইখতিলাফ ঐ ক্ষেত্রে যেখানে শরয়ী কোন কারণ ছাড়া একজনকে অপরজনের ওপর প্রাধান্য দেয়া হয়।

১। ইমাম তাউস, আতা ইবনে আবী রাবাহ, মুজাহিদ, ইবনে জুরাইজ, ইমাম নখয়ী, ইমাম শা'বী, ইমাম ইবনে শুবরুমা, ইমাম আহমদ, ইসহাক এবং আহলে জাহেরের মতে, এরূপ করা হারাম। এভাবে দেয়া হলে অতিরিক্ত অংশের মালিক হবেনা সে। বরং পিতার মৃত্যুর পর সবাই সমান অংশ লাভ করবে।

২। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) মালিক (রহ.) শাফেঈ এবং মুহাম্মাদ (রহ.) সাওরী, লাইস ইবনে সা'দ, কাসিম ইবনে আব্দুর রহমান, শুরাই,জাবির ইবনে যায়েদ প্রমুখের মতে এরূপ করা জায়িয তবে মাকরূহ এবং সে এই অংশের মালিক হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফের (রহ.) মতে যদি অন্যকে ক্ষতি করার ইচ্ছায় এরূপ না করা হয় তাহলে জায়িয তবে মাকরূহ। আর ক্ষতি করার ইচ্ছায় এরূপ করা হলে তা নাজায়িয।

দলীলসমূহ

প্রথম মতের অনুসারীগণ হযরত বাশীর (রা.)-এর হাদীস দ্বারা দীলল পেশ করেন। এতে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন—فَارْجِعْهُ ، اِنِّيْ لَاۤ اَشْهَدُ عَلٰى جُوْرٍ

অন্য রেওয়ায়াতে আছে— اعدلوا بين اولادكم

অত্র হাদীসে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় ঃ (ক) رجوع (দান) করা বস্তুকে ফিরিয়ে নিতে বলা হয়েছে। (খ) একে অন্যের ওপর প্রাধান্য দেয়াকে জুলুম বলা হয়েছে। (গ) সবার মধ্যে ইনসাফ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এসব বিষয়গুলো বিবেচনা করলে দেখা যায়—সবার মধ্যে সমান হারে বণ্টন করা ওয়াজিব।

দ্বিতীয় মতের অনুসারীদের দলীল

(১) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) হযরত ওমর (রা.) এবং হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফের (রা.) আমল।

কেননা হযরত আবূ বকর (রা.) আয়িশা (রা.)-কে ওমর (রা.) আসেমকে এবং আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) উম্মে কুলসুমের সন্তানাদিকে অতিরিক্ত কিছু অংশ প্রদান করেছিলেন। কেউ এই তিন হযরতের আমলের বিরোধিতা করেননি সুতরাং বোঝা গেল এ ব্যাপারে সাহাবাগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

২। তাঁরা নো'মান ইবনে বাশীরের এই ঘটনাকে নাজায়িয মনে করেন না। অন্যথায় তাঁরা এর খেলাফ করতেন না।

৩। সর্বসম্মতিক্রমে অন্যকে সমস্ত সম্পদ দান করা জায়িয যার ফলে সকল সন্তানকে বঞ্চিত করা হয়।

সকল সন্তানকে বঞ্চিত করা যদি জায়িয হয় তাহলে দু'একজনকেও বঞ্চিত করা জায়িয হবে।

বিপক্ষ মাযহাবের দলীলের জওয়াব

নো'মান ইবনে বাশীরের (রা.) হাদীসের জওয়াব হলো রাসূল (সা.) হারাম হওয়ার কারণে অপছন্দ করেননি বরং মাকরূহ হওয়ার কারণে অপছন্দ করেছেন। এমনিভাবে اعدلوا (ইনসাফের নির্দেশও) মুস্তাহাবের জন্য। ওয়াজিবের জন্য নয়।

কেননা অন্য রেওয়ায়াতে আছে— فليس يصلح هذا وانى لا اشهد
اِلاَّعَلٰى حَقٍّ وَفِىْ رِوَايَةٍ فَاشْهَدْ عَلٰى هٰذَا غَيْرِىْ অন্যকে সাক্ষী বানাও।
"অন্যকে সাক্ষী বানাও" কথাটি জায়িয হওয়ার দলীল।

এমনিভাবে ليس يصلح মাকরূহ হওয়ার ওপর দালালত করে। হারাম হলে রাসূল (সা.) অন্যকে হারাম কাজে পতিত হওয়ার নির্দেশ দিতেন না।

ব্যাপারটি ঠিক এমন যেমন ঋণগ্রস্থ মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে রাসূল (সা.) বলেছেন— صلوا على صاحبكم তার এই কাজটা অনুচিত হওয়ার কারণে রাসূল (সা.) অন্যদেরকে জানাযার নামায পড়তে বলেছেন। ঠিক তদ্রূপ বাশীরের ঘটনায় রাসূল (সা.)-এর অপছন্দের কারণ হলো–তাঁর স্ত্রী ছিলো দুই জন। এতে করে অন্যের ওপর জুলুম হওয়ার আশংকা ছিল বিধায় রাসূল (সা.) এতটুকু কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। অন্যথায় ايسرك ان يكونوا اليك فى البرسواء বলে যে ইল্লত (علت) বর্ণনা করেছেন এটা মূলত ঃ কল্যাণকামিতার জন্য করেছেন যার বিপরীত করায় অকল্যাণ আবশ্যক হয়ে পড়ে। অবশ্য انى لااشهدعلى جور বলে যে জুলুমের কথা বলেছেন এর দ্বারা হুরমত সাবেত হয়না। কেননা ন্যায় ও ইনসাফের পথ পরিহার করাকে جور বলা হয়। আর ইনসাফ বহির্ভুত সকল কাজকেই جور জুলুম বলা হয়। চাই হারাম হোক বা মাকরূহ।

هُوَ الْمَيْلُ عَنِ الْاِ شْتِوَاءِ وَالْاِ عْتِدَالِ وَكُلُّ مَا خَرَجَ عَنِ الْاِعْتِدَالِ فَهُوَ جُوْرٌ سَوَاءٌ كَانَ حَرَامًا اَوْ مَكْرُوْهًا ـ

باب العمرى

অধ্যায় ঃ عمرى সম্পর্কে

عمرى শব্দটি اعمار-এর মাসদার। সারা জীবনের জন্য ঘর বাড়ি কাউকে ব্যবহার করতে দেয়াকে عمرى বলে। جَعْلُ الدَّارِ وَنَحْوِهَا لِشَخْصٍ مَدَّةً عُمُرِهٰذَا الشَّخْصِ Donation for life। যেমন কাউকে একটি বাড়ি ...

করে একথা বলা هذه الدار لك عمرى দানকারীকে معمر এবং যাকে দান করা হয় তাকে معمر له বলে। عمرى-এর তিন পদ্ধতি।

১। معمر একথা বলবে اَعْمَرْتُكَ هٰذِهِ الدَّارَ فَاِذَامُتَّ فَهِىَ لِوَرَثَتِكَ وَلِعَقَبِكَ আমি তোমাকে এই বাড়ি সারা জীবনের জন্য দান করলাম। তুমি মারা গেলে তোমার ওয়ারিশগণ এর মালিক হবে।

২। একথা বলা جَعَلْتُهَا لَكَ عُمْرَكَ فَاِذَا مُتَّ عَادَتْ اِلَىَّ اَوْ اِلٰى وَرَثَتِى اِنْ مُتَّ ـ "সারা জীবনের জন্য আমি তোমাকে এই বাড়িটি দান করলাম। তুমি মারা গেলে পুনরায় আমি মালিক হবো আর আমি মারা গেলে আমার ওয়ারিশগণ মালিক হবে।

৩। কোনরূপ শর্ত ছাড়া একথা বলা اَعْمَرْتُكَ هٰذِهِ الدَّارَ

এর হুকুম সম্পর্কে মাযহাব সমূহ

১। ইমাম মালেকের (রহ.) মতে উল্লেখিত তিন পদ্ধতিই تمليك المنافع। তথা ধার হিসেবে গণ্য হবে হেবা হবে না। সুতরাং معمر له মারা গেলে معمر-এর কাছে এবং معمر না থাকলে তার ওয়ারিশদের কাছে ফিরে যাবে। অবশ্য ইমাম মালেক (রহ.) বলেন প্রথম পদ্ধতিতে যেখানে فاذامت فهى لورثتك বলা হয়েছে সেখানে معمر له মারা যাওয়ার পর তার ওয়ারিশরা এই ঘর দ্বারা উপকৃত হতে পারবে তথা منافع-এর মালিক হবে। ওয়ারিশ মারা গেলে معمر অথবা (সে না থাকলে) তার ওয়ারিশদের নিকট স্থানান্তরিত হবে। মোট কথা তাঁর মতে সর্বাবস্থায় عمرى ধার হিসেবে গণ্য হবে। মূল বস্তুর মাসিক দাতাই থেকে যাবে।

২। বাকি তিন ইমামের মতে তিন পদ্ধতিতেই এটা تمليك رقبة তথা দান হিসেবে গণ্য হবে। معمر له সর্বদার জন্য এটার মালিক হয়ে যাবে। কখনও معمر (দাতার) কাছে স্থানান্তরিত হবে না। হ্যাঁ যদি عمرى -এরপর তাফসীর স্বরূপ سكنى শব্দ উল্লেখ করে একথা বলে دارى لك عمرى سكنى ماعشت তাহলে সারা জীবনের জন্য ধার হবে ملك رقبة তথা দান হবে না।

আর যেক্ষেত্রে فاذا مت عادت الى বলা হয়েছে সেখানে এই শর্তটাই বাতিল বলে গণ্য হবে। দাতার কাছে পুনরায় ফিরে আসবে না।

ইমাম মালেকের (রহ.) দলীল

তিনি হযরত জাবেরের (রা.) قول-কে দলীল হিসেবে পেশ করেন—

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : اِنَّمَا الْعَمْرٰى الَّتِي اَجَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَقُوْلَ : هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَاَمَّا اِذَا قَالَ : هِيَ لَكَ مَاعِشْتَ فَاِنَّهَا تَرْجِعُ اِلٰى اَصْحَابِهَا ـ (متفق عليه)

"রাসূল (সা.) যে عمرى-এর অনুমতি দিয়েছেন সেটা হলো—দাতা কর্তৃক একথা বলা এটা তোমার ও তোমার ওয়ারিশের জন্য। আর যখন একথা বলবে এটাকে তোমার জীবদ্দশা পর্যন্ত দেয়া হলো এক্ষেত্রে মূল মালিকের নিকট স্থানান্তরিত হবে।"

ইমামগণের দলীল

ইমামগণও হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন—

اِنَّهُ قَالَ : اَمْسِكُوْا عَلَيْكُمْ اَمْوَالَكُمْ وَلاَ تُعْمِرُوْهَا فَمَنِ اعْمَرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَلَهُ حَيَاتَهُ وَبَعْدَ مَمَاتِهِ ـ

"নিজেদের সম্পদ নিজেদের কাছে সংরক্ষণ করে রাখ عمرى করতে যেও না। যে ব্যক্তি কারো জীবদ্দশার জন্য عمرى করল সে (معمر له) জীবদ্দশায় তো মালিক হবেই মৃত্যুর পরেও মালিক থাকবে (অর্থাৎ তার ওয়ারিশরা এর মালিক হয়ে যাবে)।

মুসলিম শরীফের এক রেওয়ায়াতে আছে—

فَاِنَّهُ مَنِ اعْمَرَ فَهِيَ لِلَّذِى اَعْمَرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا لِعَقِبِهِ ـ

যার জন্য عمرى করা হলো সে জীবদ্দশায় মালিক থাকবে, আর মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশরা মালিক হবে।

وَعَنْ جَابِرٍ اَيْضًا اَنَّهُ قَالَ : اِنَّ الْعَمْرٰى مِيْرَاثٌ لِاَهْلِهَا ـ

রাসূল (সা.) বলেন— (عمرى প্রাপ্ত ব্যক্তির) ওয়ারিশরা এর মীরাছ পাবে। মুসলিম শরীফের অন্য রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে—

اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : اَلْعُمْرٰى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ -

এসব রেওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় যে, موهوب له (অনুদান প্রাপ্ত ব্যক্তি) এর মালিক হয়ে যায়।

ইমাম মালেকের (রহ.) দলীলের জওয়াব

ইমাম মালেক (রহ.) হযরত জাবের (রা.)-এর মত (قول) দ্বারা দলীল পেশ করেছেন এর জওয়াব হলো, এটা একান্তই তাঁর ব্যক্তিগত ইজতিহাদ। যার দ্বারা মারফূ' হাদীসকে খাস করা যায়না।

তাছাড়া একমাত্র আব্দুর রায্যাকই এ কথাটিকে হযরত জাবেরের (রা.) কথা বলে মনে করেন। বাকি সকল রাবী কথাটিকে হযরত্ যুহ্রীর (রহ.) মত বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং এর দ্বারা দলীল প্রদান করা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত হতে পারে? তাছাড়া এও তো হতে পারে যে, فاما اذا قَالَ هى لك ماعشت فانها ترجع الى اصحابها বাক্য দ্বারা ঐ পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে যেখানে عمرى-এর তাফসীর হিসেবে سكنى শব্দ উল্লেখ করা হয়। যেমন একথা বলল دارى لك عمرى سكنى তাহলে এক্ষেত্রে عاريت (ধারই) হবে, মালিকানা সৃষ্টি হবেনা।

সার কথা হলো ائمة ثلاثة-এর মতে عمرى-এর তিন পদ্ধতিতেই موهوب له মূল বস্তুর মালিক হবে। আর যেক্ষেত্রে سكنى শব্দ উল্লেখ্য করা হয় সেখানে عاريت তথা ধার হয়ে যাবে, মূল বস্তুর মালিক হবে না।

رقبى-এর হুকুম

رقبى বলা হয় কাউকে জমি দিয়ে একথা বলা যে, যদি আমার পূর্বে তুমি মারা যাও তাহলে ভূমি আমার কাছে পুনরায় ফিরে আসবে। আর যদি আমি তোমার আগে মারা যাই তাহলে তুমি স্থায়ীভাবে এর মালিক হবে।

اَلرُّقْبٰى : اَنْ يُعْطِىَ الرَّجُلُ اِنْسَانًا دَارًا فَاِنْ مَاتَ اَحَدُهُمَا كَانَتْ لِلْحَيِّ مِنْهُمَا،

وَمِنْهُ هٰذِهِ الدَّارُلَكَ رُقْبٰى Donation with Provision as to death of donorordonee. (معجم لغة الفقهاء ص ٢٢٥)۔

বুঝা যাচ্ছে যে, উভয়ে একে অপরের মৃত্যু কামনা করছে।

এর হুকুমের ব্যাপারেও ইখতিলাফ রয়েছে

১। ইমাম শাফেরঈ (রহ.), আহমদ (রহ.), কাজী আবূ ইউসূফ এবং জমহুর ওলামায়ে কিরামের মতে এর মত رقبى ۔ عمرى-এর মত تملك ذات তথা মূল বস্তুর মালিকানা প্রদান করে। এখানে মৃত্যুর পরে পুনরায় মালিকের কাছে হস্তান্তরিত হওয়ার যে শর্ত করা হয়েছে এই শর্তই বাতিল হয়ে যাবে এবং হেবা সহীহ্ হবে।

দলীল ঃ اِنَّهُ قَالَ اَلْعَمْرٰى جَائِزَةٌ لِاَهْلِهَا وَالرُّقْبٰى جَائِزَةٌ لِاَهْلِهَا ۔

২। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ও মুহাম্মাদের (রহ.) মতে رقبى বাতিল। তবে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী এখানে ঐ رقبى বাতিল যাকে দাতার মৃত্যুর সাথে শর্তযুক্ত করা হয়। যেমন এরূপ বলা, وَهَبْتُكَ هٰذِهِ الدَّارَ بِشَرْطِ اَنْ اَمُوْتَ قَبْلَكَ ۔

এ ধরনের হেবা অবশ্যই ফাসিদ বলে বিবেচিত হবে। কেননা এতে ক্ষতিকর বিষয়ের সাথে মালিকানার শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে।

হ্যাঁ যদি দাতার মৃত্যুর শর্ত জুড়ে না দিয়ে এরূপ বলে هذه الدار لك منجزة بشرط انك ان مت قبلى فهى راجعة الى তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে এটা এর হুকুমের মত হবে অর্থাৎ হেবা সহীহ্ হবে। তবে মালিকের নিকট পুনরায় স্থানান্তরিত (رجوع الى الواهب) হওয়ার শর্ত বাতিল হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে এই ইখতিলাফটি اختلاف لفظى (শাব্দিক মতবিরোধ)। কেননা কুফাবাসীরা ارقبتك هذه الدار বাক্যটিকে দাতার মৃত্যুর সাথে শর্তযুক্ত বলে মনে করে। এ কারণে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) একে বাতিল বলেছেন। আর হুযূর (সা.)-এর যুগে এই বাক্যটি عمرى-এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ হত। এ জন্য হুযূর

(সা.) হেবাকে সহীহ্ এবং ফিরিয়ে নেয়ার শর্তকে বাতিল বলেছেন। সুতরাং হুযূরের (সা.) যুগে رقبى-এর (যে পদ্ধতি) ছিল তাতে হেবা (দান, تمليك الذات।) হওয়ার ব্যাপারে কোন ইখতিলাফ নেই। এ ব্যাপারে হযরত আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, রাসূলের (সা.) যুগে যে رقبى ছিল সম্ভবতঃ আবূ হানীফার (রহ.) যুগে তা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। আর যে হুকুম عرف-এর ওপর নির্ভর করে عرف পরিবর্তন হলে সেই হুকুমও পরিবর্তন হয়ে যায়। —ফয়যুল বারী ঃ খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৮০

كتاب الوصية

অধ্যায় ঃ ওয়াসিয়্যাত সম্পর্কে

وصية-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ ঃ : وصى يصى وصيا معنى لغوى অর্থ, মিলিত হওয়া, মিলানো। لازم ও متعدى দু'ভাবেই ব্যবহৃত হয়।

وصية-কে وصبة হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে, কেননা জীবদ্দশায় যা ছিল তা মৃত্যুর পর মিলিত হয় তথা কার্যকর হয়--

(وَصْلُ مَا كَانَ فِىْ حَيَاتِه بِمَا بَعْدَهُ)

আর পরিভাষায় ওয়্যাসিয়্যাত বলা হয়।

هُوَ تَمْلِيْكٌ مُضَافٌ اِلٰى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ عَيْنًا اَوْمَنْفَعَةً بِطَرِيْقِ التَّبَرُّعِ :

তার মৃত্যুর পর দান হিসেবে কোন বস্তু অথবা বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়ার মালিক বানানো।" কিয়াস অনুযায়ী ওয়াসিয়্যাত সহীহ্ না হওয়ার কথা। কেননা এতে "মালিকানা হাত ছাড়া বস্তু"কে আগাম অন্যের মালিকানায় প্রদান করা হয়। অথচ মালিকানা থাকা সত্ত্বেও আগাম কোন বস্তুর মালিক বানানো যায় না। যেমন একথা বলা ملكتك هذا الشيئ فى الغد (এক্ষেত্রে আগামী কাল সে (কথিত موهوب له) এর মালিক হবে না)।

ব্যাপারটা যদি এরূপই হয় তাহলে তো যেখানে মালিকানা নেই সেখানে জায়িয না হওয়া আরো বেশি যুক্তি সঙ্গত।

তবে মানুষ যেহেতু মুহতাজ এবং স্বভাবে কৃপন ও লোভী হয়ে থাকে এজন্য জীবদ্দশায় কোন কিছু দান করতে চায়না বরং মৃত্যুর সময় এর ক্ষতিপুষিয়ে নিতে চায়। একারণে শরীয়ত দয়ার্দ্র হয়ে ওয়াসিয়্যাত করার অনুমতি প্রদান করেছে।

হাদীসের ব্যাখ্যা

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْئٌ يُرِيْدُ اَنْ يُّوْصِيَ فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ اِلاَّ وَ وَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ۔

"যে ব্যক্তির কাছে কোন কিছু বিদ্যমান আছে এবং সে এতে ওয়াসিয়্যাত করতে চায়, তাহলে তার জন্য ওয়াসিয়্যাত লিপিবদ্ধ করা ছাড়া দুই রাত অতিবাহিত করা উচিত হবে না।

قوله : ما حق امرئ مسلم এখানে قيد احترازى হিসেবে مسلم শব্দ উল্লেখ করা হয়নি (যে ওয়াসিয়্যাত শুধু মূসলমানই করতে পারবে কোন কাফির পারবেনা)।

কেননা কাফিরও ওয়াসিয়্যাত করতে পারে। হাদীসে মুসলিম শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে উদ্বুদ্ধ ও সচেতন করার জন্য যে, মুসলমানের কাছে ওয়াসিয়্যাত নামা সংরক্ষিত থাকা উচিত।

অবশ্য قيد احترازى ও হতে পারে। এক্ষেত্রে হাদীসের আলোচনা ওয়াসিয়্যাত কার্যকর হওয়া বা জায়িয হওয়া না হওয়া নিয়ে নয় বরং উদ্দেশ্য হলো ওয়াজিব বা মুস্তাহাবের নির্দেশ বুঝানো। আর কোন কাফির ওয়াজিব বা মুস্তাহাব কাজের আদেশ প্রাপ্ত হয়না।

قوله : له شئى এখানে ব্যাপক (عام) ভাবে شيئى শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। চাই তা মান-সম্পদ হোক অথবা মুনাফা।

এর দ্বারা منافع তথা মুনাফার ওয়াসিয়্যাত সহীহ্ হওয়া বুঝায়। আর এটাই জমহুরের মত। ইবনে আবী লায়লা ইবনে শুবরুমাহ এবং দাউদ জাহেরী এতে اختلاف করেছেন।

ثلاث ليال অন্য রেওয়ায়াতে لَيْلَتَيْنِ এখানে قوله : يبيت ليلتين এবং আবূ আওয়ানার রেওয়ায়াতে ليلة উল্লেখ করা হয়েছে। রেওয়ায়াতের ভিন্নতা একথা বুঝায় যে, সময় নির্ধারণ করা উদ্দেশ্য নয় বরং এ ব্যাপারে সচেতন করা উদ্দেশ্য যাতে কেউ অলসতা না করে। এক, দুই এবং অতিরিক্ত তিন দিনের অবকাশ দেয়া হলো। কেউ যেন ওয়াসিয়্যাত ছাড়া এর চেয়ে বেশি সময় না কাটায়। ইবনে ওমর (রা.) বলেন—এই হাদীস শুনে আমি ওয়াসিয়্যাত নামা ছাড়া একদিনও অতিবাহিত করিনি।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত ইবনে ওমর (রা.) সর্বদা ওয়াসিয়্যাত নামা নিজের কাছে সংরক্ষণ করতেন। অথচ অন্য আরেকটি সহীহ্ রেওয়ায়াতে আছে তাঁকে মৃত্যুর সময় ওয়াসিয়্যাত করবেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন—

اَمَّا مَالِىْ فَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا كُنْتُ اَصْنَعُ فِيْهِ وَاَمَّا رَبَاعِىْ فَلاَ اُحِبُّ اَنْ يُشَارِكَ وَلَدِىْ فِيْهَا اَحَدٌ.

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত ইবনে ওমর (রা.) শেষ জীবনে কোন ওয়াসিয়্যাত করেননি। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) এভাবে সামঞ্জস্য সাধন করেছেন যে, তিনি সর্বদা ওয়াসিয়্যাতের প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন এবং যদি লিখতেন তা কার্যকর করতেন। এভাবে কার্যকর করার ফলে ওয়াসিয়্যাতের কোন বিষয়ই অপূর্ণ থাকত না। এদিকে ইঙ্গিত করেই তিনি বলেছেন اما مالى فالله يعلم ما كنت اصنع فيه. হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, তিনি নিজের কতক বাড়ি ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন।

সার কথা হলো—জীবদ্দশায় ওয়াসিয়্যাত কার্যকর করায় শেষ জীবনে আর ওয়াসিয়্যাত করার প্রয়োজন পড়েনি।

ওয়াসিয়্যাতের হুকুম ঃ কারো কাছে যদি আমানত, গচ্ছিত সম্পদ বা ঋণ থাকে এবং এর স্বপক্ষে কোন সাক্ষী না থাকে তাহলে এক্ষেত্রে ওয়াসিয়্যাত করা ওয়াজিব যাতে কারো হক নষ্ট না হয় এবং নিজের যিম্মাদারী আদায় হয়ে যায়।

অন্যান্য ক্ষেত্রে ওয়াসিয়্যাত করা জরুরী কিনা এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়।

১। দাউদ জাহেরী, ইসহাক প্রমুখের মতে কিছু মালের ওয়াসিয়্যাত করা ওয়াজিব। দলীল ঃ বর্ণিত হাদীস।

২। কেউ বলেন কুরআনে যে সব আত্মীয়ের অংশ নির্ধারণ করা হয়নি তাদের জন্য ওয়াসিয়্যাত করা জরুরী।

দলীল ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا نِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ -

পিতা মাতা এবং কতিপয় আত্মীয়ের অংশ কুরআনে নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু যাদের অংশ নির্ধারণ করা হয়নি তাদের জন্য ওয়াসিয়্যাত করা ওয়াজিব। তাঁরা হযরত ইবনে ওমরের (রা.) হাদীস দ্বারাও দলীল পেশ করে থাকেন।

৩। জমহুর উম্মতের মতে যদি মাল রেখে যায় তাহলে কিছু অংশের জন্য ওয়াসিয়্যাত করা মুস্তাহাব। অন্যথায় কতক অবস্থায় ওয়াসিয়্যাত করা মুবাহ কখনও মাকরূহ এবং কখনও হারাম।

মোটকথা জমহুরের মতে ওয়াসিয়্যাত করা ওয়াজিব নয়। কেননা ওয়াসিয়্যাত বৈধ হয়েছে আমাদের লাভের জন্য ক্ষতির জন্য নয়। আর যা লাভের জন্য হয় সেটা মুস্তাহাব হয়।

এছাড়া এটা মৃত্যুর পরের দান। সুতরাং জীবদ্দশার দানের ওপর কিয়াস করলে এর মুস্তাহাব হওয়া বুঝে আসে।

তাঁদের দলীলের জওয়াব

তাঁরা যে আয়াত পেশ করেছেন সেটা মানসূখ হয়ে গেছে। মীরাছের আয়াত ناسخ, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন نسخها قوله تعالى : للرجال نصيب হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন— نسخها اية الميراث এমনিভাবে হাদীসে এসেছে اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعْطٰى كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ আল্লাহ সবাইকে তার হক প্রদান করেছেন। সুতরাং ওয়ারিশদের জন্য ওয়াসিয়্যাত করার প্রয়োজন নেই। কেউ কেউ আয়াতটি এই হাদীস দ্বারা মানসূখ হয়েছে বলে মনে করেন। যেহেতু হাদীসটি مشهور সেহেতু এটা ناسخ হতে পারে। مغنى ابن قدامه-এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে অধিক সংখ্যক সাহাবী থেকেই

ওয়াসিয়্যাতের কথা উল্লেখ নেই। ওয়াসিয়্যাত ওয়াজিব হলে অবশ্যই একে তরক করার কারণে তারা ভর্ৎসনার শিকার হতেন।

হযরত ইবনে ওমরের (রা.) হাদীসের জবাব হলো—এর দ্বারা মৃত্যুর স্মরণ এবং প্রস্তুতির প্রতি ইশারা করা হয়েছে। অথবা এর দ্বারা অন্যের হকের ওয়াসিয়্যাত বুঝানো হয়েছে। কেননা অন্যের হক সংরক্ষিত থাকলে সে সময় ওয়াসিয়্যাত করা ওয়াজিব। যেমন, আমানত, গচ্ছিত সম্পদ ইত্যাদি। এদিকেও খেয়াল রাখতে হবে যে, হাদীসে له شئ يريد ان يوصى বলে ওয়াসিয়্যাতকে ইচ্ছার ওপর মওকুফ রাখা হয়েছে। যা ওয়াজিব না হওয়া বুঝায়। তাছাড়া حق শব্দটি شئ ثابت তথা সুপ্রতিষ্ঠিত বস্তুর অর্থে প্রয়োগ হয়। আর শরীয়তে যার দ্বারা কোন হুকুম ছাবেত হয় তাকে حق বলে। চাই সেই হুকুম ওয়াজিব, মুস্তাহাব বা মুবাহ হোকনা কেন। মোদ্দাকথা হযরত ইবনে ওমরের হাদীস দ্বারা কোনভাবেই ওয়াসিয়্যাত ওয়াজিব হওয়া বুঝায় না।

الوصية بالثلث

حديث سعد بن وقاص : عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ (يعنى سعد بن ابى وقاص) قَالَ عَادَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حُجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَلَغَنِىْ مَا تَرٰى مِنَ الْوَجَعِ وَاَنَا ذُوْمَالٍ وَلَايَرِثُنِىْ اِلَّا اِبْنَةٌ لِىْ وَاحِدَةٌ ، اَفَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِىْ ؟ قَالَ لَا، قُلْتُ اَفَاَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهٖ ؟ قَالَ لَا، اَلثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ، اِنَّكَ اَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌمِنْ اَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ، وَلَوْ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلَّا اُجِرْتَ بِهَا، حَتّٰى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِىْ فِىْ اِمْرَاَتِكَ ، قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُخَلَّفُ بَعْدَ اَصْحَابِىْ ؟، قَالَ اِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِىْ بِهٖ وَجْهَ اللّٰهِ اِلَّا اِزْدَدْتَ بِهٖ دَرَجَةً وَرِفْعَةً ، وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتّٰى يَنْتَفِعَ بِكَ اَقْوَامٌ وَيَضُرَّ بِكَ آخَرُوْنَ،

اَللّٰهُمَّ اَمْضِ لِاَصْحَابِىْ هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ، لٰكِنَّ الْبَائِسَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ قَالَ : رَثٰى لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَنْ تُوَفِّىَ بِمَكَّةَ ـ

হযরত সা'দ (রা.) বলেন—বিদায় হজ্জে হুযূর (সা.) আমার অসুস্থতার খোঁজ খবর নিতে আসেন। এ সময় আমি প্রায় মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিলাম। অর্থাৎ জীবনের আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম।

فى حجة الوداع দ্বারা বুঝা যায় এটি বিদায় হজ্জের ঘটনা। (ইমাম যুহরীর অধিকাংশ সহচর এ ব্যাপারে একমত) কিন্তু ইবনে উয়ায়নার (রহ.) রেওয়ায়াতে একে ফত্‌হে মক্কার ঘটনা বলা হয়েছে। আল্লামা ইবনে হাজার এভাবে তাত্‌বীক দিয়েছেন যে, ঘটনাটি দুইবার সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু এই তাত্‌বীকটি যুক্তি সঙ্গত বলে মনে হয় না। কেননা সা'দ (রা.)-এর মত ব্যক্তি দুই বছর আগে ফত্‌হে মক্কায় যে প্রশ্ন করেছিলেন দুই বছর পর বিদায় হজ্জে আবার সেই প্রশ্ন করবেন এরূপ ধারণা করা তাঁর শানের খেলাফ বলে মনে হয়। সুতরাং বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা এটাই, যা অধিকাংশ আলিম মেনে নিয়েছেন তথা এটি বিদায় হজ্জেরই ঘটনা তবে ইবনে উয়ায়না রেওয়ায়াতের ক্ষেত্রে ভুল করে একে মক্কা বিজয়ের (সময়কার) ঘটনা বলেছেন।

قوله : من وجع : وجع শব্দটি باب ضرب-এর মাস্‌দার। অর্থ অসুস্থ হওয়া, রোগাক্রান্ত হওয়া। আরবগণ সব ধরনের রোগের ক্ষেত্রে وجع শব্দ প্রয়োগ করে।

হযরত সা'দ (রা.) কখন এই রোগ (যখমী) এর শিকার হন এতে ইখতিলাফ রয়েছে।

১। হিজরতের আট মাস পর প্রথম হিজরী সনের শাওয়াল মাসে হুযূর (সা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে ৬০ জন মতান্তরে ৮০ জন মুহাজিরের নেতৃত্ব দিয়ে রাবেগ এলাকায় প্রেরণ করেন।

সেখানে কুরাঈশদের ২০০ লোক অবস্থান করছিল। তবে এদের সাথে যুদ্ধ বাধেনি। শুধু মাত্র সা'দ (রা.) একটি তীর নিক্ষেপ করেন যা ইসলামের প্রথম তীর চালনা ছিল। এদিকে কাফিররাও একটি তীর নিক্ষেপ করে যা হযরত সা'দের (রা.) বুকে এসে বিদ্ধ হয়। হাদীসে وجع اشفيت منه على الموت

বলতে এই যখমের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

২। হিজরতের ৯ মাস পর ১ম হিজরী সনের যিলকাদ মাসে হুযূর (সা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে পদাতিক বিশজন মুহাজির সাহাবীর নেতৃত্ব দিয়ে খায়বর এলাকায় প্রেরণ করেন। (খায়বর জুহফার নিকটবর্তী একটি উপত্যকার নাম)। এসব লোকজন রাতে পথ চলতেন আর দিনে আত্মগোপন করে থাকতেন। খায়বর পৌছে জানা গেল যে, কুরাইশরা সেখান থেকে চলে গিয়েছে। ফলে বাধ্য হয়ে তাঁরা মদীনায় ফিরে আসেন। কেউ কেউ বলেন–এখানে হযরত সা'দ (রা.) একটি তীর দ্বারা যখমী হোন। হাদীসে এই যখমীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তবে এই মত তেমন বিশুদ্ধ নয়।

৩। কেউ বলেন ওহুদে আর কেউ বলেন খন্দক যুদ্ধে তিনি তীর দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হন। বিদায় হজ্জে এই যখমীর ব্যথাই পুনরায় অনুভব করেন তিনি।

قوله : فقلت يا رسول الله بلغنى ما ترى من الوجع একথা বলে তিনি নিজের কষ্টের কথা বর্ণনা করেছেন, অভিযোগ করেননি। আর ভাল কোন উদ্দেশ্যে যেমন চিকিৎসা, নেককার লোকের দু'আ, ওয়াসিয়্যাত, অবস্থা জানা–ইত্যাদি কারণে রোগী তার রোগের কথা উল্লেখ করতে পারবে এবং এটা সবরের বিপরীত নয়। হ্যাঁ, রোগের শেকায়েত করা, আল্লাহর ফয়সালার ওপর রাজি না থাকা নিন্দনীয় এবং হারাম।

قوله : ولا يرثنى الا ابنة لى واحدة মেয়েটি হযরত সা'দের (রা.) আসাবা ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি বলেছেন, আমার এক কন্যা আছে মাত্র কোন ওয়ারিশ নেই।

এর ব্যাখ্যায় বলা হয় যে, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একথা বুঝানো যে, আমার সন্তান এবং খাস ওয়ারিশদের মধ্যে একটি মাত্র মেয়ে আছে। অন্য কেউ নেই। অথবা এও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, ذوى الفروض-এর মধ্যে একটি মেয়ে আছে শুধু অন্য কোন اصحاب فرائض নেই। কোন ذوى الفروض নেই একথা বলা উদ্দেশ্য না। আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন মেয়েটির নাম ছিল আয়িশা তিনি সাহাবীয়া ছিলেন।

ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন—তাঁর নাম ছিল উম্মে হাকাম কুব্‌রা (রা.)। অবশ্য হুযূর (সা.)-এর ইন্তিকালের পর তিনি আরো বিয়ে করেন এবং আরো কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

قوله : افاتصدق بثلثى مالى قال لا ، قلت افاتصدق بشطره قال لا الثلث والثلث كثير .

১। এক রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে—হুযূর (সা.) জিজ্ঞেস করলেন কী পরিমাণ মাল ওয়াসিয়্যাত করতে চাও? আমি বললাম সমস্ত মাল। কিন্তু তিনি নিষেধ করায় দুই তৃতীয়াংশ, অর্ধেক এবং এক তৃতীয়াংশ পরিমান ওয়াসিয়্যাত করার ইচ্ছা করি।

হুযূর (সা.) বললেন, الثلث والثلث كثير "একতৃতীয়াংশ কর এই অনেক।"

الثلث শব্দটি منصوب হয়েছে اغراء (উদ্বুদ্ধ করণার্থে) অথবা منصوب হয়েছে اعط ফে'লের মাফউল হওয়ার কারণে। অর্থাৎ اعط الثلث

অথবা শব্দটি فاعل হওয়ার কারণে مرفوع হবে। ইবারত এরূপ يكفيك الثلث

অথবা مبتدا হবে, খবর উহ্য, যথা الثلث كاف অথবা এটা خبر এবং مبتدا উহ্য। যথা ঃ الكافى الثلث আর দ্বিতীয় الثلث মুবতাদা হওয়ার কারণে كثير মারফূ' এর খবর (خبر)। অন্য রেওয়ায়াতে كبير শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। উভয়ের উদ্দেশ্য এক।

২। الثلث كثير হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, লোকজন যদি একতৃতীয়াংশের বদলায় একচতুর্থাংশ ওয়াসিয়্যাত করত, তাহলে ভাল হত। কেননা রাসূল (সা.) বলেছেন—এক তৃতীয়াংশের ওয়াসিয়্যাত করতে পার তবে এটাও (ثلث) অনেক। এজন্য আহনাফের মতে ওয়ারিশ ধনী হলে ثلث-এর ওয়াসিয়্যাত না করে এর চেয়ে কিছু কম করা উচিত। আর ওয়ারিশ গরীব হলে মোটেই ওয়াসিয়্যাত করবে না।

৩। সর্বোচ্চ একতৃতীয়াংশে ওয়াসিয়্যাত করা জায়িয এর চেয়ে বেশি করা সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়িয। হ্যাঁ যদি ওয়ারিশরা এরচেয়ে বেশি ওয়াসিয়্যাত করার অনুমতি প্রদান করে এবং তাদের মধ্যে কেউ পাগল বা নাবালেগ না হয় তাহলে এটা জায়িয হবে।

এসব বিধান ঐ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে ওয়াসিয়্যাতকারীর ওয়ারিশ বিদ্যমান থাকে। যদি عصبة، ذوى الارحام، ذوى الفروض কোন প্রকার ওয়ারিশ না থাকে তাহলে একতৃতীয়াংশের বেশি ওয়াসিয়্যাত করা যাবে। পরিমাণ যতই হোক না কেন কোন সমস্যা নেই। হানাফী মাযহাবের এটিই পছন্দনীয় মত। শাফেঈ ও মালেকের মতে ثلث-এর বেশি ওয়াসিয়্যাত করলে তা কার্যকর হবেনা বরং ثلث-এর বেশি বাইতুল মালে জমা হবে।

قوله : انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة ـ

১। হযরত স'াদের (রা.) ধারণা ছিল সদকা করলে সওয়াব পাওয়া যাবে, কিন্তু ওয়ারিশরা পেলে কোন সওয়াব পাওয়া যাবে না। তাঁর এই অমূলক ধারণা দূর করতে হুযূর (সা.) বললেন—নিজের সন্তানদিগকে পরনির্ভর করে রেখে যাওয়ার চেয়ে তাদের মালদার রেখে যাওয়া উত্তম। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের ছেলেমেয়েদের পিছনে খরচ করলেও সওয়াব মিলবে। এমনকি স্ত্রীর মুখে খাবারের লোকমা তুলে দিলে এর কারণে সওয়াব পাওয়া যায়।

স্ত্রীর ভরণ-পোষণ আমার ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াজিব এই নিয়ত করে যখন খরচ করবে তখন অবশ্যই সে সওয়াবের ভাগী হবে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, যে কাজ মৌলিকভাবে ইবাদত নয় নিয়ত করার দ্বারা সেটাও ইবাদতে পরিণত হয়।

قوله : انك ان تذر ورثتك اغنياء خيرمن ان تذ رهم عالة ।২

ان দুই ভাবে পড়া যায়। ১। মাস্‌দারের তাবীল হয়ে মুবতাদা, خبر এটার خير

২। ان بسكو نالهمزة ان و تذر شرط এবং خير-এর جزاء এভাবে যে, خير মূলতঃ فهو خير ছিল। شرطية-এর মধ্যে فاء থাকতে হয়। নাহু এবং রেওয়ায়াত উভয় দিক দিয়ে এই দুই প্রকার পাঠ সহীহ্।

قوله : قلت يارسول الله اخلف بعد اصحابى আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা.)! সাথীবর্গ থেকে আমাকে পিছু ফেলা হচ্ছে। فعل مجهول ـ اخلف অন্য রেওয়ায়াতে اخلف عن هجرتى এবং অন্য আরেক রেওয়ায়াতে خشيت ان اموت بالارض التى هاجرت منها বাক্য এসেছে।

উদ্দেশ্য হলো ঃ হযরত সা'দ (রা.) আশংকা করছিলেন হুযূর (সা.) এবং সাহাবাগণ চলে যাওয়ার পর অসুস্থতার দরুন তিনি সেখানেই মারা যান কিনা? একথা তিনি এজন্য বলেছিলেন যে, বিদায় হজ্জে রাসূল (সা.) এর ফরমান ছিল طواف صدر করার পর মুহাজিরগণ সর্বোচ্চ তিনদিন মক্কায় অবস্থান করতে পারবেন। হযরত সা'দের (রা.) ভয় ছিল যদি তিনি মক্কায় মারা যান তাহলে তাঁর হিজরত ত্রুটি পূর্ণ হয়ে যাবে। হুযূর (সা.) সান্ত্বনা প্রদান করে বললেন—তোমার দীর্ঘ হায়াত হবে এবং তুমি আরো অনেক নেক আমল করতে পারবে।

قوله : ولعلك تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك أخرون .

"অর্থাৎ তোমার হায়াত দীর্ঘ হবে, তোমার দ্বারা অনেকে উপকৃত হবে এবং অনেকে **ক্ষতিগ্রস্থ** হবে। لعلك تخلف বলে এর পরেও তিনি বেঁচে থাকবেন–একথার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। لَعَلَّ শব্দটি যদিও ترجى-এর জন্য ব্যবহৃত হয় কিন্তু আল্লাহর কালামে এটা "সর্বদা" এবং রাসূলের (সা.) কালামে "প্রায়ই" বাস্তব সংবাদ প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়।

বাস্তবে এরূপই হয়েছিল। হুযূর (সা.) এর পর তিনি চল্লিশ বছরের বেশি, প্রায় পঞ্চাশ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর ইন্তিকাল হয়েছিল পঞ্চান্ন হিজরীতে। আর কেউ বলেছেন আটান্ন হিজরীতে। এটাই প্রসিদ্ধ মত। এতে বুঝা যায় যে, তিনি বিদায় হজ্জের পর পঁয়তাল্লিশ অথবা আটচল্লিশ বছর জীবিত ছিলেন। ফতহুল বারী (খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৭৪) তাঁর দ্বারা মুসলমানের বহু উপকার সাধিত হয়। তাঁর নেতৃত্বে ইরাক ও পারস্য বিজয় হয়। তাঁর হাতেই ঐতিহাসিক কাদেসিয়া বিজয় হয় এবং কাফিররা চরম ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

যেমনটি হুযূর (সা.) বলেছিলেন— حتى ينتفع بك اقوام ويضربك أخرون

মনে রাখতে হবে যে, হাদীস তাঁর জীবদ্দশায় অন্যের লাভ-ক্ষতি উদ্দেশ্য। মৃত্যুর পর তাঁর কোন সন্তান সন্ততি দ্বারা অন্যের লাভ-ক্ষতি বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং তাঁর ছেলে ওমর কর্তৃক হযরত হোসাইন ইবনে আলী এবং তাঁর সাথীবর্গ শাহাদত বরণ করা হাদীসে উদ্দেশ্য নয়। এরূপ উদ্দেশ্য হলে তো নিজের দায় ভার পিতার ঘাড়ে চাপানো হয়। যা হাদীসের উদ্দেশ্য হতে পারে না।

اللهم امض لاصحابى هجرتهم ولاتردهم على اعقابهم . لكن البائس سعد بن خولة قال رثى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان توفى بمكة .

হুযূর (সা.) দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! আমার সাহাবাদের হিজরত পুরো করে দাও। তাঁদের হিজরতের সওয়াব কমিয়ে দিও না। তাঁদেরকে পিছে ঠেলে দিও না। কিন্তু আফসোস ও দুঃখ সা'দ বিন খাওলার জন্য। রাবী বলেন হুযূর (সা.) তাঁর জন্য দয়া প্রকাশ করেছেন, কেননা তিনি মক্কায় ইন্তিকাল করেন।

البائس। বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যার মধ্যে দারিদ্রতা ও নিঃস্বতা প্রকাশ পায়। হুযূর (সা.) আফসোস প্রকাশের জন্য একথা বলেছেন, প্রকৃত দারিদ্রতা ও নিঃস্বতা বুঝানো হয়নি। সা'দ বিন খাওলার ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে। কেউ বলেছেন—তিনি মক্কা থেকে হিজরতই করেননি, কেউ বলেছেন হিজরত করেছিলেন বটে। তবে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার পর নিজে নিজে মক্কায় চলে যান এবং সেখানেই তাঁর ইন্তিকাল হয়। যেহেতু তিনি নিজের ইচ্ছামত মক্কায় চলে যান এবং সেখানে ইন্তিকাল করেন এজন্য তাঁর হিজরত বাতিল হয়ে যায়। এ কারণে রাসূল (সা.) তাঁর ব্যাপারে আফসোস প্রকাশ করেছেন।

অনেকে বলেন—বিদায় হজ্জে তিনি ইন্তিকাল করেন। এই মৃত্যুটা ছিল অনিচ্ছাকৃত। কেননা মদীনা থেকে ফরয হজ্জ আদায় করার জন্য তিনি মক্কায় আগমন করেছিলেন। এতদসত্ত্বেও হিজরতের জায়গায় যেহেতু ইন্তিকাল হয়নি এজন্য রাসূল (সা.) তাঁর জন্য আফসোস প্রকাশ করেছেন।

কতিপয় আলিম এই ঘটনা দ্বারা দলীল পেশ করে বলেন যে, মুহাজির যদি তার হিজরতের জায়গায় ইন্তিকাল না করে তাহলে তার হিজরতের সওয়াব বাতিল হয়ে যায়। যদিও অন্য জায়গায় যাওয়াটা অনিচ্ছাকৃত হোক না কেন। তবে এই মত সহীহ্ নয়। কেননা ইখতিয়ার বহির্ভূত কোন কাজের জন্য সওয়াব বাতিল হয়ে যাওয়া শরীয়তের উসূলের খেলাপ। বাকি হুযূরের (সা.) আফসোস প্রকাশের কারণ ভিন্ন। হযরত সা'দ বিন খাওলার মদীনায় ইন্তিকাল করার যে বাসনা ছিল তা পূরণ না হওয়ায় হুযূর (সা.) আফসোস প্রকাশ করেছেন। সওয়াব কমে যাওয়ার কারণে আফসোস প্রকাশ করেননি।

باب وصول ثواب الصدقات الى الميت

অধ্যায় ঃ মৃত ব্যক্তির দানের সওয়াব লাভ প্রসঙ্গে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يُوْصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ نَعَمْ ـ

"এক ব্যক্তি হুযূর (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন—আমার পিতা সম্পদ রেখে মারা গেছেন কিন্তু কোন ওয়াসিয়্যাত করে যাননি। আমি যদি তার জন্য সদকা করি তাহলে তার গুনাহ মাফ হবে কী? উত্তরে হুযূর (সা.) বললেন—হ্যাঁ।

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اِنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنَّ اُمِّيْ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَاِنِّي اَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَلِيَ اَجْرٌ اِنْ اَتَصَدَّقْ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ -

এক ব্যক্তি হুযূর (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমার মা হঠাৎ করে ইন্তিকাল করেছেন। আমার ধারণা যদি তিনি কথা বলার সুযোগ পেতেন তাহলে সদকা করতেন। এ অবস্থায় আমি কি তার পক্ষ থেকে সদকা করতে পারব? হুযূর (সা.) বললেন— হ্যাঁ, পারবে।

ঈসালে সওয়াবের মাসআলা

১। মানুষ নিজের আমলের সওয়াব অন্যের আমল নামায় পৌঁছাতে পারবে কিনা এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়।

মু'তাযিলাদের মতে কোন প্রকার ইবাদতের সওয়াব পৌঁছবে না। চাই ইবাদতে মালী হোক বা বদনী। আল্লাহ তা'আলা বলেন— لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى মানুষ একমাত্র তার নিজের সওয়াব ও প্রচেষ্টা দ্বারা লাভবান হবে। সুতরাং অন্যের সওয়াব নিজের আমল নামায় পৌছবে না।

২। জমহুর আলিমের মতে মৃত ব্যক্তি সব ধরনের সওয়াবের ভাগী হবে। তবে ইমাম শাফেঈ ও মালেক (রহ.) মত ইবাদতে বদনীকে এ থেকে استثناء করেছেন। এই অধ্যায়ের হাদীস ছাড়া আরো বহু হাদীস জমহুরের দলীল। যেমন (১) আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার জন্য দু'আ করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন—

١. وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا -

٢. عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ اَنَّ اُمَّهُ مَاتَتْ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ -

৩. اِنَّهُ قَالَ اِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْبِرِّ اَنْ تُصَلِّىَ لِوَالِدَيْكَ مَعَ صَلَاتِكَ وَاَنْ تَصُوْمَ لَهُمَا مَعَ صِيَامِكَ ـ

"নেক কাজের মধ্যে এটাও একটি যে, তোমার নিজের নামাযের সাথে বাপ মায়ের জন্যও নামায আদায় করবে, নিজের রোযার সাথে তাদের জন্যও রোযা রাখবে।" এই হাদীস ইমাম শাফেঈ ও মালেকের মতের বিপক্ষে দলীল।

৪. وَفِى الصَّحِيْحَيْنِ اَنَّهُ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ اَحَدُهُمَا عَنْ نَفْسِهِ وَالْاٰخَرُ عَنْ اُمَّتِهِ "রাসূল (সা.) দুটি মেষ কোরবানী করেন। একটি নিজের পক্ষ থেকে অপরটি উম্মতের পক্ষ থেকে।"

৫. قَالَ تَعَالٰى : وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا اَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ـ

৬। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে ইস্তেগফার পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন।
৭। হুযূর (সা.) মুমিনদের জন্য দু'আ করেছেন।
৮। মুমিনদের জন্য ফেরেস্তারা দু'আ করেন।
এসব কিছু জমহুরের স্বপক্ষের দলীল।

মু'তাযিলাদের দলীলের জওয়াব

لَيْسَ عَلَى لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى-এর জবাব। (১) হাদীসে মশহুর দ্বারা এই আয়াতটি مقيد (শর্তযুক্ত)।

২। আয়াতটি ঈসালে সওয়াবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

৩। আল্লামা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) বলেন, এখানে سعى দ্বারা আমলী سعى উদ্দেশ্য নয় বরং سعى ايمانى উদ্দেশ্য। অর্থাৎ একজনের ঈমান অন্যের কোন কাজে আসবেনা। (আমলও কাজে আসবেনা একথা বলা হয়নি)।

৪। সবচেয়ে উত্তম জওয়াব হলো ঃ আয়াতে এ কথা বলা হয়েছে যে, মানুষ শুধু তার নিজের আমলের হকদার। অন্যের আমলে তার কোন হক নেই। তবে কেউ যদি দয়া পরবশ হয়ে অন্যের জন্য সওয়াব হেবা করে তাহলে সে এই সওয়াব পাবে। এভাবে মানুষের উপকৃত হওয়াকে আয়াতে রদ করা হয়নি।

কেননা আয়াতে ليس للانسان الا ماسعى বলা হয়েছে لاينتفع الا بما سعى বলা হয়নি।

ঈসালে সওয়াবকারী নিজে সওয়াব পাবে কিনা?

অন্যের জন্য ঈসালে সওয়াব কারী ব্যক্তিও সওয়াব লাভ করবে। যেমন কেউ ঈসালে সওয়াবের জন্য কুরআন শরীফ পড়ল। একে পড়া এবং ايصال ثواب দু'টোর সওয়াব লাভ করবে।

ফতওয়ায়ে শামীতে উল্লেখ করা হয়েছে—উত্তম সেই ব্যক্তি যে, নফল ইবাদতে সমস্ত মুমিন-মুমিনার জন্য ঈসালে সওয়াবের নিয়ত করে। কেননা তারা এর সওয়াব লাভ করবে কিন্তু তার সওয়াব কমবে না।"

এটুকুই নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে অধিক সওয়াব লাভের কারণ হয় এটা। হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন—

مَنْ مَرَّ عَلَى الْمَقَابِرِ وَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اِحْدٰى عَشَرَةَ مَرَّةً ثُمَّ وَهَبَ اَجْرَهُ اَمْوَاتًا اُعْطِىَ مِنَ الْاَجْرِ بِعَدَدِ الْاَمْوَاتِ.

"যে ব্যক্তি কবর স্থানের কাছ দিয়ে পথ অতিক্রম করে এবং এগার বার সূরা ইখলাস পাঠ করে মৃত ব্যক্তিদের জন্য ঈসালে সওয়াব করে তাকে কবরের মৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা পরিমাণ সওয়াব প্রদান করা হয়।

—দারে কুতনী, তাবরানী, ফতওয়ায়ে শামী

হযরত জাবের (রা.) হুযূর (সা.) থেকে রেওয়ায়াত করেন—

مَنْ حَجَّ عَنْ اَبِيْهِ اَوْ اُمِّهِ فَقَدْ قَضٰى عَنْهُ حَجَّتَهُ وَكَانَ لَهُ فَضْلُ عَشْرِ حِجَجٍ . دارقطنى

"যে ব্যক্তি বাপ-মায়ের পক্ষ হয়ে হজ্জ আদায় করে এর দ্বারা মৃত ব্যক্তির হজ্জ আদায় হয়ে যায়। আর তার নিজের দশ হজ্জের সওয়াব লাভ হয়।—দারে কুতনী

একাধিক ব্যক্তির নামে সওয়াব রেসানী করলে সওয়াব বিভক্ত হবে? না প্রত্যেকে আলাদা আলাদা পুরো সওয়াব পাবে

এ ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে। কেউ বলেন—ভাগ করে দেয়া হবে। এটাই যুক্তি সঙ্গত। আর কেউ বলেন ঃ সওয়াব ভাগ হবে না (পুরো পুরি সওয়াব পাবে

সবাই)। এটা মতের প্রশস্থতা। ফতওয়ায়ে শামীতে উল্লেখ করা হয়েছে— ইবনে হাজার মক্কী (রহ.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কেউ যদি সূরায়ে ফাতেহা পড়ে মৃত ব্যক্তিদের উপর সওয়াব রেসানী করে তাহলে মৃত ব্যক্তিরা একেকজন পুরা পুরা সওয়াব পাবে না ভাগ ভাগ করে সওয়াব পাবে? উত্তরে তিনি বললেন–একদল লোক তো পুরো সওয়াব পাবে বলে মত দিয়েছেন। আর এটাই আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের শানের মুওয়াফেক।

باب مايلحق الانسان من الثواب بعدو فاته

অধ্যায় ঃ মৃত্যুর পর যে সব সওয়াব পাওয়া যায় সে সম্পর্কে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلٰثَةٍ اِلاَّ مِنْ صَدْقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ :

মানুষ মারা গেলে সব ধরনের আমল বন্ধ হয়ে যায়। শুধু মাত্র তিন প্রকার আমলের সওয়াব জারী থাকে। সদকায়ে জারিয়াহ, উপকারী ইলম এবং পিতামাতার জন্য দু'আকারী সন্তান।

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে— مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا

এটাও علم ينتفع به হাদীসের মধ্যে শামিল। অন্য আরেকটি হাদীস—

كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلٰى عَمَلِهِ اِلاَّ الْمَرَابِطُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّ عَمَلَهُ يَنْمُوْ لَهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - (ترمذى، ابوداؤد)

"আল্লাহর রাস্তায় পাহারাদারী ছাড়া মৃত ব্যক্তির সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। পাহারাদারীর আমল কেয়ামত পর্যন্ত বাড়তে থাকে।"

এই হাদীস এবং পূর্বের হাদীসের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা পাহারাদারী সংশ্লিষ্ট হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, পাহারারত অবস্থায় যে মারা যায় সে কেয়ামত পর্যন্ত সওয়াব পাবে। আর এই তিন প্রকারের আমল সংশ্লিষ্ট হাদীসের উদ্দেশ্য হলো মরার পর আমল বন্ধ হয় না বরং সওয়াব জারী থাকে। দ্বিতীয়তঃ رباط সংশ্লিষ্ট হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, যে পাহারা দেয়ার মধ্যে লিপ্ত ছিল এবং এ অবস্থায় মারা গেছে। এ জন্য মরার পরেও এই আমলকে জারী ধরে সওয়াব প্রদান করা হয়। পক্ষান্তরে এই তিন প্রকার আমলের চিত্র ভিন্ন। কেননা এগুলোর

আমল রত অবস্থায় তার মৃত্যু হয়নি। হ্যাঁ, স্বয়ং এই আমল জারী থাকে এবং সেই সুবাধে এর সওয়াবও জারী থাকে।

باب: الوقف

অধ্যায় ঃ ওয়াক্‌ফ্ সম্পর্কে

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ : اَصَابَ عُمَرُ اَرْضًا بِخَيْبَرَ فَاَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّي اَصَبْتُ اَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ اُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ اَنْفَسُ عِنْدِيْ مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِيْ بِهِ؟ قَالَ : اِنْ شِئْتَ حَبِسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ اَنَّهُ لاَ يُبَاعُ اَصْلُهَا وَلاَ يُبْتَاعُ وَلاَ يُوْرَثُ وَلاَ يُوْهَبُ الخ ـ

انى اصبت ارضا بخيبر-এর ব্যাখ্যা

বুখারীর রেওয়ায়াতে জমিটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সেটা মূলতঃ খেজুর বাগান। নাম ছামাগ (ثمغ)। এই রেওয়ায়াত এবং দারে কুত্নীর এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী জানা যায় এটি খায়বরে অবস্থিত একটি ভূখণ্ড কিন্তু অন্য বহু রেওয়ায়াত প্রমাণ করে যে খায়বারে ছামাগ নামের কোন ভূখণ্ডের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না বরং এটা মদীনার একটি জায়গার নাম। সবগুলো রেওয়ায়াত সামনে রাখলে দেখা যায় এটা মদীনারই একটি ভূখণ্ড, যা হযরত ওমর (রা.) ওয়াক্‌ফ্ করেছিলেন। অবশ্য খায়বরেরও কিছু অংশ খরিদ করে ওয়াক্‌ফ্ করেছিলেন তিনি। নাসায়ীর এক রেওয়ায়াতে আছে—

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : جَاءَ عُمَرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنِّي اَصَبْتُ مَالاً لَمْ اُصِبْ مَالاً مِثْلَهُ قَطُّ، كَانَ لِيْ مِائَةُ رَأْسٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهَا مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ خَيْبَرَ مِنْ اَهْلِهَا، وَاِنِّي قَدْ اَرَدْتُ اَنْ اَتَقَرَّبَ بِهَا اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ـ

রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, ওমর (রা.) উভয় এলাকার জমি ওয়াক্ফ্ করেছিলেন কিন্তু কোন রাবী শুধু খায়বরের এবং কোন রাবী শুধু ثمغ-এর কথা উল্লেখ করেছেন। এতে করে কোন কোন রাবী দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে ছামাগকে খায়বরের ভূমি বলে আখ্যায়িত করেছেন। অথচ ব্যাপারটা আদৌ এমন নয়।

قال فتصدق عمر -এর ব্যাখ্যা ঃ রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় হযরত ওমর (রা.) হুযূরের (সা.) জীবদ্দশায় ওয়াক্ফ্ করেছিলেন। কিন্তু আবূ দাঊদের রেওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় ওয়াক্ফ্নামা তাঁর খেলাফতকালে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল কেননা এতে امير المؤمنين শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া দলীল নামার লিখক মুআ'ইকিব হযরত ওমরের খেলাফত কালেরই লিখক (কাতেব) ছিলেন। যার দ্বারা বুঝা যায় এটা খেলাফত কালের ঘটনা। হতে পারে হুযূরের (সা.) জীবদ্দশায় ওয়াক্ফ্ করে নিজেই এর মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব পালন করেন এবং খেলাফত কালে ওয়াক্ফ্ নামা লিখে দেন।

أَنْ لَا يُبَاعَ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعَ وَلَا يُوْرَثَ وَلَا يُوْهَبَ.-এর ব্যাখ্যা ঃ অধিকাংশ রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় এটি হযরত ওমর (রা.) এর মন্তব্য। কিন্তু অন্য রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় এটি হুযূরের (সা.) কথা। বুখারী শরীফে হযরত নাফে' থেকে সখর ইবনে জুয়াইরিয়ার সনদে বর্ণিত হয়েছে—

فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَصَدَّقْ بِاَصْلِهِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ وَلَايُوْرَثُ وَلٰكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهٗ.

এমনিভাবে ত্বহাভী শরীফে আবূ আসেম সাঈদ জুহদারীর রেওয়ায়াত সুনানে বাইহাকী ও ত্বহাভী শরীফে বর্ণিত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারীর রেওয়ায়াত প্রমাণ করে এটা হুযূর (সা.)-এর কথা ওমর (রা.) এই হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন মাত্র, (তার নিজের কথা নয়)

শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াক্ফ

উল্লেখিত হাদীসের ভিত্তিতে জমহুর ফকীহগণ বলেন, ওয়াক্ফ করা শরীয়ত সম্মত একটি কাজ এবং স্থায়ীভাবে তা কার্যকর হবে। সুতরাং ওয়াক্ফ কারীর জন্য ওয়াক্ফকৃত বস্তু ফিরিয়ে নেয়া কিংবা বিক্রি করা অথবা হেবা করা জায়িয নেই। এমনিভাবে এর মধ্যে মীরাছও কার্যকর হয় না। অবশ্য ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) নামে একথা প্রচার করা হয় যে, তিনি স্থায়ীভাবে ওয়াক্ফ

কার্যকর হওয়ার পক্ষে মত দেন না। তার মতে رجوع عن الوقف তথা ওয়াক্ফ কৃত বস্তু ফিরিয়ে নেয়া জায়িয এবং ওয়াক্ফকৃত বস্তুর মধ্যে মীরাছ জারী হবে।

কিন্তু আবূ হানীফার এই মত "বাধ ছাড়া" কিংবা "শর্তমুক্ত" নয়। বরং এর মধ্যে তাফসীল রয়েছে তা জানা জরুরী। লক্ষ্য করুন ঃ

ওয়াক্ফ দুই প্রকার।

১। মূল বস্তু (عين شئ) ওয়াক্ফ করা। যেমন মসজিদ, সরাই খানা, কবরস্থান ইত্যাদি বানানো। ইমাম আবূ হানীফার মতে এ ধরনের ওয়াক্ফ স্থায়ী ভাবে কার্যকর হবে। এ ধরনের ওয়াক্ফকৃত বস্তু ফিরিয়ে নেয়া হেবা কিংবা ক্রয়-বিক্রয় করা জায়িয নেই এবং এর মধ্যে মীরাছ চলেনা।

২। মূল বস্তু ওয়াক্ফ না করে মুনাফা ওয়াক্ফ করা। অর্থাৎ এর মুনাফা এবং উৎপন্ন বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া। যেমন—জমিনের উৎপাদিত শস্য মসজিদের জন্য ওয়াকফ্ করা। এ ধরনের ওয়াক্ফকৃত বস্তু আবূ হানীফার মতে দুই ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে কার্যকর হবে।

ক) শাসক কর্তৃক স্থায়ীভাবে ওয়াক্ফের ফয়সালা করে দেয়া।

খ) ওয়াসিয়্যাতের আন্দাযে ওয়াক্ফ করা। যেমন একথা বলা—

إِذَا مُتُّ فَقَدْ جَعَلْتُ دَارِىْ اَوْ اَرْضِىْ وَقْفًا عَلٰى كَذَا ـ

সুতরাং উল্লেখিত এই দুই ক্ষেত্রে আবূ হানীফার মতেও স্থায়ীভাবে ওয়াক্ফ হয়ে যাবে। কিন্তু এই দুই পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হলে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) জমহুরের সাথে দ্বিমত পোষণ করে বলেন এসব ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে ওয়াক্ফ কার্যকর হবেনা। যেমন—শাসক স্থায়ীভাবে ওয়াক্ফ করে নেয়ার ফয়সালা করেনি কিংবা ওয়াক্ফের সময়কে মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত করেনি। সুতরাং আবূ হানীফার মতে ওয়াক্ফকৃত এসব বস্তু ফিরিয়ে নেয়া যাবে এবং হেবা বা ক্রয়-বিক্রয় ও করা যাবে। আর জমহুরের মতে এর কোনটাই করা যাবে না, এগুলোতেও স্থায়ীভাবে ওয়াক্ফ কার্যকর হবে।

জমহুর আলিমগণ হযরত ওমরের (রা.) হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে বলেন–তিনি মুনাফা ওয়াক্ফ করে একথা বলেছেন— انه لا يباع ولا يوهب ولا يورث, আবূ হানীফার পক্ষ থেকে এই জওয়াব দেয়া হয় যে, সম্ভবতঃ হযরত ওমর (রা.) স্থায়ীভাবে কার্যকর হওয়ার কোন এক পদ্ধতিতে ওয়াক্ফ করেছিলেন। যথা ঃ (১) তিনি মূল ভূখণ্ড ওয়াক্ফ করেছিলেন, মুনাফা নয়।

(২) হতে পারে তিনি মুনাফা সদকা করেছিলেন কিন্তু শাসক হুযূর (সা.) একে স্থায়ীভাবে ওয়াক্ফ করার নির্দেশ প্রদান করেন।

৩। এও সম্ভবনা আছে যে, হযরত ওমর (রা.) মৃত্যুর পর ওয়াক্ফ (সদকা) কার্যকর করার আদেশ দিয়েছিলেন।

সার কথা ওয়াক্ফ স্থায়ী হওয়ার যে তিন পদ্ধতি রয়েছে হযরত ওমর (রা.) এর কোন এক পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। সুতরাং এটা জমহুরের দলীল হতে পারে না।

باب ترك الوصية لمن ليس له شئ يوصى فيه

অধ্যায় ঃ নিঃস্ব ব্যক্তির ওয়াসিয়্যাত তরক করা প্রসঙ্গে

حديث عبد الله ابن ابى اوفى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ :

سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰى هَلْ اَوْصٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : لاَ، قُلْتُ فَلِمَ كَتَبَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ الْوَصِيَّةَ اَوْ فَلِمَ اُمِرُوْا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ : اَوْصٰى بِكِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

সংশ্লিষ্ট আলোচনা ঃ শী'আরা জোরে শোরে একথা প্রচার করে যে, হুযূর (সা.) হযরত আলীর জন্য خلافت بلافصل (তথা হুযূরের (সা.) পরে আলীর খেলাফতের ব্যাপারে) ওয়াসিয়্যাত করে গেছেন। এমনিভাবে কেউ কেউ ধারণা করে যে, হুযূর (সা.) কতক নিকটাত্মীয়ের জন্য মালের ওয়াসিয়্যাত করে গেছেন। একারণে হযরত তালহা ইবনে মুসাররাফ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফাকে জিজ্ঞেস করেন যে হুযূর (সা.) কারো জন্য মালের ওয়াসিয়্যাত করেছেন কিনা? জবাবে তিনি নেতিবাচক উত্তর দেন। প্রশ্নকর্তা যেহেতু সম্পদ এবং খেলাফতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন এজন্য তিনি সরাসরি বলে দিয়েছেন যে, হুযূর (সা.) কোন ওয়াসিয়্যাত করেননি। এর মানে এই নয় যে, রাসূল (সা.) অন্য কোন ব্যাপারেও ওয়াসিয়্যাত করেননি। কেননা তিনি নিজেও জানতেন হুযূর (সা.) বিভিন্ন বিষয়ে ওয়াসিয়্যাত করে গেছেন। যেমন আরব ভূখণ্ড থেকে মুশরিকদের বহিস্কার করা, বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা, নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া ইত্যাদি। মোট কথা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রা.) শুধু এতটুকু বুঝাতে চেয়েছেন যে,

হুযূর (সা.) সম্পদ ও খেলাফতের ব্যাপারে কোন ওয়াসিয়্যাত করে যাননি, দ্বীনি অন্য অনেক বিষয়ে ওয়াসিয়্যাত করেছেন।

প্রশ্ন জাগে যে, হযরত তালহা (রা.) فلم كتب على المسلمين الوصية اوف لم امرو ابالوصية؟ এই কথা বলে প্রশ্ন করলে হযরত আব্দুল্লাহ শুধুমাত্র كتاب الله-এর কথা উল্লেখ করলেন কেন? এর উত্তরে বলা যায় যে, সব কিছুর মূলই যেহেতু কিতাবুল্লাহ এজন্য শুধু এটাকেই উল্লেখ করা হয়েছে।

حديث ابن عباس/قصه قرطاس

عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيْسِ ؟ ثُمَّ بَكٰى حَتّٰى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصٰى، فَقُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيْسِ ؟ قَالَ اشْتَدَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ، فَقَالَ ايْتُوْنِيْ اَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوْا بَعْدِيْ، فَتَنَازَعُوْا وَمَايَنْبَغِيْ عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ، وَقَالُوْا مَا شَانُهُ؟ اَهَجَرَ؟ اِسْتَفْهِمُوْهُ، قَالَ دَعُوْنِيْ، فَالَّذِيْ اَنَافِيْهِ خَيْرٌ، اُوْصِيْكُمْ بِثَلَاثٍ اَخْرِجُوْا الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَاَجِيْزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ اُجِيْزُهُمْ، قَالَ : وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ اَوْ قَالَهَا فَاُنْسِيْتُهَا .

এই ঘটনাটি কেচ্ছায়ে কিরতাস নামে প্রসিদ্ধ। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ : হুযূর (সা.) ইন্তিকালের চারদিন পূর্বে বৃহস্পতিবার রোগ শয্যায় শায়িত অবস্থায় সাহাবীদেরকে বলেন—লেখার সরঞ্জাম হাজির কর, আমি তোমাদের জন্য এক নসীহতনামা লিখে যাব, যার ওপর আমল করলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। এরপর সাহাবাদের মত পার্থক্য দেখা দিল। কেউ লিখিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলেন আর কেউ হুযূর (সা.)কে বাড়তি কষ্ট দেয়া পছন্দ করলেন না। হযরত ওমর (রা.) বললেন–হুযূর (সা.) এমনিতেই রোগ শয্যায় কাতর, তাঁকে বাড়তি কষ্ট দেয়া মোটেই ভালো হবে না। অসুখের কারণে লিখে দিতে না পারলেও কোন সমস্যা নেই। আল্লাহর কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। (حسبنا كتاب الله)। এই সময় কেউ কেউ বলে বসল ما شانه؟ اهجر؟ استفهموه হুযূরের

(সা.) বিচ্ছেদের সময় ঘনিয়ে এলো? তাঁকে জিজ্ঞেস কর তো? হুযূর (সা.) সব শুনছিলেন। কিছুটা রাগত স্বরে বললেন—আমাকে আমার হালতে থাকতে দাও। আমি যে অবস্থায় আছি তাই ভালো। অতঃপর বললেন আমি তিনটি বস্তুর ওয়াসিয়্যাত করে যাচ্ছি। ১। মুশরিকদেরকে আরব ভূখণ্ড থেকে বের করে দিবে ২। বিদেশি প্রতিনিধিদের যথার্থ সম্মান করবে তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করবে। ৩। ওয়াসিয়্যাতের কথা রাবী সোলায়মান ভুলে গেছেন। তৃতীয় এই নসীহতটি কী ছিল এ ব্যাপারে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মত পেশ করেছেন। আল্লামা দাঊদী (রহ.) বলেন—কুরআনের ব্যাপারে ওয়াসিয়্যাত। মুহাল্লাব বলেন—হযরত ওসামার (রা.) সৈন্য বাহিনীর ব্যাপারে ওয়াসিয়্যাত। কাজী ইয়ায বলেন—সম্ভবতঃ তৃতীয় নসিহত ছিল আমার কবরকে মসজিদ বানিয়ো না। অথবা এও হতে পারে যে, নসীহতটি ছিল নামায এবং গোলাম বাঁদীর হকের ব্যাপারে। তবে রাবী যেহেতু ভুলে গেছেন এজন্য নিশ্চিতভাবে কোন একটি নির্দিষ্ট করা মুশকিল। আল্লাহই সর্ব জ্ঞাত।

শী'আদের নানা রকম প্রশ্ন

যা বর্ণনা করা হয়েছে ঘটনা এতটুকুতেই ক্ষান্ত ছিল কিন্তু শী'আরা এতে রং চড়িয়ে মিথ্যা মনগড়া নানা রকম বানোয়াট তথ্য পেশ করে নিজেদের মত প্রতিষ্ঠা করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র এঁটেছে। কেননা তারা এই ঘটনার ভিত্তিতে বলে হযরত আলী (রা.) কে হুযূর (সা.) خلافت بلافصل-এর ওয়াসিয়্যাত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু ওমর (রা.) তা করতে দেন নি। তারা এই ঘটনাকে সামনে রেখে হযরত ওমরের (রা.) ওপর চারটি প্রশ্ন করে থাকে। যথা ঃ

১। হযরত ওমর (রা.) হুযূরের (সা.) ব্যাপারে শিষ্টাচার বহির্ভূত মন্তব্য করে বলেছেন "হুযূর (সা.) প্রলাপ বকছেন"। হাদীসে বর্ণিত هجر শব্দকে তারা প্রলাপ বকার অর্থে প্রয়োগ করে থাকে এবং একে হযরত ওমরের (রা.) মন্তব্য বলে মনে করে।

২। তিনি এমন একটি নসীহত লিখতে বাধা দেন যা লিখে রাখতে পারলে কেয়ামত পর্যন্ত কেউ গোমরা হত না। এতে হুযূরের (সা.) নাফরমানী করা হয়েছে সেই সাথে উম্মতের চরম ক্ষতি করা হয়েছে।

৩। হযরত ওমর (রা.) حسبنا كتاب الله (কুরআনই আমাদের জন্য যথেষ্ট) বলেছেন, যার অর্থ হাদীসের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

৪। হুযূর (সা.) চেয়েছিলেন তাঁর ইন্তিকালের পর হযরত আলী (রা.) খলীফা হবেন কিন্তু ওমর (রা.) তা হতে দেননি।

উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর ইজমালী জবাব

এসব প্রশ্নের ইজমালী জবাব হলো, তারা কিভাবে জানল যে, হুযূর (সা.) আলীর জন্য খেলাফতের ওয়াসিয়্যাত লিখিয়ে দিতে চেয়েছিলেন? এর স্বপক্ষে তাদের কোন দলীল আছে কি? অথচ তাঁর জীবনের সিংহভাগ কেটেছে হযরত আবূ বকরের (রা.) সাথে এবং নামাযের ইমামও বানিয়েছেন তাঁকেই। সুতরাং যদি খেলাফতের ব্যাপারে ওয়াসিয়্যাত করতেই হয় তাহলে আবূ বকরের (রা.) জন্য করতেন, আলীর জন্য কেন? যেমন, এক রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে—রোগশয্যায় হুযূর (সা.) হযরত আয়িশা (রা.)-কে বলেন, তোমার ভাই ও পিতাকে ডাক, খেলাফতের ব্যাপারে কিছু লিখে দিয়ে যাই। অতঃপর নিজেই বললেন, থাক দরকার নেই। আল্লাহ এবং মুসলমানগণ আবূ বকর (রা.) ছাড়া অন্যের খেলাফত মেনে নিবে না। (يأبى الله والمؤمنون الا ابا بكر)

সুতরাং আলীর (রা.) ব্যাপারে তো খেলাফতের ব্যাপারে কোন ইঙ্গিতই পাওয়া যায় না কোথাও। অতএব বুঝা যাচ্ছে, হুযূর (সা.) অন্য কোন ব্যাপারে ওয়াসিয়্যাত করতে চেয়েছিলেন। তাইতো দেখা যায় কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর হুযূর (সা.) কয়েকটি বিষয়ের ওয়াসিয়্যাত করেন। যথা, মুশরিকদেরকে আরব ভূখণ্ড থেকে বহিস্কার করা, প্রতিনিধিদের সার্বিক নজরদারী করা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় কথা হলো ঃ ওয়াসিয়্যাত নামা যদি লেখা জরুরীই হতো তাহলে মুখে বলে দিতেন কিংবা পরবর্তীতে এক সময় লিখে দিতেন।

তৃতীয় কথা হলো ঃ রাসূলের (সা.) ইন্তিকালের মাত্র কয়েকদিন পূর্বে ইসলামকে পরিপূর্ণতা (اكمال دين) এর ঘোষণা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ الخ সুতরাং এর পর দ্বীনের কোন বিষয়ে লিখার প্রয়োজন থাকতে পারে না। হয়ত দ্বীনের বিষয় গুলোকেই তাগিদ দেয়ার জন্য রাসূল (সা.) লিখে দিতে চেয়েছিলেন। চতুর্থ কথা হলো, এখানে তো শুধু মাত্র ওমরই (রা.) উপস্থিত ছিলেন না, অনেক সাহাবা, আহলে বাইত এমনকি হযরত আলী (রা.) ও উপস্থিত ছিলেন। কিছু হলে শুধু ওমরের (রা.) ঘাড়ে দোষ চাপানো কেন? সবাই দোষী হওয়া উচিত। নাউযুবিল্লাহ। এটা প্রতিহিংসার চরম বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়, হযরত ওমর (রা.) নিশ্চিতভাবে বুঝেছিলেন

রাসূলের (সা.) এই নির্দেশ আবশ্যকীয় (امر وجوبى) নয়, এজন্য তাঁর কষ্টের দিকে খেয়াল করে লিখা থেকে বিরত থাকেন।

সুতরাং সার্বিক দিক বিবেচনায় প্রতীয়মান হয় যে, হুযূর (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে খলীফা বানানোর জন্য ওয়াসিয়্যাত করতে চাননি আর ওমর (রা.) ও এর মাঝখানে প্রতিবন্ধক হতে যাননি।

ইজমালী এই জবাবে আলীর (সা.) খেলাফত সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে, বাকি তিন প্রশ্নের জবাব নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

প্রথম প্রশ্নের জবাব

(ক) هجر শব্দটি হযরত ওমর (রা.) বলেননি। হাদীসের কোন কিতাবে এর প্রমাণ পাওয়া যায় না। আল্লামা ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, কোন রেওয়ায়াতেই একথা নেই যে, এটি ওমরের কথা। শাহ আব্দুল আযীয (রহ.) তোহফায়ে ইছনা আশারা-য় একথাই বলেছেন। সবচেয়ে মজার কথা হলো শী'আরাও নিজেদের স্বপক্ষে এরকম কোন রেওয়ায়াত দাড় করাতে পারেনি যাতে প্রমাণিত হয় যে, এটি হযরত ওমরের (রা.) মন্তব্য। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) উল্লেখ করেছেন যে, اِنَّ الصَّحَابَةَ اخْتَلَفُوْا فِىْ ذَالِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اَهَجَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এ ব্যাপারে ইখতিলাফ করেছেন। কেউ বলেছেন, اَهَجَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ। কিন্তু হযরত আলী (রা.) এটা বলেননি যে, এ কথাটি হযরত ওমর (রা.) বলেছেন। ولم يصرح بان قائله عمر।

(খ) هجر শব্দের অর্থ শুধু প্রলাপ বকাই নয়। শব্দটি "বিচ্ছেদের" অর্থেও প্রয়োগ হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন— واهجرهم هجرا جميلا "সুন্দর ভাবে তাদেরকে পরিহার করে চলুন"। অভিধানবিদ এবং হাদীস ব্যাখ্যাকারীগণও এই অর্থ লিখে থাকেন। ফতহুলবারীতে উল্লেখ করা হয়েছে, "এও সম্ভাবনা আছে যে, هجر শব্দটি هجر মূলের فعل ماضى এর সীগা। এর মাফউল মাহযূফ রয়েছে। পূর্ণ বাক্য ইবারত এরূপ ঃ اهجر الحياة। তিনি কি প্রাণ ত্যাগ (ইন্তিকাল) করতে যাচ্ছেন?

আল্লামা মুহাম্মাদ তাহের গুজরাটী হাদীসের অভিধান গ্রন্থ مجمع بحار الانوار-এ উল্লেখ করেছেন—

ويحتمل ان يكون معناه هجركم رسول الله من الهجر ضد الوصل -

বাস্তব সত্য কথা হলো, هجر শব্দের প্রকৃত অর্থই হলো পরিহার করা, পরিত্যাগ করা। আর বিচ্ছেদের অর্থের সাথে যথেষ্ট মিল থাকার কারণেই هجر এর এক অর্থ করা হয় هذيان বা প্রলাপ বকা। কেননা মানুষ ঐ সময় প্রলাপ বকে যখন সে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে যায়। (তথা আকলের বিচ্ছেদ ঘটে)। এই অর্থই প্রসিদ্ধ, যুক্তিপূর্ণ এবং উর্দুতে هجر শব্দটি وصل শব্দের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়। উল্লেখিত ঘটনায় هجر শব্দটি এই অর্থেই প্রয়োগ হয়েছে। দুই কারণে শব্দটি প্রলাপ বকার অর্থে প্রয়োগ হতে পারেনা।

(১) هذيان প্রলাপ বকার সন্দেহ ঐ সময় হতে পরে যখন কথাটা خلاف عقل হয়। কিন্তু একজন নবী জীবন সায়াহ্নে ওয়াসিয়্যাতনামা লিখতে চাওয়া خلاف عقل হয় কি করে? আর একে هذيان-ই বা বলা যায় কোন যুক্তিতে?

(২) রেওয়ায়াতে هجر শব্দের পর استفهموا। শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ তাঁকে জিজ্ঞেস করো।' هجر শব্দের অর্থ যদি প্রলাপ বকাই হয় তাহলে প্রশ্ন করতে বলা হলো কেন? এ অবস্থায় প্রশ্ন করা নিরেট মূর্খতা নয় কি?

কিন্তু শব্দটিকে যদি বিচ্ছেদের অর্থে প্রয়োগ করা হয় তাহলে বাক্যের আগে পরের সাথে চমৎকার মিল খুঁজে পাওয়া যাবে।

হুযূর (সা.) যখন রোগশয্যায় হেদায়অতনামা লিখে দিতে চাইলেন তখন সাহাবাদের মাঝে বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে গেল। উৎকণ্ঠিত হয়ে তাঁরা ভাবতে লাগলেন কেয়ামতের সেই নির্দিষ্ট সময় এসে গেল বুঝি! কেননা এ ধরনের ওয়াসিয়্যাতনামা (সাধারণতঃ শেষ সময়েই লিখা হয়ে থাকে। এজন্য সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন—তিনি কি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন? ভালো করে জেনে নাও। অতএব هجر শব্দটি যেই বলে থাকুন না কেন রাসূলের (সা.) প্রতি পূর্ণ ভক্তি ও মহব্বতের ভিত্তিতেই বলেছেন।

আর যদি ধরে নেয়া হয় যে, هجر শব্দটি প্রলাপ বকার অর্থে প্রয়োগ হয়েছে তাহলে বলতে হবে হামযাটি استفهام। انكارى। সম্ভবতঃ একথাটি তাঁরা বলেছিলেন যাঁরা হুযূরের (সা.) ওয়াসিয়্যাতনামা লিখার পক্ষে ছিলেন। এনিয়ে

যখন বিতর্ক হচ্ছিল তখন তাঁরা বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন—তোমরা হুযূরের (সা.) ওয়াসিয়্যাত নামা লিখতে চাচ্ছ না? তোমরা কি মনে করো তিনি প্রলাপ বকছেন? তিনি তো প্রলাপ বকছেন না। স্বজ্ঞানেই কথা বলছেন।

এখন জ্ঞানীরাই ভেবে দেখুন। এসব তত্ত্ব জানার পরেও প্রশ্নের প্রাণ বাকি থাকে কিনা? কী আশ্চার্য কথা! শী'আরা যখন ওমর (রা.)-কে هجر শব্দের মন্তব্যকারী (قائل) প্রমাণ করতে পারল না তখন বলা শুরু করল এর অর্থ প্রলাপ বকা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এও চেষ্টা করতে লাগল যে, শব্দে বর্ণিত همزة টি استفهامی নয়। এসব আজেবাজে খোঁড়া যুক্তি পেশ করে প্রশ্ন দাঁড় করতে তাদের লজ্জা করা উচিত নয় কি?

দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব

জবাব জানার আগে কয়েকটি বিষয় খেয়াল করুন।

১। সর্বসম্মতিক্রমে اليوم اكملت لكم دينكم الخ আয়াতটি এই ঘটনার পূর্বে নাযিল হয়েছে। এখন প্রশ্ন জাগে জরুরী কোন বিষয় যদি লেখা বাকিই থাকত তাহলে দ্বীন পরিপূর্ণ হলো কীভাবে আর আয়াতের যথার্থতাই বা থাকল কোথায়?

২। ঘটনাটি সংঘটিত হয় বৃহস্পতিবারে আর রাসূল (সা.) ইন্তিকাল করেন সোমবারে। ঘটনার পর চারদিন পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকেন। সুতরাং জরুরী কিছু লিখার থাকলে এই সময়ে তো লিখে দিতে পারতেন কিন্তু লিখলেন না কেন? এ ধরনের প্রশ্ন করা খোদ রাসূলের (সা.) শানে চরম ধৃষ্টতা নয় কি? নাউযুবিল্লাহ!

ওমর বাধা দেয়ায় বা তাঁর ভয়ে লিখে না দেয়ার সন্দেহ করা অন্তত কোন মুসলমান বিশ্বাস করতে পারে না। কেননা নবীগণ কারো ডর ভয়ে যদি দ্বীনের কাজ থেকে নিবৃত হোন তাহলে দ্বীনের বিশ্বস্ততা উঠে যাবে এবং দ্বীন শক্তিহীন একটি শিশু বাচ্চায় পরিণত হবে।

৩। ওমর (রা.) না হয় নবী করীম (সা.)-এর জরুরী এই নসীহত লিখতে বাধা দিলেন কিন্তু আলী ও অন্যান্য সাহাবাগণ লিখে নিলেন না বা কেন? কেউতো এই দিকটা খেয়াল করলেন না। এ হিসেবে ওমরের চাইতে আলী বেশি দোষী হওয়ার কথা। কেননা শী'আদের ধারণা আলী (রা.) হুযূরের (সা.) সবচেয়ে প্রিয় ও নৈকট্য প্রাপ্ত ছিলেন। তাছাড়া এ ধরনের নির্দেশ সাধারণতঃ ঘরোয়া পরিবেশে হয়ে থাকে। যার দ্বারা বুঝা যায় হযরত আলীকেই এই নির্দেশ

দেয়া হয়েছিল। তাহলে বোঝা গেল, তিনি এই হুকুম পালনে ব্যর্থ (?) হয়েছেন! মুসনাদে আহমদে বলা হয়েছে হযরত আলীকে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

৪। হযরত ওমর (রা.) হুযূরের (সা.) আদেশ অমান্য করেন নি বরং তাঁর এই নাজুক অবস্থা দেখে আবেদন করেছেন যাতে এই কাজ আপাতত মুলতবী থাকে। এটা শুধুই হযরত ওমরের আবেদন ছিল যা হুযূর (সা.) বিবেচনায় আনেন। এটা হযরত ওমরের মতের মিল। এরকম আরো কয়েক জায়গায় হযরত ওমরের মতের সাথে ওহি মিলে যায়। শী'আরাও তো অকপটে একথা স্বীকার করে। তাদের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ فلك النجات -এ বলা হয়েছে—

وَاَمَّا سُكُوْتُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ التَّنَازُعِ فَمَا كَانَ مِنْ عِنْدِهٖ بَلْ كَانَ بِوَحْيٍ -

সুতরাং এটা হযরত ওমরের মর্যাদাই বৃদ্ধি করে শুধু অবাধ্যতা প্রকাশ করেনা।

৫। হযরত আনোয়ার কাশ্মীরী শাহ সাহেব (রহ.) বলেন, এত কিছুর পরেও যদি শী'আরা হযরত ওমরের এই আচরণকে হুযূর (সা.)-এর নাফরমানী হিসেবে প্রচার করে তাহলে আমরা হযরত আলীর (রা.) এমন কয়েকটি ঘটনা পেশ করব যাতে বাহ্যিকভাবে মনে হবে তিনি রাসূলের (সা.) বিরোধিতা করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। তোমরা কী একে সমর্থন করবে, না এর সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করবে? আলীর (রা.) ব্যাপারে তোমরা যে জবাব দিবে হুবহু সেই জবাব হযরত ওমরের (রা.) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

যেমন, হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তিতে হুযূরের (সা.) নামের সাথে رَسُوْلُ اللّٰهِ শব্দ যুক্ত ছিল। এতে কাফিররা আপত্তি করলে হুযূর (সা.) আলীকে এই শব্দ মুছে ফেলার নির্দেশ দেন। বারবার বলা সত্ত্বেও হযরত আলী (রা.) মুছে ফেলতে অস্বীকার করেন। পরে হুযূর (সা.) নিজেই মুছে ফেলেন। অথচ এই ঘটনা কিরতাসের ঘটনার চেয়ে বেশি গুরুত্ব রাখে।

কেননা এক্ষেত্রে তিনি নিজে লেখেন আর ওই ঘটনায় ওমরের কথা মেনে নিয়ে লিখে দেয়া থেকে বিরত থাকেন। অথচ কেউ হযরত আলী (রা.)কে হুযূরের (সা.) নাফরমান বলে মনে করেনা।

বুখারী শরীফের এক রেওয়ায়াতে আছে, একবার হুযূর (সা.) হযরত ফাতিমা ও আলী (রা.)-কে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার জন্য জাগ্রত করেন। হযরত আলী (রা.) এ সময় বললেন—

وَاللّٰهِ لاَ نُصَلِّى اِلاَّ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا وَاِنَّ اَنْفُسَنَا بِيَدِ اللّٰهِ .

আল্লাহর কসম! ফরয নামায ছাড়া অন্য কোন নামাযই পড়ব না। আর আমাদের প্রাণ তো আল্লাহর কব্জায় রয়েছে।

তখন হুযূর (সা.) এই বলে চলে গেলেন— وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْئٍ جَدَلاً

দেখা যাচ্ছে যে, لانصلى বলে আলী সুস্পষ্ট ভাবে রাসূলের (সা.) আদেশের বিপরীত করতে চেয়েছেন! আর রাসূল (সা.) ও একে جدل (ঝগড়া) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু খোলামনে যেহেতু কথাটি বলেছিলেন, এজন্য হুযূর (সা.) তাঁকে ভর্ৎসনা করেননি।

আলীর ব্যাপারে যদি এরূপ জবাব—ব্যাখ্যা দেয়া যায় তাহলে ওমরের ব্যাপারে দেয়া যাবে না কেন? এটা কি চরম দুশমনী আর হিংস্রতা নয়?

তৃতীয় প্রশ্নের জবাব

তৃতীয় প্রশ্ন হলো, হযরত ওমর (রা.) حسبنا كتاب الله বলে হাদীসের প্রয়োজনীয়তাকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। এর জবাবে আমরা বলব, এর ব্যাখ্যা যদি এরকমই হয় তাহলে আল্লাহ তো নিজেই (কুরআনে) বলেছেন— حسبنا الله যার অর্থ, আল্লাহই যথেষ্ট, রাসূলের (সা.) প্রয়োজন নেই। এর ব্যাখ্যায় তোমরা যা বলবে ওমরের বক্তব্যে আমরাও তেমন বলব। প্রকৃত পক্ষে কুরআনে কারীম ঈমানের প্রাণ, ইসলামের রূহ এবং শরীয়তের মূল ভিত্তি। হযরত ওমর (রা.) একথাই বলতে চেয়েছিলেন, হাদীসকে তিনি এড়িয়ে গেলেন কোথায়?

এই অধ্যায়ের অধিকাংশ আলোচনা আল্লামা রশীদ আহমদ লুধিয়ানভী (রহ.) লিখিত বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ইরশাদুল কারী গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। সর্বশেষ কাসেম-ই-ছানী আল্লামা শিব্বির আহমদ ওসমানীর কিছু চমৎকার বক্তব্যের মাধ্যমে আলোচনা শেষ করছি।

তিনি বলেন—এই ঘটনার হাকীকত জানতে হলে একটি দৃষ্টান্ত জানতে হবে। যেমন ধরুন, কোন ওস্তাদ অসুস্থ হয়ে পড়লেন কিন্তু ছাত্রদের প্রতি পরম স্নেহ থাকার কারণে বললেন, কিতাব পত্র লও সবক পড়িয়ে দেই। এতে করে ছাত্রদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলো। কেউ বলল, হুযূর অসুস্থ তাঁকে কষ্ট দেয়ার দরকার নেই। তাঁর থেকে যা শিখেছি ভবিষ্যতের জন্য তাই যথেষ্ট। অন্য

াত্ররা বলতে লাগল, পড়া উচিত, না হয় তিনি কষ্ট পাবেন। এতে করে ছাত্রদের ধ্যে উত্তপ্ত অবস্থা বিরাজ করতে লাগল। কেউ কিতাব আনা শুরু করল আর কউ বারণ করতে লাগল। এখন বলুন এর মধ্যে কে উস্তাদের প্রতি ভক্ত অনুরাগী ার কে ওস্তাদের নাফরমান, অবাধ্যচারী? এককে দিক বিবেচনায় উভয় দলই িন্তু উত্তম ও ওস্তাদের ভক্ত বলতে হবে। ঠিক এই ঘটনাতেও উভয় দলকে এক যরে দেখার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে।

সূক্ষ্ম আরেকটি কথা মনে রাখা বাঞ্ছনীয় যে, হুযূরের (সা.) এই রোগ ায্যায় দুদের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। (মুখের একপাশ দিয়ে ঔষধ পান করানো কে দুদ বলে) মানুষের ধারণা হলো, হুযূর (সা.) জাতুল জান্‌ব রোগে আক্রান্ত য়েছেন আর এই রোগে লুদুদ করা ফলদায়ক হয়। লোকজন এই ধারণা বশবর্তী য়ে লদুদ করতে চাইলে হুযূর (সা.) বারণ করেন এবং বলেন আমি জাতুল ান্‌ব রোগে আক্রান্ত নই। কিন্তু ঘর ওয়ালারা বিষয়টাকে অন্যভাবে দেখল এবং নে করল ঔষধ সেবন করতে অপছন্দ বলে রাসূল (সা.) একথা বলছেন। তাই াসূল (সা.) এক পর্যায়ে জ্ঞান হারালে সাহাবাগণ তাঁকে লদুদ করালো। এতে াসূল (সা.) খুব নাখোশ হন এবং সবাইকে শাস্তি স্বরূপ লদুদ করান (যারা ঐ ময় ঘরে ছিল)। কেননা নবীগণের আদেশ নিষেধের তোয়াক্কা না করা এবং িষেধ করা সত্ত্বেও লদুদ করানো মোটেই উচিত হয়নি তাদের। এজন্য আদব িক্ষা দিতে এবং হুকুম অমান্য করার শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে লদুদ করান।

অথচ বাহ্যিক ভাবে দেখা যায় কেরতাসের ঘটনার তুলনায় এই ঘটনার রুত্ব অনেক কম। কেননা এই ঘটনার সম্পর্ক নিজের সত্ত্বার সাথে আর করতাসের সম্পর্ক সমগ্র মুসলিম জাতীর সাথে। অথচ এই ঘটনায় শাস্তি দিলেও করতাসের ঘটনায় কাউকে শাস্তি দেননি। শুধুমাত্র ধমক দিয়েছেন কিছুটা তাও নটা অসুস্থ ব্যক্তির কাছে ঝগড়া করার জন্য কেননা অসুস্থ ব্যক্তির সামনে ঝগড়া রলে তার মেযাজ বিগড়ে যেতে পারে।

এর দ্বারা বুঝা যায় হুযূর (সা.) কোন দলের প্রতি নাখোশ ছিলেন না এবং ারো মতকে ভুল হিসেবেও আখ্যা দেননি। অন্যথায় তিনি শাস্তি দিতে পারতেন িংবা ওয়াসিয়্যাতের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য ন্যূনতম পুনরায় তাগিদ করতে ারতেন। শুধু এতটুকু করেছেন যে, ঝগড়া-ঝাটি বেধে যাচ্ছিল দেখে তিনি বাইকে সেখান থেকে উঠে যেতে বলেন এবং ঘটনা এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল হযরত ওমরের (রা.) ওপর উত্থাপিত কল প্রশ্ন, অনর্থক মিথ্যা এবং হিংস্রতামূলক। বাস্তবতার সাথে এর আদৌ কোন ল নেই। আল্লাহ পাক সবাইকে হেদায়াত দান করুন। আমীন।

অধ্যায় : মান্নত সম্পর্কে ঃ (كتاب النذر)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ : اِسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ نَذْرٍكَانَ عَلٰى اُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ اَنْ تَقْضِيَهِ ـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْضِهِ عَنْهَا ـ

'হযরত সা'দ-ইবনে ওবাদা (রা.) হুযূরের (সা.) কাছে তাঁর মৃত মায়ের মান্নত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে হুযূর (সা.) বললেন, তার পক্ষ থেকে তুমি মান্নত পুরো করে দাও।'

نذر-এর অর্থ

نذر শব্দটি বাবে ضرب-এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ, ভালো কিংবা মন্দ কোন কিছুর ওয়াদা করা। ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, এটা মূলতঃ الان ذار থেকে, অর্থ ভীতি প্রদর্শন করা।

نذر–এর পারিভাষিক অর্থ ঃ আল্লামা রাগেব (রহ.) বলেন—

وَاَمَّاعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَالنَّذْرُ اَنْ تُوْجِبَ عَلٰى نَفْسِكَ مَالَيْسَ بِوَاجِبٍ ـ

"কোন বিষয়কে সামনে রেখে নিজের ওপর এমন বস্তু ওয়াজিব করা যা মূলতঃ ওয়াজিব ছিলনা।

نذر–এর প্রকারভেদ ঃ نذر দুই প্রকার। যথা ঃ ১। نذر مطلق ২। نذر معلق

শর্তহীন কোন নযর (মান্নত) করাকে نذر مطلق বলে। যেমন, এরূপ বলল– لِلّٰهِ عَلَىَّ اَنْ اَصُوْمَ يَوْمَ كَذَا আর শর্তযুক্ত কোন নযর করাকে نذر معلق বলে। যেমন, এরূপ বলল— اِنْ شَفَى اللّٰهُ مَرْضِىْ هٰذَا فَعَلَىَّ صَوْمَ شَهْرٍ আমার এই রোগ ভালো হলে এক মাস রোযা রাখব।"

منذور তথা নযরকৃত বস্তু আবার কয়েক ভাগে বিভক্ত।

১। যদি বস্তুটি معين (নির্দিষ্ট) হয় তাহলে একে نذرمصرح বলে। আর معين না হলে একে نذر غير مصرح এবং نذرمبهم বলে।

যেমন لله على صوم شهر এটা نذر مصرح আর لله على نذر এটা نذر مبهم

এমনিভাবে যদি ভালো কাজের মান্নত হয়; তাহলে একে نذر الطاعة এবং نذر التبرر বলে।

আর পাপের মান্নত হলে একে نذر المعصية বলে। মুবাহ কাজের মান্নত হলে نذرالمباح এবং অসম্ভব কোন কাজের মান্নত হলে একে نذر المستحيل বলে। প্রত্যেকটির হুকুম আলাদা আলাদা।

فى نذر كان على امه ঃ এর ব্যাখ্যা

হযরত সা'দ ইবনে ওবাদার (রা.) মা মান্নত করেছিলেন কিন্তু মান্নত পুরা করার আগেই ইন্তিকাল করেন। হুযূর (সা.)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তাঁর পক্ষ থেকে نذر পুরা করার নির্দেশ দেন।

অবশ্য তাঁর মা কিসের মান্নত করেছিলেন কোন রেওয়ায়াত দ্বারা তা সুস্পষ্ট ভাবে জানা যায়নি। ওলামায়ে কিরাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতবিরোধ করেছেন। কেউ বলেন نذر مطلق ছিল, কেউ বলেন, রোযার মান্নত কেউ বলেন গোলাম আযাদ করার এবং কারো মতে সদকা করার মান্নত ছিল। কিন্তু উত্তম قول অনুযায়ী نذر টা ছিল মাল জাতীয় অথবা نذر مبهم অবশ্য আল্লামা ইবনে হাজার (রহ.) একে نذر معين হওয়া প্রাধান্য দিয়েছেন।

فاقضه عنه এর ব্যাখ্যা

এখানে দু'টি মাসআলা ঃ

১। মৃত ব্যক্তির নযর পুরো করা ওয়ারিশের জন্য ওয়াজিব কি-না?

আহলে জাহের فاقضه আমরের সীগার ভিত্তিতে নযর পুরো করা ওয়াজিব বলে মনে করে। জমহুরের মতে মালজাতীয় নযর হলে পুরো করা ওয়াজিব অন্যথায় ওয়াজিব নয়। দলীল ইবনে আব্বাসের (রা.) হাদীস ঃ

قَالَ اَتٰى رَجُلُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ اِنَّ اُخْتِىْ نَذَرَتْ

اَنْ تَحُجَّ وَاِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ اَكُنْتَ قَاضِيَهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَقَضَى اللّٰهُ اَحَقُّ بِالْقَضَاءِ ـ

হুযূর (সা.) হাদীসে নযরকে دين-এর সাথে তাঁশবীহ বা তুলনা দিয়েছেন। আর دين আদায় করা ঐ সময় ওয়াজিব যখন ওয়াসিয়্যাত করা হয় অন্যথায় ওয়াজিব নয়।

জবাব ঃ আহলে জাহের আমরের সীগা দ্বারা যে দলীল পেশ করেছেন তার জবাব হলো, امر। ওয়াজিবের অর্থ দেয় ঠিকই কিন্তু ভিন্ন কোন উপসর্গ (قرينة) পাওয়া গেলে ভিন্ন অর্থেরও সম্ভাবনা থাকে।

আলোচ্য হাদীসে ভিন্ন অর্থের قرينة হলো প্রশ্নকর্তা যে ভাবে হুযূর (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেছেন হুযূর (সা.) সে ভাবেই উত্তর প্রদান করে বলেছেন فاقضه عنها সুতরাং প্রশ্নকর্তা যদি ওয়াজিবের অর্থে প্রশ্ন করে থাকেন তাহলে ওয়াজিবের অর্থ প্রদান করবে আর মুবাহ ইত্যাদির অর্থে প্রশ্ন করে থাকলে মুবাহর অর্থ প্রদান করবে। প্রশ্নকর্তা জানতে চেয়েছিলেন "তাঁর পক্ষ থেকে নযর আদায় করে দিলে লাভ হবে কিনা? হুযূর (সা.) বললেন, হ্যাঁ, লাভ হবে। বুখারী শরীফের অন্য এক রেওয়ায়াতে সুস্পষ্ট ভাবে এ কথাই বলা হয়েছে—

قَالَ سَعْدٌ : فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْئٌ اِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ـ

তাছাড়া বিনা শর্তে ওয়াজিবের ফতওয়া দেয়া হলে وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى আয়াতের বিপরীত হওয়া লাযিম আসে।

২। সব রকমের নযর পুরা করা যাবে কিনা?

এ সম্পর্কীয় সার নির্যাস বক্তব্য হলো ঃ নযর যদি মালের মধ্যে হয় এবং মৃত ব্যক্তি ওয়াসিয়্যাত করে যায় এবং সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা এই ওয়াসিয়্যাত পুরা করা সম্ভব হয় তাহলে ওয়ারিশদের জন্য ওয়াসিয়্যাত পুরা করা ওয়াজিব। কিন্তু ওয়াসিয়্যাত না করলে ইমাম মালেক ও আবূ হানীফার মতে নযর পুরা করা ওয়াজিব নয়।

ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, মৃত ব্যক্তি ওয়াসিয়্যাত না করলেও মালী নযর পুরা করা ওয়াজিব। কেননা এটা دين (ঋণের) মত। আর دين আদায় করা ওয়াজিব যদিও ওয়াসিয়্যাত না করে।

আমরা এর জবাবে বলব—এটা এক প্রকারের ইবাদত আর ইবাদতের মধ্যে ইখতিয়ার থাকা জরুরী। আর এটা একমাত্র ওয়াসিয়্যাতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। মীরাছের ক্ষেত্রে নয়। কেননা মীরাছ একটি বাধ্যতামূলক বিষয় এখানে ইখতিয়ারের সুযোগ নেই। আর নযর যদি بدنى হয় তাহলে এর দুই সূরত হতে পারে। (ক) بدنى محض নামায রোযা ইত্যাদি, (খ) بدنى এবং مالى দুয়ে মিলে ইবাদত। যেমন, হজ্জের নযর। জমহুরের মতে দ্বিতীয় এই প্রকারে প্রতিনিধিত্ব চলে। সুতরাং মৃত ব্যক্তি ওয়াসিয়্যাত করলে এবং মীরাছের সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশে ওয়াসিয়্যাত পুরা হলে ওয়ারিশদের জন্য ওয়াসিয়্যাত পুরা করা ওয়াজিব। কিন্তু ওয়াসিয়্যাত না করলে পুরা করা ওয়াজিব নয় মুস্তাহাব। কিন্তু ইমাম মালেকের (রহ.) প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী হজ্জের মধ্যে প্রতিনিধিত্ব চলে না। সুতরাং তাঁর মত অনুযায়ী কোন ক্রমেই ওয়ারিশগণ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে পারবে না।

عبادت بدنيه محضه-এর নযর করলে এর রূপ কি হতে পারে এ সম্পর্কে তাফসিলী বর্ণনা রয়েছে। নামায হলে সর্বসম্মতিক্রমে নযর পুরা করা জায়িয নেই। সুতরাং ওয়ারিশরা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে নামায পড়তে পারবে না। নামায ছাড়া অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে কিছুটা ইখতিলাফ রয়েছে। ইমাম আহমদের মতে রোযার মধ্যে প্রতিনিধিত্ব চলবে অবশ্য ওয়ারিশের জন্য নযর পুরা করা ওয়াজিব নয় মুস্তাহাব। দলীল হিসেবে তিনি নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করেন যাতে রোযার হুকুম দেয়া হয়েছে। যথা ঃ

(١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ـ (متفق عليه)

(٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنَّ اُمِّيْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ اَفَاَصُوْمَ عَنْهَا ؟ قَالَ : اَرَاَيْتِ لَوْ كَانَ عَلٰى اُمِّكِ دَيْنٌ فَتَقْضِيْهِ اَكَانَ يُوَدِّىْ عَنْهَا ؟ قَالَتْ نَعَمْ : قَالَ فَصُوْمِيْ عَنْ اُمِّكِ ـ (مسلم)

৩। হযরত বুরাইদার (রা.) হাদীসে বলা হয়েছে, তিনি রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেন— افتجزءها ان اصوم عنها ؟ قَالَ نعم। তবে ইমাম

আহমদের প্রসিদ্ধ কথা হলো, এই প্রতিনিধিত্ব শুধু মাত্র মান্নতকৃত রোযার মধ্যে প্রযোজ্য হবে রমযানের রোযার মধ্যে চলবে না।

তবে ইমাম আবূ হানীফা মালেক ও শাফেঈর মতে ইবাদতে বদনীর মধ্যে কোনক্রমেই প্রতিনিধিত্ব চলে না। সুতরাং নামাযের মত রোযার মধ্যেও প্রতিনিধিত্ব চলবে না। অবশ্য ওয়ারিশগণ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে রোযার ফেদিয়া দিতে চাইলে দিতে পারবে।

তাঁদের দলীল ঃ

(١) مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا ـ (ترمذى)

(٢) فَتْوٰى ابْنِ عَبَّاسٍ : لَا يُصَلِّى اَحَدٌ عَنْ اَحَدٍ وَلَا يَصُوْمُ اَحَدٌ عَنْ اَحَدٍ ـ

(٣) فَتْوٰى عَائِشَةَ : سَأَلَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اُمِّىْ تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ رَمَضَانَ اَيَصْلُحُ اَنْ اَقْضِىَ عَنْهَا ؟ فَقَالَتْ لَا وَلٰكِنْ تَصَدَّقِىْ عَنْهَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ عَلٰى مِسْكِيْنَ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِكَ ـ

(٤) وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ـ (الاية)

ইবনে আব্বাস (রা.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন—আয়াতে ঐসব বৃদ্ধ, গর্ভবতী নারী এবং দাইমা উদ্দেশ্য যারা রোযা রাখতে অক্ষম। এব্যাপারে সবাই একমত যে, এসব লোকেরা জীবদ্দশায় যেহেতু রোযা রাখতে পারেনা মরার পরে بطريق اولى এদের পক্ষ থেকে রোযা রাখা সহীহ্ নয়।

বিরোধীদের বর্ণিত দলীলের জবাব

তাঁরা হযরত আয়িশা ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করেছেন অথচ তাঁরা নিজেরাই এর বিপরীত ফতওয়া প্রদান করেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় ঐ রেওয়ায়াতগুলো মান্সূখ হয়ে গেছে। অথবা এও বলা যেতে পারে যে, হাদীসে صام عنه وليه এবং صومى عن امك বলে ফেদিয়া দেয়ার কথা বলা হয়েছে যা রোযার স্থলাভিষিক্ত। আর এ কারণেই একে রোযা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অথবা এর ব্যাখ্যা হলো, মৃত ব্যক্তির ওলীগণ নফল

রোযা রেখে সওয়াব রেসানী করবে। এখন মৃত ব্যক্তির রোযা তরক করার গুনাহ এবং ওলীর রোযার সওয়াব পরিমাপ করা হবে যা অন্যান্য আমলের বেলায় হয়ে থাকে। সুতরাং পরিমাণের দিক দিয়ে যেটি প্রাধান্য পাবে ফলাফল সেটির ওপরেই কার্যকর হবে। মোটকথা তাঁর দলীল হয়ত মানসূখ হয়ে গেছে অথবা এর ভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। সুতরাং জমহুরের মাযহাব প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য।

انه لايرد شيئا وانما يستخرج به من الشحيح-এর ব্যাখ্যা

মান্নত আল্লাহর ফয়সালা বদলাতে পারে না। দু'আ সদকা ইত্যাদি যেমন তাকদীরে মু'আল্লাক (শর্তযুক্ত তাকদীর)কে বদলানোর বাহ্যিক মাধ্যম মান্নত ততটুকু মাধ্যমও নয়। এর মাধ্যমে কৃপণের মাল হাত ছাড়া হয় মাত্র। কারণ কৃপণ যা হাতছাড়া করতে চায়না মান্নতের মাধ্যমে তাই হাত ছাড়া হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, কৃপণতা শুধু সম্পদের সাথে খাস নয়। ব্যয়যোগ্য যে কোন কিছুই ব্যয় না করাকে বখীল-কৃপণ বলা যায়। এক হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন البخيل من ذكرت عنده ولم يصل। কৃপণ সেই যার সামনে আমার নাম নেয়া হলো অথচ সে আমার ওপর দরূদ পড়ল না।

عمران بن حصين বর্ণিত হাদীস সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : كَانَتْ ثَقِيْفٌ حُلَفَاءَ لِبَنِىْ عَقِيْلٍ فَاَسَرَتْ ثَقِيْفٌ رَجُلَيْنِ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَسَرَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنْ بَنِى عَقِيْلٍ وَاَصَابُوْا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ الخ ـ

সংশ্লিষ্ট হাদীসে দু'টি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১। হুযূর (সা.) কর্তৃক আজবা নামের উটের মালিক হওয়ার ঘটনা। ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ ছাকীফ গোত্রের সাথে বনূ আকীলের মিত্রতা ছিল। এদিকে বনূ ছাকীফ এবং তাদের মিত্রদের সাথে হুযূর (সা.)-এর চুক্তি ছিল। কিন্তু তারা দু'জন সাহাবীকে শহীদ করে দিলে চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যায়। এ কারণে সাহাবায়ে কিরাম বনূ আকীলের দু'জন লোককে গ্রেপ্তার করে। এসময়.عضباء নামের উটটিও আটক করা হয়। পরে হুযূর (সা.)-এর মালিক হন।

গ্রেপ্তারকৃত একজন হুযূর (সা.)-কে জিজ্ঞেস করল আমাকে এবং আমার উটনীকে গ্রেপ্তার করলেন কেন? হুযূর (সা.) বললেন, তোমাদের মিত্র বনূ ছাকীফের অপরাধের কারণে। (কেননা তারা চুক্তি ভঙ্গ করায় তাদের এবং তাদের গোত্রের মিত্রদের সাথে সকল প্রকার সন্ধি বাতিল হয়ে গেছে) অবশ্য পরবর্তীতে সাহাবাদ্বয়ের মুক্তির বিনিময়ে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়।

২। দ্বিতীয় ঘটনা কাফির কর্তৃক আজবা ছিনতাই ও তা পুনরায় উদ্ধার করা প্রসঙ্গে। ঘটনাটি হলো; মুশরিকরা মদীনায় আক্রমণ করে বসে। সে সময় হুযূরের (সা.) উটনী মদীনার উপকণ্ঠে বিচরণ করছিল। এর পাহারায় ছিলেন হযরত আবূ যর গেফারীর পুত্র। মুশরিকরা তাঁকে হত্যা করে সব উট হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। এমন কি আবূ যর গেফারীর স্ত্রীকেও তারা গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। ইতিহাসে এই যুদ্ধটি "যাতুল করদ" নামে প্রসিদ্ধ।

আবূ যরের স্ত্রী সুযোগ পেয়ে উটনী নিয়ে পালিয়ে আসেন। মুশরিকরা টের পেয়ে পিছু ধাওয়া করে কিন্তু উটনীর দ্রুতগামীর কাছে তারা পরাস্ত হয়।

এসময় তিনি মান্নত করেন যে, এদের হাত থেকে মুক্তি পেলে তিনি উটনীকে কুরবানী করবেন। হুযূর (সা.) একথা শুনে বললেন— بئس ما جزتها কত নিকৃষ্ট তোমার প্রতিদান! এরপর হুযূর (সা.) বললেন— لاوَفَاءَ لِنَذْرٍ فِيْ مَعْصِيَةٍ وَلاَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ الْعَبْدُ وَفِيْ رِوَايَةٍ لاَ نَذْرَ فِيْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ -

'পাপ কাজ এবং বান্দা যার মালিক না তা হতে মান্নত পুরা করতে নেই। অন্য রেওয়ায়াতে আছে, আল্লাহর নাফরমানীতে মান্নত নেই।'

যেহেতু আবূ যরের স্ত্রী উটনীর মালিক ছিলেন না এজন্য এই নযর (মান্নত) বাতিল বলে গণ্য হয়।

দ্বিতীয় এই ঘটনা সংশ্লিষ্ট আলোচনার জন্যই মুসান্নিফ (রহ.) كتاب النذر এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

নাফরমানির মান্নতের হুকুম

কোন ব্যক্তি যদি পাপ কাজের মান্নত (যেমন হত্যা করার মান্নত) করে তাহলে সর্বসম্মতি রায় হলো এই মান্নত পুরা করা যাবে না। তবে এক্ষেত্রে কাফ্ফারা দিতে হবে কিনা এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। যথা ঃ

১। ইমাম শাফেঈ ও মালেকের (রহ.) মতে এতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা কাফ্ফারা দিতে হয় نذر منعقد তথা পূরণ যোগ্য সংঘটিত

মান্নতে। আর পাপ কাজে মান্নত সংঘটিত হয় না। তাঁদের দলীল উল্লেখিত হাদীস সহ ঐসব হাদীস যাতে পাপ কাজে মান্নত করাকে বাতিল বলে গণ্য করা হয়েছে এবং সেখানে কাফ্ফারার কথাও উল্লেখ নেই। যেমন আয়িশার (রা.) এক হাদীসে হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন—

مَنْ نَذَرَ اَنْ يُطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ وَ مَنْ نَذَرَ اَنْ يَعْصِ اللّٰهَ فَلاَيَعْصِهِ ـ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের মান্নত করে সে যেন তা পুরা করে আর যে পাপ কাজের মান্নত করে সে যেন তা বাস্তবায়িত না করে।"

২। ইমাম আহমদের (রহ.) মতে মান্নত সংঘটিত হবে কিন্তু মান্নত পুরা করা যাবেনা। তবে মান্নত করার কারণে কাফ্ফারা দিতে হবে। কারণ কাফ্ফারার বিষয়টা ব্যাপক। ভালো মন্দ সর্বপ্রকার মান্নতের ক্ষেত্রে কাফ্ফারা দিতে হয়। তাঁর দলীল হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস ঃ

اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِىْ مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ ـ (ابوداؤد)

যে ব্যক্তি নাফরমানীর মান্নত করল তার কাফ্ফারা হলো কসম ভঙ্গ করার কাফ্ফারার অনুরূপ। এমনীভাবে হযরত আয়িশার (রা.) এক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে— لاَ نَذَرَ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ ـ (ترمذى نسائى)

৩। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন—বিষয়টা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। যদি মান্নত কৃত কাজটি সরাসরি হারাম হয় তাহলে এই মান্নত বাতিল বলে গণ্য হবে। যেমন, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, মদপান, ব্যভিচার ইত্যাদির মান্নত করা।

যে সব হাদীসে কাফ্ফারার কথা উল্লেখ করা হয়নি সে সব হাদীস দ্বারা এ ধরনের পাপ কাজের মান্নত্ব বুঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে মান্নত কৃত পাপ কাজটি যদি সরাসরি পাপ না হয়–সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কারণে হয় তাহলে এসব মান্নত সহীহ্ এবং সংঘটিত হবে। যেমন ঈদের দিনে রোযা রাখার মান্নত করা। অবশ্য সেদিন রোযা রাখতে পারবেনা। পরে কোনদিন কাজা করবে অথবা কাফ্ফারা আদায় করবে। হযরত ইবনে আব্বাস ও আয়িশার (রা.) হাদীসে যে কাফ্ফার কথা বলা হয়েছে—সেটা এই প্রকারের মান্নতের জন্য প্রযোজ্য।

ولا فيما لا يملك العبد কথাটির ব্যাখ্যা

আহনাফের মতে মালিকানাহীন বস্তুতে মান্নত করার দু'টি পন্থা।

এক. শর্তবিহীন মান্নত। যেমন এরূপ বলা, لِلّٰهِ عَلَيَّ اَنْ اَعْتَقَ هٰذَا الْعَبْدَ আল্লাহর ওয়াস্তে এই গোলামকে আমি আযাদ করব। অথচ এই গোলামের সে মালিকই নয়। এধরনের মান্নত গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব যদি পরবর্তীতে সে এই গোলামের মালিকও হয় তথাপি সে আযাদ হবেনা।

দুই. শর্তযুক্ত মান্নত করা। অর্থাৎ মালিক হওয়ার শর্তে কোন গোলাম আযাদ করার মান্নত করে একথা বলা—"যদি আমি অমুক গোলামের মালিক হই তাহলে সে আযাদ, যদি অমুক জায়গার মালিক হই তাহলে সদকা করব ইত্যাদি। এ ধরনের মান্নত সহীহ্ হবে এবং তা পুরা করা ওয়াজিব। কুরআনে এ ধরনের মান্নত পুরা করার কথা বলা হয়েছে।

وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ۔ سورة التوبه الاية ٧٥

"তাদের মধ্যে একদল লোক আছে যারা প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হয় যে, আল্লাহ যদি আমাদেরকে অনুগ্রহ প্রদান করেন তাহলে আমরা দান-সদকা করব এবং আমরা নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হবো।" শাফেঈগণ فيما لا يملك العبد হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে বলেন, কোন কাফির যদি মুসলমানের সম্পদ লুট করে দারুল হরবে আশ্রয় নেয় তাহলে সে ঐ সম্পদের মালিক হবে না। বরং মুসলমানই এর মালিক থেকে যাবে। যেমন, উল্লেখিত ঘটনায় বলা হয়েছে যে, হুযূর (সা.)ই উটের মালিক ছিলেন। অন্যথায় কাফিররা এর মালিক হলে আবূ যর (রা.)-এর স্ত্রী গনীমত হিসেবে সেটার মালিক হতেন। অথচ হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝায় যায় তিনি সেটার মালিকই হননি।

কিন্তু আহনাফ বলেন, কাফিররা এর মালিক হবে বটে তবে শর্ত হলো দারুল হরবে সেটা সংরক্ষিত করে ফেলা। তাঁরা স্বীয় মতের পক্ষে নিম্নোক্ত আয়াত খানা পেশ করেন—

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ الخ ۔

কেননা মক্কায় সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তাঁদেরকে ফকীর বলা হয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয় যে এসব সম্পদ তাদের মালিকানা থেকে হাত ছাড়া হয়ে যায়।

উটের ঘটনার এই জওয়াব দেয়া হয় যে, লোকগুলো তখনও তাদের স্বীয় ঠিকানায় পৌছাতে পারেনি বরং রাস্তা থেকেই উট হাত ছাড়া হয়ে যায়। ফলে পরিপূর্ণ ভাবে হস্তগত না হওয়ায় তারা মালিক হয়নি।

আজবা এবং কাস্ওয়া এক উট কিনা?

অনেকের ধারণা আজবা ও কাস্ওয়া একই উটের দুই নাম। কিন্তু হাদীস দ্বারা বুঝা যায় এটা আলাদা দুটি উট। কেননা হুযূর (সা.) হিজরত করেন কাস্ওয়ার ওপর আরোহন করে, আর আজবা আটক করা হয় বনী আকীলের উল্লেখিত কয়েদি থেকে। আর এটি নিশ্চিতভাবেই হিজরতের পরের ঘটনা। সুতরাং আজবা ওকাস্ওয়া একই উট এমন ধারণা নিতান্তই ভুল। আবার অনেকের ধারণা উটটি কান কাটা ছিল বলে একে আজবা বলা হতো। কিন্তু ঐতিহাসিকদের মতে এটি কানকাটা ছিলনা। এমনীতেই এই লকব পড়ে যায় এটির। আল্লামা যমখশরী (রহ.) বলেন— عضباء-এর অর্থ খাটো হাত বিশিষ্ট হওয়া। সম্ভবতঃ উটটির হাত (সামনের পা) খাটো ছিল, এজন্য এর নাম হয় عضباء

হযরত আবূ হুরাইরা ও আনাস (রা.)-এর হাদীস

এই হাদীসে একজন বৃদ্ধ মানুষের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি স্বীয় পুত্রের কাধে ভর করে পদব্রজে সফর করছিলেন। হুযূর (সা.) কারণ জানতে চাইলে তাঁরা জানালেন, তিনি পদব্রজে চলার মান্নত করেছেন। হুযূর (সা.) বললেন এই লোকটি নিজ কর্তৃক কষ্টে নিপতিত হওয়া থেকে আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। এরপর তিনি লোকটিকে সওয়ারের ওপর আরোহণ করার নির্দেশ দিলেন।

হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু আলোচনা

১। কোন ব্যক্তি পদব্রজে বাইতুল্লাহ শরীফে ভ্রমণ করার মান্নত করলে আহনাফের اصول। অনুযায়ী সেই মান্নত সহীহ্ না হওয়ারই কথা। কেননা সহীহ্ হওয়ার জন্য শর্ত হলো মান্নত কৃত বস্তুটি ইবাদতে মাকসূদা হওয়া সেই সাথে ইবাদতটির একই শ্রেণীর কোন ওয়াজিব থাকা। যেমন, নামায, রোযা, ইত্যাদির মান্নত। কেননা ওয়াজিব ফারায়েয এর বহু নযীর রয়েছে।

অথচ দেখা যাচ্ছে পদব্রজে সফর করা ইবাদতে মাকসূদা (মুখ্য ইবাদত) ও নয় আবার ওয়াজিব ফারায়েযের ক্ষেত্রে এর কোন নযীরও নেই।

এতদসত্ত্বেও আহনাফ এ ধরনের মান্নতকে হাদীসের সমর্থনের কারণে সহীহ্ মনে করেন। তাছাড়া ভাষাবিদগণ বাইতুল্লাহর দিকে সফর (مشى الى بيت الله) বলে পদব্রজে ইহরাম (احرام ماشيا) বুঝিয়ে থাকেন। আর হজ্জ বা ওমরা ছাড়া ইহরামের অস্তিত্ব নেই। এজন্য কেমন যেন সে পদব্রজে ওমরা বা হজ্জেরই এ ইহরাম বেধেছে। আর এ কারণেই এই মান্নতকে সহীহ্ বলা হয়েছে। তবে বাইতুল্লাহর দিকে পদব্রজে সফর করার দ্বারা ওমরা না হজ্জ উদ্দেশ্য এটা নির্ভর করে ব্যক্তির নিয়তের ওপর।

অথবা এও বলা যেতে পারে যে, ওয়াজিবের ক্ষেত্রে বাইতুল্লাহ্ শরীফে পদব্রজে সফর করার নযীর রয়েছে। যেমন, সায়ি করা, তওয়াফ করা ইত্যাদি। সুতরাং মাসআলাটি আহনাফের উসূলের খেলাফ নয়।

২। পদব্রজে হজ্জ করার নিয়্যত করলে সেটা পুরা করা ওয়াজিব। সম্ভব হলে এভাবে করবে অন্যথায় বাহনের ওপর সওয়ার হয়ে সফর করবে। এতটুকুতে সকল ইমাম একমত। কিন্তু মতবিরোধ হলো, আরোহণ করায় তার ওপর কী ওয়াজিব হবে এনিয়ে।

* ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, সম্ভব হলে পদব্রজে সফর করবে অন্যথায় বাহন নিবে এবং এর কারণে একটি দম দিতে হবে।

* ইমাম আযমের মতে শক্তি থাকুক বা না থাকুক পদব্রজে সফর করা জরুরী নয়। বাহনে আরোহণ করবে এবং এর বদলায় একটি দম দিবে। ইমাম মালেকের এক মত এরূপই। আর এই দম (হাদী) একটি বকরী দ্বারাই আদায় হবে। তবে যে রেওয়ায়াতে উটের কথা বলা হয়েছে সেখানে মুস্তাহাব বুঝানো হয়েছে ওয়াজিব নয়।

* হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী তার ওপর কসমের কাফ্ফারা ওয়াজিব।

আহনাফ ও শাফেঈগণের দলীল

(١) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا فَلْيَهْدِ هَدْيًا وَلْيَرْكَبْ ـ (مستدرك حاكم)

“যে ব্যক্তি পদব্রজে হজ্জ করার মান্নত করে সে যেন একটি দম দেয় এবং বাহনে আরোহণ করে।

(٢) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ اَنْ تَمْشِىَ اِلَى الْبَيْتِ فَاَمَرَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تَرْكَبَ وَتَهْدِىْ هَدْيًا ـ (ابوداؤد)

"ওকবা ইবনে আমেরের এক বোন পদব্রজে হজ্জের নযর করলে হুযূর (সা.) তাঁকে আরোহন করার আদেশ দেন এবং এর বদলায় একটি (হাদী) দম দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। হাম্বলীগণ আবূ দাউদে বর্ণিত ওকবা ইবনে আমরের রেওয়ায়াত দ্বারা দলীল পেশ করেন। যথা ঃ

اِنَّهُ سَاَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اُخْتٍ لَّهُ نَذَرَتْ اَنْ تَحُجَّ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرُوْهَا فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ وَلْتَصُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ـ

হযরত ওকবা ইবনে আমের তাঁর বোন সম্পর্কে হুযূর (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, যিনি পদব্রজে এবং (মাথা ও মুখে) ওড়না ব্যবহার করা ছাড়া হজ্জ করার ইচ্ছা করেন। তখন হুযূর (সা.) বললেন, যাও তাঁকে গিয়ে বলো সে যেন ওড়না ব্যবহার করে, সওয়ারী হয় এবং এর বদলায় তিন দিন রোযা রাখে।

ইমাম ত্বহাভী (রহ.) (এর জওয়াবে) বলেন, ওকবার বোন খালি মাথায় থাকারও নযর করেছিলেন, যা সুস্পষ্টগুনাহ। এ কারণেই হুযূর (সা.) তাঁকে কাফ্ফারার আদেশ দেন।

অথবা এটাও হতে পারে যে, তিনি নযর ও কসম উভয়টা এক সাথে করেছিলেন। অর্থাৎ বাইতুল্লায় যাওয়ারও কসম করেন আবার নযরও করেন। একারণে হুযূর (সা.) তাঁকে কসম খাওয়ার কারণে কাফ্ফারা এবং নযরের কারণে দম দেয়ার আদেশ দেন।

তাছাড়া এ সম্ভবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না যে হুযূর (সা.) শুধু দম দেয়ার কথা বলেছিলেন, কিন্তু রাবী একে "কাফ্ফারা" শব্দে ব্যক্ত করেছেন। কেননা নযরের অর্থেও يمين শব্দটি প্রয়োগ হয়। অতঃপর অন্য কোন রাবী একে কসম ভঙ্গের কাফ্ফারা মনে করে রোযার কথা উল্লেখ করেছেন।

ওকবা ইবনে আমেরের হাদীসের ব্যাখ্যা

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ :

তিরমিযী শরীফেও এই রেওয়ায়াত উল্লেখ করা হয়েছে। তবে শব্দগত কিছু পার্থক্য রয়েছে। যথা ঃ كفارة النذر اذا لم يسم كفارة اليمين ـ আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজার রেওয়ায়াতে ইবনে আব্বাসের এক রেওয়ায়াতে এসেছে এরূপ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ এসব রেওয়ায়াত দ্বারা হযরত ওকবার হাদীস كفارة النذر كفارة اليمين-এর অর্থ সহজেই বুঝা যায়। আর তাহলো, এখানে ঐসব নযর উদ্দেশ্য যাতে নযরকৃত বিষয়টি উল্লেখ থাকেনা। যেমন রোযা বা নামায কোন কিছু উল্লেখ না করে এরূপ বলা ঃ لله على نذر

এসব ক্ষেত্রে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। তবে নির্দিষ্ট কোন ইবাদতের নিয়ত করলে সেটা পূরণ করা ওয়াজিব। সার কথা হলো, হাদীসে শর্তবিহীন (مطلق) নযরের কথা বলা হয়েছে যাতে নযরকৃত বিষয়ের উল্লেখ থাকে না। ইমাম আবূ হানীফা ও মালেক (রহ.) এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। ইমাম নববী (রহ.) বলেন, যে নযরের ক্ষেত্রে কসমের কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয় সেখানে নযর দ্বারা نذر لجاج উদ্দেশ্য। نذر لجاج বলা হয়; কারো সাথে কথা বলা থেকে বিরত থাকার ইচ্ছা করা এবং একারণে নিজের ওপর হজ্জ বা অন্য কোন ইবাদত ওয়াজিব করে নেয়া। যেমন, এরূপ বলা ان كلمت زيدا فعلى حجة 'যায়েদের সাথে যদি কথা বলি তাহলে আমার ওপর হজ্জ ওয়াজিব।' এরপর যদি সে কথা বলে তাহলে তার ইখতিয়ার রয়েছে। ইচ্ছা করলে সেই ইবাদতও করতে পারে অথবা কসমের কাফ্‌ফারাও দিতে পারে। এটাই অধিকাংশ শাফেঈদের মত।

আর ইমাম আহমদ ও অল্প সংখ্যক শাফেঈগণের মতে এই হাদীসে نذر معصيت তথা গুনাহর নযর উদ্দেশ্য। যেমন, মদপান, চুরি ইত্যাদির নযর করা।

কিন্তু শাফেঈ ও আহমদ নযর বলতে যে, نذرلجاج এবং نذر معصيت-এর অর্থ গ্রহণ করেছেন তা সম্পূর্ণ দলীল ছাড়া কথা এবং لم

يسمه-এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাছাড়া ইমাম আহমদ কর্তৃক নযর দ্বারা نذر معصيت উদ্দেশ্য নেয়া হাদীসের যোগসূত্রের (سياق) বিপরীত। কেননা ইবনে আব্বাসের পরবর্তী হাদীস نذر معصيت-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং আগের হাদীসেও যদি نذر معصيت উদ্দেশ্য হয় তাহলে অনর্থক দ্বিরক্তিকরণ (تكرار بلا فائدة) আবশ্যক হয়। ইবনে আব্বাসের (রা.) সেই হাদীস হলো—

مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِيْ مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ.

মোদ্দাকথা হলো, সার্বিক দিক বিবেচনায় এক্ষেত্রে আহনাফের মাযহাবই প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য।

كتاب الايمان : কসম অধ্যায়

يمين-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ :

ايمان শব্দটি يمين-এর বহুবচন। শাব্দিক অর্থ, শক্তি, মজবুত। একারণে ডান হাতকে يمين বলা হয়। কেননা ডান হাতে বাম হাতের তুলনায় শক্তি বেশি থাকে। এমনিভাবে কসমকারী ব্যক্তি কসম খেয়ে কোন কাজ করতে বা পরিত্যাগ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় তথা বিষয়টাকে মজবুত করে। এমনীভাবে আরবরা কসম খাওয়ার সময় সম্বোধিত ব্যক্তির ডান হাত ধরে রাখে বলে 'কসম'কে يمين বলা হয়। —তাজুল উরুস খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৩৭১

আর পরিভাষায় কসম বলা হয় تَوْكِيْدُ الشَّيْئِ بِذِكْرِاسْمٍ أَوْصِفَةٍ তথা আল্লাহর নাম বা সিফাত (গুণ) উল্লেখ করে কোন বিষয়কে মজবুত করা। এটি সবচেয়ে সহজ ও সংগতিপূর্ণ সংজ্ঞা। দুররে মুখতারে এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এরূপ—

اَلْيَمِيْنُ فِى اللُّغَةِ ، اَلْقُوَّةُ ، وَفِى الشَّرْعِ تَقْوِيَةُ اَحَدِ طرفى الْخَبَرِ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ (معجم الفقيه والمتفقه ، للشيخ حفظ الرحمن)

"يمين-এর শাব্দিক অর্থ শক্তিশালী, মজবুত।

আর পরিভাষায় يـمـيـن বলা হয়, এমন আকদ (প্রতিশ্রুতি)কে যার দ্বারা কসমকারী ব্যক্তির কোন কাজ করা বা পরিত্যাগ করার ব্যাপারে দৃঢ়তা বুঝায়।

কসম করার হুকুম

সীমাতিরিক্ত কসম খাওয়া মাকরূহ। وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ বলে আল্লাহ্ পাক এসব লোকদের নিন্দা করেছেন। তবে প্রয়োজনের সময় কসম খাওয়াতে কোন দোষ নেই। ক্ষেত্র বিশেষে কসম খাওয়া ওয়াজিব, মুস্তাহাব, মুবাহ, মাকরূহ ও হারাম হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ ঃ

১। নিরাপরাধ কোন ব্যক্তিকে নিশ্চিত ধ্বংশ থেকে বাঁচাতে কসম খাওয়া ওয়াজিব।

২। দুই শত্রুর মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে অথবা কারো অন্তর থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূর করতে অথবা কাউকে ক্ষতি থেকে বাঁচাতে কসম খাওয়া মুস্তাহাব।

৩। বৈধ কোন কাজে কসম খাওয়া মুবাহ।

৪। মাকরূহ কোন কাজ করতে অথবা মুস্তাহাব কাজ ছাড়ার জন্য কসম খাওয়া মাকরূহ।

৫। কোন গুনার কাজ করার জন্য অথবা ওয়াজিব কাজ ছাড়ার জন্য কসম খাওয়া হারাম।

মিথ্যা কসম খেয়ে কারো হক নষ্ট বা কারো সম্পদ গ্রাস করা মারাত্মক গুনাহ্।

يـمـيـن-এর প্রকারভেদ

يـمـيـن (কসম) তিন প্রকার। منعقدة , غموس এবং لغو

১। يـمـيـن منعقدة বলা হয় ভবিষ্যতে কোন কাজ করা বা না করার জন্য কসম খাওয়া। কসমের পর যদি সে অনুযায়ী আমল করে তাহলে কোন প্রকারের ধড় পাকড় করা হবে না। আর কসম পূরণে ব্যর্থ হলে কাফ্ফারা দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ

اَهْلِيْكُمْ اَوْكِسْوَتُهُمْ اَوْتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ -

(سورة المائدة، رقم الاية ٧٨)

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে لغو (অতীতের ভ্রান্ত) কসমের জন্য পাকড়াও করবেন না। কিন্তু ভবিষ্যত কসমের জন্য পাকড়াও করবেন। আর এর কাফ্ফারা হলো, দশজন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাবার খাওয়ানো কিংবা বস্ত্র প্রদান করা অথবা একজন গোলাম আযাদ করা। যার এসব করার সাধ্য নেই সে তিন দিন রোযা রাখবে। —সূরা মায়িদা ৮৯

উল্লেখ্য যে, উল্লেখিত মাসআলার ব্যাপারে সবাই একমত।

২। يمين غموس বলা হয়, জেনে শুনে অতীতের কোন কাজের জন্য মিথ্যা কসম খাওয়া। এর হুকুমের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেঈ ও আওযায়ীর মতে এক্ষেত্রেও কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা ও মালেকের মতে কাফ্ফারা ওয়াজিব নয়। বরং পাপের জন্য শুধুমাত্র তাওবা এস্তেগ্ফার করবে। ইমাম শাফেঈ দলীল হিসেবে বলেন يمين منعقده-এর বেলায় শাস্তিস্বরূপ কাফ্ফারার কথা বলা হয়েছে।

এদিকে كسب بالقلب তথা অন্তরের ক্রিয়ার ব্যাপারে مواخذة (পাকড়াও) শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ولكن يؤاخذكم بماكسبت قلوبكم কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরের কামাইয়ের কারণে পাকড়াও করবেন।"

আর يمين غموس ও অন্তরেরই কামাই। সুতরাং এতেও مواخذة (পাকড়াও) হওয়া উচিত। আর পাকড়াও হয়ে থাকে কাফ্ফারার মাধ্যমে। সুতরাং এই প্রকারের يمين-এর মধ্যেও কাফ্ফারা আসবে।

ইমাম আবূ হানীফাও ইমাম মালেক (রহ.) হযরত ইবনে মাসঊদের (রা.) একটি হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। যথা ঃ

"যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের মাল আত্মসাত করার জন্য মিথ্যা কসম খায় সে আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় মিলিত হবে যে, তিনি তার ওপর রাগান্বিত থাকবেন। দেখা যাচ্ছে যে, হাদীসে শুধু মাত্র গুনাহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে কাফ্ফারার প্রসঙ্গ আসেনি। কাফ্ফারা ওয়াজিব হলে রাসূল (সা.) অবশ্যই তা উল্লেখ করতেন।

জওয়াব ঃ ইমাম শাফেঈ مواخذه (পাকড়াও) এর কথা উল্লেখ করে যে দলীল পেশ করেছেন, এর জওয়াব হলো, এতে আখেরাতের مؤاخذة (পাকড়াও) এর কথা বলা হয়েছে। আর يمين منعقدة-এর ক্ষেত্রে দুনিয়াবী পাকড়াও উদ্দেশ্য। فكفارته বলে এরই তাফসীর করা হয়েছে।

৩। يمين لغو-এর সংজ্ঞায় ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, মানুষের মুখ থেকে ইচ্ছা ছাড়াই অহরহ যে সব কসমের বাক্য বের হয় তাকে يمين لغو বলে। অতীত বা ভবিষ্যতের সাথে এটা খাস নয়। যেমন لا و لله ، بلى والله বলা। ইমাম আহমদের (রহ.) একমত এরূপই। দলীল হিসেবে তাঁরা এই হাদীসটি পেশ করেন—

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ فِىْ قَوْلِ الرَّجُلِ لَا وَاللّٰهِ بَلٰى وَاللّٰهِ ـ (بخارى)

'আয়িশা (রা.) বলেন, لايؤاخذكم الخ আয়াতটি নাযিল হয় ঐসব লোকের ব্যাপারে যারা (কথায় কথায়) بلى والله ، والله لا ইত্যাদি শব্দে কসম খায়। —বুখারী

আহনাফের মতে অতীত বা বর্তমানের কোন বিষয়কে সঠিক মনে করে কসম খাওয়াকে يمين لغو বলে। অথচ বিষয়টি বাস্তবতার বিপরীত।

হযরত ইবনে আব্বাসের (রা.) মত এর স্বপক্ষে সমর্থন যোগায় তিনি বলেন— هُوَ الْحَلْفُ عَلٰى يَمِيْنٍ كَاذِبَةٍ وَهُوَ يَرٰى اَنَّهُ صَادِقٌ ـ

"তথা সত্য মনে করে মিথ্যা কোন কসম খাওয়া।"

ইমাম আহমদের অপর মত এরূপ।

এর হুকুম সম্পর্কে সকল ইমামগণ একমত যে, এর জন্য দুনিয়া আখেরাতে কেউ ধর পাকড়ের সম্মুখীন হবে না। আল্লাহ পাক বলেন لا يؤاخذكم الله باللغو فى ايمانكم "ভুল শপথের জন্য আল্লাহ পাক তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না।

باب لنهى عن الحلف بغير الله تعالى

অধ্যায় ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম খাওয়া সম্পর্কে

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ، قَالَ عُمَرُ : فَوَاللّٰهِ مَاحَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْهَا ذَاكِرًا وَلاَ اٰثِرًا وَفِىْ رِوَايَةٍ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ اَوْ لِيَصْمُتْ .

“হযরত ওমর (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। ওমর (রা.) বলেন, আল্লাহর শপথ! রাসূলের (সা.) মুখ থেকে একথা শোনার পর ইচ্ছাকৃত বা কারো কথা বর্ণনা করতে গিয়ে কোন দিন আমি অন্যের নামে শপথ করিনি।

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে, হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ যদি শপথ করতেই চায় সে যেন আল্লাহর নামেই শপথ করে অন্যথায় চুপ থাকে।

আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করার হুকুম

আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা হারাম। কেননা এতে গাইরুল্লাহর সম্মান করা হয়, যা একমাত্র আল্লাহর হক।

ওলামায়ে কিরাম বলেন, অন্যের নামে শপথ করা হারাম হওয়ার রহস্য হলো, কোন বস্তুর নামে শপথ করার অর্থ হলো তাকে সম্মান বা তা'যীম করা। আর সম্মান বা তা'যীমের মালিক যেহেতু একমাত্র আল্লাহ তা'আলা এজন্য অন্যের নামে শপথ করা নাজায়িয।

এই অধ্যায়ের হাদীস ছাড়াও আরো বহু হাদীসে গাইরুল্লাহর নামে শপথ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যথা ঃ

(١) فِىْ رِوَايَةٍ اَنَّهُ قَالَ : لاَ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ حَلَفَ بِالْمَسِيْحِ هَلَكَ وَالْمَسِيْحُ خَيْرٌ مِنْ اٰبَائِكُمْ ـ (مصنف ابن ابى شيبة)

হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করো না। এমনকি তোমাদের কেউ যদি হযরত ঈসা (আ.) এর নামেও শপথ করে তথাপি সে ধ্বংস হয়ে যাবে। অথচ ঈসা (আ.) তোমাদের বাপ-দাদার চেয়ে অনেক উত্তম। —মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা

(٢) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَحْلِفُوْا بِالطَّوَاغِىْ وَلاَبِاٰبَائِكُمْ ـ (مسلم)

"হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা মূর্তি এবং বাপ-দাদার নামে শপথ করো না।–মুসলিম

(٣) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَقُوْلُ : لاَ وَالْكَعْبَةِ فَقَالَ : لاَ تَحْلِفْ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَاِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ كَفَرَ وَاَشْرَكَ ـ ترمذى

"হযরত ইবনে ওমর (রা.) জনৈক ব্যক্তিকে কা'বার নামে শপথ করতে দেখে বললেন—আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নাম নিয়ে শপথ করোনা। কেননা রাসূল বলেছেন, যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে শপথ করল সে মূলতঃ কুফরী ও শিরক করল। —তিরমিযী

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন—

لَاَنْ اَحْلِفَ بِاللّٰهِ مِائَةَ مَرَّةٍ فَاٰثَمُ خَيْرٌ مِنْ اَنْ اَحْلِفَ بِغَيْرِهٖ فَاَبَرَّهٗ ـ

গাইরুল্লাহর নামে শপথ করে তা পুরা করার চেয়ে আল্লাহর নামে একশ বার শপথ করে তা ভঙ্গ করাকে আমি উত্তম মনে করি।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) বলেন—মানুষ অন্যের নামে ঐ সময় শপথ করে যখন তাকে সীমাতিরিক্ত তা'যীম ও তাকে বরকতময় মনে করে এবং তার ব্যাপারে ত্রুটি প্রদর্শন করাকে অপরাধ মনে করে। আর এ কারণেই তিনি বলেন— এধরনের বিশ্বাসের ফলে সে মুশরিক হয়ে যায়। এদিকে লক্ষ্য

করেই হুযূর (সা.) ধমকি স্বরূপ বলেছেন—এরূপ ব্যক্তি "শিরক ও কুফুরী করল।"

কোন ব্যক্তি যদি গাইরুল্লাহর নামে শপথ করে তাহলে শপথ সম্পাদিত হবে না এবং এর জন্য কাফ্ফারাও দিতে হবে না। অবশ্য কোন কোন হাম্বলী মতের অনুসারীগণ নবীর (সা.) নামে শপথ করাকে এর থেকে আলাদা করেন। তাঁদের মতে নবী করীম (সা.) এর নামে শপথকারী ব্যক্তির শপথ সম্পাদিত হবে এবং কসম ভঙ্গ হলে কাফ্ফারা দিতে হবে। কিন্তু এটি অত্যান্ত দুর্বল মত। হাম্বলীদের এই মতের কোন ভিত্তি নেই। তাই জমহুরের মতই গ্রহণযোগ্য, আর তা হলো গাইরুল্লাহর নামে শপথ করলে তা সম্পাদিত হয় না এবং এর কারণে কাফ্ফারাও দিতে হবে না।

অন্যের নামে আল্লাহর শপথ

গুটি কতক আলিমের ধারণা গাইরুল্লাহর নামে শপথ করা জায়িয, কেননা স্বয়ং আল্লাহ গাইরুল্লাহর নামে শপথ করেছেন। যেমন, والسماء، والطارق، والطور ইত্যাদি। তাছাড়া হুযূর (সা.)-ও এক গ্রাম্য ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলেছেন—افلح وابيه ان صدق তার পিতার শপথ! সত্যবাদী হলে সে সফলকাম হবে।

এ হাদীসটি হযরত ইমাম আবূ দাঊদ (রহ.)-এর নামায ও কসম অধ্যায়ে উল্লেখ করেছে এবং ইমাম মুসলিম (রহ.) কসম অধ্যায়ে এনেছেন।

কিন্তু তাঁদের এই ধারণা সম্পূর্ণই অমূলক। কেননা কোন বস্তুর গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে ওয়াকিফহাল করতে কোন মাখলুকের নামে শপথ করা আল্লাহর একান্তই ইখতিয়ারাধীন বিষয়। আল্লাহর শপথকে বান্দার সাথে তুলনা করা বোকামী ছাড়া আর কিছু নয়। لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ আল্লাহ তাঁর কর্মকাণ্ডের জন্য কারো কাছে জবাবদিহি করেন না কিন্তু অন্যদের স্বীয় কর্মকান্ডের জন্য জবাবদিহি হতে হয়।) তাছাড়া আল্লাহ যে সব বস্তুর শপথ করেন সেগুলো আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশ করে। সুতরাং চূড়ান্ত ফল হিসেবে আল্লাহই যেন আল্লাহর নামে শপথ করলেন।

অথবা এও বলা যেতে পারে যে, এসব ক্ষেত্রে رب শব্দ উহ্য আছে। অর্থাৎ ورب السماء، ورب الطور ইত্যাদি।

রাসূল (সা.) কর্তৃক জনৈক ব্যক্তির পিতার নামে শপথ করার ব্যাখ্যা

হুযূর (সা.) কর্তৃক গাইরুল্লাহর নামে শপথ করার ঘটনায় আলিমগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা (জওয়াব) প্রদান করেছেন। যথা ঃ ১। আল্লামা ইবনে আব্দুর বার (রহ.) বলেছেন—বাড়তি এই অংশটুকু (افلح وابيه ان صدق) সহীহ্ সনদে প্রমাণিত নয়। ইমাম মালেক (রহ.) এই হাদীস উল্লেখ করেছেন কিন্তু এই বাক্যটুকু উল্লেখ করেননি।

আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (রহ.) আরো বলেন, উল্লেখিত হাদীসের রাবী ইসমাঈল ইবনে জাফর (রহ.)-এর রেওয়ায়ায়াতে এসেছে–افلح والله ان صدق। এবং এ রেওয়ায়ায়াতটি افلح وابيه-এর রেওয়ায়ায়াত হতে উত্তম।

২। মূলত ঃ শব্দটি والله-ই ছিল। কিন্তু এতে বিবর্তন হয়ে وابيه-এর রূপ ধারণ করেছে। উভয় শব্দ লিখার পদ্ধতি প্রায় একই কেননা আগের যুগে নোক্তা ইত্যাদির প্রচলন ছিল না (যার ফলে উভয়টাকে একই মনে হত)।

৩। আল্লামা মাওয়ারী (রহ.)-এর মতানুসারে এটি গাইরুল্লাহর নামে শপথ নিষিদ্ধ হওয়ার আগের ঘটনা। সুতরাং এটি (গাইরুল্লাহর নামে শপথ) মানসূখ হয়ে গেছে। কিন্তু যেহেতু এর সঠিক সন তারিখ জানা নেই এজন্য নিছক ধারণার বশবর্তী হয়ে কোন কিছু মানসূখ হওয়ার দাবি করা অযৌক্তিক। শাহ্ সাহেব (রহ.) বলেন, নবীর (সা.) পবিত্র মুখ থেকে এধরনের শব্দ নির্গত হওয়াই অসম্ভব। নিষিদ্ধ হওয়ার আগে পরের কোন প্রশ্নই নেই।

৪। আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলেন, আরবগণ কসমের শব্দ দুই ভাবে ব্যবহার করে। এক. তা'যীম (কসমের) জন্য, দুই. তাকীদ বুঝানোর জন্য। সম্ভবনা আছে হুযূর (সা.) তা'যীমের জন্য এধরনের শব্দ প্রয়োগ করতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি তাকীদের জন্য এ শব্দ উল্লেখ করেছেন।

৫। আরবরা অভ্যাস মত অনেক সময় কসমের শব্দকে তাকীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকে, এর দ্বারা তারা কসম উদ্দেশ্য নেয় না। সুতরাং হুযূর (সা.) অভ্যাস অনুযায়ী তাকীদের জন্য এই বাক্য পাঠ করেছেন। আর কসমের জন্য ব্যবহার করতে বারণ করেছেন। (বাইহাকী ও নববী (রহ.) এই ব্যাখ্যা পছন্দ করেছেন) কিন্তু এই ব্যাখ্যায় প্রশ্ন জাগে যে, হযরত ওমর (রা.) তো তাহলে অভ্যাস অনুযায়ীই وابى وابى বলছিলেন। তাঁকে মানা করা হলো কেন?

৬। এখানে مضاف তথা رب শব্দ উহ্য রয়েছে। আসল এবারত এরূপ ورب ابيه

অন্যরা যেহেতু উহ্য রাখার নিয়ত করেনা এজন্য তাদেরকে এরূপ বলতে নিষেধ করা হয়েছে।

৭। এ ধরনের বাক্য প্রয়োগ কেবলমাত্র হুযূরের (সা.) জন্য খাস। কেননা গাইরুল্লাহর নামে শপথ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো এতে তার তা'যীম করা হয়। আর হুযূরের (সা.) ব্যাপারে এরূপ কল্পনাই করা যায় না এজন্য এটা শুধু মাত্র হুযূরের (সা.) জন্য জায়িয।

৮। কাজী বায়যাবী (রহ.) বলেন, وابيه ঐসব শব্দের অন্তর্ভুক্ত যাকে শুধুই তাকীদের জন্য উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এর প্রকৃত অর্থ বুঝানো হয় না। যেমন অনেক সময় حرف نداء-কে نداء-এর অর্থে প্রয়োগ না করে শুধু মাত্র নির্দিষ্টকরণ (اختصاص) এর অর্থে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

৯। আল্লামা শিব্বীর আহমদ (রহ.) বলেন, وابيك ، وابيه শব্দগুলো অনেক সময় আশ্চার্যবোধক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর এ অর্থে এ শব্দগুলো প্রয়োগ করা নিষেধ নয়। নিষেধ ঐ সময়, যখন কসমের অর্থে প্রয়োগ করা হয়।

১০। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রা) বলেন, নাহুবিদরা একটি ভুল করে বসে আছেন। তাঁদের ধারণা واو শুধুমাত্র কসমের অর্থে ব্যবহৃত হয়। অথচ একে শাহাদাতের অর্থেও প্রয়োগ করা যায়। এক্ষেত্রে তাতে কসমের গন্ধই থাকে না।

ওমরের (রা.) হাদীসের ব্যাখ্যা

قَالَ عُمَرُ : فَوَاللّٰهِ مَاحَلَفْتُ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْهَا ذَاكِرًا وَلَاَ اٰثِرًا .

ওমর (রা.) বলেন, রাসূলের (সা.) মুখ থেকে নিষেধের বাণী শোনার পর ইচ্ছাকৃত বা কারো কথা বর্ণনা করতে গিয়ে কোন দিন গাইরুল্লাহর নামে শপথ করিনি।

ذاكرا। অর্থ ইচ্ছাকৃত (কোন কিছু বলা) اثر-এর অর্থ নকল করা, ঘটনা প্রসঙ্গে কিছু বলা।

একথার উদ্দেশ্য হচ্ছে–ইচ্ছাকৃত ভাবে কোনদিন আমি বাপ-দাদার নামে শপথ করিনি এবং অন্যেরা করেছে সেটাও আমি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে মুখে উচ্চারণ করেনি। অবশ্য এক্ষেত্রে اثرا শব্দের আগে تكلمت শব্দযোগ করতে হবে। অর্থাৎ وماتكلمت بها اثرا।

এখানে اثرا-এর আরো দুটি অর্থের সম্ভাবনা আছে ঃ

১। اثرا অর্থাৎ مختارا আরবী বচন পদ্ধতি এমন اثرالشئى اذا اختاره। সুতরাং এর অর্থ দাড়াচ্ছে অন্য কোন শব্দের ওপর প্রাধান্য দিয়ে এসব শব্দ মুখে উচ্চারণ করিনি।”

২। اثر অর্থ تفاخر তথা পরস্পর গর্ব-অহংকার বোধ। আরবগণ বাপ-দাদার নামে যে সব গর্ব অহংকারের কথা উচ্চারণ করত সেগুলোকে তারা مائرة ـ مائر নামে অভিহিত করত। সুতরাং ওমর (রা.) এর কথার অর্থ দাড়াচ্ছে–আমি বাপ-দাদার مآثر স্বরণ করতে গিয়ে তাদের নামে শপথ করিনি।

আল্লাহ ও তাঁর সিফাত (গুন বাচক) শব্দে শপথ করা

قوله عليه السلام : فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ اَوْ لِيَصْمُتْ ـ

“যে শপথ করতে চায় সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে, অন্যথায় চুপ থাকে।”

আলোচ্য হাদীসে بالله বলে খাস ভাবে আল্লাহ শব্দই উদ্দেশ্য নয় বরং আল্লাহর সত্ত্বা উদ্দেশ্য। সুতরাং আল্লাহর নাম, সিফাত সবকিছু এর মধ্যে শামিল আছে।

একারণে ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, আল্লাহর নাম এবং সিফাত উভয়টি দিয়ে শপথ সম্পাদিত হবে। অবশ্য এতে কিছু তাফসীল (ব্যাখ্যা) রয়েছে।

* আল্লাহর নাম দুই ধরনের। এক. আল্লাহর জন্য খাস অন্য কারো জন্য ব্যবহৃত হয় না। দুই. আল্লাহর জন্য খাস নয় অন্যের জন্যও ব্যবহৃত হয়। উভয় প্রকার নাম দিয়ে শপথ করা যায়। প্রথম প্রকার তো বলাই বাহুল্য। দ্বিতীয় আম (ব্যাপক) হলেও কসমের ক্ষেত্রে আল্লাহর নামই বুঝায়। এমনকি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামের নিয়তও করে তথাপি ফয়সালার ক্ষেত্রে তা গ্রাহ্য হবে না। কেননা এটা বাস্তবতার বিপরীত।

* এমনিভাবে আল্লাহর গুণবাচক নাম তিন ধরনের। এক. আল্লাহর সাথে খাস, দুই. আল্লাহ এবং গাইরুল্লাহ উভয়ের সিফাত এবং উভয়ের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রয়োগ হয়। তিন. আল্লাহ এবং গাইরুল্লাহ উভয়ের সিফাত। কিন্তু গাইরুল্লাহর ক্ষেত্রে শব্দটি বেশি প্রয়োগ হয়। প্রথম দুই প্রকার নিয়ত ছাড়াই সহীহ্ হবে, আর তৃতীয় প্রকার নিয়ত করলে (কসম) সহীহ্ হবে অন্যথায় নয়।

গুণবাচক নামের এই বিভক্তি করণ বাহ্যিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। মা ওরায়ান্নাহারের আলিমগণ একে ওরফ ও রেওয়াজের ওপর নির্ভরশীল বলে মনে করেন। সুতরাং তাঁদের মতে রেওয়াজ অনুযায়ী যাকে কসমের জন্য প্রয়োগ করা হয় সেটা কসমের জন্য ধর্তব্য হবে, আর রেওয়ায়াজ যদি কসমের জন্য প্রয়োগ না করে তাহলে সেটা কসমের অর্থে প্রয়োগ হবে না।

باب ندب من حلف يمينا فراى غيرها خيرا منها ان ياتى الذى هوخير ويكفرعن يمينه

অধ্যায় ঃ কোন ব্যাপারে কসম (শপথ) করার পর উত্তম ভেবে তার বিপরীতটা করা প্রসঙ্গে

عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : اَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ رَهْطٍ مِنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ : وَاللّٰهِ لَا اَحْمِلُكُمْ وَمَاعِنْدِىْ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، قَالَ : فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اُتِىَ بِابِلٍ، فَاَمَرَ لَنَا بِثَلَاثِ ذَوْدٍ غُرِّالذُّرَى فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا اَوْقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ لَا يُبَارِكُ اللّٰهُ لَنَا. اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ اَنْ لَايَحْمِلَنَا، ثُمَّ حَمَلَنَا، فَاَتَوْهُ فَاَخْبَرُوْهُ فَقَالَ مَا اَنَاحَمَلْتُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَمَلَكُمْ وَاِنِّى وَاللّٰهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَآ اَحْلِفُ عَلٰى يَمِيْنٍ ثُمَّ اَرٰى خَيْرًا مِنْهَا اِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِىْ وَاَتَيْتُ الَّذِىْ هُوَخَيْرٌ -

সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি নিম্নরূপ

তাবুক যুদ্ধে আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) কে তাঁর সাথীবৃন্দ হুযূরের (সা.) কাছে প্রেরণ করেন কিছু বাহনের জন্য। আবূ মূসা (রা.) কতক সহচর নিয়ে হুযূরেব (সা.) দরবারে হাজির হন উটের দরখাস্ত নিয়ে। হুযূর (সা.) এসময় কিছুটা রাগান্বিত অবস্থায় ছিলেন। তিনি কসম করে বললেন, আমি তোমাদেরকে বাহন দিতে পারব না, তাছাড়া আমার কাছে দেওয়ার মত কোন বাহন নেই।

আবূ মূসা (রা.) অত্যান্ত চিন্তিত হয়ে সাথীদের কাছে ফিরে আসলেন এবং সকল ঘটনা শুনিয়ে দিলেন। এদিকে হুযূর (সা.) হযরত সা'দের (রা.) কাছ থেকে কয়েকটি উট ক্রয় করেন। অবশ্য কোন রেওয়ায়াতে গনীমতের উটের কথা বলা হয়েছে। হতে পারে গনীমতের উটই ছিল হুযূর (সা.) সা'দ থেকে সেই গনীমতের উটই ক্রয় করেন। অতঃপর হুযূর (সা.) বেলালের মাধ্যমে আবূ মূসার কাছে সংবাদ প্রেরণ করেন এবং উটগুলো গ্রহণ করতে বলেন। তিনি এও বলে দেন—

اِنَّ اللّٰهَ اَوْ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُكُمْ عَلٰى هٰؤُلَاءِ فَارْكَبُوْهُنَّ -

হুযূর (সা.) কতটি উট দিয়েছিলেন এ ব্যাপারে কিছুটা মতভেদ আছে। কোন রেওয়ায়াতে তিনটি এবং কোন রেওয়ায়াতে ছয়টির কথা বলা হয়েছে। উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য হয় এভাবে যে, দু'টি করে একসাথে বাধা ছিল এজন্য তিনটি বলা হয়েছে। এর দ্বারা তিন জোড়া (৬টি) বুঝানো হয়েছে। আর যেখানে ছয়টি বলা হয়েছে সেখানে মূল সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বুখারীর এক রেওয়ায়াতে পাঁচটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর জওয়াব হলো—কম সংখ্যা বেশি সংখ্যার বিপরীত নয়। আল্লামা আবুল হাসান সিন্ধী (রহ.) বলেন, মতবিরোধপূর্ণ এসব রেওয়ায়াতের কারণ হচ্ছে রাবীদের ভুলে যাওয়া। সুতরাং যে রেওয়ায়াতে বেশি সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে সেটিই গ্রহণযোগ্য।

আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) উট নিয়ে সাথীদের কাছে আসলেন এবং বললেন রাসূল (সা.) বললেন, এই নাও রাসূল (সা.) তোমাদেরকে এটা দান করেছেন। তবে তিনি এও বললেন, তোমাদের মধ্য হতে কয়েকজন আমার সাথে হুযূরের (সা.) কাছে যেতে হবে যাতে করে হুযূর (সা.) কর্তৃক প্রথমে না করা আবার দান করার ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে এবং আমার ব্যাপারে যেন কারো ভুল ধারণা সৃষ্টি না হয়। তাঁর সাথীবৃন্দ বললেন, খোদার কসম! তুমি আমাদের কাছে

সত্যবাদী তবে তোমার আশাও আমরা পূরণ করব। এরপর তাঁরা হুযূরের (সা.) কাছে ফিরে আসলেন। হুযূরের (সা.) কাছ থেকে যখন তাঁরা প্রত্যাবর্তন করলেন তখন মনে হলো—রাসূল (সা.) তো না দেয়ার কসম করেছিলেন হতে পারে তিনি ভুলে গেছেন। যদি তাঁকে স্মরণ করিয়ে না দেই তাহলে এই উটে আমাদের কোন বরকত হবে না। এসব চিন্তা ভাবনা করে তাঁরা হুযূরের (সা.) কাছে ফিরে আসলেন এবং তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। রাসূল (সা.) বললেন— مَا اَنَا اَحْمِلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَمَلَكُمْ আমি বাহন দেইনি আল্লাহ তোমাদেরকে বাহন দিয়েছেন।

এরপর তিনি বললেন—আল্লাহর কসম! যদি আমি কোন বিষয়ে কসম করি অতঃপর এর বিপরীত বিষয়কে উত্তম মনে করি তাহলে সেটিই করব এবং কসমের জন্য কাফ্ফারা প্রদান করব।

হানেছ (কসম ভঙ্গকারী) হওয়ার আগেই কাফ্ফারা আদায়ের হুকুম

قوله عليه السلام : وَاِنِّى وَاللّٰهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَا اَحْلِفُ عَلٰى يَمِيْنٍ ثُمَّ اَرٰى خَيْرًا مِنْهَا اِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِىْ وَاَتَيْتُ الَّذِىْ هُوَخَيْرٌ.

"আল্লাহর শপথ আমি যদি কোন বিষয়ে কসম করি অতঃপর তার বিপরীতটাকে ভালো দেখি তাহলে আল্লাহ চাহে তো সেটাই করব এবং এর জন্য কাফ্ফারা প্রদান করব।"

মাসআলা ঃ এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, কসম করার আগে যদি কেউ কাফ্ফারা দেয় তাহলে এই কাফ্ফারা ধর্তব্য হবে না।

কিন্তু কসম খাওয়ার পর ভঙ্গ করার পূর্বে কাফ্ফারা আদায় হবে কিনা এব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে।

এই মতবিরোধের ভিত্তি হলো কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার সবব (মূলকারণ) কোনটি সেটির ওপর।

১। ائمة ثلاثة বলেন কসম করাই কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার কারণ। তবে কাফ্ফারা আদায় করা ঐ সময় জরুরী (واجب الاداء) যখন কসম ভঙ্গ করা হয়। এর উদাহরণ "যাকাত"। কেননা যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হলো নেসাব পরিমাণ মাল হওয়া। আর আদায়ের জন্য শর্ত হলো বছর অতিক্রান্ত

(حولان حول) হওয়া। সুতরাং বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই যদি কেউ যাকাত আদায় করে দেয় তাহলে যাকাত আদায় হবে। ঠিক তদ্রূপ কসম করার পর حانث (ভঙ্গ করার) পূর্বে কেউ যদি কাফ্ফারা আদায় করে তাহলে তা আদায় হবে।

অবশ্য ইমাম শাফেঈ (রহ.) কিছু মাসআলার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র মতের অধিকারী। তাঁর মতে আযাদ করা, খানা খাওয়ানো এবং বস্ত্র পরিধানের কাফ্ফারা حانث হওয়ার পূর্বে আদায় করা গেলেও রোযার কাফ্ফারা তা করা যাবে না। তিনি এ দু'য়ের মাঝে এ কারণে পার্থক্য করেন যে, আর্থিক ইবাদত (عبادت ماليه) এর ক্ষেত্রে ওয়াজিব এবং আদায় (وجوب الاداء) এর পার্থক্য বিদ্যমান কিন্তু শারীরিক ইবাদতের ক্ষেত্রে এ ধরনের পার্থক্য চোখে পড়েনা।

তাছাড়া রোযা সময়ের পূর্বে আদায়ও করা যায় না। আর حنث (কসমভঙ্গ করা) কাফ্ফারার জন্য وقت, সুতরাং ওয়াক্ত আসার আগে (حانث হওয়ার পূর্বে) কাফ্ফারা আদায় করা যাবে না।

২। আহনাফের মতে কসম ভঙ্গ করার আগে কাফ্ফারা দিলে আদায় হবে না। পরে আবার আদায় করতে হবে।

দলীলসমূহ

ائمة ثلاثة নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। যথা ঃ

১। حديث الباب তথা এই অধ্যায়ের প্রথম হাদীস। কেননা এতে হুযূর (সা.) প্রথমে কাফ্ফারার কথা এর পর কসম ভঙ্গ করার কথা বলেছেন। এতে বুঝা যায় কসম ভঙ্গ হওয়ার পূর্বে কাফ্ফারা দেয়া যায়।

এমনিভাবে অন্যদেরকেও হুযূর (সা.) এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন—

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَاٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَلْيَفْعَلْ -

"যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে শপথ করে, এর পর বিপরীত বিষয়টি উত্তম মনে করে তাহলে সে যেন কাফ্ফারা দেয় এবং সেই কাজটি সম্পন্ন করে। —মুসলিম

আদী ইবনে হাতেমের রেওয়ায়াতে আছে— فَلْيُكَفِّرْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِىْ هُو خَيْرٌ ـ "সে যেন কাফ্ফারা দেয় এবং ভালো কাজটি সম্পন্ন করে।"

আব্দুর রহমান ইবনে সামুরার (রা.) রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে— فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ وَأْتِ الَّذِىْ هُو خَيْرٌ কাফ্ফারা আদায় করো অতঃপর (সেই ভালো) কাজটি সম্পন্ন করো।

২। কুরআনের আয়াত ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ـ আলোচ্য আয়াতে حلف (কসম করা)-কে কাফ্ফারার সবব (কারণ) আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় কসম করেই কাফ্ফারা আদায় করা যেতে পারে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ج فَكَفَّارَتُهُ الخ দেখা যাচ্ছে আয়াতে কসম ভঙ্গের প্রসঙ্গ ছাড়াই ايمان-এর পর পরম্পর সূত্র فاء শব্দ (فاء تعقيب) কে উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় يمين (শপথ) করেই কাফ্ফারা দেয়া যায়। কসম ভঙ্গের পর দেয়া জরুরী নয়।

আহনাফের দলীল সমূহ

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَاٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِىْ هُو خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ ـ

"যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে শপথ করল অতঃপর এর বিপরীতটিকে উত্তম মনে করল সে যেন সেটিই করে অতঃপর কাফ্ফারা আদায় করে দেয়।"

(٢) عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ .... وَلْيَأْتِ الَّذِىْ هُو خَيْرٌ وَلْيَتْرُكْ يَمِيْنَهُ ـ

"সে যেন ভালোকাজটি সম্পন্ন করে অতঃপর কসম ছেড়ে দেয় (কাফ্ফারা আদায় করে দেয়)।

৩। আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা (রা.)-কে হুযূর (সা.) বলেন—

يَاعَبْدَالرَّحْمٰنِ ! اِذَا حَلَفْتَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَاَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًامِنْهَا فَاْتِ الَّذِىْ هُوَخَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ -

যখন তুমি কোন বিষয়ে শপথ কর অতঃপর এর বিপরীতটাকে ভালো মনে করো—তাহলে আগে সেটা করো এবং পরে কাফ্ফারা দিয়ে দাও।

উল্লেখিত রেওয়ায়াতসমূহে আগে কসম ভঙ্গ করার কথা বলা হয়েছে অতঃপর কাফ্ফারা দিতে বলা হয়েছে।

তাছাড়া কাফ্ফারার বিধান রাখা হয়েছে কসম করার পর তা ভঙ্গ করায় আল্লাহর নামের যে অমর্যাদা করা হয়েছে তার ক্ষতিপূরণের জন্য। আর কাফ্ফারার আভিধানিক অর্থও এরূপ। শুধুমাত্র "শপথ"তো কোন অপরাধ নয় যে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। হুযূর (সা.) তো হাজার বার কসম করেছেন কিন্তু তা ভঙ্গ না করে তো কাফ্ফারা দেননি।

সুতরাং কাফ্ফারা যেহেতু ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এজন্য কসম ভঙ্গ করার আগে তা আদায় করা হলে কারণ (سبب) এর অস্তিত্বের আগেই مسبب-এর অস্তিত্ব এসে যায়। আর এটা কোন সময়ই গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন ঃ কোন ব্যক্তি যদি হজ্জ ফরয হওয়ার আগেই হজ্জ করে তাহলে তা যথেষ্ট নয় বরং পরে আবার আদায় করতে হয় এখানে কর ব্যাপারটাও ঠিক তাই।

ইমামগণ যে দু'টি আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেছেন, তার জবাব হলো—যেহেতু সুস্পষ্ট দলীল (نص) এবং কিয়াস দ্বারা সুপ্রমাণিত হয়েছে যে, কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার মূল কারণ হলো কসম ভঙ্গ করা (حنث) এজন্য আয়াতে اذاحنثتم শব্দ উহ্য ধরতে হবে। মূল ইবারত হবে এমন—

بِمَاعَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ج وَحَنِثْتُمْ فِيْهَا فَكَفَّارَتُهُ .

উহ্য রাখার বহু দৃষ্টান্ত আছে কুরআন শরীফে। যেমন—

فَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْعَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ -

সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, اوعلى سفر এরপর وافطرتم শব্দ উহ্য আছে। [আহকামুল কুরআন, ইমাম রাযী (রহ.)] দলীল হিসেবে তাঁরা যে সব

হাদীস পেশ করেছেন তার জওয়াব হলো—কতক রেওয়ায়াতে প্রথমে কাফ্ফারার কথা এবং পরে কসম ভঙ্গের কথা বলা হয়েছে। আর কতক রেওয়ায়াতে এর উল্টা প্রথমে কসম ভঙ্গ এবং পরে কাফ্ফারার কথা বলা হয়েছে।

লক্ষণীয় বিষয় হলো সবগুলো হাদীসে واو শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। আর واو عاطفه তারতীব (ক্রম বিন্যাস) বুঝায় না। এ কারণে এসব রেওয়ায়াত দিয়ে কাফ্ফারা আগে আদায়ের ব্যাপারে দলীল দেয়া যায় না। অবশ্য কিছু রেওয়ায়াতে ثم শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সেগুলোকে দু'ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মুসনাদে আহমদে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) এর রেওয়ায়াত এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

فَلْيَأْتِ الَّذِىْ هُوَخَيْرٌ ثُمَّ لِيُكَفِّرْعَنْ يَمِيْنِه -

"ভালো কাজটি আগে করবে অতঃপর কাফ্ফারা দিবে" আবূ দাউদে আব্দুর রহমান ইবনে সামুরার (রা.) রেওয়ায়াত এসেছে এরূপ— فكفرعن يمينك ثم ائت الذى هوخير মুস্তাদরাকে হাকিমে হযরত আয়িশা (রা.) এর রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে— كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِىْ ثُمَّ اَتَيْتُ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ -

যেহেতু রেওয়ায়াতগুলো বিরোধপূর্ণ কোনটা واو সহ কোনটা ثم সহ আবার কোনটাতে কাফ্ফারাকে আগে এবং কোনটাতে কসম ভঙ্গ করাকে আগে উল্লেখ করা হয়েছে সুতরাং বুঝা যায় সবগুলো হাদীসের মূল অর্থ (روايت بالمعنى) করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা যায় না বরং সবগুলো হাদীসের যা সার নির্যাস বের হয় এবং যে ব্যাপারে সবাই ঐক্যমত সেটা দ্বারা দলীল পেশ করা যেতে পারে। আর কসম ভঙ্গ করার পর কাফ্ফারা আদায় হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। সুতরাং কাফ্ফারা حانث হওয়ার পরেই আদায় করতে হবে। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) বলেন—কোন কোন সময় রাবীদের কারণে হাদীসের শব্দের মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয়, এর কারণ روايت بالمعنى

আর কোন হাদীসের রাবীগণ যদি নির্ভরযোগ্য (ثقه) হোন এবং হাদীসের শব্দের মধ্যে কোন বেশ কম না হয় তাহলে বুঝতে হবে এই শব্দ সরাসরী রাসূল

(সা.) থেকে এসেছে। আর সে সময় হুবহু হাদীসের লফ্জের অর্থ অনুযায়ী দলীল পেশ করা যাবে।

আর হাদীসের লফজের মধ্যে যদি পরিবর্তন হয় এবং রাবীগণ ছেকাহ, স্মৃতিশক্তি ইত্যাদি গুণে কাছাকাছি হয় তাহলে বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী দলীল পেশ করা যাবে না বরং সবগুলো হাদীসের সমষ্টি মিলিয়ে যে ভাবার্থ প্রকাশ পায় (এবং যে ব্যাপারে সবাই একমত) সেটা দলীল হবে। অধিকাংশ রাবীগণ সর্বদা মূল অর্থের প্রতি অধিক গুরাত্বরোপ করে থাকেন। আর যদি রাবীগণের মধ্যে মর্তবার ক্ষেত্রে কমবেশি হয় তাহলে ছেকাহ (নির্ভরযোগ্য) রাবীর রেওয়ায়াত যা বাস্তবতার অধিক নিকটবর্তী সেটা গ্রহণযোগ্য হবে। অতএব এই সূত্র ধরে একথা বলা যায় যে, আলোচ্য মাসআলায় কসম ভঙ্গ করার পর কাফ্ফারা আদায়ের ব্যাপারে যেহেতু সবাই একমত সুতরাং কসমভঙ্গের পরই কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, অধ্যায়–পরস্পরে বিরোধপূর্ণ হাদীসের সমাধান প্রসঙ্গ)

باب اليمين على نية المستحلف

অধ্যায় ঃ কসম তলবকারীর নিয়তের ওপর কসম নির্ভরশীল হওয়া প্রসঙ্গে

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِيْنُكَ عَلٰى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَيُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ ـ

(٢) وَعَنْهُ اَيْضًا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْيَمِيْنُ عَلٰى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ ـ

১। "তোমার সাথী (কসম তলবকারী) যেরূপ সত্যায়ন করবে তোমার কসম সেরূপই ধর্তব্য হবে।"

২। "হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন—কসমের ভিত্তি তলবকারীর নিয়তের ওপর।"

উভয় হাদীসের উদ্দেশ্য এক তথা কসম কার্যকর হবে সেভাবেই তলবকারী যেভাবে নিয়ত করবে। সুতরাং তাবীল বা কৌশল করে বাহ্যিক অর্থ পরিহার করে ভিন্ন কোন অর্থ গ্রহণ করা যাবে না।

ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যদি কাজীর দরবারে কোন হকের ব্যাপারে কসম নেয়া হয় এবং এই কসম তালাক বা আযাদ করার ব্যাপারে না হয় তাহলে এক্ষেত্রে বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য হবে এবং কোন তাবীলের অবকাশ থাকবে না। পক্ষান্তরে যদি উল্লেখিত তিনটি শর্তের কোন শর্ত পাওয়া না যায় তাহলে কসম কারীর নিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে।

শর্তগুলো হলো ঃ ১। কাজীর দরবারে শপথ করা, ২। হকের ব্যাপারে শপথ করা এবং ৩। তালাক বা আযাদ করার ব্যাপারে শপথ না হওয়া।

এ ব্যাপারে আহনাফের যে তাফসীল রয়েছে তার সার সংক্ষেপ হলো—শপথের ক্ষেত্রে কৌশল (তাওরিয়া) অবলম্বন করার পদ্ধতি প্রথমতঃ দুই প্রকার।

শপথের শব্দে ঐ ধরনের অর্থের সম্ভাবনা থাকবে অথবা থাকবে না।

শব্দের মধ্যে যদি ভিন্ন কোন অর্থের সম্ভাবনা না থাকে তাহলে বাহ্যিক অর্থই ধর্তব্য হবে। কসমকারী ব্যক্তি ভিন্ন কোন অর্থ গ্রহণ করতে পারবে না। আর শব্দটি যদি মূল অর্থ ছাড়া ভিন্ন কোন অর্থের সম্ভাবনা রাখে তাহলে এরও আবার দুই অবস্থা। হয়ত কসম হবে আল্লাহর নামে অথবা তালাক বা আযাদ করার জন্য। যদি আযাদের জন্য বা তালাকের জন্য কসম হয় তাহলে এক্ষেত্রে শপথকারী ব্যক্তির নিয়তই ধর্তব্য হবে।

আর যদি আল্লাহর নামে শপথ হয় তাহলেও তা দুই প্রকার। হয়ত শপথ তলবকারী জালেম হবে অথবা ন্যায়পরায়ণ হবে।

তলবকারী যদি জালেম হয় তাহলেও শপথকারীর নিয়ত ধর্তব্য হবে। আর যদি ন্যায়পরায়ণ হয় তাহলে হয়ত কাজীর পক্ষ থেকে শপথ নেয়া হবে অথবা অন্য কারো পক্ষ থেকে।

যদি কাজীর পক্ষ থেকে অথবা তার অনুমতিক্রমে অন্য কারো পক্ষ থেকে শপথ নেয়া হয় তাহলে শপথ তলবকারী (مستحلف) এর নিয়ত ধর্তব্য হবে। আর যদি কাজীর পক্ষ থেকে শপথ না নেয়া হয় তাহলে হয়ত বান্দাও তার প্রভুর মধ্যে শপথ হবে অথবা কাজী ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে শপথ কার্যকর করা হবে।

যদি বান্দা ও তার প্রভুর মধ্যে শপথ হয় তাহলে এক্ষেত্রে শপথকারীর নিয়ত ধর্তব্য হওয়ার ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই।

আর যদি কাজী ছাড়া অন্য কারো নির্দেশে শপথ করে তথাপি ইমাম নববীর (রহ.) মত অনুযায়ী কসমকারীর নিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে। আহনাফের এ ব্যাপারে

সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনা পাওয়া যায় না। অবশ্য মোল্লা আলী কারী (রহ.) মিরকাত গ্রন্থে ইমাম নববীর এই ইবারত উল্লেখ করেছেন এবং এর কোন সমালোচনা বা বিরোধিতা করেননি। যার দ্বারা বুঝা যায় আহনাফও এই মতামতের পক্ষে।

তাকমিলায়ে ফতহুল মুলহিম দ্রষ্টব্য

শপথ তলবকারী জালেম হওয়ার ক্ষেত্রে শপথকারীর নিয়ত ধর্তব্য—এই মাসআলাটি সুরাইদ ইবনে হানযালার রেওয়ায়াত থেকে নেয়া হয়েছে যা আবূ দাউদে উল্লেখ রয়েছে। তিনি বলেন—একবার আমরা হুযূরের (সা.) দরবারে আগমন করতেছিলাম। আমাদের সাথে ওয়ায়েল ইবনে হজর (রা.) ও ছিলেন। কিন্তু কোন এক শত্রু তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। আমার সাথীবৃন্দ কসম করতে ইতস্ততঃ করলে আমি কসম করে বলি "ইনি আমার ভাই" একথা শুনে শত্রুরা তাঁকে ছেড়ে দেয় (কেননা এরা হযরত সুরাইদের বন্ধু ছিল)।

ঘটনা শুনে হুযূর (সা.) বললেন—তুমি সত্য বলেছ, মুসলমান মুসলমানের ভাই المسلم اخو المسلم

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে, হুযূর (সা.) বলেন—

أَنْتَ كُنْتَ أَبَرَّهُمْ وَأَصْدَقُهُمْ، اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ـ

"তুমি তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো লোক এবং বড় সত্যবাদী, এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই।"

মোল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, কৌশল (তাওরিয়া) করা জায়িয নেই কেননা এতে অন্যের হক নষ্ট হয়।—মিরকাত

باب الاستثناء فى اليمين

অধ্যায় ঃ শপথের ক্ষেত্রে প্রভেদ করা

(١) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ لِسُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ سِتُّوْنَ امْرَأَةً ، فَقَالَ لَأَطُوْفَنَّ عَلَيْهِنَّ اللَّيْلَةَ فَتَحْمِلَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا فَارِسًا يُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةٌ فَوَلَدَتْ نِصْفَ إِنْسَانٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ اسْتَثْنٰى لَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا فَارِسًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاؤُدَ نَبِىُّ اللّٰهِ : لَاَطُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلٰى سَبْعِيْنَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ تَاْتِىْ بِغُلَامٍ يُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ اَوِالْمَلِكُ : قُلْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِىَ ، فَلَمْ تَاْتِ وَاحِدَةٌ مِنْ نِسَائِهِ اِلَّا وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ غُلَامٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَوْ قَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمْ يَحْنَثْ ، وَكَانَ دَرْكًا لَهُ فِىْ حَاجَتِهِ ـ

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ ঃ হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন—হযরত সোলায়মান (আ.)-এর ষাট জন মতান্তরে সত্তর জন স্ত্রী ছিল। একদিন তিনি বললেন আজ রাতে সকল স্ত্রীর সাথে মিলিত হবো। যাতে সবাই গর্ভবতী হয় এবং প্রতিটি সন্তান অশ্বারোহী মুজাহিদ হয়।

তাঁর কোন এক সাথী বা ফেরেস্তা ইনশাআল্লাহ বলতে বললেন। তিনি ভুলে যাওয়ায় আর বলার সুযোগ হয়নি। এতে করে একজন ছাড়া আর কেউ গর্ভবতী হয়নি। তাও গর্ভবতী মহিলাটি অসম্পূর্ণ একটি বাচ্চা প্রসব করে। হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন—যদি সোলায়মান (আ.) ইনশাআল্লাহ বলতেন তাহলে তিনি حانث (কসম ভঙ্গ কারী) হতেন না এবং এতে তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হত।

হাদীসের বিভিন্ন অংশের ব্যাখ্যা

كان لسليمان ستون امرأة হযরত সোলায়মানের (আ.) স্ত্রী কতজন ছিল—এ ব্যাপারে রেওয়ায়াতগুলো পরস্পরে বিরোধপূর্ণ। রেওয়ায়াতে ষাট, সত্তর, নব্বই এবং নিরানব্বই সংখ্যা পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে।

এর সমাধানে বলা যায় কম সংখ্যা বেশি সংখ্যার সাথে দ্বন্দ্বপূর্ণ নয়।

তাছাড়া এই বিরোধের কারণে হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কোন সংশয় নেই। কেননা রাবীদের কারণে হয়ত এতে সামান্য এই বিরোধ দেখা গেছে। এর কারণ হলো ঃ রাবীগণ মূলতঃ হাদীসের মূল ঘটনা খেয়াল রাখতেন। আনুষাঙ্গিক যাবতীয় বিষয়ের প্রতি এত খেয়াল করতেন না। এতে করে কিছুটা শাব্দিক বিরোধ হয়ে যেত।

فقال له صاحبك اوالملك : صاحب বলতে ফেরেস্তাকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা কতক রেওয়ায়াতে সন্দেহাতীতভাবে فَقَالَ له الملك বলা হয়েছে, صاحب শব্দ উল্লেখ করা হয়নি।

কেউ কেউ صاحب বলে সোলায়মান (আ.) এর সহচর আসিফ ইবনে বরখিয়াকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) একে ভুল ধারণা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

فلم يقل ونسى : فلم يقل বলতে এখানে মুখে উচ্চারণ না করা বুঝানো হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি ان شاء الله বলতে অস্বীকৃতি জানান। বরং এর অর্থ হলো তাঁর অন্তরে ছিল ঠিকই কিন্তু মুখে উচ্চারণ করতে ভুলে যান অথবা তাঁকে ভুলিয়ে দেয়া হয়।

হযরত সোলায়মান (আ.) বলেছিলেন لاطو فن عليهن الليلة আলোচ্য এই বাক্যে لام অক্ষরটি কসমের জবাবে (جواب قسم) উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে কসম উহ্য আছে, আর একারণেই সে অনুযায়ী আমল না হওয়ায় কসম ভঙ্গকারী (حانث) বলা হয়েছে।

অথবা এও সম্ভাবনা আছে যে, সোলায়মান (আ.) কসম করেননি বরং রূপকার্থে কসম ভঙ্গকারী বলা হয়েছে।

لم يحنث ঃ বাক্যের দু'টি অর্থের সম্ভাবনা আছে। যথা ঃ

১। যদি সোলায়মান (আ.) اِنْ شَاءَ اللّٰهُ বলতেন তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাসনা অনুযায়ী প্রত্যেক স্ত্রীর গর্ভে একেকজন মুজাহিদ সন্তান দান করতেন। আর এভাবেই তাঁর কসম পুরো হত এবং তিনি কসম ভঙ্গকারী (حانث) হতেন না। মনে রাখতে হবে যে, اِنْ شَاءَ اللّٰهُ বললেই মনের বাসনা পুরো হয়ে যাবে এটা জরুরী নয় কোন সময় তা নাও হতে পারে। হযরত খিযির (আ.)-কে মূসা (আ.) ধৈর্য্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন اِنْ شَاءَ اللّٰهُ বলেই কিন্তু তাঁর কথা পুরণ হয়নি। খিযির (আ.) তাই বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে বলেছিলেন ذلك تأويل مالم تستطع عليه صبرا তবে সোলায়মানের (আ.) ব্যাপারে হুযূর (সা.) মন্তব্য করেছিলেন ওহীর মাধ্যমে ধারণার ভিত্তিতে নয়।

২। لم يحنث-এর দ্বিতীয় অর্থ হলো : সোলায়মান (আ.) যদি প্রভেদকরণ (استثناء) হিসেবে انْ شَاءَ اللّٰهُ বলে দিতেন তাহলে কসম সম্পাদিত হত না এবং এর ব্যত্যয় ঘটায় তিনি কসম ভঙ্গকারী (حانث) হতেন না। এই অর্থের প্রতি খেয়াল করেই মুহাদ্দিসগণ হাদীসটিকে باب الاستثناء فى اليمين-এর অধীনে উল্লেখ করেছেন। ইমাম মুসলিম (রহ.) ও একারণেই হাদীসটিকে এখানে উল্লেখ করেছেন।

কসমের মধ্যে প্রভেদকরণের মাসআলা

কসম করার সময় ان شاء اللّٰه বলাকে استثناء فى اليمين বলা হয়। হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন— من حلف فقَالَ ان شاء اللّٰه فقد استثنى "যে ব্যক্তি শপথ করার সময় ان شاء اللّٰه বলল সে استثناء করল।"

এই নামের ব্যাপারে এবং এ ধরনের শপথে কসম ভঙ্গ না হওয়ার ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। কেননা হুযূর (সা.) বলেন–কসম করার সময় যে ব্যক্তি انْ شَاءَ اللّٰهُ বলবে তার কসম ভঙ্গ হবে না।

مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَقَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَلاَ حِنْثَ عَلَيْهِ ـ

হুযূর (সা.) আরো বলেন—

مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنٰى فَاِنْ شَاءَ فَعَلَ وَاِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حِنْثٍ ـ (ابوداؤد)

"যে ব্যক্তি শপথ করার সময় প্রভেদ করে সে ইচ্ছা করলে সেই কাজ করতেও পারে আবার তরকও করতে পারে।

১। জমহুরের মত হলো যদি শপতের সাথে সাথে ان شاءاللّٰه বলে তাহলে শপথ সম্পাদিত (منعقد) হবেনা। এমনকি যদি হাঁচি ও শ্বাস নেয়ার কারণে কিছুটা বিলম্ব হয় তথাপি শপথ সম্পাদিত হবে না।

এর দলীল ঃ من حلف فاستثنى ، الحديث কেননা এতে فاء অক্ষরটি উল্লেখ করা হয়েছে যা অবিচ্ছিন্নতার (تعقيب)-এর অর্থ প্রদান করে। তাছাড়া استثناء হলো বাক্যকে পূর্ণকারী সুতরাং خبر ـ مبتدا ، جزاء ، شرط-এর মত এটিও অবিচ্ছিন্ন (متصل) হওয়া জরুরী।

আরো কারণ আছে। কসমকারী কসম করে ফেললে এর হুকুম সাবেত হয়ে যায় এবং এর হুকুমে রদবদল করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সুতরাং যদি অবিচ্ছিন্ন (متصل) ভাবে ان شاء الله বলা জরুরী না হতো তাহলে মানুষ প্রতারণার আশ্রয় নিত এবং কসম ভঙ্গ করার পূর্ব মুহূর্তে ان شاء الله বলত। হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলেন—হুযূর (সা.) হযরত আব্দুর রহমানকে লক্ষ্য করে বলেন— اِذَا حَلَفْتَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَاَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْعَنْ يَمِيْنِكَ সুতরাং যদি অনেক বিলম্বে (ان شاء الله) استثناء বলা যেত তাহলে হুযূর (সা.) শুধু এতটুকু বলতেন انشاء الله বলো, তাহলে কসমই হলো না” এবং কাফ্ফারা দিতে হলো না। কিন্তু তা না বলে রাসূল (সা.) বলেছেন فكفرعن يمينك কসম ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা দাও।”

২। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ প্রমুখের মতে استثناء (প্রভেদকরণ) তথা সাথে সাথে ان شاء الله বলা জরুরী নয়। বরং দীর্ঘদিন পরেও বলা যেতে পারে। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (রহ.) চার মাস পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করেছেন। কতিপয় আলিম এই মতের জওয়াব দিতে গিয়ে বলেছেন, সম্ভবতঃ এত দীর্ঘ সময় পর বরকত লাভের জন্য ان شاء الله বলার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ বরকত লাভের জন্য ‘ইনশাআল্লাহ’ বলার নির্দিষ্ট কোন সময় নেই এবং যখনই মনে হবে তখনই তা বলতে পারবে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, যতদিন পরেই ان شاء الله বলুক কসম সম্পাদিত (منعقد) হবে না। হাসান বসরী, আতা প্রমুখের মতে কসমকারী যতক্ষণ পর্যন্ত মজলিসে বিদ্যমান থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ان شاء الله বলা যাবে। কতিপয় হাম্বলীর মতও এরূপ। আর কাতাদা (রহ.) বলেছেন—যতক্ষণ পর্যন্ত না দাঁড়াবে এবং অন্য কোন কথা না বলবে ততক্ষণ পর্যন্ত সুযোগ আছে। ইমাম আহমদ ও আওযায়ীর মতও এরূপ।

একটি রস ঘটনা

আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) تَبْيِيْضُ الصَّحِيْفَةِ فِىْ مَنَاقِبِ الْاِمَامِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) একটি ঘটনা বলতেন। ঘটনাটি হলো ঃ

একবার ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-কে খলীফা আবূ মানসুর দরবারে আসার অনুরোধ জানান। খলীফার প্রহরী রবী ইমামকে ঈর্ষা করত। সে খলীফাকে বলল, আমীরুল মুমিনীন! ইনি তো আপনার দাদা ইবনে আব্বাসের বিরোধিতা করেন। কেননা ইবনে আব্বাস বলেন দু'একদিন পরেও انشاء الله বলা যায় আর ইনি বলেন যায় না বরং সাথে সাথে বলতে হবে। এতদশ্রবণে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বললেন—আমিরুল মুমিনীন! রবী চাচ্ছে সৈন্যরা যেন আপনার সাথে কৃত অঙ্গীকার পুরা না করে। খলীফা বললেন—এটা কী করে সম্ভব?

আবূ হানীফা (রহ.) বললেন—সৈন্যরা আপনার সাথে কসম করে অঙ্গীকার করবে আর ঘরে গিয়ে استثناء করবে তথা انشاء الله বলবে এতে করে কসম বাতিল হয়ে যাবে। এরপর তারা আপনার বিরুদ্ধে যাবে!

একথা শুনে খলীফা হাসলেন এবং রবীকে লক্ষ্য করে বললেন–রবী! তুমি আবূ হানীফার পিছু বিরুদ্ধে যেও না। তিনি সত্যিকার অর্থেই একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, তুমি তাঁর সাথে কেটে উঠতে পারবে না! যখন আবূ হানীফা (রহ.) দরবার থেকে বের হচ্ছিলেন তখন রবী বলল—আপনিতো আমাকে মেরে ফেলছিলেন প্রায়! আবূ হানীফা (রহ.) বললেন—না, বরং তুমিই আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলে, কৌশল করে আমি ছুটে এসেছি মাত্র। —তারিখে ইবনে খালকান

দ্বিতীয় মতের অনুসারীদের দলীল

যাঁরা বলেন–সাথে সাথে استثناء (ইনশাআল্লাহ বলা) জরুরী নয় পরেও বলা যেতে পারে তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেন।

১। حديث الباب তথা এই অধ্যায়ের হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত সোলায়মান (আ.) কথা শেষ করার পর তাঁর সাথী বললেন— ان شاء الله বলুন। যদি সাথে সাথে ان شاء الله বলা জরুরী হত তাহলে ঐ সাথী কথা শেষ করার পর ان شاء الله বলার পরামর্শ দিতেন না।

২। আবূ দাউদে হযরত ইকরামার সনদে একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে—

عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَاللّٰهِ

لَاَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا وَاللّٰهِ لَاَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا وَاللّٰهِ لَاَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ثُمَّ سَكَتَ ثُمَّ قَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ۔

"রাসূল (সা.) বলেন—অবশ্যই আমি কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করব, (এরূপ তিনবার বলেন) অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ থাকেন এবং বলেন—আল্লাহ যদি চান, (اِنْ شَاءَ اللّٰهُ)।

শরীক (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একথা বলার পর কুরাইশদের সাথে রাসূলের (সা.) আর যুদ্ধ হয়নি। এতে দেখা যাচ্ছে যে, রাসূল (সা.) কসম করার পর চুপ থাকেন অতঃপর اِنْ شَاءَ اللّٰهُ বলেন। এতে বুঝা যায় দেরি করেও استثناء (প্রভেদ করা) তথা اِنْ شَاءَ اللّٰهُ বলা যায়।

জমহুরের পক্ষ থেকে এর জবাব

প্রথম দলীলের জবাব ঃ হাদীসে صاحب বলতে ফেরেস্তা বুঝানো হয়েছে। তাঁর বলা অর্থ অন্তরে জাগ্রত করা। আর ফেরেস্তা কর্তৃক বাক্য শেষ হওয়ার আগেই অন্তরে কোন বিষয় জাগ্রত করা অসম্ভব কিছু না। সুতরাং তিনি অবিচ্ছিন্নভাবে,
اِنْ شَاءَ اللّٰهُ বলতে সক্ষম ছিলেন।

অতএব হাদীসটি তাঁদের দলীল হতে পারে না। দ্বিতীয় কথা হলো اِنْ شَاءَ اللّٰهُ বলা হয় দুই উদ্দেশ্যে। এক. কোন কাজকে শর্তযুক্ত করার জন্য। দুই. বরকত লাভের আশায়। হতে পারে ফেরেস্তা শুধুমাত্র বরকত লাভের জন্য সোলায়মান (আ.)-কে اِنْ شَاءَ اللّٰهُ বলতে বলেছিলেন যাতে তিনি তাঁর কাঙ্খিত লক্ষ্য পৌছতে পারেন। কসমকে অসম্পাদিত (غير منعقد) করার জন্য বলেননি। দ্বিতীয় দলীলের জবাব হলো—হুযূর (সা.) বরকত লাভের জন্য اِنْ شَاءَ اللّٰهُ বলেছেন, কাজকে শর্তযুক্ত করার জন্য নয়। অথবা হুযূর শ্বাস প্রশ্বাস বা অন্য কোন কারণে অল্প সময় নীরব থেকেছেন। আর এটা اتصال (অবিচ্ছিন্নতার) মধ্যেই শামিল।

আহকামুল কুরআনে ইমাম জামসাস (রহ.) এই জওয়াব দিয়েছেন যে, ইকরামা থেকে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে—

وَاللّٰهِ لَاَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ فِىْ اٰخِرِهِنَّ : اِنْ شَاءَ اللّٰهُ

এর দ্বারা বুঝা যায় কসমের সাথে সাথেই استثناء (প্রভেদ) করেছেন।

উল্লেখিত রেওয়ায়াতটি ইমাম আবূ দাঊদ ও ইবনে হিব্বানও উল্লেখ রেছেন। আবূ দাঊদের রেওয়ায়াত ভঙ্গি এরূপ—

وَاللّٰهِ لَاَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ثُمَّ قَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ لَاَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ لَاَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ثُمَّ سَكَتَ ثُمَّ قَالَ : اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ـ

এর দ্বারা বুঝা যায় রাসূল (সা.) প্রথম দুই বার একসাথে اِنْ شَاءَ اللّٰهُ লেছেন। আর তৃতীয়বার এসে কিছুক্ষণ চুপ থেকেছেন হয়ত কোন ওজরের ারণে। অথবা এও হতে পারে প্রথম যে দুইবার اِنْ شَاءَ اللّٰهُ বলেছেন সেটার পর ভিত্তি করে চুপ থেকেছেন এবং পরে বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে তৃতীয় র اِنْ شَاءَ اللّٰهُ বলেছেন। যদি মেনেও নেয়া হয় যে, রাসূল (সা.) বিলম্ব করে اِنْ شَاءَ الّٰ বলেছেন, তাহলে আমরা বলব এটা হুযূরের (সা.) জন্য খাস, অন্য ারো এরূপ করার অনুমতি নেই। দুররে মানসূরে হযরত ইবনে আব্বাসের কটি রেওয়ায়াত উল্লেখ করা হয়েছে—

وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ قَالَ اِذَا نَسِيْتَ الْاِسْتِثْنَاءَ فَاسْتَثْنِ اِذَا ذَكَرْ قَالَ هِىَ خَاصَّةٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ لِاَحَدٍ يَسْتَثْنِىَ اِلَّا فِىْ صِلَةِ يَمِيْنِهِ ـ

"ভুলে যাওয়ার পর আপনার প্রভুকে স্মরণ করুন। হযরত ইবনে আব্বাস া.) বলেন, ভুলে যাওয়ার অর্থ হলো استثناء (প্রভেদ করা) ভুলে যাওয়া। তরাং এটা স্মরণ হওয়া মাত্র استثناء করুন তথা انشاء الله বলুন। তিনি ারো বলেন—এটা রাসূল (সা.) এর জন্য খাস, অন্য যে কেউ কসমের সাথে থে ان شاء الله বলবে। অতএব উল্লেখিত দলীল পেশ করা সহীহ্ নয়।

সুতরাং এক্ষেত্রে জমহুরের মতই প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য।

باب النهى عن الاصرار على اليمين

অধ্যায় ঃ (ক্ষতিকর) কসমে অটল থাকা নিষেধ প্রসঙ্গে

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَنْ يَلِجَ اَحَدُكُمْ بِيَمِيْنِهِ فِىْ اَهْلِهِ اٰثَمُ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ اَنْ يُعْطِىَ كَفَّارَتَهُ الَّتِىْ فَرَضَ اللّٰهَ ـ

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ ঃ কোন ব্যক্তি যদি স্বীয় পরিবার সম্পর্কে এমন কসম করে যা ক্ষতিকর এবং এই কসম ভঙ্গ করাতে গুনাহ নেই তাহলে তার উচিত হলো কসম ভঙ্গ করে কাফ্ফারা আদায় করা। এ কথা যেন না বলে কসম ভঙ্গ করা তো গুনাহের কাজ, ভঙ্গ করি কীভাবে?

কেননা কসমের ওপর অটল থেকে পরিবার পরিজনকে কষ্ট দেয়া কসম ভঙ্গ করার চেয়ে বড় গুনাহ।

প্রশ্ন : اٰثم ইসমে তাফজিলের (আধিক্যবোধক শব্দ) সীগা দ্বারা বুঝা যায় কসমের ওপর অটল থাকাও গুনাহ আবার কসম ভেঙ্গে কাফ্ফারা দেওয়াও গুনাহ। তাহলে কসম ভঙ্গ করায় লাভ হলো কী?

উত্তর : ১। রাসূল (সা.) ধরে নেওয়ার পর্যায়ে একথাটি বলেছেন। অর্থাৎ যদি মেনে নেওয়া হয় যে, কসম ভঙ্গ করায় গুনাহ হবে কিন্তু অটল থাকায় আরো বেশি গুনাহ।

২। কসমকারীর ধারণা অনুযায়ী একথা বলেছেন। অর্থাৎ কসমকারী ধারণা করে এতে তার গুনাহ হবে অথচ বাস্তবে সে গুনাহগার হবে না।

উল্লেখ্য যে, اهل বলতে শুধু নিজের পরিবারের লোকের জন্য এ হুকুম না বরং যেখানেই এ ধরনের কোন কারণ পাওয়া যাবে সেখানেই এই হুকুম প্রযোজ্য। একথাও মনে রাখতে হবে যে, হারাম কাজে কসম করা জায়িয নেই, এরকম কসম ভঙ্গ করা ওয়াজিব। আর মুস্তাহাব কাজ পরিত্যাগ করার কসম খাওয়া মাক্রূহ অবশ্য তা ভঙ্গ করা ওয়াজিব নয়, মুস্তাহাব।

باب نذر الكافر وما يفعل فيه اذا اسلم

অধ্যায় ঃ কাফিরের মান্নত এবং মুসলমান হওয়ার পর করণীয়

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنِّىْ نَذَرْتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اَنْ اَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ : فَاَوْفِ بِنَذْرِكَ

"ওমর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাহেলী যুগে মান্নত করেছিলাম মসজিদুল হারামে এ'তেকাফ করব বলে। রাসূল (সা.) বললেন, ঠিক আছে, তোমার মান্নত পুরা করো।

হাদীসের ব্যাখ্যা

হুযূর (সা.) মক্কা বিজয় করার পর তায়িফ ঘুরে জি'ইররানা নামক স্থানে অবস্থান নেন। তখন ওমর (রা.) এ কথাটি বলেন।

ان اعتكف ليلة বলে শুধু রাত উদ্দেশ্য নয় বরং রাতদিন উভয়টি উদ্দেশ্য। কেননা অন্যান্য রেওয়ায়াতে রাতের বদলে يوم বা দিনের কথা বলা হয়েছে। যেমন—

(١) جعل عليه يوما يعتكفه . (٢) ان اعتكف يوما . (٣) جعل عليه ان يعتكف فى الجاهلية ليلة اويوماعند الكعبة .

সব হাদীস মিলে যা ফলাফল বের হচ্ছে তাতে বুঝা যায় হযরত ওমর (রা.) এক দিন ও এক রাতের এ'তেকাফের মান্নত করেছিলেন। অতএব এ রেওয়ায়াতকে পুঁজি করে একথা বলা যাবে না যে, সুন্নাত এ'তেকাফ শুধুমাত্র রাতেও হতে পারে এবং এর জন্য রোযারও প্রয়োজন নেই।

একটি জরুরী মাসআলা

কাফির অবস্থায় মান্নত করে মুসলমান হয়ে তা পুরা করা ওয়াজিব কিনা এসম্পর্কে আলিমদের মধ্যে বিরোধ রয়েছে।

১। তাউস, কাতাদা, হাসান বসরী, আবূ ছাওর, শাফেঈর একদল, ইবনে হাযম, আহলে যাহের, ইবনে জারীর তাবারী প্রমুখের মতে মান্নত পুরা করা ওয়াজিব। কেননা রাসূল (সা.) امر (নির্দেশ) দিয়ে বলেছেন— فاوف بنذرك আর امر ওয়াজিবের অর্থ প্রদান করে।

২। জমহুর ওলামার মতে কাফিরের মান্নত সহীহ্ নয়। কেননা মান্নত সহীহ্ হওয়ার জন্য ইসলাম শর্ত। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন— انما النذر ما ابتغى به وجه الله। মান্নত এমন বিষয় যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুটি অর্জন করা যায়।" —ত্বাহাভী

আর কাফিরের কোন কাজই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয় না বরং গাইরুল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়। আর গাইরুল্লাহর নামে মান্নত করা পাপ। অথচ রাসূল (সা.) বলেন— لا نذر فى معصية পাপ কাজে মান্নত নেই।

সুতরাং কাফিরের মান্নত যেহেতু সুসম্পন্ন (منعقد) হয়না এজন্য তা পুরা করা ওয়াজিব নয়। হ্যাঁ পুরা করা মুস্তাহাব হতে পারে।

হুযূর (সা.) ওমর (রা.)-কে এই মুস্তাহাবের জন্যই فاوف بنذرك বলেছিলেন, ওয়াজিবের জন্য নয়।

باب صحبة المماليك

অধ্যায় ঃ গোলাম বাঁদীর সাথে আচরণ প্রসঙ্গে

عَنْ زَاذَانَ اَنْ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ : اَتَيْتُ اِبْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقَدْ اَعْتَقَ مَمْلُوْكًا ، قَالَ : فَاَخَذَ مِنَ الْاَرْضِ عَوْدًا اَوْ شَيْئًا فَقَالَ : مَافِيْهِ مِنَ الْاَجْرِ مَايَسْتَوِىْ هٰذَا اِلَّا اَنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ لَطَمَ مَمْلُوْكَهُ اَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ اَنْ يُعْتِقَهُ ـ

'যাযান (রহ.) বলেন, একদা আমি হযরত ইবনে ওমরের (রা.) কাছে আগমন করলাম। তিনি একটি গোলাম আযাদ করেছিলেন সে সময়। মাটি থেকে একটি কাঠের টুকরা বা এ জাতীয় কিছু হাতে নিয়ে বললেন—এই আযাদ করায় এই কাঠের টুকরা সমপরিমাণ সওয়াবেরও আশা করি না। কিন্তু আসল কথা হলো, হুযূর (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার গোলামকে চড়-থাপ্পড় দিবে তার কাফ্ফারা হলো সেই গোলামকে আযাদ করা।

তিনি এজন্য সওয়াবের প্রত্যাশা করেননি। কারণ তিনি তাকে আঘাত করেছিলেন। হুযূর (সা.)-এর কথা মত আযাদ করা ছিল কাফ্ফারা স্বরূপ।

সুতরাং আযাদ করার বিশেষ সওয়াব আঘাত করার ক্ষতিপূরণ হিসেবে মনে করেছেন তিনি।

فكفارته ان يعتقه কথাটির ব্যাখ্যা

আল্লামা নববী (রহ.) বলেন, সকল আলিম এ ব্যাপারে একমত যে, প্রহৃত গোলাম আযাদ করা ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব। ওয়াজিব না হওয়ার দলীল হযরত সুয়াদ ইবনে মুক্‌রিনের হাদীস-তিনি বলেন, রাসূলের (সা.) যুগে আমাদের একটি মাত্র গোলাম ছিল। একদা আমাদের মধ্য হতে কেউ তাকে আঘাত করে। ঘটনা শুনে রাসূল (সা.) বলেন—তাকে আযাদ করে দাও। রাসূল (সা.)-কে বলা হলো, তাদের গোলাম এই একটিই। তখন তিনি বললেন—আপাতত খেদমত গ্রহণ করো, সুযোগ হলে আযাদ করে দিও।

কাজী ঈয়ায (রহ.) বলেন—সামান্য পরিমাণ আঘাত করলে আযাদ করা ওয়াজিব না এ ব্যাপারে সবাই একমত। তবে যদি আগুন দিয়ে পোড়ায় অথবা অঙ্গহানী করে কিংবা বিনা কারণে প্রচন্ড আঘাত করে তাহলে ইমাম মালেক ও ফকীহ আবূ লাইছের মতে তাকে আযাদ করা ওয়াজিব। কিন্তু অন্যান্য আলিমদের মতে এক্ষেত্রেও আযাদ করা ওয়াজিব নয়।

ইসলাম এবং দাস প্রথা

ইসলাম প্রাক যুগ থেকেই দাস বানানোর প্রথা চালু ছিল। দাস বানানোর বিভিন্ন পন্থা নিম্নরূপ :

১। যুদ্ধে গ্রেফতারকৃত পুরুষ, বাচ্চা এবং নারীদের দাস-বাঁদী বানানো।

২। ডাকাতী করে গ্রেফতারকৃতদের দাস-বাঁদী বানানো।

৩। শিশু বাচ্চাকে চুরি করে তাকে দাস বানানো।

৪। ঋণী ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে তাকে দাস বানানো।

৫। ইউনানী দর্শন শাস্ত্রবিদ কর্তৃক মানুষকে শাসক ও শাসিত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্তি করণ এবং প্রথম শ্রেণীকে বুদ্ধিচর্চা ও দ্বিতীয় শ্রেণীকে দাসের মত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে নিয়োগ দান।

ইসলাম শুধুমাত্র প্রথম প্রকার বাকী রাখে এবং বাকী প্রথাগুলো বিলুপ্ত ঘোষণা করে।

তবে নিম্নোক্ত দিকগুলো বিবেচনায় দাস প্রথা একেবারে বিলুপ্ত করা হয়নি—

১। ঐ যুগে ব্যাপক আকারে দাস-বাঁদীর প্রচলন ছিল। যদি এই প্রথা একদম বাতিল করে দেয়া হতো তাহলে মুসলমান সহ অন্যান্যরা চরম ক্ষতির সম্মুখীন হত।

২। যুদ্ধে গ্রেপ্তার মুসলমানদেরকে কাফিররা গোলাম বানিয়ে রাখত। কাফির বন্দিদেরকে যদি গ্রেপ্তার করে আযাদ করে দেয়া হয় তাহলে মুসলমানদের শক্তি হ্রাস পাবে এবং কাফিরদের শক্তি উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাবে।

৩। যদি গ্রেফতার করে আযাদ করে দেয়া হয় তাহলে মুসলমানদের ক্ষতি হবে, আবার জেলখানায় বন্দি করে রাখলে অসংখ্য মানুষ বেকার বসে থাকবে। এজন্য সবচেয়ে উত্তম পন্থা হলো বন্দি করে তাদের থেকে লাভবান হওয়া।

উল্লেখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করে দাস প্রথা একেবারে বিলুপ্ত করা হয়নি।

কয়েদ করে হত্যা করার চেয়ে এতটুকু ইহসানের কী কোনই মূল্য নেই?

তবে ইসলাম দাস প্রথা চালু রাখলেও দাসদের সাথে উত্তম আচরণের আদেশ দিয়েছে। এমনকি তাদেরকে প্রায় আযাদ লোকদের সমপরিমাণ মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

এরপর পর্যায়ক্রমে আযাদ করার ফযীলত এবং আযাদ করার ক্ষেত্র বর্ণনা করা হয়েছে যাতে করে আস্তে আস্তে দাস প্রথা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়।

সাধারণ ঘটনার কারণেও দাস আযাদ করার কথা বলা হয়েছে। আর মুসলমানরাও অত্যন্ত উদ্দীপনার সাথে এর ওপর আমল করেছেন। নমুনাস্বরূপ হুযূর (সা.) ও কয়েক জন সাহাবীর আযাদকৃত গোলামের সংখ্যা দেয়া হলো ঃ হুযূর (সা.) ৬৩ বছর যিন্দেগীতে ৬৩জন, হযরত আয়িশা (রা.) ৬৯জন, আব্বাস (রা.) ৭০ জন, হাকিম ইবনে হেযাম (রা.) ১০০ জন, ইবনে ওমর (রা.) ১,০০০ (একহাজার), যুলকিলা' হোমায়রি একদিনে ৮ হাজার, এবং আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) ৩০ হাজার গোলাম আযাদ করেন।

দাস-বাঁদীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া নিষেধ

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ بِالزِّنَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ كَمَا قَالَ : وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ نَبِىَّ التَّوْبَةِ ـ

"আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, হুযূর (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি (নিজের অধীন) দাস-বাঁদীকে ব্যভিচারের অপবাদ দিবে কেয়ামতের ময়দানে তাকে অপবাদের শাস্তি প্রদান করা হবে। তবে হ্যাঁ, যদি তারা সত্যিই অপরাধী হয় তাহলে ভিন্ন কথা।

মাসআলা ঃ মালিক নিজের গোলাম বাঁদীকে ব্যভিচারের অপবাদ দিলে দুনিয়াতে এর জন্য সে শাস্তির সম্মুখীন হবে না। শুধু মালিকই নয় অন্য যে কেউ অপবাদ দিলে একই হুকুম অর্থাৎ গোলাম বাঁদীকে অপবাদ দেয়ার কারণে حد قذف (অপবাদের শাস্তি) কার্যকর হয় না। কেননা এই শাস্তি কার্যকর হওয়ার জন্য শর্ত হলো যাকে অপবাদ দেয়া হয় সে আযাদ ব্যক্তি হওয়া।

অবশ্য অপবাদ দেয়ার কারণে تعزير (প্রশাসনিক শাস্তি) কার্যকর হবে।

نبى التوبة উপাধির কারণ

نبى التوبة নবী করীম (সা.)-কে নবীয়ে তাওবা বলা হয়। এর কারণ নিম্নরূপ ঃ

১। হুযূরের (সা.) উম্মত অন্তরে অনুশোচনা নিয়ে খাঁটি ভাবে মৌখিক তাওবা করলে তাওবা কবুল হয় অথচ আগের যুগের অনেক উম্মতের তাওবা ছিল নিজের জীবন বিসর্জন দেয়া।

তাওবার ক্ষেত্রে এই উম্মতের ব্যাপারে নমনীয়তার কারণে হুযূর (সা.)-কে نبى التوبة বলা হয়।

২। توبة-এর অর্থ কুফরী পরিত্যাগ ও ইসলাম গ্রহণ করা। যেহেতু নবীর হাতে অসংখ্য লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে—যা অন্য নবীর বেলায় ঘটেনি–এজন্য হুযূর (সা.)-কে نبى التوبة বলা হয়।

আবূ যর গিফারী (রা.)-এর হাদীস

عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ : مَرَرْنَا بِاَبِىْ ذَرٍّ بِالرَّبْذَةِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلٰى غُلَامِهِ مِثْلُهُ ، فَقُلْنَا يَا اَبَاذَرٍّ ! لَوْجَمَعْتَ بَيْنَهُمَا كَانَتْ حُلَّةً فَقَالَ : اِنَّهُ كَانَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ اِخْوَانِىْ كَلَامٌ وَكَانَتْ اُمُّهُ اَعْجَمِيَّةً فَعَيَّرْتُهُ بِاُمِّهِ فَشَكَانِىْ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا اَبَاذَرٍّ ! اِنَّكَ امْرُؤٌ فِيْكَ جَاهِلِيَّةٌ قُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! مَنْ سَبَّ الرِّجَالَ سَبُّوْا اَبَاهُ وَاُمَّهُ ، قَالَ :

يَا اَبَاذَرٍّ ! اِنَّكَ امْرُؤٌ فِيْكَ جَاهِلِيَّةٌ . هُمْ اِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَاطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ وَاَلْبِسُوْهُمْ مِمَّا تَلْبِسُوْنَ وَلَا تُكَلِّفُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ ، فَاِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ فَاَعِيْنُوْهُمْ .

"মা'রূর ইবনে সুয়াইদ বলেন—আমরা রাবদা নামক স্থানে হযরত আবূ যর (রা.) এর পাশ দিয়ে (কোথাও) যাচ্ছিলাম।

এ সময় তাঁর ও তাঁর গোলামের গায়ে একই ধরনের দু'টি কাপড় ছিল। আমরা আবূ যর (রা.)-কে বললাম, আবূ যর! দু'টি কাপড় একত্রিত করলে তো জোড়া কাপড় হত! বুখারীর রেওয়ায়াতে আছে— عليه حلة وعلى غلامه حلة .

حلة বলা হয় জোড়া কাপড়কে, এক কাপড়কে কখনও حلة বলা হয় না। দেখা যাচ্ছে, বুখারীর রেওয়ায়াত মুসলিমের রেওয়ায়াতের সাথে দ্বন্দ্বপূর্ণ। কেননা মুসলিমের রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে এক কাপড় আর বুখারীতে বলা হয়েছে জোড়া কাপড়। উভয় রেওয়ায়াতকে এভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যায় যে, এ সময় আবূ যর ও তার গোলামের গায়ে একটি করে উত্তম ও একটি নিম্ন মানের কাপড় (চাদর) ছিল। তাঁকে বলা হয়েছিল আপনী গোলাম থেকে উত্তম চাদরটি নিতে পারতেন? একথা শুনে তিনি বললেন–একলোক (জনৈক গোলাম) এর সাথে আমার কথা কাটাকাটি হয়। তার মা ছিল অনারবী ' আমি তার মায়ের নাম ধরে গালি দেই। লোকটি হুযূরের (সা.) দরবারে অভিযোগ করলে আমি বললাম, মানুষ কাউকে গালি দিলে তাঁর বাপ-মার নাম নিয়েই দেয়। একথা শুনে রাসূল (সা.) বললেন, আবূ যর! তোমার মধ্যে এখনও জাহিলী যুগের বদ অভ্যাস রয়েছে। তারা তোমাদের ভাই, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা যা খাবে, পরিধান করবে তাদেরকেও তাই খাওয়াবে পরিধান করাবে। তাদেরকে মাত্রাতিরিক্ত কোন কাজে নিয়োগ দিবে না। নিয়োগ দিতে হলে নিজেরা যথাসাধ্য সহযোগিতা করবে।

ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, আমার ধারণা আবূ যর (রা.) অজ্ঞতা বশত এরূপ করেছিলেন জেনে-শুনে নয়।

এ কারণেই তিনি বলতেন–এই বয়সেও আমার কাছে বিষয়টি দুঃখজনক থেকে গেল।

রেওয়ায়াত সংশ্লিষ্ট কিছু ব্যাখ্যা

হযরত আবূ যর (রা.) ওসমান (রা.) এর খেলাফত কালে তাঁর ওপর কোন কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে রাব্বা নামক স্থানে বসবাস করতে থাকেন এবং মৃত্যু (৩২ হিঃ সাল) পর্যন্ত এখানেই কাটিয়ে দেন। তাঁর কবরস্থানও সেখানে। এটি মদীনা থেকে তিন দিনের দূরত্বে হিজাযের পথে অবস্থিত একটি গ্রামের নাম।

হাদীস সংশ্লিষ্ট মাসআলা

হাদীসের বাহ্যিক অর্থের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় অন্ন-বস্ত্র ইত্যাদিতে মালিক ও দাসের মধ্যে সমতা বজায় রাখা জরুরী (ওয়াজিব)। কিন্তু আলিমগণ একে মুস্তাহাব বলেছেন। অবশ্য সমাজের রীতি অনুযায়ী অন্ন-বস্ত্র দেয়া ওয়াজিব। এর চেয়ে বেশি দেয়া মুস্তাহাব। আবূ হুরাইরার (রা.) এক হাদীসে বলা হয়েছে গোলামকে তার চাহিদা অনুযায়ী (সামাজিক রীতিমত) অন্ন-বস্ত্র দিতে হবে।

للمملوك طعامه وكسوته

ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهٖ وَاَحْسَنَ عِبَادَةَ اللّٰهِ فَلَهٗ اَجْرُهٗ مَرَّتَيْنِ -

"গোলাম যখন তার মুনীবের কল্যাণ কামনা করে এবং আল্লাহর ইবাদত উত্তম ভাবে সম্পন্ন করে তার জন্য তখন দ্বিগুণ সওয়াব লাভ হয়। আল্লামা ইবনে আবদিল বার (রা.) বলেন, গোলামের ওপর দু'টি দায়িত্ব (ফরয) বর্তায়। এক. আল্লাহর ইবাদত করা দুই. মুনীবের আনুগত্য করা। এজন্য তার দ্বিগুণ সওয়াব। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) তাঁর এই মতটি প্রত্যাখান করে বলেছেন, দুই ফরয কাজের জন্য যদি দ্বিগুণ সওয়াব হয় তাহলে এতে গোলামের বৈশিষ্টের কিছু নেই। আসল কথা হলো, সীমাতিরিক্ত কষ্ট স্বীকার করে বলে গোলামের দ্বিগুণ সওয়াব লাভ হয়। অথবা বলা যেতে পারে দ্বিগুণ সওয়াব হবে ঐ সময় যখন একই কাজ একদিকে আল্লাহর ইবাদত অপর দিকে মুনীবের আনুগত্য বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং এক আমল করেই দুইদিক বিবেচনায় গোলাম দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হবে।–ফতহুল বারী।

গোলামের একাংশ আযাদ করা

(١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِىْ عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيْمَةَ الْعَدْلِ ـ فَاَعْطٰى شُرَكَائَهُ حِصَصَهُمْ وَعُتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَاِلَّا فَقَدْ عَتِقَ مِنْهُ مَاعَتَقَ ـ

(٢) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اَعْتَقَ شَقِيْصًا لَهُ فِىْ عَبْدٍ فَخَلَاصُهُ فِىْ مَالِهِ اِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اِسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ ـ

১। "ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন—যে ব্যক্তি তার যৌথ মালিকানাধীন গোলামের নিজস্ব অংশ আযাদ করে এবং তার কাছে এতটুকু সম্পদ আছে যা গোলামের মূল্য পরিমাণ হতে পারে তাহলে ন্যায় সঙ্গত মূল্য ধরে অন্যান্য অংশীদারকে মূল্য পরিশোধ করে দিবে এবং এভাবে পুরো গোলাম তার পক্ষ থেকে আযাদ হয়ে যাবে, অন্যথায় ঐ সামান্য অংশই আযাদ হবে।"

২। হুযূর (সা.) বলেন—শরীকানা গোলামের নিজস্ব অংশ আযাদ করে দিলে বাকি অংশও নিজের সম্পদ থেকে আযাদ করতে হবে যদি সম্পদ থাকে আর তা না হলে গোলাম সাধ্যমত শ্রম দিয়ে মূল্য পরিশোধ করে দিবে।

গোলামের কিছু অংশ আযাদ করার হুকুম

শরীকানা গোলামের একাংশ আযাদ করার হুকুম, অপর শরীকের করণীয়, বাকী অংশের মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ইমামগণের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। ইমাম নববী (রহ.) এ সম্পর্কে ১০ মাযহাব, আল্লামা আইনী (রহ.) ১৪ মাযহাবের কথা উল্লেখ করেছেন।

গুরুত্বের বিবেচনায় এর মধ্য থেকে আমরা তিনটি মাযহাব উল্লেখ করছি।

১। ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) মাযহাব

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন—আযাদকারী হয়তো সম্পদশালী হবে অথবা দরিদ্র হবে। সম্পদশালী হওয়ার অর্থ—অপর শরীককে গোলামের মূল্য দিয়ে ছাড়িয়ে নেয়ার সাধ্য থাকা। আর এই সাধ্য না থাকাই দারিদ্র্যতা।

আযাদকারী শরীক দরিদ্র হলে, অন্য শরীক দু'টি পন্থার কোন একটি পন্থা অবলম্বন করবে। এক. সেও আযাদ করে দিবে, দুই. মূল্য উসূল করার জন্য গোলামকে কাজে খাটাবে। আর আযাদকারী সম্পদশালী (موسر) হলে, অপর শরীকের তিনপন্থার কোন একপন্থা অবলম্বনের সুযোগ থাকবে। যথা : এক. নিজের অংশ আযাদ করা, দুই. গোলামকে কাজে খাটানো, তিন. تضمين তথা আযাদকারী শরীক থেকে মূল্য উসূল করে নেয়া।

আযাদকারী শরীক যদি তৃতীয় পন্থা মেনে নেয় তাহলে সেই গোলামের ولاء (পরিত্যক্ত সম্পদ) এর মালিক হবে এবং তাকেই প্রকৃত আযাদকারী মানতে হবে। তবে গোলামের কাছ থেকে সে মূল্য আদায় করে নিবে; যতটুকু সে অপর শরীক কে প্রদান করেছিল।

অপর শরীক যদি প্রথম দুই পন্থার কোন এক পন্থা অবলম্বন করে তাহলে উভয়েই ولاء (গোলামের পরিত্যক্ত সম্পদ) এর মালিক হবে।

২। সাহেবাঈনের (রহ.) মাযহাব

সাহেবাঈনের মতে আযাদকারী যদি দরিদ্র হয় তাহলে অপর শরীক শুধুমাত্র কাজে নিয়োগ করার অধিকার লাভ করবে। আর আযাদকারী শরীক যদি ধনী হয় তাহলে অপর শরীক প্রথম শরীক থেকে মূল্য উসূল করবে কাজে নিয়োগ দিতে পারবেনা। তাঁদের মতে সর্বক্ষেত্রে প্রথম আযাদকারীই ولاء (পরিত্যাক্ত সম্পদ) লাভ করবে।

৩। ইমাম শাফেঈর (রহ.) মাযহাব

ইমাম শাফেঈর মাযহাব মতে আযাদকারী সামর্থবান হলে অপর শরীক মূল্য উসূল করার অধিকার লাভ করবে। আর সামর্থবান না হলে অপর শরীক মূল্য উসূল বা কাজে নিয়োগ দিতে পারবে না বরং ঐ অংশ গোলাম হিসেবেই থেকে যাবে। একদিন গোলামী করবে অপর দিন আযাদ থাকবে।

আংশিক আযাদ করা যায় কি-না

আংশিক আযাদ করা যায় কি-না—এ মাসআলাটি মতবিরোধ পূর্ণ। ইমাম আবূ হানীফার মতে আংশিক আযাদ করা যায়–আযাদকারী ধনী হোক বা গরীব। সাহেবাঈনের মতে কোন অবস্থাতেই আংশিক আযাদ করা জায়িয নেই। ইমাম শাফেঈর (রহ.) মতে–প্রথম শরীক যদি দারিদ্র নিঃস্ব হয় তাহলে আংশিক আযাদ হবে আর সামর্থবান হলে আংশিক আযাদ হবে না।

মনে রাখতে হবে, যারা আংশিক আযাদ করা (তথা اعتاق-কে متجزى) মনে করেন তাঁরা একথা বলেন না যে, এক ব্যক্তি কিছু অংশ গোলাম হিসেবে এবং কিছু অংশ আযাদ হিসেবে থাকে। কেননা একই ব্যক্তির মধ্যে আযাদী ও গোলামী উভয়টি থাকা অসম্ভব।

ইমামগণের মধ্যে এ সংক্রান্ত মতভেদের ব্যাখ্যা হচ্ছে; ইমাম আবূ হানীফার মতে اعتاق (আযাদ করা) متجزى (বিভাজ্য) একথার অর্থ হচ্ছে, ازالة ملك তথা আযাদকারী শরীকের মালিকানা খতম হওয়া। অর্থাৎ যদিও প্রথম শরীক আংশিক আযাদ করেছে কিন্তু সে পুরোপুরি গোলামই থেকে যাবে (যতক্ষণ পর্যন্ত না পুরো অংশ আযাদ করা হবে)।

অপর শরীক আযাদ, মূল্য উসূল কিংবা কাজে খাটিয়ে টাকা আদায় করার পর পূর্ণভাবে আযাদ হয়ে যাবে। আর তাকে এই তিন পন্থার কোন এক পন্থা অবলম্বন করতেই হবে। এর ব্যতিক্রম করা যাবে না। যেহেতু পরবর্তীতে ঐ গোলাম আযাদ হবেই এ কারণে ভবিষ্যত অবস্থার প্রতি খেয়াল করে হাদীসে একে আযাদ বলা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, সে এখনই আযাদ হয়ে গেছে।

ইমাম সাহেবাঈনের মতে আংশিক আযাদ করা যায় না। (اعتاق বিভাজ্য {متجزى} নয়) একথার অর্থ হচ্ছে—এখানে اعتاق-এর অর্থ হলো اثبات الحرية তথা আযাদ সাব্যস্থ হওয়া। তাঁদের মতে কোন একজন নিজের অংশ আযাদ করে দিলে গোলাম পুরোপুরি আযাদ হয়ে যায়। অবশ্য অপর শরীক যেন ক্ষতিগ্রস্থ না হয় এজন্য সে আযাদকারীর কাছ থেকে মূল্য আদায় কিংবা গোলামকে কাজে নিয়োগ দিয়ে টাকা উসূল করতে পারবে। প্রথম ব্যক্তি আযাদকারী এবং পরিত্যক্ত সম্পদের (ولاء) মালিক হবে। ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাঈনের মধ্যে মৌলিক কোন মতবিরোধ নেই। মতবিরোধ শুধু اعتاق-এর

ব্যাখ্যা নিয়ে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর ব্যাখ্যা করেছেন ازالة الملك তথা মালিকানা খতম হওয়া, আর সাহেবাঈন ব্যাখ্যা করেছেন اثبات الحرية তথা মালিকানা সাব্যস্থ হওয়া। আর একথা সবাই জানে, আংশিকভাবে اثبات الحرية (মালিকানা সাব্যস্থ) হয় না। কেননা এটা এমন গুণ যখন আসে পূর্ণ ভাবে আসে আর যখন যায় পূর্ণ ভাবে যায়।

এমনিভাবে একথাও সর্বজন স্বীকৃত যে, ازالة الملك (মালিকানা খতম হওয়া) আংশিকভাবে (متجزى) হতে পারে। সুতরাং এর দ্বারা বুঝা যায় মৌলিকত্বের বিচারে তাঁদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, সাহেবাঈনের মতে আযাদকারী ব্যক্তি সামর্থবান হলে অপর শরীক শুধুমাত্র (আযাদকারী থেকে) টাকা উসূল করার অধিকার লাভ করবে। আর আবূ হানীফার মতে টাকা উসূল কিংবা কাজে নিয়োগ উভয় প্রকার অধিকার লাভ করবে। আর ইমাম শাফেঈর মতে এর কোনটাই করতে পারবে না।

মাসআলার সারসংক্ষেপ

মাসআলাটির সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

১। ইমাম আবূ হানীফার মতে প্রথম আযাদকারী সামর্থবান হলে অপর শরীক–আযাদ, মূল্য উসূল এবং কাজে নিয়োগ দান–এই তিন পন্থার যে কোন এক পন্থা অবলম্বন করতে পারবে। আর দরিদ্র হলে প্রথম ও তৃতীয় পন্থার যে কোন পন্থা অবলম্বন করবে। সাহেবাঈনের মতে সামর্থবান হলে মূল্য উসূল এবং দরিদ্র হলে শুধুমাত্র কাজে নিয়োগ দানের অধিকার লাভ করবে।

ইমাম শাফেঈর মতে আযাদকারী সামর্থবান হলে অপর শরীক তার থেকে মূল্য উসূল করে নিবে। আর দরিদ্র হলে এক অংশ আযাদ এক অংশ গোলাম হিসেবে থাকবে।

২। আবূ হানীফার (রহ.) মতে اعتاق (আযাদকরা) সর্বাবস্থায় متجزى (বিভাজ্য) এবং اعتاق-এর অর্থ মালিকানা খতম (ازالة الملك) হওয়া আর সাহেবাঈনের মতে আযাদ করা متجزى (বিভাজ্যযোগ্য) নয় এবং اعتاق-এর অর্থ আযাদীলাভ করা (اثبات الحرية)। ইমাম শাফেঈর মতে আযাদকারী দারিদ্র হলে متجزى সামর্থবান হলে নয়।

৩। ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) মতে আংশিক আযাদ করলে গোলাম গোলামই থেকে যাবে। সাহেবাঈনের মতে পুরোপুরিভাবে আযাদ হবে এবং

ইমাম শাফেঈর মতে আযাদকারী সামর্থবান হলে তাৎক্ষণিকভাবে আযাদ হবে, দারিদ্র হলে আংশিক আযাদ হবে।

৪। সাহেবাঈনের মতে সর্বাবস্থায় প্রথম ব্যক্তিই পরিত্যক্ত সম্পদ (ولاء) এর মালিক হবে। ইমাম আবূ হানীফার মতে শুধু মাত্র দ্বিতীয় ব্যক্তি কর্তৃক প্রথম ব্যক্তি থেকে মূল্য আদায় করার ক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তি এককভাবে ولاء (পরিত্যক্ত) এর মালিক হবে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে উভয়ে এর মালিক হবে।

মাযহাবসমূহের ওপর হাদীস প্রয়োগকরণ

ইমাম নববী (রহ.) দাবি করেছেন ইমাম শাফেঈর মাযহাব হাদীসের সাথে বেশি সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু তাঁর এই দাবি যথার্থ নয়। কেননা অনেক সহীহ্ হাদীসে استسعاء। (গোলামকে কাজে নিয়োগ দেয়া)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে (অথচ শাফেঈ মাযহাবে একথা বলা হয়নি)।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) হাফেয ইবনে হযমের (রহ.) উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন কাজে নিয়োগ প্রদান সংক্রান্ত হাদীস অত্যন্ত উঁচু স্তরের হাদীস এবং ৩০ জন সাহাবী এর সমর্থন করেছেন। হাদীস দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত এমন বিষয়কে শাফেঈ মাযহাবের কোন ক্ষেত্রেই উল্লেখ করা হয়নি অথচ তাঁর মাযহাবকে হাদীসের সাথে অধিক সঙ্গতি পূর্ণ বলা হয়েছে।

অবশ্য শাফেঈগণ কাজে নিয়োগ দেয়া (استسعاء) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন– এর দ্বারা নিজের কাজে নিয়োগ দেয়া উদ্দেশ্য। কিন্তু এই ব্যাখ্যা হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কেননা তিরমিযীর এক হাদীসে বলা হয়েছে—

وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ قِيْمَةُ عَدْلٍ ثُمَّ يُسْتَسْعٰى -

যদি (আযাদকারীর) সম্পদ না থাকে তাহলে ন্যায় সঙ্গত মূল্য ধার্য করে (গোলামকে) কাজে নিয়োগ দিবে।

যদি হাদীসে নিজের কাজে নিয়োগ দেয়া উদ্দেশ্য হয় তাহলে মূল্য ধার্য করার কথা বলা হলো কেন? বুখারী শরীফেও এ ধরনের রেওয়ায়াত আছে। এর দ্বারা বুঝা যায় কাজে নিয়োগ দেয়ার যে অর্থ আমরা করেছি হাদীসে সেটিই উদ্দেশ্য।

অধিকাংশ হাদীসে দরিদ্রতার ক্ষেত্রে কাজে নিয়োগ দান এবং সামর্থবান থাকা অবস্থায় মূল্য উসূলের কথা বলা হয়েছে। এসব হাদীস বাহ্যিক ভাবে

সাহেবাঈনের মতের সমর্থন করে। ইমাম ত্বহাভীও এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) সমর্থ থাকা অবস্থায় মূল্য উসূল কিংবা কাজে নিয়োগ এ দু'টির যে কোন একটি পন্থা অবলম্বন করা জায়িয বলেন। অথচ আমভাবে হাদীস সমূহে শুধুমাত্র প্রথমটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে করে বাহ্যিক ভাবে সাহেবাঈনের মত শক্তিশালী মনে হলেও ফেক্হী দৃষ্টিকোণে ইমাম আবূ হানীফার মতই শক্তিশালী বলে মনে হয়। কেননা কাজে নিয়োগ দেয়ার চেয়ে মূল্য উসূলের স্তর উর্ধ্বে। কারণ হলো, কাজে নিয়োগ দানের সম্পর্ক নিজের গোলামের সাথে, আর মূল্য উসূলের সম্পর্ক সমপর্যায়ের অপর শরীকের সাথে। সুতরাং যেক্ষেত্রে উঁচু স্তরের (মূল্য উসূলের) অধিকার লাভ হয় সেক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এর চেয়ে নিম্ন (কাজে নিয়োগদানের) অধিকার লাভ হবে। তাছাড়া ত্বহাভী শরীফে ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) সমর্থনে একটি اثر। ও উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লামা কাশ্মীরীও (রহ.) عرف الشذى তে এর সমর্থনে দু'টি সহীহ্ হাদীস উল্লেখ করেছেন। যার একটি মুসনাদে আহমাদ ও অপরটি মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক এ উল্লেখ করা হয়েছে।

মুমূর্ষ রোগীর আযাদ করা

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَجُلاً اَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوْكِيْنَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِه لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَدَعَا بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَزَّاَهُمْ اَثْلاَثًا . ثُمَّ اَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَاَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَاَرَقَّ اَرْبَعَةً وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيْدًا .

"....এক ব্যক্তি মৃত্যুর সময় তার একমাত্র সম্পদ ছয়টি গোলামকে আযাদ করে। রাসূল (সা.) গোলামগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করে লটারী দেন এবং সে অনুযায়ী দুই জনকে আযাদ করে অন্যদেরকে গোলাম হিসেবে রেখে দেন এবং লোকটাকে শক্ত কথা বলেন।"

এ সংক্রান্ত আলোচনা ও মতবিরোধ

মৃত্যুর সময় সম্পদের সাথে যেহেতু ওয়ারিশদের সংশ্লিষ্টতা স্থাপিত হয়, এ কারণে এসময় গোলাম আযাদ করলে এটা ওয়াসিয়্যাতের মধ্যে শামিল হবে এবং এক তৃতীয়াংশ সম্পদে তা কার্যকর হবে।

কোন ব্যক্তি যদি একমাত্র 'সম্পদ' গোলামকে আযাদ করে (এবং এছাড়া তার অন্য কোন সম্পদ না থাকে) তাহলে সকল ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত যে, গোলামের একতৃতীয়াংশ আযাদ হবে এবং অবশিষ্ট দুইতৃতীয়াংশ উত্তরাধিকার সূত্রে ওয়ারিশরা লাভ করবে।

তবে এর নির্ণয় পদ্ধতি সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। যথা ঃ

১। তিন ইমামের মতে গোলাম ছাড়া যদি অন্য কোন সম্পদ না থাকে তাহলে তিন ভাগ করে লটারী দিতে হবে। লটারীতে যাদের নাম উঠবে তারা আযাদ হয়ে যাবে এবং অবশিষ্টরা গোলাম হিসেবে থেকে যাবে। যেমন ঃ ছয় জন গোলাম হলে লটারীর মাধ্যমে দুই জনকে বাছাই করে আযাদ করতে হবে এবং বাকি চার জন গোলামই থেকে যাবে।

২। ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) মতে তাৎক্ষনিক ভাবে প্রত্যেক গোলামের এক তৃতীয়াংশ আযাদ হবে এবং পরবর্তীতে কাজকর্ম করে অবশিষ্ট দুই অংশের মূল্য পরিশোধ করতে হবে। যেহেতু প্রত্যেকের সাথে আযাদ হওয়া সমপৃক্ত হয়েছে সে কারণে প্রত্যেকেই আযাদ হওয়ার অধিকার রাখে। ইমাম শা'বী নখয়ী, শোরাইহ, হাসান বসরী সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, কাতাদা প্রমুখের মত এরূপই।

ইমামগণের দলীলসমূহ

তিন ইমাম হযরত ইমরান ইবনে হোসাইনের (রা.) হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন, যাতে ছয় গোলামকে তিন ভাগ করে লটারীর মাধ্যমে দুই জনকে আযাদ করার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। আহনাফ বলেন— ائمة ثلاثة-এর মাযহাব কুরআন-হাদীসের সর্বস্বীকৃত উসূলের বিপরীত। কেননা কুরআন হাদীস দ্বারা জুয়াকে হারাম করা হয়েছে। আর কারো অধিকারকে ক্ষতিকর কোন কিছুর সাথে শর্তযুক্ত করাই জুয়া। আমাদের আলোচ্য মাসআলায় প্রত্যেক গোলামকে আযাদ করা হয়েছিল। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির আযাদ হওয়ার অধিকার আছে। অতএব লটারীর মাধ্যমে কাউকে আযাদ করা আর কাউকে গোলাম হিসেবে রেখে দেয়া হয় তাহলে অধিকার খর্বও অনিষ্টকর বস্তুর সাথে শর্ত করায় এটা লটারীর মধ্যে গণ্য হবে।

সুতরাং প্রত্যেক গোলামের এক-তৃতীয়াংশ আযাদ হবে এবং আযাদ অংশকে লটারীর মাধ্যমে বাতিল করা যাবে না। মোটকথা হচ্ছে, জুয়ার সম্ভবনার কারণে আহনাফ লটারীর বিপক্ষে মত দেন।

ইমাম আবূ বকর জাস্সাস (রহ.) বলেন— اِذْ يُلْقُونَ اَقْلاَمَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ (মরিয়ম (আ.)-কে লালন-পালনের জন্য যখন তারা (লটারী স্বরূপ) কলম নিক্ষেপ করল...)

এই আয়াতকে মৃত্যুকালীন সময়ে আযাদ করা গোলামের ক্ষেত্রে লটারীর বৈধতার ব্যাপারে দলীল দেয়া যাবে না।

কেননা লটারী ছাড়াই যে কোন এক জনের জন্য মরিয়ম (আ.)-এর লালন-পালন জায়িয ছিল, (শুধুমাত্র লোক ঠিক করার জন্য লটারী দেয়া হয়েছিল) পক্ষান্তরে আমাদের আলোচ্য মাসআলার প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেননা যার একাংশ আযাদ হয়ে গেছে সে কস্মিন কালেও পুনরায় গোলাম হতে চাইবে না। আর এটা তার অধিকারও বটে। সুতরাং লটারীর মাধ্যমে কারো আযাদীকে স্থানান্তর করা যাবে না।

ইমামগণের দলীলের জওয়াব

فاعتق اثنين وارق اربعة-এর জওয়াব ঃ

১। উল্লেখিত রেওয়ায়াতের রাবী হাদীসের সারাংশ (ভাবার্থ) বর্ণনা করেছেন। কেননা প্রত্যেক গোলামকে তিন ভাগ করলে এর সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮। সুতরাং প্রত্যেক গোলামের এক-তৃতীয়াংশ আযাদ করা হলে এর পরিমাণ দাঁড়ায় দুই ষষ্ঠাংশ তথা পুরো দুই গোলাম। এ দৃষ্টিকোণেই اثنين শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। আর লটারী দেয়া হয়েছিল মূলতঃ কোন্ ওয়ারিশের ভাগে কোন্ গোলাম পড়বে সেটা নির্ধারণ করার জন্য। কেননা প্রত্যেকের যিম্মাদারী ছিল শ্রম বিনিয়োগ করে মূল্য পরিশোধ করা। যেহেতু পরিশ্রমের ধরন একেকজনের একেক রকম হয়ে থাকে এ কারণে ওয়ারিশদের মধ্যে কে কাকে নিবে এ ব্যাপারে ঝগড়া হওয়ার আশংকায় লটারী দেয়া হয়।

২। অথবা বলা যায় এটা ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনা। পরবর্তীতে লটারীর পদ্ধতি মানসূখ হয়ে গেছে। ইমাম ত্বহাবী (রহ.) বলেন, প্রথম যুগে ফয়সালা করার এক পদ্ধতি ছিল লটারী, পরবর্তীতে তা মানসূখ হয়ে গেছে।

হযরত আলী (রহ.) হুযূরের জমানায় একবার লটারীর মাধ্যমে ফয়সালা দিয়েছিলেন। তিন ব্যক্তি তাঁর কাছে একই বাঁদীর সাথে সহবাসের ফলে জন্ম নেয়া এক সন্তানের পিতৃত্ব দাবি করলে তিনি লটারীর মাধ্যমে একজনকে নির্ধারণ করে সন্তান দিয়ে দেন। হুযূরের (সা.) কাছে এই সংবাদ পৌছলে তিনি এতে সমর্থন দেন। পরবর্তীতে হযরত ওমরের (রা.) যুগে এ ধরনের একটি ঘটনা ঘটলে তিনি এর বিপরীত ফয়সালা দেন এবং লটারী না করে সন্তানকে দুই জনের মধ্যে ভাগ করে দেন। এটা লটারীর বিধান মানসূখ হওয়ার প্রমাণ বহন করে। অন্যথায় যে ফয়সালা হুযূরের (সা.) যুগে দিয়েছিলেন সে ফয়সালা ওমরের (রা.) যুগে দিবেন না এটা কিভাবে হতে পারে?

ইমাম ত্বহাভী (রহ.) একথাও বলেছেন, লটারী বর্তমানে শুধুমাত্র এক ক্ষেত্রে বৈধ। আর তাহলো সমান অংশিদার দুই জনের কোন এক জনকে বিচারক কর্তৃক লটারীর মাধ্যমে নির্ধারণ করা। এটা এ কারণে করা হয় যাতে বিচারকের প্রতি মানুষ পক্ষ পাতিত্বের অভিযোগ না তোলে।

সুতরাং কোনক্রমেই লটারীর মাধ্যমে কারো হক নির্ণয় করা কিংবা বাতিল করা জায়িয হবে না।

باب جواز بيع المدبر

অধ্যায় ঃ মুদাব্বার গোলাম বিক্রি করা সম্পর্কে

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ اَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِّيْ ؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ - فَدَفَعَهَا اِلَيْهِ -

"হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত ঃ আনসারী এক সাহাবী মুদাব্বার গোলাম আযাদ করে অথচ এই গোলাম ছাড়া তাঁর ভিন্ন কোন সম্পদ ছিল না। ঘটনাটি রাসূলের (সা.)-এর নিকট পৌছুলে তিনি বললেন—আমার তরফ থেকে কে এই গোলামটি ক্রয় করবে? ঘোষণা শুনে নোআইম ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) আট শত দিরহাম দিয়ে তাকে ক্রয় করেন। অতঃপর মূল্য আযাদকারীর কাছে অর্পণ করেন।

تدبير (মুদাব্বার) এর অর্থ ও প্রকারভেদ

নিজের মৃত্যুর সাথে গোলাম বাঁদী আযাদ করার শর্ত করাকে تدبير (বা মুদাব্বার বানানো) বলা হয়। মুদাব্বার দুই প্রকার। যথা ঃ

১। مدبر مطلق তথা বিশেষ কোন রোগ কিংবা সফরের শর্ত করা ছাড়া স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুর পর আযাদ হওয়ার ঘোষণা দেয়া। যেমন, এরূপ বলা : আমি মারা যাওয়ার পর তুমি আযাদ।

২। مدبر مقيد ঃ তথা নির্দিষ্ট কোন সফর কিংবা রোগের সাথে শর্ত করে আযাদ করতে চাওয়া। যেমন এরূপ বলা ঃ যদি এই রোগে কিংবা এই সফরে মারা যাই তাহলে তুমি আযাদ।

মুদাব্বার গোলাম বিক্রির হুকুম

দ্বিতীয় প্রকার মুদাব্বার বিক্রি করা জায়িয হওয়ার ব্যাপারে সকল আলিম একমত কিন্তু مدبر مطلق-এর ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে।

১। ইমাম শাফেঈ ও আহমদের মতে مدبر مطلق বিক্রি করা জায়িয। তাঁরা হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীস দ্বারা নিজেদের মতের স্বপক্ষে দলীল পেশ করেন।

২। ইমাম আবূ হানীফা ও মালেকের (রহ.) মতে এধরনের গোলাম বিক্রি করা জায়িয নেই। ইবনে ওমর (রা.) সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, শা'বী, ইমাম নখয়ী, মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন, যুহরী, ছাওরী, আওযায়ী, হাসান ইবনে সালেহ, যায়েদ ইবনে সাবেত, আলী ইবনে আবী তালিব, কাজী শুরাই প্রমুখের অভিমতও এরূপ।

ইমাম দ্বয় উল্লেখিত সাহাবা ও তাবেঈর মতকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন—যদি এসব মহা মনীষীদের সমর্থন না থাকত তাহলে মুদাব্বার গোলাম বিক্রি করাকে আমিও জায়িয বলতাম। لولا هؤلاء الاجلة لقلت بجواز بيع المدبر তাছাড়া দারে কুতনী এবং বাইহাকীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের (রা.) হাদীসেও মুদাব্বার গোলাম বিক্রি করতে নিষেধ করা হয়েছে।

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلَاثِ ـ

"মুদাব্বার গোলাম বিক্রি করা কিংবা দান করা যাবে না, সে একতৃতীয়াংশ আযাদ।"

উল্লেখ্য যে, এই হাদীসটি বিভিন্ন সনদে মারফূ' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ কেউ অবশ্য একে حديث موقوف বলেছেন। কিন্তু যে সব হাদীস যুক্তি ভিত্তিক (مدرك بالقياس) নয় সেগুলো مرفوع হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। সুতরাং এই হাদীসটি দলীল হওয়ার ব্যাপারে কোন সংশয় নেই।

ইমাম শাফেঈ ও আহমদের বর্ণিত হাদীসের জওয়াব

১। যেই মুদাব্বার গোলামটি বিক্রি করা হয়েছিল সেটি ছিল مدبر مقيد আর আমাদের মতে এ প্রকারের গোলাম বিক্রি জায়িয। কিন্তু এটি বিতর্কসূচক জওয়াব। অনেকটা اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال-এর মত। অনেক রেওয়ায়াতে এই জওয়াব রদ করা হয়েছে। কেননা হাদীসে اعتق غلاما له عن دبر বাক্য উল্লেখ করা হয়েছে, যা مدبر مقيد বুঝায় না।

২। দ্বিতীয় জওয়াব হলো, হাদীসে بيع বলতে بيع الخدمة তথা ইজারা বুঝানো হয়েছে। যেহেতু লোকটির অন্য কোন সম্পদ ছিলনা এজন্য গোলামের সাথে এই ওয়ারিশদের মালিকানা সত্ত্ব হাসিল হয়। এজন্য রাসূল (সা.) তাকে কাজে নিয়োগ দিয়ে ওয়ারিশদের মূল্য ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করেন। সুতরাং বুঝা যায়, হাদীসে সরাসরী গোলাম বিক্রির কথা বলা হয়নি বরং গোলামের মুনাফা বিক্রির কথা বলা হয়েছে। দারে কুতনীতে এই ব্যাখ্যার সমর্থন রয়েছে। আতা ও তাউস (রহ.) বিক্রির সমর্থনে এই হাদীস উল্লেখ করলে আবূ জাফর বললেন— شهدت الحديث من جابر انما اذن فى بيع خد متة "আমি সরাসরি জাবের (রা.) থেকে হাদীসটি শ্রবণ করেছি, মূলতঃ তিনি মুনাফা বিক্রির (খেদমতের) অনুমতি দিয়েছিলেন। দারে কুতনীর অপর রেওয়ায়াতে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ قَالَ : بَاعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ ـ

রাসূল (সা.) মুদাব্বার গোলামের শ্রম বিক্রি করেছিলেন। তাছাড়া মদীনাবাসীর লোগাত অনুযায়ী بيع শব্দ اجارة (ইজারার) অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এতে বুঝা যায় ৮০০ দিরহামে রাসূল (সা.) গোলামকে ইজারায় দিয়েছিলেন— বিক্রি হিসেবে নয়। আর আমাদের মতেও মুদাব্বার গোলমকে ইজারায় দেয়া যায়।

৩। কেউ কেউ বলেন—প্রথম যুগে মুদাব্বার গোলাম বিক্রি করা জায়িয ছিল পরে এটি মানসূখ হয়ে গেছে।

৪। হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) এই জওয়াব দিয়েছেন যে, রাসূল (সা.) তার মুদাব্বারের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে সাধারণ গোলামের মত বিক্রি করেছেন। আর এটা রাসূলের (সা.) বিশেষ বৈশিষ্ট।

كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات

অধ্যায় ঃ কাসামা সম্পর্কে

عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ قَالَ يَحْيٰى وَحَسِبْتُ قَالَ : وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اَنَّهُمَا قَالاَ : خَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلِ ابْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدِ بْنِ زَيْدٍ حَتّٰى اِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِىْ بَعْضِ مَا هُنَالِكَ - ثُمَّ اِذَا مُحَيِّصَةُ يَجِدُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ سَهْلٍ قَتِيْلاً فَدَفَنَهُ ، ثُمَّ اَقْبَلَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَحُوَيِّصَةُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْلٍ وَكَانَ اَصْغَرَ الْقَوْمِ ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَتَكَلَّمُ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبِّرِ الْكُبْرَ فِى السِّنِّ ، فَصَمَتَ فَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ ، وَتَكَلَّمَ مَعَهُمَا ، فَذَكَرُوْا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتَلَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَهْلٍ ، فَقَالَ لَهُمْ اَتَحْلِفُوْنَ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا؟ فَتَسْتَحِقُّوْنَ صَاحِبَكُمْ اَوْقَاتِلَكُمْ ، قَالُوْا :

وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نُشْهَدْ؟ قَالَ فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُوْدُ بِخَمْسِيْنَ يَمِيْنًا ، قَالُوْا وَكَيْفَ نَقْبَلُ اَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ ، فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطٰى عَقْلَهُ ـ

'সাহল ইবনে আবী হাসমাহ্ এবং রাফে' ইবনে খাদীজ থেকে বর্ণিত, একদা আব্দুল্লাহ ইবনে সাহল ইবনে যায়েদ এবং মুহাইয়্যাসা ইবনে মাসউদ ইবনে যায়েদ খায়বরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। গন্তব্যে পৌঁছে তাঁরা পরসপরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। পরবর্তীতে আব্দুল্লাহ ইবনে সাহলকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেলে মুহাইয়্যাসা তাঁকে দাফন করেন।

অতঃপর তিনি হোয়াইয়্যাসা এবং আবদুর রহমান ইবনে সাহল হুযূরের (সা.) দরবারে নালিশ নিয়ে আগমন করেন। আবদুর রহমান বয়সে ছোট ছিলেন, তিনি কথা বলা শুরু করলে হুযূর (সা.) বললেন—তুমি বড় কে সম্মান কর এবং তাঁদের হক আদায় কর। একথা শুনে তিনি চুপ হয়ে যান এবং অপর দুই জন কথা বলা শুরু করেন। তাঁরা রাসূলের (সা.) কাছে হত্যাকান্ডের ঘটনা বর্ণনা করেন। ঘটনা শুনে রাসূল (সা.) বলেন—তোমাদের মধ্য থেকে পঞ্চাশ জন লোক কসম করে নিহত সাথীর হক উসূল করবে কি? তাঁরা বললেন, আমরা তো ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলাম না সুতরাং কসম করব কিভাবে? তখন হুযূর (সা.) বললেন, তাহলে পঞ্চাশ জন ইহুদী কসম খেয়ে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। তাঁরা আবার বললেন—কাফিরদের কসমের কোন মূল্য আছে কিছু?

একথা শুনে রাসূল (সা.) নিজেই এর দিয়্যাত আদায় করে দেন।

قسامة-এর অর্থ ঃ قسامة শব্দটি اقسم (বাবে افعال) এর মাসদার। অর্থ, কসম খাওয়া। অভিধানবিদগণ শব্দটিকে কসমকারী ব্যক্তির জন্য প্রয়োগ করে থাকেন। আর ফকীহগণ একে কসমের অর্থে ব্যবহার করেন। শব্দটির মূলে রয়েছে— قسم يقسم قسمة অর্থ تقسيم তথা বিভক্ত করা। আর শরীয়তের পরিভাষায় কাসামা বলা হয়, হত্যাকারী সনাক্ত করার লক্ষ্যে অভিভাবক কর্তৃক অথবা মহল্লাবাসী কর্তৃক ৫০টি শপথ বাক্য পাঠ করাকে। অবশ্য এর সংজ্ঞায় আলিমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরে আসছে।

قسامة-এর ব্যাখ্যা

কোন মহল্লায় যদি লাশ পাওয়া যায় এবং জখম কিংবা গলায় ফাস লাগানোর কোন আলামত না পাওয়া যায় তাহলে বুঝা যাবে লোকটি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছে, কেউ তাকে হত্যা করেনি। অতএব এর হত্যাকারী সনাক্ত করার প্রয়োজন নেই।

পক্ষান্তরে যদি মৃত ব্যক্তির শরীরে মার, যখম, গলায় ফাস ইত্যাদি চিহ্ন পাওয়া যায় তাহলে বুঝা যাবে একে হত্যা করা হয়েছে, সুতরাং হত্যাকারী সনাক্ত করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এ ধরনের একটি ঘটনা রাসূল (সা.)-এর যুগে সংঘটিত হয়, যার বিবরণ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। হুযূর (সা.) পঞ্চাশ বার কসমের মাধ্যমে এর ফয়সালা করেন। একেই কাসামা বলা হয় এবং এর বৈধতা সম্পর্কে চার ইমাম একমত। অবশ্য নগণ্য সংখ্যক আলিম কাসামার বৈধতার ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন কিন্তু তাঁদের এই মতবিরোধের কোন ধর্তব্য নেই। উল্লেখ্য যে, রেওয়ায়াতের মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে আর একে কেন্দ্র করেই কাসামার পদ্ধতি ও হুকুমের ব্যাপারে ওলামায়ে কিরাম মতবিরোধ করেছেন।

কাসামার পদ্ধতি সম্পর্কে আলিমগণের মতভেদ

কাসামার পদ্ধতি, হুকুম এবং এতদসংশ্লিষ্ট প্রশাখামূলক মাসআলায় ইমামগণের বিস্তর মতবিরোধ রয়েছে। পৃথকভাবে প্রত্যেক মাযহাব আলাদা আলাদা উল্লেখ করা হলো, যাতে বুনিয়াদী মাসআলা বুঝা সহজ হয়।

হানাফী মাযহাব

কোন মহল্লায় যদি লাশ পাওয়া যায় এবং লাশের গায়ে খুনের আলামত পাওয়া যায়, যে জায়গায় লাশ পাওয়া গেছে সেই জায়গা কারো মালিকানাধীন হয় এবং হত্যাকারীকে চেনা না যায় তাহলে হানাফী মাযহাব মতে মহল্লার পঞ্চাশ জন লোককে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণ নির্বাচন করে তাদের থেকে কসম আদায় করবে।

কসম করে প্রত্যেকেই একথা বলবে "আল্লাহর কসম আমি তাকে হত্যা করিনি এবং হত্যাকারী কে তা জানি না। যদি মহল্লাবাসীর সংখ্যা কম হয় তাহলে ৫০ সংখ্যা পূরণ করার জন্য একেকজন থেকে একাধিকবার কসম আদায় করবে।

কসম করার পর তাদের ওপর দিয়্যাত ওয়াজিব হবে। কসম করার ফায়দা হলো, এর দ্বারা তারা মৃত্যুদন্ড (কেসাস) এবং গ্রেফতারী থেকে রেহাই পাবে। কসম করতে অস্বীকৃতি জানালে তাদেরকে আটকে রাখবে যতক্ষণ পর্যন্ত না হত্যার কথা স্বীকার করবে কিংবা কসম করবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) এর মতে আটকে রাখার দরকার নেই অস্বীকার করলেই তাদের গোষ্ঠীর উপর দিয়াত দেয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে। কাযী ইয়ায মুখতাসারে তাহযীব ব্যাখ্যাগ্রন্থে এরূপ বলেছেন। كذافى بدائع الصنائع ٧ / ٢٨٧ إلى ٢٨٩

শাফেঈ মাযহাব

শাফেঈর (রহ.) মতে মৃত ব্যক্তিকে যদি বড় শহর থেকে পৃথক কোন মহল্লায় কিংবা ছোট গ্রামে পাওয়া যায় এবং হত্যাকারীকে খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে কাসামা কার্যকর হবে। তবে শর্ত হলো নিহত ব্যক্তির অভিভাবক কর্তৃক নির্দিষ্ট করে এক বা একাধিক ব্যক্তির ওপর ইচ্ছাকৃত (عمدا) বা অনিচ্ছাকৃত (شبه عمد) হত্যার অভিযোগ উত্থাপন করতে হবে।

এমনিভাবে ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে لوث পাওয়া যেতে হবে। لوث-এর অর্থ হলো, হত্যাকান্ড সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন প্রমাণ থাকা। যেমন কোন ব্যক্তির কাপড়ে কিংবা তলোয়ারে রক্ত থাকা কিংবা নিহত ব্যক্তির ঐ এলাকার কারো সাথে দুশমনী থাকা, অথবা একজন ন্যায়পরায়ণ বা (বিচারকের কাছে) গ্রহণযোগ্য একাধিক ব্যক্তির হত্যাকান্ড প্রত্যক্ষ করা। এসব বিষয় অভিভাবক কর্তৃক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার দাবি করার স্বপক্ষে আলামত পরিভাষায় যাকে لوث বলা হয়।

এসব পাওয়া যাওয়ার শর্তে মৃত ব্যক্তির অভিভাবকগণ পঞ্চাশ বার কসম করে বলবে অমুক ব্যক্তি আমাদের এই লোককে হত্যা করেছে। যদি ইচ্ছাকৃত হত্যার (قتل عمد) দাবি করা হয় তাহলে হত্যাকারীর ওপর আর অনিচ্ছাকৃত (شبه عمد) বা ভুলক্রমে (قتل خطا) হত্যার দাবি করা হয় তাহলে عاقله তথা হত্যাকারীর অভিভাবকের ওপর দিয়্যাত ওয়াজিব হবে।

আর নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা যদি কসম করতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে মহল্লাবাসী কসম করবে এবং কসম করলে সবকিছু থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, দিয়্যাত ওয়াজিব হবে না।

যদি لـوث (বিশেষ আলামত) না পাওয়া যায় তাহলে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা কসম করবে না বরং মহল্লাবাসী পঞ্চাশ বার কসম করবে। যদি তারা কসম করে তাহলে সবকিছু থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এবং তাদের ওপর দিয়্যাত ওয়াজিব হবে না।

কসম করতে অস্বীকৃতি জানালে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা কসম করে দিয়্যাতের অধিকারী হবে। তারাও কসম করতে অস্বীকৃত জানালে মহল্লাবাসীর ওপর কোন কিছু বর্তাবে না।

মালেকী ও হাম্বলী মাযহাব

মালেকী ও হাম্বলী মাযহাব শাফেঈ মাযহাবের অনুরূপ, তবে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ে উভয়ের মধ্যে মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যথা ঃ

১। মালেকী ও হাম্বলী মতে لـوث পাওয়ার ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত হত্যার দাবি করলে কেসাস ওয়াজিব হবে আর শাফেঈর ফতওয়া হলো দিয়্যাত ওয়াজিব হবে।

২। হাম্বলী ও মালেকী মাযহাব মতে لـوث পাওয়ার ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা কসম করতে অস্বীকৃতি জানালে মহল্লাবাসী (مـدعـى عـلـيـه) পঞ্চাশ বার কসম করবে আর لـوث না পাওয়া গেলে একবার কসম করবে। শাফেঈর (রহ.) মতে সর্বাবস্থায় মহল্লাবাসী পঞ্চাশ বার কসম করবে।

৩। শাফেঈর মতে مـدعـى عـلـيـه (মুহল্লাবাসী) কসম করতে অস্বীকৃতি জানালে দাবিকারী (مـدعـى) তথা মৃত ব্যক্তির অভিভাবকদের ওপর পুনরায় (দ্বিতীয়বার) কসম বর্তাবে।

মালেকী ও হাম্বলী মতে দ্বিতীয় বার কসম বর্তাবে না। মালেকীগণ বলেন— এক্ষেত্রে মহল্লাবাসীকে আটকে রাখতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না কসম কিংবা হত্যার স্বীকারোক্তি করে অথবা এই অবস্থাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

হাম্বলীগণ বলেন—আটকে রাখা যাবেনা, বরং (একমত অনুযায়ী) বাইতুল মাল (সরকারী কোষাগার) থেকে দিয়্যাত পরিশোধ করা হবে, (অপর মত অনুযায়ী) মহল্লাবাসীর ওপর দিয়্যাত ওয়াজিব হবে। দ্বিতীয় রেওয়ায়াত অধিক বিশুদ্ধ।

ইমামগণের মধ্যে মৌলিক মতবিরোধ কোথায়?

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় কাসামার পদ্ধতি, শাখা, এবং এতদসংশ্লিষ্ট আলোচনায় মতবিরোধ থাকলেও মৌলিক মতবিরোধ মূলতঃ তিনটি। যথা ঃ

১। قسامة-এর দাবি করার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে

ائمه ثلاثة-এর মতে কাসামার দাবি শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো নির্দিষ্ট এক বা একাধিক ব্যক্তিকে হত্যাকারী হিসেবে শনাক্ত করা। আহনাফের মতে কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করা শর্ত নয় বরং অনির্দিষ্ট করে হত্যার দাবি করলেও কাসামা কার্যকর হবে।

২। নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের ওপর কসম

ائمة ثلاثة-এর মতে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণ কসম করতে পারবে। আহনাফের মতে এদের ওপর কসম আসবে না। কসম শুধু মহল্লাবাসীর জন্য।

৩। কাসামার হুকুম

আহনাফ ও শাফেঈর মতে কাসামার কারণে শুধুমাত্র দিয়্যাত ওয়াজিব হয়। আর হাম্বলী ও মালেকী মাযহাব অনুযায়ী لوث পাওয়ার ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত হত্যার দাবি করলে কেসাস (মৃত্যুদণ্ড) ওয়াজিব হবে।

তাছাড়া মহল্লাবাসী কসম করলেও আহনাফের মতে তাদের ওপর দিয়্যাত ওয়াজিব হয়। আর ائمه ثلاثة-এর মতে এক্ষেত্রে তাদের ওপর দিয়্যাত ওয়াজিব নয়।

ইমামগণের দলীলসমূহ

১। কাসামার দাবির বিশুদ্ধতা ঃ এ সম্পর্কে ائمه ثلاثة বলেন এটি মূলতঃ ‘হক’ এর ‘দাবি’। সুতরাং অন্যান্য দাবির ন্যায় এক্ষেত্রেও مدعى عليه (অভিযুক্ত ব্যক্তি) নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। অন্যথায় এই দাবিই গ্রহণযোগ্য হবেনা। আহনাফ বলেন, এই অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় অনির্দিষ্ট ভাবেও দাবি করা যায়। কেননা আনসারী সাহাবাগণ অনির্দিষ্টভাবে খায়বরের ইহুদীদেরকে অভিযুক্ত করেছিলেন। নির্দিষ্ট কোন হত্যাকারীর নাম উল্লেখ করেননি। হুযূর

(সা.) এই দাবি গ্রহণ করেছেন এবং এর ভিত্তিতে ফয়সালাও দিয়েছেন। ওমরও (রা.) এ ধরনের দাবি গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া কাসামা মূলতঃ কোন কতলের দাবি নয় বরং এটি এ কথার দাবি যে, নিহত অবস্থায় এই ব্যক্তিকে অভিযুক্তদের মহল্লায় পাওয়া গেছে। এতে সন্দেহ হচ্ছে যে, হয় এরা নিজেরা একে হত্যা করেছে অথবা হত্যাকারীকে চেনে। আর তাও না হলে এতটুকু বলতে হবে যে, এরা অন্যের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এই দাবিটি মহল্লাবাসী পঞ্চাশ জন লোকের মোকাবেলায় হয়ে থাকে সুতরাং একে অনির্দিষ্ট দাবি বলা যায় না বরং এক দৃষ্টি কোণে নির্দিষ্টই।

২। নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের কসম করা ঃ

ائمه ثلاثة-এর মতে অভিভাবকরা কসম করবে। আহনাফ বলেন কোন ক্ষেত্রেই অভিভাবকদের ওপর কসম বর্তায় না। ائمه ثلاثة হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে বলেন– হুযূর (সা.) অভিভাকদের লক্ষ্য করে বলেন—

اَ تَحْلِفُوْنَ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا فَتَسْتَحِقُّوْنَ صَاحِبَكُمْ ـ

পঞ্চাশ বার কসম করে তোমাদের নিহত ব্যক্তির হত্যাকারীর বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদানের হকদার হয়ে যাবে কি?"

তারা যখন কসম করতে অস্বীকৃতি জানালো তখন ইহুদীরকে কসম করতে বলা হয়।

এ ব্যাপারে আহনাফের দলীল ঃ

১। মশহুর (প্রসিদ্ধ) হাদীস ঃ

اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِىْ وَالْيَمِيْنُ عَلٰى مَنْ اَنْكَرَ (ترمذى ـ بيهقى)

"বাঁদী দলীল পেশ করবে এবং বিবাদী কসম করবে।"

এই হাদীসে একটি উসূল বর্ণনা করা হয়েছে। যথা ঃ সর্বদাই বাঁদীর কর্তব্য হলো প্রমাণ উপস্থাপন করা। আর বিবাদীর দায়িত্ব হচ্ছে বাঁদী প্রমাণ উপস্থাপন করতে না পারলে কসম করা। আর আলোচ্য মাসআলায় অভিভাবকরা হচ্ছে বাঁদী। সুতরাং তারা প্রমাণ পেশ করতে ব্যর্থ হওয়ায় বিবাদী (মহল্লাবাসী) কসম করবে, তারা কসম করতে পারবেনা।

২। এই ঘটনাটি আবূ দাউদে রাফে' ইবনে খাদিজের সনদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে—প্রথমে হুযূর (সা.) অভিভাবকদেরকে প্রমাণ পেশ করতে বলেন। তাঁরা এতে ব্যর্থ হলে রাসূল (সা.) মহল্লাবাসী পঞ্চাশ জন লোককে নির্বাচন করে

তাদের থেকে কসম নেয়ার আদেশ দেন। বুখারীতে সাহল ইবনে আবী হাসমা থেকেও এভাবে বর্ণিত হয়েছে।

৩। হযরত ওমর (রা.) তাঁর খেলাফত কালে সমস্ত সাহাবাদের সামনে আমাদের বর্ণিত পন্থা অনুযায়ী বিবাদী থেকে কসম নিয়ে ফয়সালা প্রদান করেন। কোন সাহাবী এর বিরুদ্ধাচারণ করেননি। এমনকি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হযরত মুহাইসা (রা.) সে সময় জীবিত ছিলেন। তিনি সহ কেউ এই ঘটনার বিপক্ষে মত না দেয়ায় প্রমাণিত হয় যে, এ ব্যাপারে সাহাবাদের ইজমা সাব্যস্থ হয়েছে।

—ত্বহাভী

৪। রাসূল (সা.) জাহিলী যুগের কাসামার পদ্ধতিকেই বহাল রাখেন। মুসলিমের এক রেওয়ায়াতে আছে—

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلٰى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ـ

ত্বহাভী ও বাইহাকীর এক রেওয়ায়াতে একথাও বলা হয়েছে—

وَقَضٰى بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اُنَاسٍ فِىْ قَتِيْلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُوْدِ ـ

“জাহেলী যুগের কাসামা অনুযায়ী রাসূল (সা.) একজন নিহত ব্যক্তির ব্যাপারে ইহুদীদের বিরুদ্ধে ফয়সালা প্রদান করেন।”

আর সে যুগের কাসামার পদ্ধতি আহনাফ বর্ণিত কাসামার হুবহু অনুরূপ। ইমাম বুখারীর (রহ.) মতও আহনাফের মত। কেননা তিনি জাহেলী যুগের কাসামার একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। সম্ভবতঃ এর মাধ্যমে তিনি একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, শরীয়তে প্রচলিত কাসামা আর সে যুগের কাসামার পদ্ধতি একই।

শুধু এক্ষেত্রেই নয়, আরো অনেক ক্ষেত্রে জাহেলীযুগের নিয়ম-পদ্ধতি ইসলামে বহাল রাখা হয়েছে।

বর্ণিত ঘটনার (খায়বরের) জওয়াব

দলীল হিসেবে তাঁরা হুযূরের (সা.) যে উক্তি উল্লেখ করেছেন তার জবাবে আমরা বলব—

১। রাসূল (সা.) তাদেরকে কসম করতে বলেছিলেন কিনা এ সম্পর্কীয় রেওয়ায়াতগুলো শক্ত বিরোধপূর্ণ। কতক রেওয়ায়াত তাঁদের অনুকূল আর কতক আমাদের। সুতরাং এর দ্বারা কারো দলীল হতে পারে না। বরং সাহাবা ও তাবেঈগণের মতও ফতওয়া, উসূল এবং কিয়াস অনুযায়ী মাসআলার সমাধান প্রদান করতে হবে। আর এটা আহনাফের অনুকূলে।

২। কেউ কেউ বলেছেন—অভিভাবক থেকে কসম নেয়ার রেওয়ায়াতটি রাবী কর্তৃক وهم (ত্রুটি) হয়ে গেছে। সুতরাং এর দ্বারা দলীল দেয়া যাবে না।
—আবূ দাঊদ

৩। সবচেয়ে উত্তম জওয়াব হলো, اتحلفون خمسين يمينا-এর همزه টি অস্বীকার মূলক প্রশ্নবোধক হামযা (همزه استفهام انكارى)। আবূ দাঊদে এর বিশদ আলোচনা এসেছে এরূপ—প্রথমে রাসূল (সা.) অভিভাবকদের দলীল পেশ করতে বলেন। এতে তাঁরা ব্যর্থ হলে তিনি ইহুদীদের থেকে কসম নিতে বলেন। এতে তাঁরা আপত্তি করে বলেন—ইহুদীদের কসমের ওপর আমরা কিভাবে আস্থা রাখতে পারি?

সত্য-মিথ্যার তো কোন তোয়াক্কা করেনা তারা? এতে রাসূল (সা.) তাঁদের দাবি প্রত্যাখান করে বলেন, 'তাহলে তোমরা কি মনে করছ যে, তোমরা কসম করে তোমাদের হক আদায় করে নিবে, অথচ এটা উসূলের খেলাফ?

মোদ্দাকথা, যে হাদীসে এতগুলো সম্ভাবনা বিদ্যমান সেটি কোন ক্রমেই মূল উসূল-এর মোকাবেলা করতে পারে না।

কাসামার হুকুম

বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে, আহনাফ ও শাফেঈর মতে কাসামার হুকুম শুধুমাত্র দিয়্যাত, কোন ক্ষেত্রেই কেসাস ওয়াজিব হবেনা। মালেকী ও হাম্বলী মতে لوث পাওয়ার ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত হত্যার দাবি করা হলে কেসাস ওয়াজিব হবে।

দলীল হিসেবে তাঁরা বলেন—হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন— اتحلفون خمسين فتستحقون صاحبكم او قاتلكم হত্যাকারী থেকে হক আদায় করার অর্থ কেসাস নেয়া। অন্য রেওয়ায়াতে আছে, হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন—

يَقْسِمُ خَمْسُوْنَ مِنْكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيَدْفَعُ بِرُمَّتِهِ.

برمته-এর অর্থ কেসাস আদায় করা। কেননা رُمَّةٌ বলা হয় ঐ রশিকে যার দ্বারা কয়েদী বা হত্যাকারীকে কেসাসের সময় বাধা হয়। সুতরাং হাদীসের অর্থ দাঁড়াচ্ছে যদি তোমরা কসম কর তাহলে হত্যাকারীকে রশি সহ তোমাদের নিকট সোপর্দ করে দেয়া হবে। আহলে আরব এর দ্বারা কেসাসই বুঝে থাকে। আহনাফ ও শাফেঈগণ নিম্নোক্ত রেওয়ায়াত দ্বারা দলীল পেশ করেন। যথা ঃ فَاَغْرَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُود دِيَةً لِاَنَّهُمْ قُتِلَ بَيْنَ اَظْهُرِهُمْ রাসূল (সা.) ইহুদীদের ওপর দিয়্যাতের ফয়সালা করেন কেননা তাদের মহল্লাতেই নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। অন্য রেওয়ায়াতে আছে—

فَجَعَلَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةً عَلَى الْيَهُوْدِ لِاَنَّهُ وُجِدَ بَيْنَ اَظْهُرِهِمْ ـ

রাসূল (সা.) ইহুদীর ওপর দিয়্যাত ওয়াজিব করে দেন, কেননা তাদের এলাকায় লাশ পাওয়া যায়। ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) এর আমল পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনিও কেসাস নিতেন না। ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের মজলিসে হযরত আবূ কেলাবা (রহ.) এ সম্পর্কীয় আলোচনায় বলেন—পঞ্চাশ ব্যক্তি যদি কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ করে কসম খায় (অথচ তারা দেখেনি) তাহলে কি রজম করা হবে? কারো বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ এনে কসম খায় তাহলে হাত কাটাত যাবে? যদি তাই না হয় তাহলে কাসামার ক্ষেত্রে কেসাস ওয়াজিব হবে কেন? রাসূল (সা.) শুধুমাত্র তিন ক্ষেত্রে কতল (হত্যা) করার আদেশ দিয়েছেন। رَجُلٌ قُتِلَ بِجَرِيْرَةِ نَفْسِه فَقُتِلَ وَرَجُلٌ زَنٰى بَعْدَ اِحْصَانٍ وَرَجُلٌ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ঐ ব্যক্তি যাকে নিজের অপরাধের কারণে হত্যা করা হয়, বিবাহিত ব্যক্তিকে যেনার কারণে হত্যা করা হয় এবং আল্লাহ ও রাসূলের (সা.) সাথে বিদ্রোহের কারণে হত্যা করা হয়।

ইমামগণের পেশকৃত দলীলের জওয়াব

১। فَتَسْتَحِقُّوْنَ صَاحِبَكُمْ اَوْ قَاتِلَكُمْ-এর অর্থ দিয়্যাতের অধিকারী হওয়া। তাছাড়া পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূল (সা.) প্রথমে আনসারী

সাহাবাদেরকে দলীল পেশ করতে বলেন। কোন রাবী হয়ত একে ব্যাখ্যা করেছেন কসমের অর্থে।

সুতরাং হাদীসের অর্থ হচ্ছে, যদি তোমরা হত্যাকারীর বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট কোন দলীল পেশ করতে পার তাহলে আমি হত্যাকারীকে তোমাদের হাতে সোর্পদ করব। হাদীসে কাসামার হুকুম এসেছে দলীলের ভিত্তিতে কসমের ভিত্তিতে নয়। নাসায়ীর এক রেওয়ায়াতে আমর ইবনে শো'আইবের সনদে উল্লেখ করা হয়েছে— اَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلٰى قَتْلِهِ اَدْفَعْهُ اِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ দুইজন সাক্ষী পেশ কর হত্যাকারীকে তোমাদের হাতে সোপর্দ করা হবে।

২। যদি মেনে নেয়া হয় যে, হুযূর (সা.) তাঁদের থেকে কসম তলব করেছেন তবু সেটা কাসামার 'উসূল' হিসেবে নয় বরং তাঁদের উত্তেজনা নিরসনের জন্য তলব করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য হলো, কসম করে যদি তোমরা হত্যাকারীকে শনাক্ত করতে পার তাহলে তোমরা কেসাস পাবে। যেহেতু হত্যাকারী সম্পর্কে তোমাদের কোন ধারণা নেই এ কারণে কসমও করতে পারছ না। তাহলে তোমরাই বল কেসাস আসবে কি করে? এরূপ বক্তব্যের পর তাঁদের উত্তেজনা প্রশমিত হয় এবং মহল্লাবাসীর কসমের ওপর তাঁরা সন্তুষ্টি প্রকাশ করে।

৩। পূর্বেই বলা হয়েছে খায়বরের কাসামা সম্বলিত ঘটনাটির রেওয়ায়াত পরস্পর বিরোধ পূর্ণ। সুতরাং এরূপ রেওয়ায়াত দ্বারা দলীল পেশ না করাই উত্তম। বরং ওমরের (রা.) اثر (মতামত) এবং মূল উসূল অনুযায়ী আমল করা উচিত। আর اثر ও উসূল দিয়্যাতের পক্ষেই রায় দেয় কেসাসের পক্ষে নয়। কেননা ওমর (রা.) কাসামার পর দিয়্যাতের ফয়সালা দিয়েছিলেন, কেসাসের ফয়সালা দেননি।

এমনিভাবে উসূল অনুযায়ী কেসাস না আসার কথা। কেননা কেসাস ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হলো হত্যাকারীকে স্বচক্ষে হত্যাকান্ড সংঘটিত করতে দেখা—এখানে যা অনুপস্থিত।

তাছাড়া মহল্লাবাসী যখন কসম করে একথা বলল–আমরা তাকে হত্যা করিনি এবং হত্যাকারী কে তাও জানিনা এর পরও তাদের ওপর কেসাসের হুকুম দেয়া সুস্পষ্ট জুলুম ছাড়া আর কি হতে পারে?

কাসামার হুকুম সংশ্লিষ্ট দ্বিতীয় কথা হলো—আহনাফের মতে মহল্লাবাসী কসম করার পরেও তাদের ওপর দিয়্যাত ওয়াজিব হবে আর অন্যান্য ইমামদের মতে এক্ষেত্রে দিয়্যাত ওয়াজিব হবে না। তাঁরা বলেন কসম করা হয় মূলতঃ

নিজের ওপর থেকে কোন যিম্মাদারী দূর করার জন্য। সুতরাং যদি দিয়্যাত ওয়াজিবই হয় তাহলে কসম করে লাভ কী?

আমরা বলব—কসম করার ফায়দা হলো কেসাস এবং গ্রেফতারী থেকে রেহাই পাওয়া। দিয়্যাত থেকে বাঁচার জন্য কসম নেয়া হয় না। কাসামার বিধান রাখা হয়েছে মূলতঃ হত্যাকারীকে শনাক্ত করে তার থেকে কেসাস নেয়ার জন্য কিন্তু কসম করে যখন তাঁরা হত্যাকান্ড অস্বীকার করল এতে করে তারা কেসাস থেকে বেঁচে গেল এবং দিয়্যাত অবশিষ্ট থাকল।

মোদ্দাকথা হলো কাসামা সম্পর্কীয় বুনিয়াদী তিনটি মাসআলায় বরাবরের ন্যায় আহনাফের মাযহাবই প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য।

ফায়েদা ঃ হুযূর (সা.) ইহুদীদেরকে দিয়্যাত দিতে বললেন এদিকে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা তাদের কসমে পরিতৃপ্ত হচ্ছিল না, এ কারণে রাসূল (সা.) তাঁদেরকে নিজের পক্ষ থেকে দিয়্যাত আদায় করে দেন। অথচ নিয়ম অনুযায়ী কোন কিছু ওয়াজিব হওয়ার কথা ছিলনা। তবে এরও সম্ভাবনা রয়েছে যে, ইহুদীরাও অর্ধেক দিয়্যাত পরিশোধ করেছিল। কেননা কোন কোন রেওয়ায়াতে একথা উল্লেখ করা হয়েছে।

কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে— فَوَادَهٗ مِأَةً مِنْ اِبِلِ الصَّدَقَةِ সদকার উট দেয়ার অর্থ হলো, হুযূর (সা.) সদকার উট ক্রয় করে কিংবা করজ নিয়ে পরিশোধ করেছিলেন। পরবর্তীতে নিজের সম্পদ থেকে এটা আদায় করে দেন। অথবা বলা যায় তাঁরা সদকা খাওয়ার উপযুক্ত ছিল কিংবা আত্মিক প্রশান্তির জন্য বিশেষ একটি অংশ তাদের প্রদান করেন। আর একে রূপক অর্থে সদকা বলা হয়েছে। এতগুলো ব্যাখ্যা এ জন্য করা হলো, কারণ সদকা পাওয়ার বিশেষ শ্রেণী নির্ধারিত রয়েছে, যাদের ছাড়া অন্য কাউকে দেয়া যায় না।

باب حكم المحار بين والمرتد ين

অধ্যায় ঃ মুরতাদ এবং বিদ্রোহীদের হুকুম

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ نَا سًامِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنْ شِئْتُمْ اَنْ تَخْرُجُوْا اِلٰى اِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوْا مِنْ

اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا. فَفَعَلُوْا فَصَحُّوْا ثُمَّ مَالُوْا عَلَى الرُّعَاةِ فَقَتَلُوْهُمْ وَارْتَدُّوْا عَنِ الْاِسْلَامِ وَسَاقُوْا ذَوْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فِىْ اٰثَرِهِمْ فَاُتِىَ بِهِمْ، فَقَطَعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ اَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِى الْحَرَّةِ حَتّٰى مَاتُوْا .

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত—উরায়না গোত্রের কয়েক জন লোক হুযূর (সা.) এর দরবারে (মদীনায়) আগমন করে। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া অনুকূল না হওয়া রাসূল (সা.) তাদেরকে মদীনার বাইরে গিয়ে সদকার উটের দুধ ও পেশাব পান করার পরামর্শ দেন। পরামর্শ মতে তারা এরূপ করে সুস্থ হয়ে উঠে এবং রাখালের ওপর হামলা করে তাকে হত্যা করে উট নিয়ে পালিয়ে যায়।

হুযূরের (সা.) কাছে ঘটনার সংবাদ পৌছলে তিনি তাদেরকে ধরার জন্য লোক প্রেরণ করেন। তাদেরকে গ্রেফতার করে আনা হয়। অতঃপর তাদের হাত-পা কেটে দেয়া হয়, চোখ উপড়ে ফেলা হয় এবং মৃত্যু পর্যন্ত উত্তপ্ত বালুকাময় স্থানে ফেলে রাখা হয়।

হাদীস সংশ্লিষ্ট কয়েকটি আলোচনা (ব্যাখ্যা)

১। ان ناسا من عرينة--এর ব্যাখ্যা ঃ عرينة শব্দটি পেশ বিশিষ্ট। এটি কুজা'আ (قضاعة) ও বুজায়লা (بجيلة) কবীলার একটি শাখাগোত্র। তবে হাদীসে দ্বিতীয় কবীলার শাখার কথা বলা হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়াতে من عكل শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। এটি তায়মুর রাবাব কবীলার অন্তর্ভুক্ত। অন্য রেওয়ায়াতে আবার সন্দেহের (شك) সাথে من عكل او عرينة বলা হয়েছে। কিছু রেওয়ায়াতে ثمانية نفر من عكل বলা হয়েছে। কতক রেওয়ায়াতে من عكل وعرينة বলা হয়েছে। অবশ্য এটিই সবচেয়ে বিশুদ্ধ রেওয়ায়াত। তাবারী ও আবূ আওয়ানার রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে عرينة গোত্রের চারজন এবং عكل গোত্রের তিন জন লোক এসেছিল। সবগুলো রেওয়ায়াতের সঠিক সমাধান হলো মোট আট জন লোক আগমন করেছিল। চারজন উরায়নার তিনজন উকলের এবং একজন অন্য কোন কবীলার।

২। فاجتووها-এর ব্যাখ্যা ঃ বলা হয়ে থাকে اجتويت البلد-এর অর্থ কোন শহরে বসবাসে ক্ষতিসাধন হওয়ায় সেখানে অবস্থান করতে না চাওয়া। অন্য রেওয়ায়াতে আছে استوخموا। অর্থ আবহাওয়া অনুকূল না হওয়া।

কথিত আছে—এসব লোক অত্যন্ত জীর্ণশীর্ণ ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে অসুস্থ অবস্থায় মদীনায় আগমন করে। মদীনায় আসার পর তারা সুস্থ হয়ে উঠে কিন্তু পেট ফুলে যায়। এ কারণে তারা মদীনায় অবস্থান করতে অপছন্দ করে। আরবীতে একে موم এবং বাংলায় কুষ্ঠ রোগ বলে। রাসূলের (সা.) কাছে এই ঘটনা শোনালে তিনি তাদেরকে উটের চারণ ভূমিতে চলে যাওয়ার আদেশ দেন এবং উটের দুধ ও পেশাব পান করার অনুমতি প্রদান করেন।

৩। الى ابل الصدقة-এর ব্যাখ্যা ঃ এখানে বলা হয়েছে সদকার উট (ابل الصدقة) অন্য রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে রাসূলের (সা.) উট (ابل رسول الله)। উভয় রেওয়ায়াতের দ্বন্দ্ব নিরসন করা হয় এভাবে যে, সদকার উটের সাথে রাসূলের (সা.) নিজস্ব উটও ছিল এজন্য এরূপ বলা হয়েছে। অথবা এও হতে পারে যে, যেহেতু হুযূর (সা.) সদকার উটের মুতাওয়াল্লী ছিলেন এজন্য তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট (نسبت) করে ابل رسول الله صلى الله عليه وسلم বলা হয়েছে।

৪। فتشربوا من البانها وابوالها-এর ব্যাখ্যা ঃ রাসূল (সা.) তাদেরকে উটের দুধ এবং পেশাব পান করতে বলেন। আলোচ্য হাদীস অংশে দু'টি মাসআলা আলোচনা করা হয়। যথা ঃ ১। مسئلة بول ما يوكل لحمه (তথা হালাল প্রাণীর পেশাব পান করার হুকুম) ২। مسئلة التداوى بالحرام (তথা হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা)

হালাল প্রাণীর পেশাবের হুকুম

হালাল প্রাণীর পেশাব সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে।

১। ইমাম মালেক, আহমদ এবং মুহাম্মাদের মতে হালাল প্রাণীর পেশাব এবং গোবর পাক। এটা ইমাম শা'বী, আতা, ন'খয়ী, যুহরী, ইবনে সিরীন, আবূ দাউদ, ইবনে উলাইয়্যার মাযহাবও।

২। ইমাম আবূ ইউসুফ আবূ হানীফা এবং শাফেঈ, ইমাম আবূ সাউর এবং ওলামায়ে কিরামের বৃহৎ এক জামাআতের মতে নাপাক। প্রথম মাযহাব ওয়ালারা বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন—যাতে পেশাব পান করার কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া অন্য এক হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন صلوا فى مرابض الغنم তোমরা ছাগল রাখার স্থানে নামায আদায় করো। যদি এর পেশাব পাক না হতো তাহলে রাসূল (সা.) এখানে নামায পড়ার অনুমতি দিতেন না।

ইমাম আবূ হানীফা ও শাফেঈর দলীল ঃ

(١) اِسْتَنْزِهُوْا عَنِ الْبَوْلِ فَاِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ ـ

পেশাব থেকে বেঁচে থাক, কেননা এর কারণে কবরে ব্যাপক আকারে শাস্তি হয়ে থাকে।

২। এমনিভাবে ইবনে আব্বাস ও আবূ উসামা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে— اتقوا البول فانه اول مايحاسب به العبد فى القبر "পেশাব থেকে সংযত থেকো, কেননা কবরে বান্দার প্রথম হিসাব হবে পেশাব নিয়ে।

যদি পেশাব পাকই হতো তাহলে এ থেকে বেঁচে থাকার এবং কবরে হিসেব নেয়ার কোন প্রশ্নই আসত না। দ্বিতীয় মাযহাবের ইমামগণ হাদীসে উল্লেখিত البول-এর لا الف -কে جنس বা استغراق-এর অর্থে প্রয়োগ করেন। যাতে সব ধরনের পেশাব শামিল হয়ে যায়। আর প্রথম মাযহাবের অনুসারীগণ একে عهد خارجى-এর অর্থে প্রয়োগ করেন এবং অর্থ করেন-শুধুমাত্র মানুষের পেশাব থেকে বাঁচতে বলা হয়েছে।

৩। হযরত ওমর (রা.) এর হাদীস نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَاَلْبَانِهَا 'রাসূল (সা.) মুক্ত-স্বাধীন প্রাণীর গোশত ও দুধপান করতে নিষেধ করেছেন। جلّالة বলা হয় ঐ প্রাণীকে যে (মুক্ত থেকে) গোবর-ময়লা ভক্ষণ করে। আর নিষেধ করার কারণ একটিই তথা গোবর নাপাক হওয়া যা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে দুধ ও গোশতকে নাপাক করে দিয়েছে। সুতরাং গোবরের যে হুকুম পেশাবেরও একই হুকুম।

৪। হারাম প্রাণী (مالا يؤكل لحمه) এর গোবর নাপাক হওয়ার কারণ–খাদ্যের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে অন্য রূপ ধারণ করা। আর এই কারণ হালাল প্রাণীর মধ্যেও হয়ে থাকে। সুতরাং এগুলোর পেশাব ও গোবর নাপাক হওয়া উচিত। এ কারণেই ইবনে মাসউদ (রা.) গোবর দ্বারা ইস্তেঞ্জা করতেন না এবং বলতেন এটা নাপাক (انهارِجس اى نجس)।

৫। নযরে ত্বহাভী ঃ ইমাম ত্বহাভী (রহ.) বলেন–মানুষের গোশত পাক অথচ পেশাব নাপাক। এতে বুঝা যায় মানুষের পেশাব রক্তের তাবে'। সুতরাং রক্ত যেহেতু নাপাক এজন্য পেশাবও নাপাক। অতএব কেয়াসের দাবি হলো, হালাল প্রাণীর পেশাবও তার রক্তের তাবে' হওয়া। সুতরাং সেগুলোর রক্ত যেহেতু নাপাক এজন্য এর পেশাবও নাপাক হবে।

ইমামগণের বর্ণিত দলীলের জওয়াব

ইমামগণ উরায়নার ঘটনা পেশ করে যে দলীল প্রদান করেছেন এর জওয়াব হলো, ১। হাদীসটি মানসূখ হয়ে গেছে। মানসূখ হওয়ার দলীল হলো, এই হাদীস সংশ্লিষ্ট অনেক হুকুমকে ইমাম মালেক ও হাম্বলীগণও মানসূখ মানেন। যেমন, এই হাদীসে মুছলার (লাশ বিকৃত করা) কথা উল্লেখ করা হয়েছে অথচ সবার মতে এই হুকুম মানসূখ হয়ে গেছে।

২। চিকিৎসার স্বার্থে রাসূল (সা.) ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন। এর অর্থ এই নয় যে, এটা পাক। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন— ان فى ابوال الابل والبانها شفاء لذربة بطنهم "উটের পেশাব ও দুধ তাদের পেটের পীড়ার জন্য ঔষধের কাজ করেছিল" অনেক চিকিৎসকও একথা বলেছেন যে, উটের পেশাব পেটের পীড়ার জন্য উপকারী। সুতরাং ঔষধের কাজ দেয়া মানেই এটা পাক হওয়া বুঝায় না।

৩। মূলতঃ রাসূল (সা.) তাদেরকে দুধ পান করার আদেশ দিয়েছিল পেশাব পান করতে বলেন নি কিন্তু তারা পুরাতন অভ্যাস অনুযায়ী দুধের সাথে পেশাবও পান করে। অনেক রেওয়ায়াতে শুধু দুধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, اشربوا من البانها এই রেওয়ায়াতে ابوال-এর কথা উল্লেখ নেই। কিন্তু কোন রাবী ধারণার বশবর্তী হয়ে البان-এর সাথে ابوال-কেও উল্লেখ করেছেন।

অথবা একথা বলা যেতে পারে এখানে صنعت تضمين (অলংকার শাস্ত্রের এক বিশেষ নিয়ম) অনুযায়ী ابوال শব্দকে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং মূল বাক্য

হবে এরূপ اشربوا من البانهاواستنشقوا من ابوالها আরবীতে এরূপ ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। বলা হয়ে থাকে—

عَلَّفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا اَىْ عَلَّفْتُهَا تِبْنًا، سَقَيْتُهَا مَاءً بَارِدًا ـ

"আমি জন্তুকে ঘাস ও ঠাণ্ডা পানি পান করিয়েছি" সুতরাং যে রেওয়ায়াতে এতগুলো বিষয়ের সম্ভবনা রয়েছে সে রেওয়ায়াত কোনভাবে দলীল হতে পারে না।

হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা

হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা জায়িয আছে কিনা এ সম্পর্কে কিছুটা তাফসীল রয়েছে। যদি প্রাণ নাশের প্রবল সম্ভাবনা থাকে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করা জায়িয। কিন্তু প্রাণ নাশের আশংকা না থাকলে শুধুমাত্র সুস্থতা লাভের জন্য হারাম বস্তু ব্যবহার করা যাবে কিনা এ সম্পর্কে মত বিরোধ রয়েছে।

১। ইমাম মালেকের (রহ.) মতে এক্ষেত্রেও হারাম বস্তু ব্যবহার করা জায়িয।

২। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) মুহাম্মদ এবং ইমাম শাফেঈর মতে এক্ষেত্রে تداوى بالحرام তথা হারাম বস্তু ব্যবহার করা নাজায়িয। ইমাম শামসুল আয়িম্মা তাঁর অমর গ্রন্থ মাবসূতের অযূ ও গোসল অধ্যায়ে লিখেছেন ইমাম আবূ হানীফার মাযহাব অনুযায়ী এ পেশাব কোনভাবে পান করা যাবে না।

—মাবসূত খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৪

৩। ইমাম বাইহাকীর মতে নেশাজাত বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা নাজায়িয অন্যান্য হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা জায়িয।

৪। ইমাম আবূ ইউসুফের (রহ.) মতে অভিজ্ঞ ডাক্তার যদি এই রায় দেয় যে হারাম বস্তু ছাড়া আপাতত কোন চিকিৎসা নেই তাহলে জায়িয অন্যথায় নাজায়িয। যারা জায়িয বলেন (ইমাম মালেক) তাঁরা حديث عرينة-কে দলীল হিসেবে পেশ করেন। আর যারা নাজায়িয বলেন (আবূ হানীফা ও শাফেঈ) তারা নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। যথা ঃ

(١) عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَتَدَاوَوْا بِالْحَرَامِ ـ (ابوداؤد)

"আল্লাহ্ তা'আলা রোগ এবং চিকিৎসা উভয়টি দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো তবে হারাম বস্তু দিয়ে নয়।

(٢) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ : اَنَّ طَبِيْبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِيْ دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا ـ ابوداود

"কোন এক ডাক্তার হুযূর (সা.) এর কাছে ব্যাঙ দিয়ে ঔষধ বানানোর অনুমতি চাইলে তিনি বারণ করেন (ব্যাঙ হত্যা করতে নিষেধ করেন)।

(٣) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيْثِ ـ ابوداود

"রাসূল (সা.) নাপাক ঔষধ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন"

(٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ فِيْ رِجْسٍ اَوْ فِيْمَا حَرَّمَ شِفَاءً ـ طحاوى

আল্লাহ্ তা'আলা নাপাক এবং হারাম বস্তুর মধ্যে তোমাদের আরোগ্য রাখেননি।

(٥) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ لاَ تُشْفِ مَنِ اشْتَشْفٰى بِالْخَمْرِ ـ

"হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি মদের মাধ্যমে আরোগ্য তলব করে তাকে আরোগ্য দিও না।"

যারা জায়িযের পক্ষে তাঁরা এসব হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন—এসব হাদীস স্বাভাবিক অবস্থায় (যখন ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ থাকে) প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে ভিন্ন কোন ঔষধ না থাকলে হারাম বস্তু ব্যবহার করা নাজায়িয নয়। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী, আল্লামা সাহারানপুরী, ইউসুফ বিন্নুরী, ইউসুফ কান্ধালভী প্রমুখ ওলামা এই ব্যাখ্যা (জওয়াব) পছন্দ করেছেন। আল্লামা ইবনে হাযম (রহ.) বলেন—হারাম বস্তুতে কোন চিকিৎসা নেই। হ্যাঁ, যদি আমরা অপারগ হয়ে যাই তখন এটা আমাদের জন্য জায়িয হয়ে যায়।

৫। ثم مالو اعلى الرعاه فقتلوهم-এর ব্যাখ্যা

رعاء শব্দটির ر কালিমা কাসরা যুক্ত। এটি راعى-এর বহুবচন। অর্থ রাখাল। তারা শুধুমাত্র হুযূর (সা.) এর গোলাম ইয়াসার (রা)-কে হত্যা করে ছিল। রাবী روايت بالمعنى করতে গিয়ে বহুবচনের সীগা উল্লেখ করেছেন।

৬। فبعث فى اثرهم-এর ব্যাখ্যা

হুযূর (সা.) তাদের পাকড়াও করতে কুরয্ ইবনে জাবের ফেহরী (রা.)-কে বিশ জন সাথী দিয়ে প্রেরণ করেন। এই সারিয়্যাকে সারিয়্যায়ে কুরয্ ইবনে জাবের ফেহরী বলা হয়। তাঁরা সবাইকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসেন।

এটি ৬ষ্ঠ হিজরী শাওয়াল মাসের ঘটনা। এটা অবশ্য আল্লামা ওয়াকেদী, ইবনে সা'দ এবং ইবনে হিব্বানের অভিমত। ইমাম বুখারীর মতে এটি হুদাইবিয়ার পর খায়বরের আগের ঘটনা।

৭। فقطع ايديهم وارجلهم وسمل اعينهم-এর ব্যাখ্যা

তাদের হাত-পা কাটা হয় বিদ্রোহের কারণে। আর চোখ উপড়ে ফেলা হয় কেসাস স্বরূপ। কেননা তারাও রাখালের চোখ উপড়ে ফেলেছিল। জমহুরের মতে কেসাসের ক্ষেত্রে مماثلت (সাদৃশ্য) জরুরী। যেরূপভাবে হত্যা করা হবে সেভাবেই কেসাস আদায় করা হবে। তাঁরা এই হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। কিন্তু আহনাফের মতে কেসাস শুধুমাত্র তলোয়ার দিয়েই হতে পারে অন্য কোন কিছু দিয়ে নয়। ইবনে মাজার এক রেওয়ায়াতে উল্লেখ করা হয়েছে— لا قود الا بالسيف তলোয়ার ছাড়া অন্য কোন পন্থায় কেসাস নেই। হাদীসের জওয়াব হলো; এসব লোকের অপরাধ অত্যন্ত মারাত্মক ছিল। রাজনৈতিক বিবেচনায় রাসূল (সা.) তাদেরকে এরূপ কঠোর শাস্তি প্রদান করেছিলেন। সুতরাং রাসূলের (সা.) এই কাজটি نهى عن المثلة-এর হাদীস দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে। এতদ সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা হবে। এ পর্যায়ে আমরা ডাকাতি ও মুরতাদের হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করব।

قطع الطريق তথা ডাকাতির সংজ্ঞা

اَلْحِرَابَةُ هِىَ قَطْعُ الطَّرِيْقِ وَهُوَ الْخُرُوْجُ لِاَخْذِ الْمَالِ عَلٰى سَبِيْلِ الْمُغَالَبَةِ عَلٰى وَجْهٍ يُمْتَنَعُ الْمَارَّةُ عَلَى الْمُرُوْرِ وَيَنْقَطِعُ الطَّرِيْقُ سَوَاءٌ كَانَ الْقَطْعُ مِنْ جَمَاعَةٍ اَوْ مِنْ وَاحِدٍ بَعْدَ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ قُوَّةُ الْقَطْعِ ـ

(تكملة فتح الملهم)

حرابة অর্থ قطع الطريق অর্থাৎ জবরদস্তিমূলক মাল-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে মানুষের চলার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। এটা এক বা একাধিক ব্যক্তির পক্ষ থেকে হতে পারে। তবে শর্ত হলো প্রতিবন্ধকতার শক্তি থাকা। —তাকমিলা ফতহুল মুলহিম

উল্লেখ্য যে, ডাকাতির শাস্তি কার্যকর হওয়ার জন্য মাল ছিনতাইয়ের নিয়ত থাকা শর্ত নয়। সুতরাং উড়োজাহাজ ইত্যাদিতে অপহরণ করাও ডাকাতির অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং ডাকাতির যা শাস্তি এদের বেলায়ও সেই শাস্তি প্রযোজ্য হবে।

ডাকাতির শাস্তি ঃ সূরা মায়িদায় ডাকাতির চারটি শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াত—

اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُقَتَّلُوْا اَوْيُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ـ

যারা আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর সাথে বিদ্রোহ করে এবং জমিনে ফেৎনা-ফাসাদের চেষ্টা করে তাদেরকে হত্যা করা হবে কিংবা শূলিতে চড়ানো হবে অথবা বিপরীত দিক হতে হাত-পা কাটা হবে নতুবা দেশান্তর করা হবে।
—সূরা মায়িদা

প্রথম তিনটি শাস্তির বেলায় আধিক্যতা বুঝাতে باب تفعيل-এর সীগা নির্বাচন করা হয়েছে, যা ক্রিয়ার (فعل) কঠোরতা ও আধিক্যতা বুঝায়। এমনিভাবে বহুবচনের সীগা উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে সরাসরি অপরাধ কর্মে অংশ নিয়েছে শাস্তি শুধু তারই হবে না বরং এতে

সহযোগিতা-উদ্বুদ্ধকারী পুরো জামাতকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। এমনিভাবে হত্যা কিংবা শূলিতে চড়ানোর শাস্তি কেসাস স্বরূপ নয় যে, নিহত ব্যক্তির অভিভাবক ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিবে। এটা সরাসরি আল্লাহর হক হওয়ায় তারা ক্ষমা করলেও ক্ষমা হবে না।

ডাকাতির এই চারটি শাস্তি او শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। শব্দটি কয়েকটি বিষয়ের কোন একটিকে বরণ করে নেয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া বিবণ্টন (تقسيم) ও তাকমীলের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ কারণে একদল ফকীহ এই মত পেশ করেছেন যে, রাষ্ট্রনায়ক অপরাধের ধরন দেখে এই চার শাস্তির যে কোন একটি কার্যকর করতে পারে। এটি ইমাম মালেক, সাঈদ ও আতা প্রমুখের অভিমত।

ইমাম আবূ হানীফা, শাফেঈ ও আহমদের মতে এখানে او শব্দটি তাফসীল ও তাকসীম (বিবণ্টনের) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক অপরাধে আলাদা আলাদা শাস্তি হবে। যুক্তির দাবিও এটি। কেননা অপরাধের ধরন যেহেতু ভিন্ন হয় এজন্য শাস্তির ধরনও ভিন্ন হওয়া উচিত।

সুতরাং আবূ হানীফার মতে ডাকাতির ধরন চারটি। যথা ঃ ১। শুধু মাল কেড়ে নিয়েছে, অন্য কিছু করেনি। এক্ষেত্রে বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কাটতে হবে।

২। শুধু হত্যা করেছে। এক্ষেত্রে তাকেও হত্যা করা হবে। আর এটা হদ (শরীয়তের দণ্ড) হিসেবে, কেসাস হিসেবে নয়। এজন্য নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা ইচ্ছা করলেও ক্ষমা করতে পারবে না।

৩। হত্যার সাথে সাথে মালও ছিনিয়ে নিলে বিচারকের ইখতিয়ার থাকবে। তিনি ইচ্ছা করলে হাত-পা কাটার পর কতল করবেন কিংবা জীবিতবস্থায় শূলিতে উঠাবেন অথবা শুধু হত্যা করবেন অথবা শুধু শূলিতে চড়াবেন নতুবা হত্যা ও শূলি উভয়টি করবেন কিংবা হাত-পা কাটার পর হত্যা ও শূলি সবটি করবেন।

ইমাম শাফেঈ, মুহাম্মাদ এবং আহমদের মতে হাত-পা কাটা যাবে না শুধুমাত্র হত্যা ও শূলিতে দেয়া যাবে।

৪। শুধুমাত্র ভীতি প্রদর্শন করলে (হত্যা ও মাল না নিলে) তাকে দেশান্তর করতে হবে।

জমহুর আলিমগণ উল্লেখিত শাস্তির এই ধরন ও বিভক্তিকরণ হযরত ইবনে আব্বাসের (রা.) রেওয়ায়াত থেকে গ্রহণ করেছেন। তাঁর রেওয়ায়াতে হুবহু তাই তাফসীল উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া শাস্তির রকমফের হওয়া যুক্তিরও দাবি বটে। তবে দেশান্তর-এর ব্যাখ্যায় মতবিরোধ রয়ে গেছে। ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, দেশান্তর হলো, এক শহর থেকে অন্য শহরে সর্বদা তাড়িয়ে বেড়ানো, কোথাও স্থায়ী হতে না দেয়া। হাসান বসরী (রহ.) বলেন, ইসলামী ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করা।

আহনাফের মতে দেশান্তরের অর্থ জেলখানায় আবদ্ধ করা যে যাবত না তওবা করে কিংবা মৃত্যুবরণ করে।

অন্যান্য ইমামগণ দেশান্তরের যে পন্থা বর্ণনা করেছেন তা সামগ্রিক কল্যাণের পরিপন্থী। কেননা অন্য শহরে তাড়িয়ে দিলে আরো বেশি করে অপকর্ম করবে আর ইসলামী ভূখণ্ড থেকে বিতাড়ন করলে কাফির-মুরতাদ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এটা তার এবং পুরো মুসলিম জাতির জন্য ক্ষতিকর।

মুরতাদের সংজ্ঞা এবং হুকুম

সংজ্ঞা ঃ ارتداد (মুরতাদ হওয়ার) অর্থ ফিরে যাওয়া, পশ্চাদ্ধাবন করা। কিন্তু কুরআন, হাদীস ও প্রচলিত রেওয়াজ (عرف) অনুযায়ী ইসলাম থেকে ফিরে যাওয়াকে মুরতাদ বলা হয়। সুতরাং মুরতাদের অর্থ দাঁড়াচ্ছে ঃ কোন মুমিন কর্তৃক এমন কথা বা কাজ প্রকাশ পাওয়া যার দ্বারা আল্লাহর জাত (সত্ত্বা) ও সিফাত (গুণাবলী) অস্বীকার বুঝায় কিংবা কোন নবী-রাসূল (সা.)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয় অথবা দ্বীনের কোন বিষয়কে বিদ্রূপ করা হয়। এসব ক্ষেত্রে লোকটি যদি বালেগ, সুস্থ জ্ঞানের অধিকারী (عاقل) হয় তাহলে তাকে মুরতাদ বলে ঘোষণা দিতে হবে এবং এর নির্ধারিত হুকুম তার উপর প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু অপ্রাপ্ত বয়স্ক, পাগল ও নির্বোধ কাউকে শাস্তি দেয়া যাবে না।

রদ্দুল মুহতারে উল্লেখ করা হয়েছে–যে ব্যক্তি রাসূল (স.)-কে গালি দিবে বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে অথবা দোষারোপ করবে কিংবা ত্রুটিযুক্ত মনে করবে সে কাফির হয়ে যাবে এবং তার স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। মহিলার হুকুমও এরূপ। তবে আবূ হানীফার মতে মহিলাকে হত্যা করা যাবে না।

—রদ্দুল মুহতার খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৩৪

মুরতাদের হুকুম

মুরতাদের হুকুম হলো তাকে হত্যা করা। চার ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, যে ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায় তাকে হত্যা করা ওয়াজিব এবং তার রক্ত মূল্যহীন হয়ে যায়। মুরতাদকে হত্যা করার ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যথা ঃ

١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوْعًا مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ

"যে ব্যক্তি দ্বীন-ইসলামকে ত্যাগ করলো তাকে হত্যা করো।"

٢. عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ ـ

আবূ হুরাইরা (রা.) ইসমা (রা.) প্রমুখ সাহাবা থেকে এ ধরনের রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে।

মুয়াত্তার এক রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ مَنْ غَيَّرَ دِيْنَهُ فَاضْرِبُوْا عُنُقَهُ ـ

(٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِءٍ مُّسْلِمٍ يَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَّا بِاِحْدٰى ثَلاَثٍ ، اَلثَّيِّبُ الزَّانِيْ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ وَالْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ـ بخاری ومسلم

"হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, মুসলমান যে কালিমা শাহাদাতের সাক্ষ্য দেয় তাকে তিন কারণের কোন এক কারণ ছাড়া হত্যা করা জায়িয নেই। যথা ঃ (১) বিবাহিত ব্যভিচারী, (২) অন্যায়ভাবে হত্যাকারী এবং (৩) দ্বীন পরিত্যাগকারী (মুরতাদ)।

(٤) عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ بْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اَشْرَفَ يَوْمَ الدَّارِ فَقَالَ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ، اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِءٍ مُّسْلِمٍ اِلَّا بَاِحْدٰى ثَلٰثٍ، زِنًا

بَعْدَ اِحْصَانٍ اَوْ كُفْرٍ بَعْدَ اِسْلاَمٍ اَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ فَيُقْتَلُ بِهِ فَوَاللّٰهِ مَا زَنَيْتُ فِىْ جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ فِىْ اِسْلاَمٍ وَلاَ ارْتَدَدْتُ مُنْذُ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا قَتَلْتُ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ ـ ترمذى، نسائى، ابوداود

আবূ উমামা থেকে বর্ণিত, হযরত ওসমান (রা.) কে যে সময় অবরোধ করে রাখা হয় সে সময় একদিন তিনি মাথা উঁচু করে বিদ্রোহীদের প্রতি সম্বোধন করে বলেন, আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, তোমরা কি জানো না যে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, তিন কারণ ছাড়া মুসলমানকে হত্যা করা জায়িয নেই? কারণ তিনটি হলো, বিবাহিত হয়ে ব্যভিচার করা, ইসলাম গ্রহণ করার পর কুফরী করা এবং অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা। আল্লাহ্র কসম! আমি জাহেলী যুগেও ব্যভিচার করিনি, ইসলাম গ্রহণ করেও নয়। আমি মুরতাদ হয়ে যাইনি এবং কাউকে হত্যাও করিনি। —তিরমিযী, নাসায়ী, আবূ দাউদ

(٥) عَنْ جَرِيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : اِذَا اَبَقَ الْعَبْدُ اِلَى الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ ـ ابوداود

"যে ব্যক্তি শিরকে লিপ্ত হয় তার রক্ত হালাল হয়ে যায়।"

(٦) عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : أُتِىَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِزَنَادِقَةٍ فَاَحَرَّقَهُمْ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ :لَوْ كُنْتُ اَنَا لَمْ اَحْرِقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ : لَا تُعَذِّبُوْا بِعَذَابِ اللّٰهِ، وَلَقَتَلْتُهُمْ، لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ ـ (بخارى ، ترمذى، ابوداؤد) وغيرذلك من الاحاديث الكثيرة ـ

ইকরামা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা.)-এর কাছে কয়েকজন যিন্দীককে গ্রেফতার করে আনা হলে তিনি সবাইকে পুড়িয়ে মারেন। ইবনে আব্বাসের কাছে এই সংবাদ পৌছলে তিনি বলেন, "আমি হলে পুড়িয়ে মারতাম

না। কেননা রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা আল্লাহর শাস্তি দিয়ে কাউকে শাস্তি দিও না।"

বরং আমি তাদের হত্যা করতাম। কেননা রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দ্বীন (ইসলাম) পরিত্যাগ করে তাকে হত্যা করো।"

মুরতাদের তওবা গ্রহণ করা

১। ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) মতে মুরতাদকে কিছুটা অবকাশ দেয়া উচিত যাতে এ সময়ে পুনরায় তার কাছে ইসলাম পেশ করা যায়। কাজী ইচ্ছা করলে তিন দিন জেলখানায় আবদ্ধ রাখবে। এ সময় সে ইসলাম কবুল করলে ভালো অন্যথায় তাকে হত্যা করতে হবে। এই অবকাশ দেয়াটা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। কেননা তার কাছে তো ইসলামের দাওয়াত আগেই পৌঁছেছে। আর যার কাছে আগে থেকেই দাওয়াত পৌঁছেছে তাকে নতুন করে দাওয়াত দেয়া ওয়াজিব নয়, মুস্তাহাব। কুরআনের আয়াত فاقتلوا المشركين এবং হাদীস من بدل دينه فاقتلوه-এ অবকাশ দেয়ার কথা উল্লেখ নেই। তাছাড়া মুরতাদ হলো হরবী কাফিরের মত যাকে অবকাশ দেয়া জরুরী নয়। আর সে যিম্মিত নয় কেননা তার থেকে জিযিয়া (কর) আদায় করা হয় না। সুতরাং অবকাশ না দিয়েই তাকে হত্যা করা যাবে।

—আল ফিকহু আলা মাযাহিবিল আরবা'আ খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪২৪

২। ইমাম শাফেঈর (রহ.) মতে তিনদিন পর্যন্ত অবকাশ দেয়া ওয়াজিব। তিনি বলেন, মুসলমান কোন সন্দেহের কারণেই মুরতাদ হয়ে থাকে। সুতরাং এতটুকু সময় দেয়া উচিত যাতে করে সে সন্দেহ দূর করতে পারে। আর এই সময়ের পরিমাণ তিনদিন। তিনদিন সময়ের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। মূসা (আ.) ও খিজির (আ.)-এর ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে—

وَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ قَالَ لَهُ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّيْ عُذْرًا ـ

এটি মালেকী মাযহাব এবং আহমদ (রহ.)-এর একমত এরূপ।

মহিলা মুরতাদের হুকুম

১। ইমাম শাফেঈ, আহমদ ও মালেকের মতে মহিলা মুরতাদকেও পুরুষের মত হত্যা করা হবে। কেননা উভয়ের অপরাধ সমান। তাঁরা বলেন, মহিলা মুরতাদের হুকুম পুরুষ মুরতাদের মতো। সুতরাং কতল করার আগে তাকেও তিনদিন অবকাশ দিতে হবে।

عَنْ جَابِرٍ : اَنَّ امْرَأَةً يُقَالُ اُمُّ رُوْمَانَ ارْتَدَّتْ فَاَمَرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْاِسْلَامُ فَاِنْ تَابَتْ وَاِلَّا قُتِلَتْ ـ دارقطنى

"উম্মে রূমান নামী এক মহিলা মুরতাদ হয়ে গেলে রাসূল (সা.) তাকে তিনদিনের অবকাশ দেয়ার নির্দেশ দেন। এ সময়ে ইসলাম কবুল না করলে হত্যা করার আদেশ দেন। এমনিভাবে من بدل دينه فاقتلوه হাদীসে ব্যাপকভাবে নারী-পুরুষ সকল মুরতাদকে হত্যা করতে বলা হয়েছে।

২। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে মহিলা মুরতাদকে হত্যা করা যাবে না। বরং বন্দী করে রেখে ইসলাম পেশ করতে হবে। প্রত্যেক দিন ৩৯টি দোররা লাগাতে হবে। এভাবে হয় ইসলাম কবুল করবে না হয় জেলখানাতেই মারা যাবে। হ্যাঁ, কোন ব্যক্তি যদি হত্যা করেই ফেলে তাহলে তার জন্য তাকে কেসাস বা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

কতল না করার স্বপক্ষে দলীলসমূহ ঃ

(١) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِىْ بَعْضِ مَغَازِى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُوْلَةً فَاَنْكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ـ

রাসূল (সা.)-এর যুগে কোন এক যুদ্ধে একজন মহিলাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। এতে রাসূল (সা.) অসন্তুষ্ট হন এবং মহিলা ও শিশু বাচ্চা হত্যা করতে বারণ করেন।

(٢) رُوِىَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَهُ حِيْنَ بَعَثَ اِلَى الْيَمَنِ ؛ اَيُّمَا رَجُلٍ اِرْتَدَّ عَنِ الْاِسْلَامِ فَادْعُهُ فَاِنْ تَابَ فَاقْبَلْ مِنْهُ وَاِنْ لَمْ يَتُبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ، وَاَيُّمَا امْرَأَةٍ اِرْتَدَّتْ عَنِ الاِ سْلَامِ فَادْعُهَا فَاِنْ تَابَتْ فَاقْبَلْ مِنْهَا وَاِنْ اَبَتْ فَاسْتَتِبْهَا الخ ـ

মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)-কে ইয়ামেনে প্রেরণ করার সময় রাসূল (সা.) নসীহত করেন—যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করবে তাকে পুনরায় দাওয়াত দাও,

যদি সে তওবা করে তাহলে ভালো আর তওবা না করলে গর্দান উড়িয়ে দাও। আর যে মহিলা মুরতাদ হয়ে যায় তাকে দ্বীনের দিকে আহবান কর। যদি তওবা করে তাহলে তা কবুল করে নাও। অস্বীকৃতি জানালে বারবার তওবা করার আহবান জানাও।

(٣) رَوٰى اَبُوْ يُوْسُفَ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ اَبِى النَّجُوْدِ عَنْ اَبِىْ رُزَيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا تُقْتَلُ النِّسَاءُ اِذَا هُنَّ ارْتَدَنَ عَنِ الْاِسْلَامِ وَلٰكِنْ يُحْبَسْنَ وَيُدْعَيْنَ اِلَى الْاِسْلَامِ وَيُجْبَرْنَ عَلَيْهِ ـ

"ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, মহিলা মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে হত্যা করা যাবে না বরং বন্দী করে রাখতে হবে এবং ইসলামের প্রতি বারবার আহবান করতে হবে।"

(٤) عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ بَلَغَنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ ؛ اِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْاَةُ عَنِ الْاِسْلَامِ حُبِسَتْ ـ وَمِثْلُ هٰذَا لَا يُقَالُ عَنِ اجْتِهَادٍ ـ

ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আমাদের কাছে এই রেওয়ায়াত এসেছে, যে মহিলা মুরতাদ হয়ে যাবে তাকে আটকে রাখতে হবে। আর এ ধরনের ফতওয়া কেউ ইজতেহাদ করে দেয় না।"

(٥) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : اَلْمُرْتَدَّةُ تُسْتَتَابُ وَلَا تُقْتَلُ ـ دارقطنى

"আলী (রা.) বলেন, মুরতাদ মহিলাকে হত্যা করা যাবে না, তাওবা করতে বলা হবে।"—দারা কুতনী

৬। মহিলার বুদ্ধি কম হওয়ায় তার অপরাধ কম বলে বিবেচিত হবে।

৭। মহিলার যুদ্ধাংদেহী মনোভাব কম হয়ে থাকে। এ কারণে রাসূল (সা.) মহিলাদেরকে কতল করতে নিষেধ করেছেন এবং এর কারণ স্বরূপ বলেছেন, এরা যুদ্ধ করে না।

ইমামগণের দলীলের জওয়াব

ইমামগণ উম্মে রূমান নামী মহিলার ঘটনা দ্বারা যে দলীল পেশ করেছেন এর জওয়াব হলো, তাকে শুধু মুরতাদ হওয়ার কারণেই হত্যা করা হয়নি বরং সে ছিল একাধারে যাদুকারিণী এবং কবি। সে রাসূল (সা.)-এর শানে অপমানজনক

কবিতা আবৃত্তি করত। তার ৩০ জন পুত্র সন্তান ছিল। তাদেরকে সে রাসূল (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উৎসাহ দিত। এসব কারণে রাসূল (সা.) তাকে হত্যা করার আদেশ দেন। —আল ফিকহু আলা মাযাহিবিল আরবা'আ

ফাসাদ সৃষ্টিকারী নেত্রী ধরনের মুরতাদ মহিলার হুকুম

আহনাফের মতে যদিও সাধারণ মুরতাদ মহিলাকে হত্যা করা যাবে না কিন্তু সে যদি নেত্রী ধরনের হয় এবং নিজের অনুসারী নিয়ে ফেৎনা করার সম্ভাবনা থাকে তাহলে তাকে হত্যা করা যাবে। এটা মুরতাদ হওয়ার জন্য নয় বরং ফাসাদ দমানোর জন্য। —ফাতহুল কাদীর খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৭২

রাসূল (সা.)-কে গালি দেয়ার হুকুম

মুরতাদ যদি তওবা করে তাহলে তার তওবা কবুল করতে হবে এবং তাকে হত্যা করা যাবে না।

কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি রাসূল (সা.)-কে গালি দেয়ার কারণে মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে তার তওবা কবুল হবে না। তওবা কবুল করলেও তাকে হত্যা করতে হবে।

এমনকি কোন ব্যক্তি যদি অন্য কারণে মুরতাদ হয়ে মুরতাদ অবস্থায় রাসূল (সা.)-কে গালি দেয় অতঃপর তওবা করে মুসলমান হয়ে যায় তথাপি তাকে হত্যা করতে হবে। কেননা এটা আল্লাহর একটি দণ্ড বিধান। যা মওকুফ হওয়ার নয়।

উল্লেখ্য যে, কেউ যদি আল্লাহকে গালি দিয়ে পরে তওবা করে তাহলে তার তওবা কবুল হবে। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত ত্রুটি থেকে পবিত্র হওয়াটা যুক্তির নিরিখে সুপ্রমাণিত। পক্ষান্তরে রাসূল (সা.)-এর দোষমুক্ত হওয়াটা যুক্তিদ্বারা প্রমাণিত নয় বরং সরাসরি আল্লাহ্ প্রদত্ত ওহী (সংবাদের) ভিত্তিতে প্রমাণিত। সুতরাং আল্লাহর ওহী অস্বীকার করায় এর অপরাধ অনেক বেশি। —আল ফিকহু আলা মাযাহিবিল আরবা'আ খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪২৮-৪২৯

যিন্দীকের পরিচয় ও তার শাস্তি

পরিচয় ঃ যিন্দীক বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে, বাহ্যিকভাবে এবং অন্তর দিয়ে ইসলামের সত্যতা স্বীকার করে কিন্তু দ্বীনের মৌলিক বিষয়ের এমন অপব্যাখ্যা করে যা সাহাবা, তাবেঈন, সলফ সালেহীন এবং কুরআন হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত।

যেমন, জান্নাত ও জাহান্নামের বিশ্বাস রাখা কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যা করা যে, জান্নাত-জাহান্নাম বিশেষ কোন স্থানের নাম নয়। বরং জান্নাত হলো আত্মিক প্রশান্তির নাম যা নেক আমল দ্বারা হাসিল হয়। আর জাহান্নাম হলো আত্মিক অশান্তির নাম যা বদ আমলের কারণে হয়ে থাকে।

আল্লামা শামী (রহ.) রদ্দুল মুহতারে যিন্দীকের সংজ্ঞা করেছেন এরূপ—

هُوَ الْمُبْطِنُ لِلْكُفْرِ الْمُعْتَرِفُ بِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

অর্থাৎ যিন্দীক বলা হয়, ঐ ব্যক্তিকে যে মনের মধ্যে কুফরী লুকিয়ে রেখে প্রকাশ্যে মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবুওয়াত স্বীকার করে।

আল ফিকহু আলা মাযাহিবিল আরবা'আ এ উল্লেখ করা হয়েছে—

وَهُوَ الَّذِيْ يُسِرُّ الْكُفْرَ وَيُظْهِرُ الْاِسْلَامَ وَهُوَ الَّذِيْ كَانَ يُسَمّٰى مُنَافِقًا فِىْ زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابِهٖ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ ـ ٥/٤٢٧

"যিন্দীক ঐ ব্যক্তি, যে কুফরী লুকিয়ে রেখে ইসলাম প্রকাশ করে। রাসূল (সা.) ও সাহাবাদের যুগে এদেরকেই মুনাফিক বলা হতো। খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪২৭

মিরকাত শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে—ফকীহ লাইছ বলেন, যিন্দীক বলা হয় যে আখেরাত ও আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস রাখে না। -খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১০৪

সা'লাব (রহ.) থেকে বর্ণিত, আরবীতে যিন্দীক বলতে কোন শব্দ নেই। তবে ওরফে মুলহিদ (অবিশ্বাসী) ও নাস্তিক বলা হয়।

একটি সন্দেহ নিরসন

এখানে একটি সন্দেহ হয় যে, কারো অন্তরে কুফরী গোপন রাখলে আমরা তার সন্ধান পাব কী করে? এটা তো নিতান্তই আল্লাহর জানার বিষয়, অন্যে তা জানবে কি করে? তাছাড়া সকল আলিম এ ব্যাপারে একমত যে, শরীয়তের হুকুম আহকাম ও দণ্ডবিধি কার্যকর হয় বাহ্যিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে, বাতেনী বিষয় তো আল্লাহর হাতে ন্যস্ত। সুতরাং যিন্দীক কে তা আমরা বুঝব কি করে?

হুযূর (সা.) হযরত ওসামা (রা.)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, هلا شققت عن قلبه "তাঁর অন্তর ফেঁড়ে দেখলে না কেন?"

আবূ সাঈদের এক রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন— اِنِّى لَمْ أُوْمَرْ اَنْ اَنْقُبَ عَنْ قُلُوْبِ النَّاسِ . "আমি মানুষের অন্তর ফেঁড়ে দেখার আদেশ প্রাপ্ত হইনি।"

এর জবাবে বলব, যখন কেউ কুরআনের এমন অপব্যাখ্যা করবে এবং ইসলাম বিরোধী কথা বলবে তখন বাহ্যিক অবস্থাই একথা বলবে যে, সে যিন্দীক।

যিন্দীকের হুকুম

১। মালেকী ও হাম্বলী মতে যিন্দীককে হত্যা করা ওয়াজিব, তার কাছে তওবা তলব করা হবে না। এমনকি যদি তওবা করে তবু তাকে হত্যা করতে হবে। এক্ষেত্রে তাকে হদ হিসেবে হত্যা করা হবে কুফরী করার কারণে নয়। সুতরাং মুসলমান গণ্য করে তার কাফন-দাফন করতে হবে এবং জানাযা নামায পড়তে হবে।

২। আহনাফ ও শাফেঈর মতে প্রথমে তওবা তলব করা হবে। তওবা করলে হত্যা করা যাবে না। হ্যাঁ, যদি সে নিজের ভ্রান্ত মতবাদের দিকে মানুষকে আহবান করে তাহলে তার তওবা কবুল হবে না, তাকে হত্যা করতে হবে।

باب ثبوت القصاص فى القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة

অধ্যায় ঃ পাথর, ধারালো এবং ভারী বস্তু দ্বারা হত্যা করলে কেসাস ওয়াজিব হওয়া এবং নারী হত্যা প্রসঙ্গে

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ يَهُوْدِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلٰى اَوْضَاحٍ لَهَا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ قَالَ : فَجِيْئَ بِهَا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ لَهَا : اَقَتَلَكِ فُلَانٌ ؟ فَاَشَارَتْ بِرَاْسِهَا اَنْ لَا ، ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّانِيَةَ : فَاَشَارَتْ اَنْ لَا ، ثُمَّ سَاَلَهَا الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ نَعَمْ وَاَشَارَتْ بِرَاْسِهَا ، فَقَتَلَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ .

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, জনৈক ইহুদী এক মেয়ের কাছ থেকে অলংকার ছিনিয়ে নেয়ার জন্য তাকে পাথর দিয়ে মাথা থেতলে দেয়। মেয়েটিকে মুমূর্ষ অবস্থায় রাসূল (সা.)-এর দরবারে উপনীত করা হয়। রাসূল (সা.) বললেন, তোমাকে কে আঘাত করেছে, অমুকে? সে মাথা নেড়ে নেতিবাচক জবাব দেয়। তৃতীয় বার এরূপ প্রশ্ন করলে সে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে। অতঃপর রাসূল (সা.) তাকে পাথর দিয়ে হত্যা করেন।"

উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র ঐ মেয়েটির কথায় মোকাদ্দমা সাজানো হয়নি, বরং ইহুদীর স্বীকারোক্তির কারণে মোকাদ্দমা সাজানো হয়। কারণ সে নিজেই এই অপরাধের কথা স্বীকার করে।

এ ব্যাপারে চার ইমাম একমত যে, শুধুমাত্র জখমী ব্যক্তির স্বীকারোক্তি দ্বারা কতল সাব্যস্ত হয় না।

ইমাম মালেকের (রহ.) মতে এটা لوث (বিশেষ আলামত) হিসেবে গণ্য হবে এবং কাসামার বিধান কার্যকর করতে হবে এবং কাসামার যাবতীয় শর্ত, হুকুম এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

হাদীস সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় মহিলাকে হত্যা করলে কেসাস স্বরূপ পুরুষকে হত্যা করতে হবে। এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। অবশ্য এখানে দু'টি মাসআলা আছে বিরোধপূর্ণ। যথা ঃ

১। ভারী বস্তু দ্বারা হত্যা করা قتل عمد (ইচ্ছাকৃত হত্যা) এর অন্তর্ভুক্ত কিনা এবং এতে কেসাস ওয়াজিব হবে কিনা?

২। কেসাসের বেলায় مساوات (সাদৃশ্য) বজায় রাখা জরুরী কিনা?

মাসআলা বুঝার সহজার্থে আমরা কতলের প্রকারভেদ এবং তার যাবতীয় হুকুম-আহকাম নিম্নে তুলে ধরছি।

কতলের প্রকারভেদ

কতল পাঁচ প্রকার। ১। قتل عمد (ইচ্ছাকৃত হত্যা) ২। قتل شبه عمد (অনিচ্ছাকৃত হত্যা) ৩। قتل خطأ (ভুলক্রমে হত্যা) ৪। قتل جارى مجرئ خطأ (ভুলের কাছাকাছি হত্যা) এবং ৫। قتل سبب (হত্যার কারণ বনে যাওয়া)।

সংজ্ঞা

قتل عمد ঃ আবূ হানীফার মতে قتل عمد হলো, কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে ধারালো অস্ত্র দ্বারা কিংবা শরীর থেকে গোশত-মাংস বিচ্ছিন্ন করে এমন অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে হত্যা করা।

ائمة ثلاثة। এবং সাহেবাঈনের মতে قتل عمد হলো কাউকে এমন অস্ত্র দ্বারা আঘাত করা যার দ্বারা সাধারণত হত্যা করা যায়। ধারালো হওয়া শর্ত নয়। যেমন বড় পাথর, লাঠি ইত্যাদি। যা ধারালো কিংবা শরীর থেকে অঙ্গ বিচ্ছিন্নকারী অস্ত্র নয়।

قتل شبه عمد ঃ ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে এর সংজ্ঞা হলো, কাউকে এমন অস্ত্র দ্বারা আঘাত করা যা দ্বারা সাধারণতঃ হত্যা করা হয় না। চাই এই আঘাতে মারা যাক বা না যাক। যেমন, বড় লাঠি, পাথর, ছোট পাথর, ছোট লাঠি ইত্যাদি।

ائمة ثلاثة। এবং সাহেবাঈনের মতে قتل شبه عمد হলো কাউকে এমন অস্ত্র দ্বারা আঘাত করা যার আঘাতে সাধারণত কেউ মরে না, কিন্তু ঘটনাক্রমে আঘাতপ্রাপ্ত লোকটি মারা গেছে। যেমন, বেত্রাঘাতে মারা যাওয়া। মতভেদের ফলাফল প্রকাশ পাবে ঐ ক্ষেত্রে যখন বড় লাঠি বা বড় পাথরের আঘাতে কাউকে হত্যা করা হবে। সাহেবাঈন এবং ائمة ثلاثة।-এর মতে একে قتل عمد-এর মধ্যে গণ্য করা হবে এবং এতে কেসাস ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে একে قتل شبه عمد-এর মধ্যে গণ্য করা হবে এবং দিয়্যাত ওয়াজিব হবে কেসাস ওয়াজিব হবে না। উভয়ের দলীল পরে বর্ণনা করা হবে। قتل عمد অত্যন্ত বড় গুনাহ। কুরআন হাদীসে এর ভয়ানক শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর দুনিয়াবী শাস্তি কেসাস (মৃত্যুদণ্ড)। তবে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা মাফ করলে কেসাস মাফ হয়ে দিয়্যাত ওয়াজিব হবে। তবে শর্ত হলো, হত্যাকারী দিয়্যাত দিতে রাজী থাকতে হবে। যদি রাজী না হয় তাহলে কেসাসই নিতে হবে, দিয়্যাত নেয়া যাবে না। এটা ইমাম আবূ হানীফা (রহ.), মালেক (রহ.) এবং ইবরাহীম নখয়ীর মাযহাব।

কিন্তু ইমাম শাফেঈ, আহমদ ও ইসহাকের মতে হত্যাকারীর সন্তুষ্টি ছাড়াই দিয়্যাত আদায় করা যাবে। সুতরাং অভিভাবকরা কেসাস মাফ করে দিয়্যাত আদায় করতে পারবে।

ইচ্ছাকৃত হত্যা (قتل عمد)-এর আরেকটি হুকুম হলো, মীরাছ থেকে বঞ্চিত হওয়া। কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। শাফেঈর মতে ওয়াজিব, আমাদের মতে ওয়াজিব নয়।

قتل شبه عمد-এর হুকুম চারটি। ১। বড় গুনাহ ২। কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়া। হত্যাকারী নিজেই এই কাফ্ফারা আদায় করবে।

কাফ্ফারা হলো, একজন মুমিন গোলাম আযাদ করা, সম্ভব না হলে লাগাতার ২ মাস রোযা রাখা। এক্ষেত্রে اطعام مسكين (খাদ্য দানের) কথা উল্লেখ নেই। কুরআনে শুধু এই দু'টির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

৩। আকেলা (অভিভাবকদের) উপর دية مغلظة ওয়াজিব হওয়া।

৪। মীরাছ থেকে বঞ্চিত হওয়া।

قتل خطأ ঃ এর দু'টি পন্থা। ১। خطأ فى القصد দূর থেকে শিকারী মনে করে মানুষের গায়ে আঘাত করে তাকে মেরে ফেলা অথবা কাফির মনে করে ভিন্ন কাউকে হত্যা করা।

২। خطأ فى الفعل তথা শিকারকে আঘাত করা কিন্তু লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত না করে মানুষের গায়ে আঘাত লাগা।

যাই হোক না কেন, উভয় অবস্থায় এর হুকুম হলো ঃ

১। হত্যাকারীর উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়া।

২। عاقلة (হত্যাকারীর অভিভাবকের) উপর দিয়্যাত ওয়াজিব হওয়া।

৩। মীরাছ থেকে বঞ্চিত হওয়া।

৪। প্রথম দুই প্রকারের মত অত কঠোর না হলেও অসতর্কতার কারণে গুনাহ হওয়া এবং এর কারণে কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়া।

قتل جارى مجرى خطأ ঃ ঐ কতল যাকে ভুলের মত মনে করা হয়। অর্থাৎ হত্যাকারী হত্যাকর্ম করেছে বটে কিন্তু এতে তার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। যেমন ঘুমন্ত অবস্থায় কারো গায়ে পড়ে যাওয়ার কারণে মারা যাওয়া। এর হুকুম, হুবহু قتل خطأ-এর মত। কেননা এ ক্ষেত্রেও সে সতর্কতা অবলম্বন করেনি বলে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

قتل سبب ঃ হত্যাকারীর কাজটি মৃত্যুর কারণ হওয়া। যেমন অন্যের জমিতে কূপ খনন করায় সেখানে পড়ে কেউ মারা যাওয়া। যদিও লোকটি এই

মৃত্যুর জন্য দায়ী কিন্তু সে সরাসরি এই কাজে অংশ নেয়নি। হানাফীদের মতে এর হুকুম হলো, অভিভাবকদের (عاقلة) উপর দিয়্যাত ওয়াজিব হওয়া। আর হত্যার গুনাহ হবে না বটে কিন্তু অন্যের ভূখণ্ডে কূপ খনন করার গুনাহ হওয়া।

এ ক্ষেত্রে কাফ্ফারাও ওয়াজিব হবে না এবং মীরাছ থেকেও বঞ্চিত হবে না। কেননা সে সরাসরি হত্যাকর্মে অংশ নেয়নি। কাফ্ফারা এবং মীরাছ থেকে বঞ্চিত হয় ঐ ক্ষেত্রে যখন সে (হত্যাকারী) সরাসরি হত্যাকর্মে অংশ নেয়। তবে দিয়্যাত ওয়াজিব করা হয়েছে যাতে মানুষের রক্ত একদম বেকার না যায়। ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে এর হুকুম قتل خطأ-এর মত।

এতক্ষণ পর্যন্ত কতলের প্রকারভেদ আলোচনা করা হলো। এখন হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট দু'টি মাসআলা বর্ণনা করা হচ্ছে।

১। ভারী বস্তু দ্বারা কতল করার হুকুম

একথা পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইমাম আবূ হানীফার মতে قتل عمد হওয়ার জন্য এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে কেসাস ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হলো, ধারালো অস্ত্র কিংবা অঙ্গ বিচ্ছিন্নকারী ধারালো অস্ত্রের অনুরূপ কোন অস্ত্র দ্বারা হত্যা করা। সুতরাং বড় লাঠি কিংবা পাথর দ্বারা হত্যা করলে একে قتل عمد বলা যাবে না এবং এতে কেসাস ওয়াজিব হবে না। বরং একে شبه عمد বলতে হবে এবং দিয়্যাত ওয়াজিব হবে। হাসান বসরী, শা'বী, সাঈদ, আতা, তাউস প্রমুখের অভিমত এরূপই।

তিন ইমাম এবং সাহেবাঈনের মতে যে বস্তুর আঘাতে সাধারণতঃ মানুষ মারা যায় সেই বস্তু দ্বারা আঘাত করে হত্যা করলে সেটাকে قتل عمد বলা হবে। সুতরাং বড় পাথর, লাঠি ইত্যাদির আঘাতে হত্যা করলে একে قتل عمد ধরে কেসাস ওয়াজিব হবে। ইমাম নখয়ী, ইবনে সীরীন, হাম্মাদ প্রমুখের অভিমতও এরূপ।

ইমামগণের দলীল

জমহুর ইমামগণ বর্ণিত এই হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। কেননা পাথর দ্বারা শিশুবাচ্চাকে হত্যা করায় রাসূল (সা.) কেসাস স্বরূপ ইহুদীকে হত্যা করেন।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর দলীল

(١) عَنْ نُعْمَانَ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ مَرْفُوْعًا: كُلُّ شَيْئٍ خَطَّأٌالاَّ السَّيْفَ وَفِيْ كُلِّ خَطَأٍ اَرْشٌ ـ دار قطنى

তরবারী ছাড়া অন্য যে কোন হত্যা قتل خطأ-এর অন্তর্ভুক্ত এবং এতে দিয়্যাত ওয়াজিব হয়। দারা কুতনী তাঁর থেকে আরেকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে— لاعمد الا بالسيف তরবারী ছাড়া قتل عمد হয় না। —কানযুল উম্মাল

(٢)عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : اَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلاَ اِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ شِبْهُ الْعَمَدِ مَا كَانَ بِالْعَصَا مِأَةٌ مِنَ الْاِبِلِ ـ ابوداؤد، نسائى ابن ماجه ـ

রাসূল (সা.) বলেন, অনিচ্ছাকৃত হত্যার দিয়্যাত হলো قتل خطا-এর মত যা লাঠির আঘাতে সংঘটিত হয়। মোট একশত উট। —আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্

(٣) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ مَرْفُوْعًا : اَلاَ اِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ شِبْهُ الْعَمَدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا ـ

"অনিচ্ছাকৃত (قتل خطأ)-এর দিয়্যাত হলো, قتل عمد-এর মত যা লাঠি কিংবা চাবুকের আঘাতে হয়ে থাকে। এসব রেওয়ায়াতে রাসূল (সা.) লাঠি ও চাবুকের আঘাতে মৃত্যুকে قتل شبه عمد হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

(٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَال النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا قَوَدَ اِلَّا بِحَدِيْدَةٍ ـ

"ধারালো অস্ত্রের আঘাত ছাড়া কেসাস নেই।"

(٥) وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ : لَا قَوَدَ اِلَّا بِالسَّلَاحِ :

"অস্ত্র ছাড়া কেসাস নেই।"

(٦) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلْقَوَدُ بِالسَّيْفِ وَالْخَطَأُ عَلَى الْعَاقِلَةِ : دار قطنى

"তরবারীর আঘাতের কারণে কেসাস আসবে আর قتل خطأ-এর কারণে ওয়ারিশদের উপর দিয়্যাত বর্তাবে।"—দারা কুতনী

(৮) আবূ হুরাইরা (রা.)-এর সনদে বুখারী, মুসলিম সহ একাধিক কিতাবে একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। এতে হোযাইল কাবীলার দু'জন মহিলার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এরূপ ঃ فَرَمَتْ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرٰى بِحَجَرٍ ـ

এক মহিলা অপর মহিলার প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে। অন্য রেওয়ায়াতে আছে— ضَرَبَتْ اِمْرَأَةٌ ضُرَّتَهَا بِعَوْدِ فُسْطَاسٍ ـ

"জনৈক মহিলা তার সতীনকে তাঁবুর খুঁটি দিয়ে আঘাত করে।"

এতে করে আঘাতপ্রাপ্তা মহিলা মারা যায়। রাসূল (সা.) হত্যাকারিণী মহিলার ওয়ারিশদের উপর দিয়্যাত ওয়াজিব করে দেন। রাসূল (সা.) এই ঘটনার বিশ্লেষণে একথা বলেননি যে, পাথর ছোট নাকি বড় ইত্যাদি। বরং সরাসরি রাসূল (সা.) দিয়্যাতের হুকুম দেন। এতে বুঝা যায়, এ ধরনের কতল قتل عمد নয় অন্যথায় কেসাস ওয়াজিব হত।

আবূ হানীফা (রহ.)-এর মাযহাব বিশ্লেষণ

উল্লেখ্য যে, আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে ভারী বস্তু (قتل بالمثقل) দ্বারা হত্যাকারীর আঘাত করার দ্বারা মেরে ফেলার ইচ্ছা থাকে না। কিন্তু এর দ্বারা যদি সে হত্যা করার ইচ্ছা করে আঘাত করে এবং আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি মারা যায়, তাহলে একে قتل عمد ধরতে হবে যাতে কেসাস ওয়াজিব হবে।

অনেক মানুষ এই কথাটি না জেনে অনর্থক বিভ্রান্তি ছড়ায়। অথচ হানাফী মাযহাবের কিতাবসমূহ সুস্পষ্টভাবে একথা উল্লেখ করা হয়েছে। দেখুন রদ্দুল মুহতার সহ অন্যান্য ফতওয়ার কিতাবসমূহ।

ফায়েদা ঃ আসল কথা হলো, عمد-এর অর্থ قصد তথা ইচ্ছা করা। সুতরাং কতলের ইচ্ছা পাওয়া গেলে একে قتل عمد ধরা হবে। আর "ইচ্ছা"

যেহেতু অস্পষ্ট বিষয়, এজন্য একে চেনার উপায় হিসেবে অস্ত্রকে মাধ্যম বানানো হয়েছে। সুতরাং ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলে হত্যা করার জন্যই আঘাত করা হয়েছে বলে মনে করা হবে।

রদ্দুল মুহতারে উল্লেখ করা হয়েছে-قتل عمد-এর জন্য শর্ত হলো ইচ্ছা থাকা। ইচ্ছা আছে কিনা তা জানা যাবে দলীল দ্বারা। আর এর দলীল হলো, হত্যাকারী কর্তৃক ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করা। সুতরাং এটাকেই ইচ্ছার পরিবর্তিত রূপ হিসেবে ধরে নিতে হবে এবং হত্যাকারী যদি বলেও "আমি হত্যা করার ইচ্ছা করিনি" তথাপি তার এই কথা গ্রাহ্য করা হবে না। —রদ্দুল মুহতার খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৫২৭

অতএব বিচারক বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে ফয়সালা দিবে হত্যাকারীর কথায় কান দিবে না।

পরবর্তীতে মতভেদ হয়েছে কোন ধরনের অস্ত্র ব্যবহারে কতলের ইচ্ছা থাকে সেটা নির্ণয় করা নিয়ে। ইমাম আবূ হানীফার মতে ধারালো কিংবা এর অনুরূপ কোন অস্ত্র হওয়া। জমহুরের মতে এ ধরনের অস্ত্র হওয়া যা দ্বারা সাধারণত হত্যা করা যায়। চাই ধারালো হোক বা না হোক। যেমন, বড় লাঠি, পাথর ইত্যাদি। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, এসব বস্তু হত্যার কাজ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং হত্যা করার ইচ্ছা ছিল না, একথার দাবি করলে বিচারক তা মানতে বাধ্য থাকবেন এবং ইচ্ছা ছিল স্বীকার করলে قتل عمد হবে।

বুঝা যাচ্ছে, এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত যে, হত্যাকারী যদি হত্যার নিয়তেই আক্রমণ করে তাহলে এটা قتل عمد হবে। চাই যে কোন ধরনের অস্ত্র দ্বারা আক্রমণ করুক না কেন।

জমহুরদের হাদীসের দলীলের জওয়াব

জমহুর হাদীস দ্বারা যে দলীল পেশ করেছেন তার বিভিন্ন জওয়াব দেয়া যায়। যথা ঃ

১। রাসূল (সা.) ইহুদীকে রাজনৈতিক কল্যাণ বিবেচনায় হত্যা করেছেন, কেসাস হিসেবে নয়। কেননা সে মারাত্মক অপরাধী ছিল।

২। যদি কেসাস স্বরূপই হত্যা করে থাকেন তথাপি قود إلا بالسيف হাদীস দ্বারা এই হুকুম মানসূখ হয়ে গেছে।

৩। ইহুদী শিশু বাচ্চাটাকে রাস্তায় প্রহারও করেছে আবার মালও ছিনতাই করেছে। সুতরাং এটা ডাকাতি (قطع الطريق) এর অন্তর্ভুক্ত এবং এ কারণেই রাসূল (সা.) তাকে হত্যা করেছেন।

৪। অলংকার ছিনতাইর ঘটনা যাতে ফাঁস না হয় সে লক্ষ্যে ইহুদী লোকটি বাচ্চাটাকে মেরে ফেলারই ইচ্ছা করেছিল। আর যখন মেরে ফেলার ইচ্ছা থাকে সেক্ষেত্রে আবূ হানীফার মতেও قتل عمد হয়। সুতরাং হাদীসকে সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করা ঠিক হবে না। উল্লেখ্য যে, হানাফীগণ ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মাযহাবের ব্যাখ্যায় বিষয়টাকে অনেক ব্যাপক করে দিয়েছেন এবং পিতল, তামা, স্বর্ণ সব ধরনের বস্তুকে حديدতথা লৌহজাত ধারালো বস্তুর মধ্যে গণ্য করেছেন। আল্লামা শামী (রহ.) বলেন, লৌহজাত সকল অস্ত্র চাই এর দ্বারা হত্যা করা যাক বা না যাক এটা তরবারীর মধ্যে গণ্য। এমনিভাবে লৌহজাত অস্ত্রের সাদৃশ্য, যেমন পিতল, তামা, স্বর্ণ এবং রৌপ্য এসব বস্তু (অস্ত্র) দ্বারা হত্যা করলে কেসাস ওয়াজিব হবে। —রদ্দুল মুহতার-খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৫২৭-৫২৮

এ কারণে বর্তমান যুগে তিন ইমাম এবং সাহেবাঈনের মত অনুযায়ী বিচার করাই শ্রেয়। কেননা একালে মানুষ হত্যা করতে নানা রকম অস্ত্র আবিষ্কার করা হচ্ছে। যেমন, বিষ পান করিয়ে হত্যা করলে রেওয়ায়াতের বাহ্যিক অর্থে কেসাস ওয়াজিব হওয়ার কথা নয় কিন্তু যুগের পট পরিবর্তনে এখন কেসাসের ফয়সালা দেয়া হয়।

কেসাসের পদ্ধতি-ধরন কেমন হওয়া উচিত

কেসাসের পদ্ধতির ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

১। ائمة ثلاثة-এর মতে হত্যাকারী যে পদ্ধতিতে হত্যা করেছে হুবহু সেই পদ্ধতিতে কেসাস আদায় করতে হবে। সুতরাং পাথর, লাঠি দিয়ে কিংবা পানিতে ডুবিয়ে মারলে কেসাসের বেলায়ও অনুরূপভাবে হত্যা করতে হবে। তবে সেই কাজটা গুনাহের না হতে হবে। যেমন, কাউকে ধর্ষণ কিংবা পুংমৈথুন করে মেরে ফেলা হয়েছে। এক্ষেত্রে অনুরূপ কর্মপন্থা অবলম্বন করে হত্যাকারী থেকে কেসাস আদায় করা যাবে না।

ইমামগণ বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন, কেননা ইহুদী লোকটি পাথর দ্বারা মেয়েটিকে মেরে ফেললে রাসূল (সা.)ও পাথর মেরেই কেসাস আদায় করেন। তাছাড়া কুরআনও অনুরূপ শাস্তি দিয়ে কেসাস আদায়ের পক্ষে। ইরশাদ হয়েছে— وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به .

"প্রতিশোধ নিতে চাইলে যেভাবে তোমাদেরকে আঘাত করা হয়েছে সেভাবে আঘাত করে প্রতিশোধ নাও।"

وجزاء سيئة سيئة مثلها খারাপের প্রতিদান অনুরূপ খারাপ আচরণ।"

২। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এবং ইমাম আহমদের এক মত অনুযায়ী হত্যাকারী যা দিয়েই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে থাকুক না কেন, কেসাস আদায় করতে হবে তরবারী বা এর মত কোন অস্ত্র দ্বারা। দলীলসমূহ ঃ

১। النفس بالنفس "হত্যার বদলায় হত্যা"। এই আয়াতে শুধুমাত্র প্রাণ সংহারের ব্যাপারে সাদৃশ্য রাখার কথা বলা হয়েছে, পদ্ধতির ব্যাপারে নয়।

২। অন্যান্য ইমামগণ যে আয়াত দ্বারা দলীল দেন ইমাম আবূ হানীফাও ঐ আয়াত দ্বারাই দলীল পেশ করে বলেন, আয়াতে শুধুমাত্র জান নেয়ার ব্যাপারে مماثلت (সাদৃশ্য) গ্রহণ করতে বলা হয়েছে, পদ্ধতির সাদৃশ্য উদ্দেশ্যও নয়, সম্ভবও নয়। কেননা পাথরের এক আঘাতে হত্যা করলে কেসাস আদায়ের বেলায়ও এক আঘাত করতে হবে। যদি এক আঘাতে না মরে তাহলে কেসাস আদায় হলো না। আর একাধিক আঘাত করলে সাদৃশ্যতা থাকল না, সীমালঙ্ঘন হলো। সুতরাং বুঝা যায় মূল উদ্দেশ্য প্রাণ সংহার করা আর যা দ্বারা এই উদ্দেশ্য হাসিল হয় সেটাই ব্যবহার করতে হবে। আর সেটি হলো তরবারী।

৩। ইমাম ত্বহাভী (রহ.) ও আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) لا قود الا بالسيف হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন এবং হাদীসের এরূপ ব্যাখ্যা করেন ঃ القود لا يستوفى الا بالسيف. অর্থাৎ কেসাস শুধুমাত্র তলোয়ার দ্বারাই আদায় করা যেতে পারে।"

কিন্তু পূর্বে বলা হয়েছে হাদীসের অর্থ হলো, কেসাস ওয়াজিব হয় শুধুমাত্র ঐ কতলের ক্ষেত্রে যা তরবারী দ্বারা করা হয়। সুতরাং এই তাফসীর অনুযায়ী لا بالسيف-এর باء অক্ষরটি سبب (কারণ) বুঝানোর অর্থে এবং পূর্বের ব্যাখ্যা অনুযায়ী استعانت (মাধ্যম) বুঝানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, একই সাথে কোন হাদীস বা আয়াত দু'টি বিষয়ের দলীল হওয়াকে عموم مشترك বলে। আহনাফের মতে এটি জায়িয নেই। সে অনুযায়ী এই হাদীস দ্বারা একই সাথে উভয় মাসআলার দলীল দেয়াও জায়িয না হওয়ার কথা।

এজন্য কোন কোন হানাফীগণ হাদীসকে শুধু দ্বিতীয় অর্থে (سبب-এর অর্থে) প্রয়োগ করে থাকেন।

তবে যাঁরা উভয় অর্থে প্রয়োগ করে থাকেন, তাঁরা এর ব্যাখ্যায় বলেন, হাদীসটি একাধিক সাহাবা থেকে বর্ণিত হয়েছে। এতে বুঝা যায় হুযূর (সা.) উভয় অর্থের ক্ষেত্রেই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। সুতরাং অন্তত পক্ষে এই হাদীসের ক্ষেত্রে عموم مشترك নাজায়িয না হওয়ার কথা।

ইমামগণের বর্ণিত দলীলের জওয়াব

১। ইমাম ত্বহাভী (রহ.) نهى عن المثلة-এর হাদীস দ্বারা এই হাদীসকে মানসূখ বলেছেন। কেননা তরবারী ছাড়া অন্য কোন কিছু দ্বারা কেসাস নিলে مثلة (বিকৃতি) হবেই আর এটাকে নিষেধ করা হয়েছে।

২। বিচ্ছিন্ন একটি ঘটনা। মূলতঃ কেসাস আদায় করা হয়েছিল (ইহুদীকে) হত্যা করেই। তবে পাথর ব্যবহার করা হয়েছিল প্রশাসনিক কোন কারণে। কেননা সে এ রকম অপরাধ প্রবণতায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। আর কাজী কর্তৃক এ ধরনের প্রশাসনিক শাস্তি দেয়া বৈধ। সুতরাং এই হাদীস ইমামগণের দলীল হতে পারে না।

باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه ، إذادفعه الموصول عليه فاتلف نفسه أو عضوه فلا ضمان عليه

অধ্যায় ঃ আক্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক আক্রমণকারীর প্রাণ কিংবা অঙ্গনাশ করায় ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব না হওয়া প্রসঙ্গে

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : قَاتَلَ يعلى بن مينة او ابن اميه رحلا فَعَضَّ اَحَدُ هُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَاخْتَصَمَا اِلٰى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ اَيَعُضُّ اَحَدُكُمْ كَمَا يَعُضُّ الْفَحْلَ ؟ لاَ دِيَةَ لَهُ ـ

ইমরান ইবনে হোসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া'লা ইবনে মায়না এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হন। ঝগড়ার এক পর্যায়ে একজন অপরজনের হাত কামড়ে ধরেন। আক্রান্ত ব্যক্তি মুখ থেকে হাত ছাড়িয়ে নিতে গেলে অপর ব্যক্তির সামনের পাটির দাঁত উপড়ে যায়। রাসূল (সা.)-এর কাছে অভিযোগ দায়ের করলে তিনি বলেন, তোমাদের কেউ কি উটের মত একজনের

হাত কামড়ে ধরবে আর অপরজন নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকবে? যাও এতে কোন দিয়্যাত নেই।

ফায়েদা ঃ এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় কোন ব্যক্তি যদি অন্যায়ভাবে আক্রান্ত হয় তাহলে তার প্রতিহত করার অধিকার আছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন—

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ .

এমনিভাবে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন—

مَنْ اَشَارَ بِحَدِيْدَةٍ اِلٰى اَحَدِ الْمُسْلِمِيْنَ يُرِيْدُ بِهَا قَتْلَهُ فَقَدْ وَجَبَ دَمُهُ .

"যে ব্যক্তি অস্ত্র দিয়ে কোন মুসলমানের প্রতি এগিয়ে যায় (ইঙ্গিত করে) তাহলে তার রক্ত হালাল হয়ে যায়।"

অবশ্য প্রাণ বাঁচানো এবং সম্পদ বাঁচানোর মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রাণের উপর আঘাত আসলে প্রতিহত করা ওয়াজিব, না করলে গুনাহগার হবে। মালের উপর আঘাত আসলে অধিকাংশ ফকীহের মতে প্রতিহত করা জায়িয। ওয়াজিব নয়। কেননা মাল বিলিয়ে দেয়ার অধিকার আছে, কিন্তু প্রাণ বিলিয়ে দেয়ার অধিকার নেই। এটাই উভয়ের মধ্যে বড় পার্থক্য।

সুতরাং প্রতিহত করতে গিয়ে হামলাকারী যদি আর্থিক বা শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে এর জন্য কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

শরহুস সুন্নাহ্ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, কোন মহিলা যদি ধর্ষণের হাত থেকে বাঁচার জন্য ধর্ষকের উপর আক্রমণ করে তাকে মেরে ফেলে তাহলে এর জন্য কোনরূপ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে এ ধরনের একটি ঘটনা ঘটলে তিনি বলেন— هٰذَا قَتِيْلُ اللّٰهِ وَهَدَرٌ دَمُهُ "এ লোক আল্লাহর হাতে নিহত, সুতরাং তার রক্তমূল্য বৃথা যাবে।"

অবশ্য উত্তম হলো, স্বাভাবিকভাবে প্রতিহত করা, হত্যা করার চেষ্টা না করা। একান্তই অপারগ হলে হত্যা করবে। —মিরকাত

এমনিভাবে জালিমকে হত্যা করার জন্য তার অন্তরে হত্যা করার ইচ্ছা ছিল কি-না তা যাচাই করা জরুরী নয় সে যদি হত্যা করার নিয়ত নাও করে তথাপি তাকে হত্যা করা যাবে। সুতরাং চোর হত্যা করা ছাড়া যদি মাল সংরক্ষণ করা সম্ভব না হয় তাহলে তাকে হত্যা করা যাবে, অথচ চোরের হত্যা করার ইচ্ছা থাকে না। কেননা রাসূল (সা.) নিঃশর্তভাবে সাধারণত খুন করার অনুমতি দিয়ে বলেছেন— من قتل دون ماله فهو شهيد "যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায় সে শহীদ।"—ই'লাউস্ সুনান খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ১২৩

باب اثبات القصاص فى الاسناد ومافى معناها

অধ্যায় ঃ দাঁত ভাঙলে কেসাস ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اُخْتَ الرَّبِيْعِ اُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ اِنْسَانًا فَاخْتَصَمُوْا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْقِصَاصَ اَلْقِصَاصَ، فَقَالَتْ اُمُّ الرَّبِيْعِ، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ : اَيُقْتَصُّ مِنْ فُلاَنَةٍ ؟ وَاللّٰهِ لاَ يُقْتَصُّ مِنْهَا ، فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سُبْحَانَ اللّٰهِ يَا اُمَّ الرَّبِيْعِ اَلْقِصَاصُ كِتَابُ اللّٰهِ قَالَتْ : لاَ وَاللّٰهِ لاَ يُقْتَصُّ مِنْهَا اَبَدًا ، قَالَ فَمَا زَالَتْ حَتّٰى قَبِلُوْا الدِّيَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ مَنْ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لاَبَرَّهٗ .

"আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—রুবাইর বোন উম্মে হারিছা কোন এক ব্যক্তিকে যখমী করে। যখমীর অভিভাবকগণ হুযূর (সা.)-এর কাছে মোকদ্দমা দায়ের করে। হুযূর (সা.) বলেন— القصاص ۸القصاص কেসাস দিতে হবে, কেসাস। রুবাইর মা বললেন, তার থেকেও কেসাস আদায় করা হবে? হুযূর (সা.) বললেন, সুবহানাল্লাহ! ওহে রুবাইর মা! কেসাস আল্লাহর ফয়সালা। রুবাইর মা বললেন, আল্লাহর কসম তার থেকে কেসাস নেয়া যাবে না!

আনাস (রা.) বলেন, তারা এরূপ কথাবার্তা বলছিল এই মুহূর্তে বাদীরা দিয়্যাত নিতে রাজী হয়ে যায় এবং কেসাসের দাবি ছেড়ে দেয়।

তখন রাসূল (সা.) বললেন, নিশ্চয় আল্লাহর এমন কতক বান্দা আছে যারা আল্লাহর নামে কসম করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে حانث (কসম ভঙ্গকারী) বানান না।

একটি দ্বন্দ্ব নিরসন

এরূপ ঘটনা সম্বলিত বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়াত বিরোধপূর্ণ।

বুখারী শরীফের রেওয়ায়াত এরূপ ঃ

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ الرَّبِيْعَ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ وَطَلَبُوْا اِلَيْهَا الْعَفْوَ فَاَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَبَوْا اِلَّا الْقِصَاص فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ اَنَسُ بْنُ النَّضْرِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرَّبِيْعِ ؟ لاَ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كِتَابُ اللّٰهِ اَلْقِصَاصُ، فَرَضِىَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ مَنْ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهٗ ـ

....রুবাই (রা.) এক বালিকার সামনের পাটির দাঁত ভেঙে ফেলেন। অতঃপর তারা ঐ মহিলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। এরপর তারা রাসূল (সা.)-এর দরবারে আগমন করে। রাসূল (সা.) কেসাসের ফয়সালা দেন। তখন ইবনে নযর বলে ওঠেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! রুবাইর দাঁত ভাঙতে হবে? আল্লাহর কসম তা করা যাবে না! রাসূল (সা.) বললেন, আল্লাহর বিধান হলো কেসাস। সুতরাং কেসাসই দিতে হবে। ইতিমধ্যে বাদীরা বিবাদীকে ক্ষমা করে দেয়। ঘটনা দর্শনে রাসূল (সা.) বলেন, আল্লাহর এমন কতক বান্দা আছে যারা আল্লাহর নামে কসম করলে আল্লাহ্ তা পূরণ করেন।

উভয় রেওয়ায়াত অনুযায়ী তিনটি বিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

১। মুসলিম শরীফের রেওয়ায়াত অনুযায়ী আঘাতকারী মহিলা রুবাইর বোন কিন্তু বুখারীর রেওয়ায়াত অনুযায়ী আঘাতকারী স্বয়ং রুবাই, তার বোন নন।

২। মুসলিম শরীফের রেওয়ায়াত অনুযায়ী কসমকারী ব্যক্তি রুবাইর মা কিন্তু বুখারীর রেওয়ায়াত অনুযায়ী কসমকারী হলেন রুবাইর ভাই, আনাস ইবনে মালিকের চাচা হযরত আনাস ইবনে নযর (রা.)।

(আনাস (রা.)-এর পিতার নাম মালিক ইবনে নযর ইবনে জমজম। মালিকের ভাই আনাস ইবনে নযর এবং তাঁর বোন রুবাই। সুতরাং আনাস ইবনে নযর হযরত আনাস ইবনে মালেকের চাচা এবং রুবাই বিনতে নযরের ভাই)

৩। মুসলিম শরীফের রেওয়ায়াতে যখমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে আর বুখারী (রহ.) সহ অন্যান্য রেওয়ায়াতে দাঁত ভাঙার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বিরোধপূর্ণ এসব রেওয়ায়াতের সমাধান দিতে গিয়ে আল্লামা নববী (রহ.) বলেন, মূলতঃ এখানে দু'টি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এক ঘটনায় রুবাইর বোন জনৈক ব্যক্তিকে যখম করে এবং কসম করে রুবাইর মা।

অন্য ঘটনায় স্বয়ং রুবাই কোন এক মেয়ের দাঁত ভেঙে ফেলে এবং কসম করে আনাস ইবনে নযর। আল্লামা কিরমানী (রহ.) এটাকেই নিশ্চিত সত্য বলেছেন এবং আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.)-এর মতও অনেকটা এরূপ।

কিন্তু ভিন্ন ঘটনা বলে পাশ কাটানোর কোন অবকাশ নেই। কেননা রাবীও একজন এবং ঘটনার আগাগোড়াও এক মনে হয়।

ঘটনার মূল কর্তা স্বয়ং রুবাই। কোন রাবীর ভুলের কারণে অথবা কাতেবের ভুলের কারণে ربيع-এর জায়গায় اخت الربيع বলা হয়েছে। এভাবেই প্রথম দ্বন্দ্বের সমাধান হয়ে যায়। দ্বিতীয় দ্বন্দ্বের সমাধানে বলা যায় যে, কসমকারী একজনই। রাবীর সন্দেহের কারণে একাধিক নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় দ্বন্দ্বের সমাধান অতি সহজ। কেননা যখম করা দাঁত ভাঙার মধ্যে শামিল। সুতরাং উভয় রেওয়ায়াতে মৌলিক কোন দ্বন্দ্ব নেই।

উল্লেখ্য যে, এ ধরনের দ্বন্দ্ব হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কোন ব্যাঘাত ঘটায় না এবং এ কারণে সমাধান স্বরূপ দু'টি ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত করারও প্রয়োজন নেই।

ই'লাউস্ সুনানে উল্লেখ করা হয়েছে, আঘাতকারী এবং কসমকারী নির্ণয় করতে গিয়ে দু'টি ঘটনা বলার কোন প্রয়োজন নেই। এই দ্বন্দ্ব মূলত রাবীর কমতির কারণে হয়ে গেছে। কোন সময় তো রাবীগণ হাদীসের মূল বিষয়েই দ্বন্দ্ব করে থাকেন, সুতরাং আনুষঙ্গিক বিষয়ের কোন প্রশ্নই নেই।

—ইউলাউস সুনান খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ১১০

পুরুষ এবং মহিলার মধ্যে কেসাস কার্যকর হওয়া

পুরুষ এবং মহিলার মধ্যে পরস্পরে কেসাস কার্যকর হওয়ার ব্যাপারে চার ইমাম একমত যে, পুরুষের বদলায় মহিলাকে এবং মহিলার বদলায় পুরুষকে কেসাস স্বরূপ হত্যা করতে হবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, النفس بالنفس প্রাণের বদলায় প্রাণ। الحر بالحر স্বাধীন লোকের বদলায় স্বাধীন। এমনিভাবে হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে রাসূল (সা.) কোন এক নারী (মেয়ের) বদলায় একজন ইহুদীকে হত্যা করেন।

তবে নারী পুরুষ পরস্পরের অঙ্গহানীর বেলায় কেসাস ওয়াজিব হবে কিনা এ ব্যাপারে মত বিরোধ রয়েছে।

ائمة ثلاثة-এর মতে অঙ্গহানীর বেলায়ও কেসাস কার্যকর করতে হবে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে অঙ্গহানীর বেলায় কেসাস কার্যকর করা যাবে না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন জরুরী। কেননা অবশ অঙ্গের বদলায় সুস্থ এবং অপূর্ণ অঙ্গের বদলায় পূর্ণ অঙ্গের কেসাস নেয়া যায় না।

এমনিভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পদের মতো। আর মহিলা ও পুরুষের অঙ্গের মূল্য অবশ্যই সমান নয়। অতএব সামঞ্জস্য না থাকায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে কেসাস আসবে না।

আল্লামা আবূ বকর জাস্সাস (রহ.) রচিত আহকামুল কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে-পুরুষ ও মহিলার হাতের মূল্য (মুনাফা) সমান নয়। এটা ডান হাত ও বাম হাতের মতো। সুতরাং একজনের হাতের বদলায় অপরজনের হাত কর্তন করা যাবে না। যেমন ডান হাতের বদলায় বাম হাত কর্তন করা যায় না।

—আহকামুল কুরআন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৪০

ইমামগণ ইমাম বুখারী (রহ.) বর্ণিত এই হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে বলেন—রুবাইর বোন জনৈক ব্যক্তিকে যখম করলে রাসূল (সা.) কেসাসের ফয়সালা দেন। আর "ব্যক্তি" বলে যে পুরুষ মানুষ বুঝানো হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। অতএব বুঝা যায় পুরুষ-মহিলা পরস্পরে অঙ্গহানী করলে কেসাস ওয়াজিব হয়। কিন্তু বুখারী (রহ.)-এর এই দলীল সহীহ্ নয়। কেননা হাদীসে 'ব্যক্তি' (جرحت انسانا) বলে পুরুষ মানুষ বুঝানো হয়েছে—এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন দলীল নেই। অন্যান্য রেওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় সে মহিলা ছিল। যেমন এক রেওয়ায়াতে এসেছে ثنية جارية সুতরাং এই রেওয়ায়াত পূর্বের রেওয়ায়াতের তাফসীর স্বরূপ। —ই'লাউস্ সুনান খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ১১০

সুতরাং উভয়ে মহিলা হওয়ায় কেসাসের হুকুম দেয়া হয়েছে। অতএব হাদীসটি ইমামদের দলীল হতে পারে না।

والله لا يقتص منها-এর ব্যাখ্যা

এই বাক্য দ্বারা বুঝা যায়, তাঁরা রাসূল (সা.)-এর ফয়সালা প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য আদৌ এমন নয়। বরং তাঁরা আল্লাহর উপর অগাধ বিশ্বাস রেখে একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, আল্লাহ্ তাদের থেকে কেসাস নিবেন না বরং অভিভাবকদের অন্যভাবে রাজি করিয়ে দিবেন। এ কারণেই লোকগুলো যখন দিয়্যাত নিতে রাজী হলো তখন রাসূল (সা.) বললেন, আল্লাহর

এমন কতক বান্দা আছে, যাঁরা তাঁর নামে শপথ করলে শপথ ভঙ্গ হয় না। এটা এক প্রকারের প্রশংসা এবং এটা এ কথারই প্রমাণ বহন করে যে, তাঁরা রাসূল (সা.)-এর কথার বিরুদ্ধাচরণ করতে চাননি। —মিরকাত খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৫৫-৫৬

এর দ্বারা একটি মাসআলা বুঝে আসে যে, হুকুম সর্বদা বাহ্যিক অবস্থার উপর আবর্তিত হয় না। কেননা মানুষ অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবমুখী কথাই বলে কিন্তু আবেগ বা অন্য কোন কারণে উপস্থাপনা ভঙ্গিতে পরিবর্তন এসে যায়। এ কারণে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা উচিত এবং বক্তা কী বুঝাতে চায় সেদিকে খেয়াল রাখা প্রয়োজন।

সা'দ ইবনে উবাদা (রা.)-কে স্বীয় স্ত্রীর সাথে কাউকে অপকর্ম করতে দেখলে রাসূল (সা.) সাক্ষী আনতে বলায় তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! এর আগেই আমি তরবারী দিয়ে এর ফয়সালা করে ফেলব। কক্ষনও সাক্ষী খুঁজতে যাব না। রাসূল (সা.) তাঁর প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পেরে প্রশংসাসুলভ বলেন, انه لغيور "লোকটি বড় আত্মর্যাদাশীল!"

باب مايباح به دم المسلم

অধ্যায় ঃ যে সব কারণে মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত করা হালাল হয়

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِأٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَّا بِاِحْدٰى ثَلاَثٍ ، اَلثَّيِّبُ الزَّانِىْ وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ اَلْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ـ

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, নিম্নোক্ত তিন কারণ ছাড়া আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.)-এর ব্যাপারে সত্য সাক্ষীদাতা মুসলমানকে হত্যা করা জায়িয নেই।

১। বিবাহিতা ব্যভিচারী, ২। অন্যায়ভাবে হত্যাকারী এবং ৩। স্বধর্ম (ইসলাম) এবং মুসলমান জামাত পরিত্যাগকারী।

المفارق للجماعة বাক্যটি التارك لدينه-এর সিফাত। অর্থ, মুসলমান জামাতের আকীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী বিশ্বাস স্থাপনকারী। এটা কুফরীর কারণ। কেননা মুরতাদ হওয়ার জন্য সরাসরি কুফরীতে লিপ্ত হওয়া জরুরী নয় বরং ইসলামের মৌলিক যে কোন বিশ্বাস বিরোধী আকীদা রাখলেই মুরতাদ হয়ে যায়।

المفارق للجماعة। বলে রাসূল (সা.) বড় ধরনের এক সন্দেহ দূর করেছেন। সেটা হলো, ওটুকু বাক্য বললে সন্দেহ হতে পারত যে, মুরতাদকে ঐ সময় হত্যা করা যায় যখন সে সরাসরি ইসলাম পরিত্যাগ করে। ইসলাম দাবিকারী যিন্দীক এর মধ্যে শামিল নয়। এসব সন্দেহ দূর করার জন্য রাসূল (সা.) বলেছেন, المارق للجماعة। মুসলিম আকীদা বিরোধী বিশ্বাস স্থাপনকারী যিন্দীকও এতে শামিল।

মোটকথা, মুরতাদের উভয় প্রকার সরাসরি ইসলাম ত্যাগকারী এবং ইসলামের জরুরী আকীদা বিরোধী বিশ্বাস স্থাপনকারীকে শামিল করার জন্য রাসূল (সা.) বলেছেন, المفارق للجماعة।

অবশ্য এই হুকুম থেকে মহিলা বাদ যাবে। কেননা আহনাফের মতে মহিলা মুরতাদকে হত্যা করা জায়িয নেই। —মিরকাত খণ্ড ৭ ,পৃষ্ঠা ৪৭

হত্যা করার কারণ এই তিনটির মধ্যে সীমাবদ্ধ কিনা

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, হত্যা করার কারণ এই তিনটিই। অথচ বিদ্রোহী, মুসলমানের উপর আক্রমণকারীকেও হত্যা করতে হয়। তবে হাদীসে নিম্নোক্ত কারণে মাত্র তিনটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। যথা ঃ

১। অন্যান্য হাদীসে বিদ্রোহী, আক্রমণকারীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে বিধায় এখানে এই তিনটির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং হাদীসে শুধুমাত্র এই তিন প্রকারই উদ্দেশ্য নয়।

২। বিদ্রোহী, আক্রমণকারী المفارق للجماعة।-এর মধ্যে শামিল।

৩। অথবা হাদীসের অর্থ হলো, এই তিন প্রকার লোক ছাড়া অন্য কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা জায়িয নেই। —মিরকাত খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৪৮

৪। আল্লামা সিন্ধী (রহ.) বলেছেন, হাদীসের অর্থ এই তিন প্রকার লোককে হত্যা করা যাবে কিন্তু তাদের সাথে যুদ্ধ করা যাবে না। বিদ্রোহী এর মধ্যে শামিলই নয়। কেননা তাদের সাথে قتال (যুদ্ধ) করতে হয় قتل (হত্যা) নয়। আর আক্রমণকারীকেও باغى (বিদ্রোহীর) মত قتال-এর আওতায় ফেলা যায়।

باب اثم من سن القتل

অধ্যায় ঃ হত্যার প্রচলন ঘটানোর গুনাহ

عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا اِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ الْاَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِاَنَّهُ اَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ ـ

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, অন্যায়ভাবে যতগুলো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, এর এক অংশ আদমের (আ.) পুত্র কাবিলের আমলনামায় লিখা হয়। কেননা সেই সর্বপ্রথম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে।

হাদীস সংশ্লিষ্ট ঘটনা

কুরআনে বর্ণিত একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে উক্ত হাদীসে। ঘটনাটি হলো, হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) দুনিয়ায় আগমন করেন এবং বংশ বিস্তার শুরু করেন। তখন হাওয়া (আ.) এর গর্ভে এক সাথে দু'টি সন্তান জন্ম নিত। একটি ছেলে ও অপরটি মেয়ে।

এ সময় যেহেতু আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) দম্পতি ছাড়া অন্য কোন দম্পতি ছিল না যে, তাদের সন্তানের সাথে এই সন্তানগুলোর বিয়ে দেবেন। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা এই বিধান দেন যে, হাওয়ার (আ.) গর্ভে একসাথে জন্ম নেয়া ভাই-বোন পরস্পরের জন্য হারাম কিন্তু আগের গর্ভে জন্ম নেয়া ভাই-বোন পরবর্তী জোড়ার জন্য হারাম নয়, তাদের সাথে বৈবাহিকহ সম্পর্ক জায়িয। এ কারণে আদম (আ.) একগর্ভের ছেলের সাথে আরেক গর্ভের মেয়ে বিয়ে দিয়ে দিতেন। —রূহুল মা'আনী

কিন্তু হাওয়া (আ.)-এর গর্ভে জন্ম নেয়া প্রথম সন্তান কাবিলের বোন (আকলিমা) ছিল অপরূপা সুন্দরী। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় গর্ভে জন্ম নেয়া হাবিলের বোন ছিল কুৎসিত। বিবাহের বেলায় কাবিলের ভাগে এই কুৎসিত মেয়ে পড়ায় সে দারুন মনঃক্ষুণ্ন হয় এবং হাবিলের দুশমন বনে যায়।

এর সমাধানস্বরূপ আদম (আ.) উভয়কে কুরবানী করার পরামর্শ দেন। হাবিলের কুরবানী কবুল হয় এবং কাবিল আরো বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। শেষ পর্যন্ত সে হাবিলকে হত্যা করে বসে।

ফায়েদা ঃ এই হাদীস দ্বারা একথা জানা যায়, কাবিল যেহেতু সর্বপ্রথম অন্যায়ভাবে হত্যাকাণ্ডের প্রচলন ঘটায় এজন্য কেয়ামত পর্যন্ত যত অন্যায় হত্যাকাণ্ড ঘটবে এর গুনাহের এক অংশ তার ভাগে গিয়ে পড়বে। এটাই ইসলামের বিধান।

হযরত জাবের (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন—

مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ مسلم

"যে ব্যক্তি শরীয়তে উত্তম কোন প্রথার প্রচলন ঘটায় সে এর এবং কেয়ামত পর্যন্ত মানুষ এ অনুযায়ী আমল করবে তার সওয়াব পাবে। আর যে খারাপ কিছুর প্রচলন ঘটায় সেও অনুরূপ পাপের অংশীদার হবে।"

মনে রাখতে হবে যে, হাদীসটি কুরআনের আয়াত لا تــزر وازرة وزر اخرى-এর সাথে বিরোধ নয়। কেননা এটাও বান্দার নিজেরই পাপ। কোন ব্যক্তি যদি খারাপ কোন কিছুর প্রচলন ঘটিয়ে তওবা করে তাহলে পরবর্তীদের আমলের কারণে সে গুনাহগার হবে না।

باب المجازاة بالدماء فى الاخرة وانها اول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة

অধ্যায় ঃ কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম খুনের (রক্ত প্রবাহিত করার) ফয়সালা হবে

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَوَّلُ مَا يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِى الدِّمَاءِ ـ

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম খুনের ব্যাপারে ফয়সালা করা হবে।"

এই হাদীস দ্বারা জানা যায় প্রথমে খুন, যুদ্ধ বিগ্রহের ফয়সালা হবে কিন্তু অন্যান্য রেওয়ায়াতে প্রথমে নামাযের হিসেবের কথা বলা হয়েছে। যেমন—

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ الْعَبْدُ عَلَيْهِ صَلٰوتَهُ ـ (نسائى)

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا : اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ الْعَبْدُ عَلَيْهِ صَلٰوتَهُ ـ

"কেয়ামতের দিন বান্দার প্রথম হিসাব হবে নামায নিয়ে।" বিরোধপূর্ণ হাদীসদ্বয়ের সমাধানে বলা যায় যে, ১। প্রথমে হিসাব হবে নামাযের আর ফয়সালা হবে রক্তের (খুনের)। আর হিসাব ও ফয়সালা ভিন্ন দু'টি বিষয় হওয়ায় উভয় হাদীসে কোন বিরোধ নেই।

২। حقوق اللّٰه-এর মধ্যে প্রথম হিসাব হবে নামাযের আর حقوق العباد এর মধ্যে প্রথম হিসাব হবে খুনের।

৩। আদিষ্ট বিষয়সমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম নামাযের এবং নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের মধ্যে (সর্বপ্রথম) খুনের বিচার হবে।

অবশ্য حقيقى (বাস্তবতার) নিরিখে নামাযের হিসাব হবে আগে এর পরে খুনের। কেননা নামাযের বেলায় يحاسب এবং খুনের বেলায় يقض শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, ফয়সালার আগে হিসাব হয়ে থাকে।

—মিরকাত খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৪৭

باب تغليظ تحريم الدماء والاعراض والاموال

অধ্যায় ঃ মানুষের জান, মাল ও সম্পদ রক্ষার গুরুত্ব

عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ : اِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ ، اَلسَّنَةُ اِثْنَاعَشَرَ شَهْرًا ، مِنْهَااَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ، ثَلٰثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ، ذُوالْقَعْدَةِ وَذُوالْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ وَرَجَبٌ شَهْرُ مُضَرَ الَّذِىْ بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ ، ثُمَّ قَالَ : اَىُّ شَهْرٍ هٰذَا ؟ قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ ، قَالَ :

فَسَكَتَ ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ ؟ قُلْنَا : بَلٰى، قَالَ : فَأَيُّ بَلَدٍ هٰذَا ؟ قُلْنَا : اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : فَسَكَتَ ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ : أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ ؟ قُلْنَا: بَلٰى، قَالَ : فَأَيُّ يَوْمٍ هٰذَا؟ قُلْنَا : اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : فَسَكَتَ ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ ، أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحَرِ ؟ قُلْنَا: بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَأَحْسِبُهُ قَالَ : وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْئَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ فَلَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِيْ كُفَّارًا أَوْضُلَّالاً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلَّغُهُ يَكُوْنَ أَوْعٰى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ ثُمَّ قَالَ : أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ قَالَ ابْنُ حَبِيْبٍ فِيْ رِوَايَتِهِ وَرَجَبُ مُضَرَ، وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ بَكْرٍ فَلَا تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ .

আবূ বাক্‌রাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বর্ণনা করেন, যমানা তার আপন গতিতে চলমান, যেদিন থেকে আল্লাহ্ তাআলা আসমান-জমিন সৃষ্টি করেছেন সেদিনকার মতোই। বছরে মাস বারটি। এর মধ্যে চার মাস হারাম (অতীব সম্মানিত)। তিনমাস পর্যায়ক্রমিক, যুলকা'দা, যুলহজ্জা এবং মুহাররম। আরেকটি হলো মুদার কবীলা চিহ্নিত রজব। যা জুমাদাসসানী এবং শা'বানের মধ্যবর্তী মাস। অতঃপর রাসূল (সা.) বললেন, এটা কোন্ মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলই ভালো জানেন। এরপর রাসূল (সা.) কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। এতে আমাদের ধারণা হলো তিনি প্রচলিত নাম ছাড়া অন্য কোন নামে এই মাসকে আখ্যায়িত করবেন। অতঃপর বললেন, এটা কি যিলহজ্জ মাস নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ, যিলহজ্জ মাস।

অতঃপর বললেন, এটা কোন্ শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলই ভালো জানেন। অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন যাতে আমাদের ধারণা

হলো, তিনি হয়ত এর অন্য কোন নাম বলবেন। এরপর তিনি নিজেই বললেন, এটা কি মক্কা শহর নয়? আমরা বললাম, জি হ্যাঁ, এটা মক্কা শহর।

অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কোন দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলই ভালো জানেন। অতঃপর নিজেই বললেন এটা কি নহরের দিন নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ, নহরের দিন। তিনি বললেন, তোমাদের রক্ত, সম্পদ এবং সম্মান অতীব সম্মানী যেমন এই শহর, এই দিন, এই মাস সম্মানী। অতিসত্বর তোমরা তোমাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাত করবে। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন আমার অন্তর্ধানের পর পুনরায় কুফরীতে লিপ্ত না হয় এবং একে অপরের উপর আক্রমণ না করে। শুন! উপস্থিতরা যেন অনুপস্থিতদের কাছে আমার এই কথাগুলো পৌঁছে দেয়। অনেক সময় শ্রোতাই বক্তার চেয়ে বেশি সংরক্ষণশীল হয়ে থাকে। অতঃপর বললেন, আমি কি তোমাদের কাছে যথার্থভাবে শরীয়ত পৌঁছে দেইনি?"

হাদীসের ব্যাখ্যা

ان الزمان قد استدار كهيئته يوم الخ ঃ রাসূল (সা.) বিদায় হজ্জে মিনায় অবস্থানকালে এই ভাষণ প্রদান করেন। এ কথাটির বিভিন্ন বাখ্যা হতে পারে। যথা ঃ

১। আরববাসী ছিল হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর। এ সূত্রে তারা ইবরাহীম (আ.)-এর নবুওয়াতের বিশ্বাসী বলে দাবি করত। ইবরাহীম (আ.)-এর শরীয়তে উল্লেখিত চার মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম ছিল। আহলে আরব যুদ্ধ বিগ্রহের প্রয়োজনীয়তার অনেক সময় মুহাররম মাসের 'অবৈধতা' (حرمت) কে সফর মাসে স্থানান্তরিত করত। হজ্জের মৌসুমে ঘোষণা করে দিত, এ বছর মহররম মাসের অবৈধতা (حرمت)-কে সফর মাসে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সুতরাং এ বছর মুহররম মাসে যুদ্ধ করা হালাল এবং সফর মাসে হারাম।

রাসূল (সা.) এই কুপ্রথা বাতিল করে ঘোষণা দেন ان الزمان قد استدار الخ। যমানার সৃষ্টিলগ্ন থেকেই নির্দিষ্ট ঐ চার মাসই হারাম, এতে কোনরূপ পরিবর্তন সাধন করার কারো অধিকার নেই।

তাফসীরে কুরতুবীতে উল্লেখ করা হয়েছে, আহলে আরব ছিল যোদ্ধা জাতি। লাগাতার তিন মাস (যিলকদ, যিলহজ্জ, মহররম) যুদ্ধ হারাম হওয়ায় তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠে এবং তারা ঘোষণা দেয় এ বছর আমরা মুহররম মাসের অবৈধতাকে সফর মাসে স্থানান্তরিত করলাম। —কুরতুবী খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১৩৭

২। আরবে চন্দ্রমাসের হিসেবের রেওয়াজ ছিল। এতে করে 'হজ্জ' কোন সময় শীতকালে কোন সময় গ্রীষ্ম-বর্ষাকালে পড়ে যেত। এ কারণে আরবরা হজ্জকে সুবিধামত এক মৌসুমে আদায় করার জন্য সূর্য মাসের হিসেব করতে থাকে আরবীতে একে كبيسه বলে। এই সুবিধা ছাড়াও এতে তাদের ব্যবসায়িক সুবিধাও থাকতো।

এই করতে গিয়ে তারা প্রতি বছরে ১১ দিন অথবা প্রতি তিন বছর অন্তর ১ মাস বৃদ্ধি করে দিত। যার ফলে اشهر حرم। (হারাম ৪ মাসে) ব্যাঘাত ঘটত। এর ফলে যিলহজ্জ মাসের বদলায় যিলকদ, রমযানে হজ্জ পড়ে যেত।

এ কারণেই ৯ম হিজরীতে হুযূর (সা.) হজ্জে না গিয়ে আবূবকর (রা.)-কে আমীর বানিয়ে হজ্জে প্রেরণ করেন।

কেননা ঐ বছর মূলত যিলকদ মাসে হজ পালন করা হয়েছিল। পরবর্তী বছর কুদরতীভাবে হজ্জের মৌসুম আসল মাস যিলহজ্জে ফিরে আসে। এ কারণে রাসূল (সা.) এ বছর হজ্জব্রত পালন করেন।

উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক বছর ১১ দিন করে বাড়তি হওয়ায় ৩৩ বছর পর প্রত্যেক মাস তার আসল অবস্থানে ফিরে আসে। এই ধারাবাহিকতায় সে বছর যিলহজ্জ মাস তার আসল অবস্থানে ফিরে এসেছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতেই রাসূল (সা.) বলেন, ان الزمان قد استدار الخ। "সময় তার আসল অবস্থায় ফিরে এসেছে যে অবস্থায় আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টি করেছেন।"

রাসূল (সা.)-এর বক্তব্যের সাথে এই তাফসীরটি অধিক সঙ্গতিপূর্ণ। কেননা এরপরেই রাসূল (সা.) বলেন, السنة اثنا عشر شهرا।-এ কথা পরোক্ষভাবে ঐ বাড়তি ১১দিনের অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে, আরববাসী যা বৃদ্ধি করতো।

—কুরতবী খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৯

সর্বপ্রথম কে এই প্রথা চালু করে?

জাহেলী যুগের এই প্রথা সর্বপ্রথম কে আবিষ্কার করে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

১। ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ, জাহ্হাক প্রমুখের মতে এই প্রথার আবিষ্কারক বনূ মালেক ইবনে কেনানা। তারা সংখ্যায় ছিল তিনজন।

২। জুয়াইবের জাহ্হাকের সূত্রে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর আরেকটি মত উল্লেখ করে বলেন, সর্বপ্রথম এই প্রথার প্রচলন ঘটায় আমর ইবনে লুহাই ইবনে কামআ' ইবনে খানযাফ।

৩। ইমাম কালবী (রহ.) বলেন, এই প্রথার আবিষ্কারক বনী কেনানার নোআইম ইবনে ছা'লাবা। এরপর একে পূর্ণমাত্রা দেয় জুনাদা ইবনে আওফ। সে রাসূল (সা.)-এর যমানা পর্যন্ত বেঁচে ছিল।

৪। ইমাম যুহরী বলেন, বনী কেনানার এক গোত্র এই প্রথার আবিষ্কারক। অতঃপর বনী ফাকীমের 'কালাম্মাস" একে পূর্ণতা দেয়। তার নাম হোযাইফা ইবনে ওবাইদ। আরববাসীর উপর তার একচ্ছত্র আধিপত্য থাকায় সে এই প্রথা আরবদের উপর চাপিয়ে দেয়।

এদিকে ইঙ্গিত করে এক কবি বলেছেন— مناناسى الشهر القلمس আমাদের মধ্যে কালাম্মাস আছেন, যিনি মাসের অবৈধতা থেকে আগপিছকারী। কবি কুমাইত বলেন,

السنا الناسئين على معد * شهور الحل نجعلها حراما .

আমরাই কি মাসের অবৈধতাকে আগপিছকারী নই? হালাল মাসকে আমরা হারাম বানাই? —কুরতুবী খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১৩৮

منهااربعة حرم ، ثلاثة متواليات الخ-এর ব্যাখ্যা

হারাম মাস ৪টি এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। যিলকদ, যিলহজ্জ, মহররম এবং রজব। অবশ্য গণনার ক্ষেত্রে আলিমগণ মতবিরোধ করেছেন।

কুফার একদল আলিমের মতে গণনা করতে হবে এভাবে, ১। মহররম, ২। রজব, ৩। যিলকদ এবং ৪। যিলহজ্জ। এরূপ গণনার ফায়েদা হলো, এভাবে ৪ মাস একই বছরে গণ্য হয়।

জুমহুরের মতে, বর্ণিত হাদীস অনুযায়ীই গণনা করতে হবে। যথা ঃ ১। যিলকদ, ২। যিলহজ্জ, ৩। মহররম এবং ৪। রজব। এভাবে গণনা করলে যিলকদ এবং যিলহজ্জ এক বছরে এবং রজব ও মহররম অন্য বছরে গণ্য হয়।

আল্লামা নববী (রহ.) বলেন, এরূপ গণনা পদ্ধতি সহীহ্। যেসব সহীহ্ হাদীসে এসংশ্লিষ্ট আলোচনা এসেছে তার মধ্যে এই হাদীসও একটি, যে অনুযায়ী আমরা মত পেশ করি।

و رجب شهر مضر الذى بين جمادى وشعبان-এর ব্যাখ্যা

রজব মাস নিয়ে মুদার ও রবী'আ কবীলার মধ্যে মতভেদ ছিল।

রবী'আ কবীলার লোক রমযান মাসকে আর মুদার কবীলা জুমাদাস সানী এবং শাবানের মধ্যবর্তী মাসকে রজব মাস বলত। এজন্য সঠিক মাস নির্ণয় করতে রাসূল (সা.) شهر مضر বলেন।

কেউ কেউ আবার বলেছেন, অন্যান্য কবীলার তুলনায় মুদার কবীলা রজব মাসকে বেশি সম্মান করত এজন্য মুদার কবীলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

আরবী মাসের নামকরণের কারণ

ইলম পিপাসু, অনুসন্ধিৎসু ছাত্রদের কথা মাথায় রেখে আমরা নিম্নে আরবী বার মাসের নাম ও নামকরণের কারণ উল্লেখ করছি।

১। محرمات (মহররম) ঃ এর অর্থ হারামকৃত, মর্যাদাপূর্ণ। এ শব্দের বহুবচন আসে محاريم، محارم محرمات. প্রাচীন আরবরা এ মাসকে المؤتمر। বলত। যেহেতু এই মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম মনে করা হতো এজন্য একে মহররম বলা হয়। –গিয়াসুল লোগাত পৃষ্ঠা ৪৫৭

২। صفر (সফর) ঃ فاء কালিমায় ফাতাহ। এর মূলে রয়েছে صفر অর্থ খালি, শূন্য। মহররম মাসে যুদ্ধ বন্ধ থাকায় আহলে আরব সফর মাসে দলে দলে যুদ্ধে যাত্রা করতো এজন্য তাদের ঘর খালি হয়ে যেত। এ জন্য এর নামকরণ করা হয়েছে صفر বলে। অথবা এর মূল (মাদ্দা) صفر অর্থ হলদে বর্ণ ধারণ করা। যেহেতু এই মাসে গাছের পাতা হলুদ বর্ণ ধারণ করত এবং পাতা ঝরত এজন্য একে সফর মাস বলা হয়।

৩। ربيع الاول (রবীউল আউয়াল) ঃ ربيع অর্থ বসন্ত। এই মাসের নামকরণ করা হয় বসন্তকালের শুরুলগ্নে। সময়ের সাথে মিল রেখে এর নাম রাখা হয় ربيع الاول । –রেসালায়ে নুজুম পৃষ্ঠা ২২৯

৪। ربيع الاخر (রবীউল আখার/সানী) ঃ বসন্তকালের শেষ পর্যায়ে গিয়ে এই মাসের নামকরণ করা হয়। এজন্য এর নাম রাখা হয় রবীউস সানী বা ربيع الاخر বলে। —প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ২২৯

৫। جمادى الاولى (জুমাদাল উলা) ঃ শব্দটির মূলে রয়েছে جمود অর্থ জমে যাওয়া, স্থবির হওয়া। যখন এই মৌসুমের নামকরণ করা হয় সে সময়কালটা ছিল শীতের শুরুলগ্ন। যখন ঠাণ্ডায় সবকিছু জমে যেত। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে মিল রেখে এই মাসের নাম রাখা হয়েছে জুমাদাল উলা।

৬। جمادى الاخرى (জুমাদাল উখরা) ঃ শীতকালের শেষলগ্নে গিয়ে এ মাসের নামকরণ করা হয় বলে এর নাম রাখা হয়েছে جمادى الاخرى

উল্লেখ্য যে, একে جمادى الثانى বলা উচিত নয়। কেননা ثانى ঐ ক্ষেত্রে বলা হয় যেখানে ثالث থাকে। অথচ এর ثالث বা তৃতীয় কোন মাস নেই।

৭। رجب (রজব) ঃ এটি ترجيب থেকে। এর বহুবচন আসে رجبات وارجاب অর্থ সম্মান করা। আহলে আরব একে شهرالله বলত এবং এর যথেষ্ট সম্মান করত। এজন্য এর নামকরণ করা হয়েছে 'রজব' বলে। –রেসালায়ে নুজুম ২৩০

৮। شعبان (শা'বান) ঃ এর মূল تشعيب، شعب অর্থ ছড়িয়ে দেয়া, বিচ্ছিন্ন হওয়া। যেহেতু এই মাসে অসংখ্য কল্যাণ আর রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং হায়াত, মওত, রিযিক এবং তাকদীরের নানা রকম বিষয় ফেরেস্তাদের হাতে ন্যস্ত করা হয় এজন্য এর নামকরণ করা হয় شعبان বলে। এর বহুবচন আসে شعبانا ، وشعابة ، وشعابين –গিয়াসুল লোগাত পৃষ্ঠা ২৯৩

অথবা এ কারণে এর নাম শা'বান রাখা হয়েছে যে, আরববাসী রজব মাসে যুদ্ধ নিষিদ্ধ থাকার পর এ মাসে যুদ্ধ করতে ছড়িয়ে পড়ত এবং শত্রুর উপর ঝাপিয়ে পড়ত। —ইবনে কাছীর খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ৩৫৪

৯। رمضان (রমযান) ঃ এর মাদ্দা (মূল) رمض অর্থ জ্বালানো। যেহেতু এই মাসে বান্দার গুনাহ জ্বলে (মুছে) যায় অথবা গরমের মৌসুমে এর নামকরণ করা হয় এজন্য একে رمضان বলা হয়। —ইবনে কাছীর খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৩৬

১০। شوال (শাওয়াল) ঃ এর ক্রিয়া মূল شول অর্থ উঠানো। আহলে আরব যেহেতু এ মাসে শিকার করার উদ্দেশ্যে কাঁধে অস্ত্র উঠাতো, এজন্য এর নামকরণ করা হয়েছে شوال বলে। —ইবনে কাছীর খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩০০

১১। ذوالقعدة (যিলকাদ) ঃ قعدة অর্থ বসা। যেহেতু আরবরা এ মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে বিরত থাকত (বসে থাকত) এজন্য এর নামকরণ করা হয়েছে ذوالقعدة বলে। —ইবনে কাছীর খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২২৬

১২। ذوالحجة (যিলহজ্জ) ঃ হজ্জের মাস বলে একে যিলহজ্জ বলা হয়। তাছাড়া حج (حاء এর মধ্যে কাছরা এবং جيم তাশদীদ সহ) এর এক অর্থ বর্ষ। যেহেতু এটি বছরের শেষ মাস এজন্য একে যিলহজ্জ বলা হয়েছে।

—ইবনে কাসীর খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২২৬

তাফসীরে রূহুল মা'আনী এবং ইবনে কাছীরে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। আমরা প্রয়োজনীয় অংশটুকু এখানে তুলে ধরলাম। বিস্তারিত জানতে তাফসীরের কিতাব দেখা যেতে পারে।

وان دمائكم واموالكم واعر اضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شهركم هذا -এর ব্যাখ্যা

রাসূল (সা.) সাহাবাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে বলেন— اى يوم هذا؟ اى شهر هذا؟ اى بلد هذا؟ যাতে রাসূল (সা) যা বললেন অন্তরে তা গেঁথে যায়। প্রত্যেক প্রশ্নের পর সাহাবাগণ اللّٰه ورسوله اعلم বলেন। এটা তাঁদের পরম শিষ্টাচার এবং মহৎ হৃদয়ের আলামত। তাছাড়া সাহাবাগণ জানতেন রাসূলের (সা.) কাছে এই প্রশ্নের উত্তর অজানা থাকার কথা নয়। তথাপি জানতে চাওয়ায় নিশ্চয় কোন কারণ বিদ্যমান রয়েছে। এজন্য সাহাবাগণ বলেন-আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই (সা.) ভালো জানেন।

জাহেলী যুগে এসব লোকেরা মক্কা, হারাম মাসসমূহ এবং নহরের দিনের মর্যাদা দিত কিন্তু মানুষের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রুর সম্মান দিত না। এ কারণে রাসূল (সা.) সম্মানিত এসব শহর ও মাসের সাথে মানুষের জান, মাল ও ইজ্জতের সাদৃশ্য (তাশবীহ) দিয়ে বলেন—

فان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام الخ -

বর্বরতার ঐ যুগে মক্কা শহর মহররম মাস, নহরের দিনের মর্যাদা তাদের অন্তরে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু মানব জীবন, মানুষের মাল ও ইজ্জতের কোন মূল্য তাদের অন্তরে ছিল না। উপরোল্লিখিত তিনটি বিষয়ের চাইতে নিম্নে বর্ণিত তিনটি বিষয়ের মূল্য অধিক। এজন্য তাদেরকে বলা হয়েছে যেমনিভাবে তোমরা মক্কা ভূমি, হারাম মাস এবং নহরের দিনের সম্মান কর ঠিক তদ্রূপ মুসলমানের জান, মাল ও ইজ্জত-আব্রুর সম্মান করবে।

উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র আহলে আরবের আদত অনুযায়ী বিষয়টাকে সুস্পষ্ট করে বুঝানোর উদ্দেশ্যে এরূপ সাদৃশ্য দেয়া হয়েছে। সুতরাং এ প্রশ্ন করা যাবে না যে, তুলনামূলক নিম্নমানের বস্তুর সাথে মানুষকে তাশবীহ (সাদৃশ্য) দেয়া হলো কেন?

فلا ترجعن بعدى كفارا اوضلالا يضرب الخ -এর ব্যাখ্যা

আলোচ্য রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায়, খুন-খারাবীর কারণে মুসলমান কাফির হয়ে যায়। অথচ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে কবীরা গুনাহ (খুন-খারাবী)র কারণে মানুষ কাফির হয়ে যায় না।

এ কারণে হাদীসের এই অংশটুকুর বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। যথা ঃ

১। মুমিনকে হত্যা করা হালাল মনে করো না। এতে করে যে কেউ কাফির হয়ে যাবে।

২। মুমিনকে হত্যা করা কাফিরের কাজ। তোমরা এই কুফরী কাজ করতে যেও না।

৩। মুমিনকে খুন করা মানুষকে কুফরীর দিকে আহবান করে। সুতরাং মুমিনকে খুন করো না।

৪। এখানে কুফরীর শাব্দিক অর্থ (অকৃতজ্ঞ) উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তোমরা খুন করে আল্লাহর অকৃতজ্ঞ বান্দা হয়ো না।

৫। كفارا অর্থ لا بسين السلاح অর্থাৎ অস্ত্রধারণ করো না। كفر শব্দটি অনেক সময় পরিহিত-ধারণ করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, কেউ লৌহবর্মের উপর কাপড় পরিধান করলে বলা হয়— كفر درعه

৬। لا يكفر بعضكم بعضا অর্থাৎ তোমরা একে অপরকে কাফির আখ্যায়িত করো না।

৭। এর অর্থ তোমরা সত্যি সত্যি কাফির হয়ো না, বরং মৃত্যু পর্যন্ত মুমিন থেকো।

৮। ধমকীর স্বরে এরূপ কঠোর কথা বলা হয়েছে।

باب صحة الاقرا بالقتل وتمكين ولى القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه

অধ্যায় ঃ হত্যার স্বীকারোক্তি, নিহতের অভিভাবককে কেসাস গ্রহণের সুযোগ দান এবং (হত্যাকারীর পক্ষ হয়ে) ক্ষমা প্রার্থনা প্রসঙ্গে

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ : اِنِّىْ لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُوْدُ اٰخَرَ بِنِسْعَةٍ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا قَتَلَ اَخِىْ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَقَتَلْتَهُ ؟ فَقَالَ : اِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ اَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ، قَالَ نَعَمْ، قَتَلْتَهُ ـ قَالَ كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟ قَالَ : كُنْتُ اَنَا وَهُوَ نَخْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ ،

فَسَبَّنِيْ فَاَغْضَبَنِيْ، فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلٰى قَرْنِهِ فَقَتَلْتُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ لَكَ مِنْ شَيْئٍ تُؤَدِّيْهِ عَنْ نَفْسِكَ ؟ قَالَ : مَا لِيْ مَالٌ اِلَّا كِسَائِيْ وَفَأْسِيْ قَالَ : فَتَرٰى قَوْمَكَ يَشْتَرُوْنَكَ ؟ قَالَ اَنَا اَهْوَنُ عَلٰى قَوْمِيْ مِنْ ذٰاكَ ـ فَرَمٰى اِلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ ، وَقَالَ دُوْنَكَ صَاحِبَكَ ، فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ، فَرَجَعَ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ بَلَغَنِيْ اَنَّكَ قُلْتَ : اِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ ، وَاَخَذْتُهُ بِاَمْرِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَمَا تُرِيْدُ اَنْ يَبُوْءَ بِاِثْمِكَ وَاِثْمِ صَاحِبِكَ؟ قَالَ : يَانَبِيَّ اللّٰهِ لَعَلَّهُ هٰذَا ؟ قَالَ : بَلٰى، قَالَ ؛ فَاِنَّ ذٰاكَ كَذَاكَ ، قَالَ : فَرَمٰى بِنِسْعَتِهِ، وَخَلّٰى سَبِيْلَهُ ـ

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) বর্ণনা করেন, একদা আমি হুযূর (সা.)-এর দরবারে বসেছিলাম। এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি উটের লাগামে বেঁধে এক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে আসে এবং উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, হে আল্লাহর রাসূল! এ লোক আমার ভাইকে খুন করেছে। হুযূর (সা.) গ্রেফতারকৃত লোকটিকে বললেন, তুমি কি সত্যি খুন করেছ?

এ সময় নিহতের অভিভাবকরা বলে উঠে সে যদি অস্বীকার করে তাহলে এর স্বপক্ষে আমরা দলীল পেশ করতে পারব।

কিন্তু হত্যাকারী নিজেই খুনের কথা স্বীকার করে বলে-আমি খুন করেছি। হুযূর (সা.) বললেন, কীভাবে খুন করেছ? সে বলল, আমি এবং নিহত ব্যক্তি লাঠি দিয়ে গাছের পাতা পাড়ছিলাম। এ মুহূর্তে সে আমাকে গালি দিয়ে বসে। আমি রাগান্বিত হয়ে তার মাথায় কুড়াল দিয়ে আঘাত করি এতে সে মারা যায়।

হুযূর (সা.) বললেন, তোমার কাছে এমন কিছু আছে কি যার দ্বারা দিয়্যাত পরিশোধ করবে? সে বলল, এই কুড়াল ও চাদরই আমার একমাত্র সম্পদ।

হুযূর (সা.) বললেন, তোমার কওমের লোকেরা তোমাকে টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিবে না? সে বলল, কওমের কাছে আমার কোন মূল্যই নেই! তারা আমাকে সাহায্য করতে আসবে না।

হুযূর (সা.) তখন রশিটি নিহতের অভিভাবকের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, একে নিয়ে যাও এবং ইচ্ছা হলে এর থেকে কেসাস আদায় করো। লোকটিকে নিয়ে চলে যাওয়ার সময় হুযূর (সা.) বললেন, যদি এরা তাকে হত্যা করে তাহলে এরা উভয়ে বরাবর হয়ে গেল। একথা শুনে তারা ফিরে এল এবং বলল হে আল্লাহর নবী! শুনলাম আপনি এরূপ বললেন, অথচ আপনার আদেশেই তো তাকে নিয়ে যাচ্ছি!

হুযূর (সা.) বললেন, তুমি কি চাও না যে, সে তার এবং তোমার ভাইয়ের গুনাহ বয়ে বেড়াক? সে বলল, ব্যাপারটা কি আসলেই এরূপ?

হুযূর (সা.) বললেন, অবশ্যই। লোকটি তখন বলল, তাহলে তাই হোক।

বর্ণনাকারী বলেন, একথা বলে লোকটি রশি ছেড়ে দিল এবং হত্যাকারীকে মুক্ত করে দিল।

হাদীস সংশ্লিষ্ট কিছু ব্যাখ্যা

هل لك من شئى تؤديه–এর ব্যাখ্যা

হুযূর (সা.) খুনীকে জিজ্ঞেস করেন, দিয়্যাত আদায় করার মত তোমার কাছে কিছু আছে কিনা? এটা আহনাফ ও মালেকীদের দলীল যে, ইচ্ছাকৃত হত্যার বদলায় দিয়্যাত আদায় করতে হলে খুনীর সন্তুষ্টি জরুরী। নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের নিজের তরফ থেকে দিয়্যাত চাপিয়ে দেয়ার অধিকার নেই। সুতরাং খুনী যদি দিয়্যাত দিতে রাজী না হয় তাহলে অভিভাবকরা কেসাস নিতে বাধ্য থাকবে। দিয়্যাত আদায় করতে পারবে না।

আর ইমাম শাফেঈ ও আহমদের মতে খুনীর সন্তুষ্টি জরুরী নয়। সন্তুষ্টি ছাড়াই অভিভাবকরা খুনীর উপর দিয়্যাত চাপিয়ে দিতে পারে। তাঁদের দলীল ঃ

(١) عَنْ اَبِىْ شُرَيْحِ الْكَعْبِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً فَاَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ اِنْ اَحَبُّوْا قَتَلُوْا وَاِنْ اَحَبُّوْا اَخَذُوا الْعَقْلَ . رواه الترمذى والشافعى

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, কোন ব্যক্তি কাউকে হত্যা করলে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের দু'টি অধিকার থাকবে। ১. ইচ্ছা করলে দিয়্যাত নিতে পারবে, ২. ইচ্ছা করলে কেসাস নিবে।

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ : مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظْرَيْنِ اِمَّا اَنْ يُفْدِىَ وَاِمَّا اَنْ يَقْتُلَ (مسلم) وَفِىْ رِوَايَةِ الْبُخَارِىْ - فَمَنْ قَتَلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظْرَيْنِ اِمَّا اَنْ يَعْقُلَ وَاِمَّا اَنْ يُقَادَ اَهْلَ الْقَتِيْلِ -

...অভিভাবকরা দু'টি অধিকার লাভ করবে। এক. কেসাস, দুই. দিয়্যাত। বুখারীর রেওয়ায়ায়েতও একই অর্থবোধক।

আহনাফ ও মালেকীগণ উল্লেখিত হাদীস ছাড়াও নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন।

(١) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى -

আলোচ্য আয়াতে ইচ্ছাকৃত হত্যার (قتل عمد) বেলায় শুধুমাত্র কেসাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যদি দিয়্যাত আবশ্যক হতো তাহলে অবশ্যই তা উল্লেখ করা হতো।

২। আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন— كتاب الله القصاص (بخارى)। এখানেও দিয়্যাতের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

৩। হযরত ইবনে আব্বাসের হাদীস ঃ হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন, العمد قود। ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি হলো কেসাস।

৪। ইমাম তাঊস (রহ.) নিজের কাছে সংরক্ষিত হাদীসের পাণ্ডুলিপি থেকে একটি হাদীস পাঠ করতেন— اذا اصطلحوا فى العمد فهو على ما اصطلحوا عليه। "ইচ্ছাকৃত হত্যার বদলায় যদি কোন কিছুর উপর সন্ধি হয় তাহলে সেটাই গ্রহণ করতে হবে।" এই রেওয়ায়াত দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় মাল (দিয়্যাত) লাভের জন্য সন্ধি জরুরী। আর এটা পরস্পরে সন্তুষ্টির ভিত্তিতেই হয়ে তাকে। সুতরাং একতরফা দিয়্যাত চাপানো যাবে না, যদি খুনী পক্ষ রাজী না হয়।

৫। আয়াতে বলা হয়েছে— ان النفس بالنفس। "প্রাণের বদলায় প্রাণ।"

আর এটা তো সুস্পষ্ট কথা যে, দিয়্যাত প্রাণের বরাবর নয়। সুতরাং খুনের আসল শাস্তি কেসাসই। হ্যাঁ, খুনী যদি মাল দিতে রাজী হয় তাহলে অভিভাবকরা তা গ্রহণ করতে পারবে।

ইমাম শাফেঈ ও আহমদের দলীলের জবাব

তাঁরা যেসব হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন সেসব ক্ষেত্রেও খুনীর সন্তুষ্টি থাকা ধরে নিতে হবে। তাহলেই অন্যান্য হাদীস ও আয়াতের সাথে এসব হাদীস খাপ খাবে।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

হানাফী ও মালেকী মাযহাব অনুযায়ী একটি প্রশ্ন জাগে যে, احياء نفس তথা প্রাণ বাঁচানো ওয়াজিব। সুতরাং এ উদ্দেশ্যে অভিভাবকরা যদি দিয়্যাত নিতে রাজী হয়ে যায় তাহলে খুনীর এতে একমত হওয়া ওয়াজিব।

জবাব ঃ যদি একথা মেনে নেয়া হয় তাহলে তো কেসাসের কোন অস্তিত্বই থাকবে না। কেননা, একথা অনুযায়ী খুনী যদি মাল (দিয়্যাত) দিতে রাজী হয়ে যায় তাহলে অভিভাবকদেরও এটা মেনে নেয়া ওয়াজিব হবে এবং কেসাসের দাবি ছাড়তে বাধ্য থাকবে। এই যদি হয় তাহলে কেসাসের হুকুমের মূল্য থাকল কোথায়? তাছাড়া এই বক্তব্য অনুযায়ী অভিভাবকরা যদি খুনীর কাছে ঘরবাড়ি, ভূসম্পত্তি এবং স্থাবর, অস্থাবর সব সম্পত্তির দাবি করে তাহলে খুনী তা মেনে নিতে বাধ্য থাকবে। কেননা তার তো জান বাঁচানো ওয়াজিব। অথচ এই ইমামগণও দিয়্যাতের নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশি দাবি করা হলে এই দাবি মেনে নেয়া খুনীর জন্য ওয়াজিব নয় বলে মনে করেন। সুতরাং পরিমাণের বেশি দাবি পূরণ করা যেমন ওয়াজিব নয়—ঠিক তদ্রূপ দিয়্যাতের দাবি পূরণ করাও ওয়াজিব নয়। —আহকামুল কুরআন খণ্ড ১ ঃ পৃষ্ঠা ১৫৬

একথা তো আমরাও মানি যে, অভিভাবকরা যদি কেসাসের দাবি ছেড়ে দিয়্যাত নিতে রাজী হয়ে যায় এবং এই পরিমাণ মাল দেয়া খুনীর জন্য সম্ভবও হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে দাবি মেনে নেয়া উচিত। কিন্তু এটাকে আমরা ফয়সালা হিসেবে (قضاء) ওয়াজিব বলে মেনে নিতে পারি না এবং হাদীসে এর স্বপক্ষে কোন দলীল আছে বলে মনে করি না। —ই'লাউস্ সুনান খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ৭৭

ان قتله فهو مثله–এর ব্যাখ্যা

খুনীকে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের হাতে সোপর্দ করে রাসূল (সা.) একথাটি বলেন যে, অভিভাবকরা একে হত্যা করলে এর মতই (আচরণ) হলো। এর দ্বারা বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় কেসাস স্বরূপ হত্যা করলেও অভিবাকরা দোষী হবে। এজন্য আলিমগণ এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। যথা ঃ

১। ইমাম নববী (রহ.) বলেন, এর ব্যাখ্যা হলো ঃ উভয়ে এ ব্যাপারে বরাবর হয়ে গেল যে, কারো উপর কারো ইহসান থাকল না। পক্ষান্তরে খুনীকে যদি মাফ করা হতো তাহলে তার উপর বড় অনুগ্রহ করা হতো এবং এর বদলায় কেয়ামতের দিন অনেক সওয়াব পাওয়া যেত, আর সেই সাথে দুনিয়ায় অনেক প্রশংসা কুড়াত।

২। ইমাম নববী (রহ.) এ ব্যাখ্যাও করেছেন যে, কতল করার ব্যাপারে উভয়ে বরাবর হয়ে গেল। গুনাহ কার হলো না হলো সেটা ভিন্ন কথা। ক্রোধ এবং প্রতিশোধ পরায়ণের দিক দিয়ে উভয়েই তো সমান হলো।

কিন্তু ইমাম নববীর এই ব্যাখ্যা দু'টি সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কেননা আবূ দাউদে আবূ হুরাইরাহ (রা.)-এর হাদীসে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, হত্যাকারী রাসূল (সা.)-কে বলে আমার হত্যা করার ইচ্ছা ছিল না। একথা শুনে রাসূল (সা.) বলেন— اما اه ان كان صادقا ثم قتلته دخلت النار .

হাদীসের শেষের বাক্যটুকু (ثم قتلته دخلت النار) ইমাম নববীর (রহ.) ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা এখানে অভিভাবকদের জাহান্নামে প্রবেশের কথা বলা হয়েছে।

সুতরাং এর সহীহ্ ব্যাখ্যা হলো, হত্যাকারী যেমনিভাবে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে তুমিও তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে। কেননা তার হত্যা করার ইচ্ছা ছিল না। বিধায় সে মাফ পাওয়ার যোগ্য। উল্লেখ্য যে, কেউ যদি ইচ্ছাকৃত হত্যা করার কথা অস্বীকার করে এবং এই দাবিতে সে সত্যবাদী বলে প্রতিপন্ন হয় তাহলে তাকে হত্যা করা উচিত হবে না। সুতরাং যাকে হত্যা করা উচিত নয় তাকে হত্যা করা আর খুনী কর্তৃক নিরাপরাধ ব্যক্তিকে খুন করা প্রায় একই কথা। এ কারণে রাসূল (সা.) বলেছেন, ان قتله فهو مثله।

—ই'লাউস্ সুনান খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ৭৮

উক্ত কিতাবে একথাও বলা হয়েছে যে, ইমাম নববী (রহ.)সহ অন্যান্য আলিমগণ এ ধরনের ব্যাখ্যা করেছেন ধারণা বশীভূত হয়ে। কেননা তাঁরা ধারণা করেছেন যে, হত্যাকারী হয়ত ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করার কথা স্বীকার করেছে। অথচ আবূ দাউদে সুস্পষ্টভাবে একথা বলা হয়েছে যে, হত্যাকারী ইচ্ছাকৃত হত্যার কথা অস্বীকার করেছে। এই ভুল ধারণার কারণেই তাঁরা সঠিক ব্যাখ্যা সম্বলিত রাসূলের এই মন্তব্য اما انه ان كان صادقا ثم قتلته دخلت النار।-এর দিকে খেয়াল দেননি। —ই'লাউস সুনান খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ৭৮

একটি সন্দেহের নিরসন

আবূ দাউদের এই রেওয়ায়াত اما انه ان كان صادقا الخ-এর উপর একটি প্রশ্ন জাগে যে, হত্যাকারী قتل عمد (ইচ্ছাকৃতভাবে) হত্যা করার কথা অস্বীকার করলেই সেটাকে মেনে নেয়া জরুরী নয়। হতে পারে অভিভাবকরা এই দাবি প্রত্যাখ্যান করবে এবং খুনীকে কেসাস স্বরূপ হত্যা করবে। এক্ষেত্রে তো অভিভাবকরা গুনাহগারও হবে না এবং তারা জাহান্নামীও হওয়ার কথা নয়। এর সমাধান কী?

এ সমাধানে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়।

১। কেউ কেউ বলেন, রাসূল (সা.) মূলতঃ فهو مثله-ই বলেছিলেন। কিন্তু কোন রাবী হয়ত روايت بالمعنى (হাদীসের ভাবার্থ) করতে গিয়ে دخلت النار শব্দ বৃদ্ধি করেছেন। সুতরাং এটা উপস্থাপনগত ত্রুটি।

২। যদি এটা রাসূল (সা.)-এর বক্তব্যই হয়ে থাকে তাহলে এর অর্থ হবে, "যদি হত্যাকারী তার দাবিতে সত্যবাদী হয় এরপরও তোমরা তাকে হত্যা করো তাহলে তোমরা এমন একটা কাজ করলে যা জাহান্নামে প্রবেশের কারণ, যদিও অন্য কারণে জাহান্নামে যাবে না।" আর সেই কারণটি হলো, খুনীর দাবি সত্যায়ন করা অভিভাবকের জন্য ওয়াজিব নয়। কেননা তার দাবি বাস্তবতার বিপরীত। যদি এই কারণ না থাকত তাহলে তোমরা অবশ্যই জাহান্নামী হতে।

—ই'লাউস্ সুনান খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ৭৯

القاتل والمقتول فى النار-এর ব্যাখ্যা

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হজরের (রা.) অন্য এক রেওয়ায়াতে ان قتله فهو مثله-এর পরিবর্তে القاتل والمقتول فى النار বাক্য উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় হত্যাকারী এবং কেসাস গ্রহণকারী উভয়েই জাহান্নামী হবে। অথচ অভিভাবকরা এক্ষেত্রে নিজেদের হক আদায় করেছে মাত্র! এ জন্য আলিমগণ এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

১। قاتل তথা কেসাস গ্রহণকারীরা জাহান্নামে যাওয়ার যোগ্য যদি খুনী ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত হত্যার কথা অস্বীকার করে। যদিও সে অন্য কারণে জাহান্নামে যাওয়া থেকে বেঁচে যাবে। আর مقتول তথা খুনী ব্যক্তি জাহান্নামী হবে যদি সে মিথ্যা দাবি করে।

২। সম্ভবতঃ রাসূল (সা.) শুধুমাত্র ان قتله فهو مثله বলেছিলেন কিন্তু কোন রাবী روايت بالمعنى করতে গিয়ে القاتل والمقتول فى النار বলে ফেলেছেন। —মু'তাসির পৃষ্ঠা ৩০৩

৩। আল্লামা মাযুরী (রহ.) বলেছেন, নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের জাহান্নামী হওয়াটা কেসাস গ্রহণ করার কারণে নয়, অন্য কোন কারণে যা রাসূল (সা.) জানতেন। অথবা রাসূল (সা.)-কে অসন্তুষ্ট করায় তারা জাহান্নামী হবে।

৪। ইমাম নববী (রহ.) বলেন, এই ঘটনার قاتل ও مقتول উদ্দেশ্য নয়। বরং যারা গোত্রীয় উম্মাদনায় পরস্পরে হত্যা করে তাদের বেলায় হাদীসটি প্রযোজ্য। রাসূল (সা.) এদেরকে সতর্ক করার জন্য হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যাতে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয় এবং খুনীকে মাফ করে দেয়।

কিন্তু নববীর এই ব্যাখ্যা প্রমাণ নির্ভর নয়। اعلاء السنن প্রণেতা একে সুস্পষ্ট ভ্রান্ত ব্যাখ্যা বলে অভিহিত করেছেন।—ই'লাউস্ সুনান খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ৭৯

ফায়েদা ঃ হাদীস গবেষণা করে যতটুকু জানা যায়, তাহলো–রাসূল (সা.) এই বাক্যগুলো বলেছিলেন মূলতঃ অভিভাবকদেরকে কেসাস থেকে নিবৃত রাখার জন্য। আরবীতে এ ধরনের বাক্য প্রয়োগকে تعريض ও تورية বলে। সামগ্রিক কোন কল্যাণ থাকলে এ ধরনের তাওরিয়া করা যায়। ইমাম নববী (রহ.) বলেছেন, মুফতী সাহেব যদি কল্যাণকর মনে করে তাহলে ফতওয়া তলবকারীর সাথে তাওরীয়া করা যায়। যেমন, কেউ হত্যা করার পরামর্শ চাইলে বলবে ইবনে আব্বাসের সনদে বর্ণিত হয়েছে— لا توبة للقاتل হত্যাকারীর তওবা নেই এবং রোযার দিনে গীবতকারীকে বলবে الغيبة تفطر الصائم গীবত রোযাদারের রোযা ভেঙে ফেলে।

এরূপ বলায় মিথ্যা বলা থেকে বেঁচে থাকা গেল সেই সাথে উদ্দেশ্যও পূরণ হলো।

اما تريد ان يبوء باثمك واثم صاحبك؟–এর ব্যাখ্য

ইমাম নববী (রহ.)-এর ভাষ্যমতে বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে।

১। তুমি কি চাওনা যে, হত্যাকারীকে ক্ষমার বদলায় তোমার এবং তোমার নিহত ভাইয়ের গুনাহ ক্ষমা করা হোক? এক্ষেত্রে গুনাহ বলতে আগের পুরাতন গুনাহ উদ্দেশ্য। হত্যাকারীর সাথে এই গুনাহর কোন যোগ্যসূত্র নেই।

২। তুমি কি চাও না যে, তোমার ভাইকে কতল করার এবং এ কারণে তোমার যে কষ্ট হয়েছে এই দ্বিমুখী গুনাহ বহন করুক আর তোমরা দু'জন মাফ পেয়ে যাও?

তুমি যদি কেসাস গ্রহণ করো তাহলে তো তার আখেরাতের শাস্তির সাথে দুনিয়ারও শাস্তি বাড়িয়ে দিলে। এর চেয়ে দুনিয়ার শাস্তিটা তাকে ক্ষমা করে দাও।

একটি মাসআলা

শাফেঈর মতে, হদ, কেসাস গুনার কাফ্ফারা স্বরূপ। হদ ও কেসাস কার্যকর করার পর ঐ ব্যক্তি কেয়ামতের দিন এই অপরাদের জন্য শাস্তির সম্মুখীন হবে না। আমাদের বর্ণিত দ্বিতীয় অর্থটি (আখেরাতে পাকড়াও হবে—তাঁদের মাযহাবের অনুকূলে নয় বলে ইমাম নবী (রহ.) এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন-এটা এই ব্যক্তির জন্য খাস। রাসূল (সা.) ওহীর মাধ্যমে তা জানতে পেরেছিলেন।

পক্ষান্তরে আহনাফের মতে হদ, কেসাস গুনাহের কাফ্ফারা নয়। সুতরাং এই অর্থ ঐ লোকটির জন্য খাস নয়, সকলের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য।

باب دية الجنين ووجو ب الدية فى قتل الخطاء وشبه العمد على قاتلة الجانى

অধ্যায় ঃ গর্ভস্থ বাচ্চার দিয়্যাত এবং ভুলক্রমে ও অনিচ্ছাকৃত হত্যার বদলায় দিয়্যাত ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে

(١) عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى فَطَرَحَتْ جَنِيْنَهَا، فَقَضٰى فِيْهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ ـ

(٢) عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ : قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ جَنِيْنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِىْ لَحْيَانَ، سَقَطَ مَيْتًا، بِغُرَّةٍ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ، ثُمَّ اَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِىْ قَضٰى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ ، فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَنَّ مِيْرَاثَهَا لِبَنِيْهَا

وَزَوْجَهَا وَاَنَّ الْعَقْلَ عَلٰى عَصَبَتِهَا ، وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ .... فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِىُّ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لكَيْفَ اَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا اَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذٰلِكَ يُطَلُّ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّمَا هٰذَا مِنْ اِخْوَانِ الْكُهَّانِ ، مِنْ اَجْلِ سَجَعِهِ الَّذِىْ سَجَعَ .

১। আবূ সালামা হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হুযাইল কবীলায় দুইজন মহিলা ছিল। এদের একজন অপরজনকে আঘাত করে যার ফলে আঘাত প্রাপ্তা মহিলার পেটের বাচ্চা বের হয়ে যায়।

হুযূর (সা.)-এর ফয়সালায় গুররা-এক গোলাম অথবা বাঁদী আদায়ের আদেশ দেন।

২। আবূ হুরাইরার (রা.) অন্য রেওয়ায়াতে আছে, হুযূর (সা.) কবীলায়ে বনী লেহইয়ানের এক মহিলার ব্যাপারে এই ফয়সালা করেন। এরপর আঘাতকারী মহিলা মারা যায়। রাসূল (সা.) তখন দ্বিতীয় আরেকটি ফয়সালা দেন এবং বলেন মৃত এই মহিলার মীরাছ পাবে তার সন্তান এবং স্বামী আর দিয়্যাত আদায় করবে 'আসাবা'রা।

এই ফয়সালা শুনে হাম্‌ল ইবনে নাবেগা হুযালী বলে উঠেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যে বাচ্চা খায় নেই, কথা বলে নেই এবং চিৎকারও করেনি। তার জন্য আবার দিয়্যাত আদায় করতে হবে? এ ধরনের হত্যাকাণ্ড তো ক্ষমার যোগ্য।

রাসূল (সা.) লোকটির ছন্দময় এসব বাক্য শুনে বললেন, লোকটাকে গণকের ভাই বলে মনে হচ্ছে!

হাদীস সংশ্লিষ্ট কিছু আলোচনা এবং ব্যাখ্যা

ان امرأتين من هذيل -এর ব্যাখ্যা

এই হাদীসে হুযাইল কবীলা ও অপর হাদীসে বনী লেহইয়ান কবীলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মূলতঃ এ দু'য়ের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। কেননা লেহইয়ান হুযাইলেরই এক শাখা গোত্র। একজন ছিল হুযাইলীর অপরজন লেহইয়ানের। এরা পরস্পরে সতীন ছিল। একজনের নাম মুলাইকা অপরজনের নাম উম্মে গুতাইফ। তাদের স্বামীর নাম ছিল হামল ইবনে মালেক ইবনে নাবেগা।

رمت احدهما الاخرى فطرحت جنينها-এর ব্যাখ্যা

এই রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে—فرمت احدهما الاخرى একজন অপরজনের প্রতি (কিছু একটা) নিক্ষেপ করে।"

অন্য রেওয়ায়াতে আছে, فرمت احدهما الاخرى بحجر পাথর নিক্ষেপ করে। মুগীরা ইবনে শো'বার রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, ان امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط এক মহিলা তার সতীনকে তাঁবুর খুঁটি দিয়ে হত্যা করে।" আবূ দাউদে হাম্‌ল ইবনে মালেকের রেওয়ায়াতে এসেছে فضربت احدهما الاخرى بمسطح ... পিঁড়ি দিয়ে আঘাত করে" বুরাইদার রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে-ان امرأة خذفت امرأة اخرى "এক মহিলা অপর মহিলার প্রতি পাথর ছুঁড়ে মারে"। দেখা যাচ্ছে রেওয়ায়াতগুলো পরস্পরে বিরোধপূর্ণ। এর জবাবে বলা হয়ে থাকে যে, সম্ভবত ঐ মহিলা আঘাত করতে গিয়ে ঐ সবগুলো বস্তুই (পাথর, খুঁটি, পিঁড়ি) ব্যবহার করেছিল। এজন্য রেওয়ায়াতসমূহে একেকটার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা বলা যায় এর মধ্যে এক রেওয়ায়াত সহীহ্‌, বাকীগুলোতে রাবীকর্তৃক সন্দেহ (وهم) হয়েছে। আর এ ধরনের وهم (সন্দেহ) হাদীসের মূলে কোন সমস্যা করে না।

الجنين বলা হয় গর্ভে থাকাকালীন বাচ্চাকে। এ নামকরণের কারণ হলো, এ مادة-এর মধ্যে লুকায়িত হওয়ার অর্থ বিদ্যমান আছে। আর গর্ভে থাকা অবস্থায় যেহেতু বাচ্চা লুকায়িত থাকে তাই তাকে جنين বলা হয়। (حمل المرأة مادام فى بطنها)। যদি জীবিত বের হয়ে আসে তাহলে একে ولد এবং মৃত বের হয়ে আসলে سقط বলে। কখনো মৃত ভূমিষ্ট হওয়া বাচ্চাকে جنين ও বলা হয়। আল্লামা রাযী (রহ.)-এর মতে মেয়ে যে বাচ্চা জন্ম দেয় তাকে جنين বলে চাই সে বাচ্চা ছেলে হোক বা মেয়ে হোক। তবে শর্ত হলো, আওয়াজ না দেয়া।

আল্লামা রাযী (রহ.) মুয়াত্তার ব্যাখ্যা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, جنين বলা হয়, মহিলার গর্ভপাত সন্তানকে, যাকে ولد বলা হয়। চাই ছেলে হোক বা মেয়ে।

—ফতহুল বারী

فقضى فيه النبى بغرة عبد اوامة-এর ব্যাখ্যা

غرة বলা হয় ঘোড়ার কপালের শুভ্র রেখাকে। উত্তম-উম্‌দা'র অর্থেও এটি ব্যবহৃত হয়। আর গোলাম-বাঁদী যেহেতু উত্তম মাল এজন্য এদেরকে غرة বলা হয়।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, غرة শব্দটি উত্তম কোন কিছু বুঝানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়। মানুষ হোক বা অন্য কিছু। পুরুষ হোক বা মেয়ে। কেউ কেউ বলেন, মানুষের বেলায় এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কেননা মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী। আল্লামা নববী (রহ.) বলেন, আরববাসী উত্তম কিছু বুঝাতে শব্দটি প্রয়োগ করে থাকে। এখানে অবশ্য মানুষের অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা মানুষকেই আল্লাহ তা'আলা সর্বোত্তম করে সৃষ্টি করেছেন।

بغرة عبد او امة-এর তারকীব

عبد এবং امة শব্দদ্বয়কে غرة-এর সাথে اضافت (সম্বন্ধযুক্ত) করে পড়া যায়। তবে এই اضافت টি اضافت بيانية বর্ণনাসূচক اضافت ।

এমনিভাবে غرة শব্দকে তানভীনের সাথেও পড়া যায়। এ সময় عبد এবং امة শব্দ দু'টি غرة-এর বদল (পরিবর্তিত রূপ) হিসেবে গণ্য হবে। অথবা এ দু'টি مبتدا-এর خبر বলে ধর্তব্য হবে। হাদীসে غرة (শুভ্ররেখা) শব্দ উল্লেখ থাকায় কেউ কেউ [আবূ আমর (রা.)] বলেছেন, গর্ভস্থ বাচ্চার দিয়্যাত সাদা গোলাম বা সাদা বাঁদী হতে হবে।

কিন্তু জমহুর বলেন, হাদীসে রঙের কথা বলা হয়নি। যে কোন রঙের গোলাম-বাঁদী যথেষ্ট। হাদীসের সুস্পষ্ট অর্থ পরিহার করে غرة শব্দের আভিধানিক অর্থ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন নেই।

হাদীসের ব্যাখ্যাকারীগণ এ ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন যে, غرة শব্দের ব্যাখ্যায় যে عبد এবং امة শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে এটা কার কথা? হুযূর (সা.)-এর না-কি কোন রাবীর কথা এটি? কিন্তু প্রনিধানযোগ্য কথা হলো, এটি রাসূল (সা.)-এর কথা এবং তাঁরই প্রদত্ত غرة শব্দের ব্যাখ্যা। কেননা আটজন সাহাবা এই হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং প্রত্যেকের হাদীসে এই তাফসীর অংশ উল্লেখ রয়েছে। এতগুলো সাহাবীর নিজেদের পক্ষ থেকে একই তাফসীর করা অসম্ভব বলেই মনে হয়। সুতরাং এটি হুযূর (সা.)-এরই ব্যাখ্যা।

কতক রেওয়ায়াতে আবার بـغـل او فـرس শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। আবূ দাউদের এক রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে—

قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ اَوْ فَرَسٍ اَوْ بِغَلٍ ـ

কিন্তু এই বাড়তি অংশটুকু সহীহ্‌হ নয়। কেননা হাদীসটি অনেক সনদে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু কোন সনদেই بـغـل او فـرس উল্লেখ নেই। শুধুমাত্র ঈসা ইবনে ইউনুস এরূপ উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা ইবনে কুদামা (রা.) মুগনী (খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৫৪০) এ এরূপ অর্থ সম্বলিত একটি ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। সেখানে নযর দেয়া যেতে পারে। তাছাড়া او فـرس শব্দটি সম্ভবতঃ ইমাম তাউসের কথা। যা তিনি غـرة-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন। সুনানে বাইহাকীতে উল্লেখ করা হয়েছে—

فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْجَنِيْنِ غُرَّةً وقال طاؤس : الفرس غرة ـ

আল্লামা তাউস (রহ.) বলেন, الـفـرس (ঘোড়াকে) غـرة বলে। সারকথা হলো, সহীহ্ হাদীসে শুধুমাত্র امـة او عـبـد-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে او فـرس او بـغـل অংশ সম্বলিত হাদীসটি সহীহ্ নয়।

এই দিয়্যাতের পরিমাণ

যদি জীবিত অবস্থায় বাচ্চা (جـنـيـن) গর্ভপাত হয় তাহলে ইমামগণের সর্বসম্মতি রায় হলো, এক্ষেত্রে পুরো দিয়্যাত ওয়াজিব হবে। আর মৃত হলে একটি গোলাম বা বাঁদী দিতে হবে। এমনিভাবে সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, غـرة-এর মূল্য হতে হবে نـصـف عـشـر الـديـة তথা পূর্ণ দিয়্যাতের বিশভাগের একভাগ। পূর্ণ দিয়্যাত যেহেতু একশত উট এজন্য এর সংখ্যা হলো ৫টি উট। আর স্বর্ণ দিলে দিতে হবে ৫০ দীনার। কেননা স্বর্ণের পূর্ণ দিয়্যাত ১০০০ (একহাজার) দীনার। এটা ইমাম নখয়ী, শা'বী, রবী'আ, কাতাদা, মালিক, শাফিঈ, আহমদ, ইসহাক প্রমুখ ওলামায়ে কিরামের অভিমত। হযরত উমর (রা.) ও যায়েদ (রা.) থেকে এ কথাটি বর্ণিত আছে। আল্লামা ইবনে কুদামা মুগনী কিতাবে তা উল্লেখ করেছেন। তবে রৌপ্য মুদ্রায় غـرة-এর মূল্য কত এ ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে।

আহনাফের মতে পূর্ণ দিয়্যাত যেহেতু দশ হাজার দিরহাম এজন্য غرة-এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৫ শত দিরহাম। আর শাফেঈ ও আহমদের মতে পূর্ণ দিয়্যাত বার হাজার দিরহাম। সুতরাং غرة-এর পরিমাণ ছয়শত দিরহাম।

দিরহামের ব্যাপারে এই মতবিরোধ মূলতঃ কোন মত বিরোধই নয়। কেননা দিরহাম ছিল দুই ধরনের। এক. ছোট, দুই. বড়। প্রথম অবস্থায় যে দিরহাম ছিল সেটি ছিল পরিমাণে ছোট, ছয় মিছকালের সমান। পরবর্তীতে এর পরিমাণ বাড়িয়ে সাত মিছকাল করা হয়। ছয় মিছকাল পরিমাণ (দিরহাম) কে وزن ستة এবং সাত মিছকালকে وزن سبعة বলে। وزن ستة-এর বার হাজার এবং وزن سبعة-এর দশ হাজার দিরহাম পরিমাণে সমান। সুতরাং ইমামদের মতে মৌলিক কোন মতভেদ নেই।

দিয়্যাতের উল্লেখিত পরিমাণ বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন—

১। তাবরানী শরীফের এক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে—

فِيْهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ اَوْ اَمَةٌ اَوْخَمْسُمِائَةٍ اَوْ فَرَسٍ اَوْ عِشْرُوْنَ وَمِاْةُ شَاةٍ .

"এতে একটি গোলাম, অথবা একটি বাঁদী, অথবা পাঁচশত দিরহাম, কিংবা একটি ঘোড়া বা একশত বিশটি ছাগল।

এই রেওয়ায়াতে ঘোড়ার কথা এসেছে কোন রাবীর অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি (وهم) এর কারণে। আর একশত বিশ বকরীর কথা বলা হয়েছে সম্ভবতঃ এর মূল্য পাঁচশত দিরহামের হিসাবে।

(٢) اَخْرَجَ الْبَزَّارُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ امْرَأَةً خَذَفَتْ امْرَأَةً فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِخَمْسِمِاْةٍ وَنَهٰى عَنِ الْخَذَفِ .

"...রাসূল (সা.) পাঁচশত দিরহামের ফয়সালা দেন এবং কারো প্রতি পাথর ছুঁড়তে বারণ করেন।

(٣) عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَوَّمَ الْغُرَّةَ خَمْسِيْنَ دِرْهَمًا .

"ওমর (রা.) غرة এর পরিমাণ নির্ধারণ করেন পাঁচশত দিরহাম।

—মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা (রহ.)

(٤) عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِيِّ قَالَ : اَلْغُرَّةُ خَمْسُمَاْةٍ يَعْنِى دِرْهَمًا - ابوداؤد

ইবরাহীম নখয়ী (রহ.) বলেন, غرة হলো ৫০০ দিরহাম। —আবূ দাঊদ

(٥) رَوَىْ اِبْرَاهِيْمُ الْحَرْبِىُّ فِىْ كِتَابِ غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ عَنْ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : اَلْغُرَّةُ خَمْسُوْنَ دِيْنَارٌ ، مرقاة

غرة হলো ৫০০ দীনার। —মিরকাত

ফায়েদা ঃ ১। মহিলার উপর হামলা করায় যদি তা জীবিত বাচ্চা জন্মে মারা যায় তাহলে সকল ইমামের ঐক্যমতে এক্ষেত্রে দিয়্যাত ওয়াজিব হবে। তবে জীবিত জন্মেছে কি-না এ ব্যাপারে অস্পষ্টতা দেখা দিলে— ائمة ثلاثة-এর মতে জন্মের পর যদি চিৎকার করে তাহলে বুঝতে হবে সে জীবিত। নড়াচড়াকে জীবিত থাকার আলামত ধরা যাবে না।

আর আহনাফের মতে যা কিছুই বেঁচে থাকার আলামত তা পাওয়া গেলে জীবিত ধরতে হবে। চিৎকার বা ক্রন্দন করার সাথে জীবিত থাকার আলামত সীমাবদ্ধ নয়। যেমন ঃ ক্রন্দন করা, দুধপান করা, শ্বাস নেয়া ইত্যাদি।

ائمة ثلاثة। নিজেদের মতের স্বপক্ষে প্রসিদ্ধ ঐ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন যাতে মীরাছ পাওয়া এবং জানাযা নামায পড়া জায়িয হওয়ার জন্য চিৎকার করার শর্ত করা হয়েছে। যথা ঃ

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ الصَّبِىَّ لاَ يَرِثُ وَلاَ يُوْرَثُ وَلاَ يُصَلَّى حَتَّى يَسْتَهِلَّ ـ

"শিশু বাচ্চা ওয়ারিশ হবে না এবং অন্য কাউকে ওয়ারিশ বানাবে না যে যাবত না সে ক্রন্দন করে।

আহনাফ বলেন, ক্রন্দন করা যেমনিভাবে জীবিত থাকার আলামত তেমনিভাবে বর্ণিত বিষয়গুলোও জীবিত থাকার আলামত। তবে বাচ্চা জন্মগ্রহণ করার পর যেহেতু অধিকাংশ সময় ক্রন্দন করে থাকে এজন্য হাদীসে ক্রন্দন করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা অন্যান্য আলামতগুলোকে পরিহার করার কথা বলা হয়নি। তবে এ ব্যাপারেও মতবিরোধ আছে যে, ছয় মাসের কম বয়সে জন্ম নিলে এতে কিছু ওয়াজিব হবে কি-না।

আহনাফের মতে গুররা (غرة) এবং শাফেঈর মতে দিয়্যাত ওয়াজিব হবে।

২। বাচ্চা মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ট হওয়ার পর (বাচ্চার) মা মারা গেলে বাচ্চার কারণে غرة এবং মায়ের কারণে দিয়্যাত ওয়াজিব হবে।

যদি আঘাতের কারণে বাচ্চা জীবিত অবস্থায় জন্ম নিয়ে মারা যায় অতঃপর বাচ্চার মা মারা যায় তাহলে আলাদা আলাদা দু'টি দিয়্যাত ওয়াজিব হবে।

এমনিভাবে যদি আগে মা মারা যায় অতঃপর জীবিত বাচ্চা ভূমিষ্ট হয়ে মারা যায় তাহলেও আলাদা আলাদা দু'টি দিয়্যাত ওয়াজিব হবে। —মিরকাত খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৮৯

তবে আঘাত করার কারণে যদি মা মারা যায় অতঃপর মৃত বাচ্চা পয়দা হয় তাহলে এর হুকুম কী হবে এ ব্যাপারে আলিমগণ দ্বিমত পোষণ করেছেন।

ইমাম শাফেঈ ও আহমদের মতে মা মারা যাওয়ার কারণে দিয়্যাত এবং বাচ্চা মারা যাওয়ার কারণে غـرة (গোলাম বা বাঁদী) ওয়াজিব হবে। কেননা বাহ্যিকভাবে এ কথাই বুঝা যায় যে, যে আঘাতের কারণে মা মারা গেছে বাচ্চাও সেই আঘাতের কারণেই মারা গেছে। ইমাম আবূ হানীফা ও মালেকের মতে বাচ্চা মারা যাওয়ার কারণে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা এতে সন্দেহ আছে যে, ঐ আঘাতে মারা গেছে নাকি মা মারা যাওয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছে। সুতরাং সন্দেহ থাকার দরুন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। এক্ষেত্রে বাচ্চাকে মায়ের অন্যান্য অঙ্গের মত একটি অঙ্গ মনে করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে تـعـزيـر তথা প্রশাসনিক শাস্তি কার্যকর হবে।—মুগনী, ই'লাউস্ সুনান

৩। আঘাত করার কারণে যদি কোন মহিলার একাধিক (গর্ভস্থ) বাচ্চা মারা যায় তাহলে প্রত্যেক বাচ্চার বদলায় আলাদা আলাদা غـرة (গোলাম-বাঁদী) ওয়াজিব হবে। আর সবাই জীবিত জন্মে পরে মারা গেলে প্রত্যেকের বদলায় দিয়্যাত ওয়াজিব হবে।

৪। আঘাতকারীর উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব কি-না?

বাচ্চা যদি জীবিত ভূমিষ্ট হয়ে পরে মারা যায় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে দিয়্যাতের সাথে সাথে আঘাতকারীর উপর কাফ্ফারাও ওয়াজিব হবে। আর মৃত ভূমিষ্ট হলে আহনাফ ও মালেকের মতে শুধুমাত্র গোলাম-বাঁদী (غـرة) ওয়াজিব হবে। কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না, তবে কাফ্ফারা দেয়া মুস্তাহাব। আর শাফেঈ ও আহমদের মতে এক্ষেত্রে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

প্রথম মাযহাব অনুসারীগণ বলেন, হুযূর (সা.) শুধু মাত্র غـرة (গোলাম বা বাঁদী) ওয়াজিব করেছেন, দিয়্যাত ওয়াজিব হলে অবশ্যই তা বলে দিতেন। দ্বিতীয় মাযহাব অনুসারীগণ দলীল হিসেবে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো পেশ করেন।

(١) وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ـ

কেউ যদি ভুলক্রমে মুমিনকে হত্যা করে তাহলে একজন গোলাম বা বাঁদী আযাদ করতে হবে।"

(٢) فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِهٖ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ـ

প্রথম মাযহাবপন্থীরা বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কাফ্ফারা ওয়াজিব করেছেন দিয়্যাতের সাথে। সুতরাং যেখানে দিয়্যাত ওয়াজিব হবে সেখানে কাফ্ফারা ওয়াজিব। আর غرة দিয়্যাত নয়। সুতরাং উল্লেখিত আয়াত দ্বারা غرة-এর সাথে কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত নয়। —বাদায়ে, দুররে মুখতার, মুগনী

ثم ان المرأة التى قضى عليها بالغرة توفيت-এর ব্যাখ্যা ঃ

হাদীসের এই অংশ দ্বারা বুঝা যায় আঘাতকারী ঐ মহিলা মারা গিয়েছিল। অথচ অন্যান্য রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় বাচ্চার মাকেও সেই হত্যা করেছিল। রেওয়ায়াতটি এমন فقتلها وما فى بطنها অতএব আঘাতকারিণী নয় বরং আঘাতপ্রাপ্তা মহিলা মারা যায়।

কাজী ইয়ায ও ইমাম নববী (রহ.)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, قضى عليها বাক্যের عليها-এর অর্থ لها অর্থাৎ যে মহিলার পক্ষে ফয়সালা দেয়া হয়েছিল সে মারা যায়। আর সে আঘাতকারিণী নয় বরং আঘাতপ্রাপ্তা। এভাবে সকল রেওয়ায়াত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যায়। অবশ্য এ অর্থেরও সম্ভাবনা আছে যে, সতীন মারা যাওয়ার পর সে নিজেও মারা যায়।

আর এটা জরুরী নয় যে, আঘাতপ্রাপ্তার মৃত্যু আর غرة-এর ফয়সালার সাথে সাথে ঐ মহিলারও মৃত্যু ঘটেছে।

বরং এই অর্থের সম্ভাবনা আছে যে পরবর্তীতে যখন আঘাতকারী মহিলা মারা যায় তখন তার অভিভাবকরা মীরাছের দাবি করে এবং বলে যেহেতু আমরা দিয়্যাত আদায় করেছি সুতরাং আমরাই মীরাছের দাবিদার।

তাদের পক্ষ থেকে এই দাবি উঠার পর রাসূল (সা.) বলে দেন, মীরাছ পাবে শুধুমাত্র ওয়ারিশরা (সন্তান-স্বামী)। যদিও দিয়্যাত আদায় করেছে পুরো অভিভাবকরা (عاقلة)।

হযরত মাওলানা আহমদ আলী সাহারান পুরী (রহ.) এই ব্যাখ্যার প্রতি ইশারা করেছেন। —বযলুল মাযহুদ খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৮৪

وان العقل على عصبتها-এর ব্যাখ্যা

এক রেওয়ায়াত এরূপ। অন্য রেওয়ায়াতে আছে, وقضى ان دية المرأة على عاقلتها এসব রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় রাসূল (সা.) আঘাতপ্রাপ্ত মহিলা মারা গেলে আঘাতকারিণীর عاقلة (অভিভাবকের) উপর দিয়্যাত ওয়াজিব করে দেন। রাসূল (সা.) এই হত্যাকাণ্ডকে شبه عمد (অনিচ্ছাকৃত) হত্যা সাব্যস্ত করে কেসাসের হুকুম দেয়া থেকে বিরত থাকেন।

তবে আবূ দাউদের এক রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, রাসূল (সা.) ঐ মহিলাকে হত্যা করার আদেশ দেন।

فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنينها بغرة ان تقتل -

কিন্তু আবূ দাউদের এই রেওয়ায়াত অন্য সকল রেওয়ায়াতের বিপরীত। ইবনে জুরাইজ (রহ.) হাদীসের রাবী আমরের এই হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করলে আমর বলেন شككتنى তুমি আমাকে সন্দেহে ফেলে দিলে। স্বয়ং আবূ দাউদ (রহ.) সুফিয়ানের সনদে এই অংশটুকু উল্লেখ করেননি।

عاقلة কারা?

عاقلة বলা হয় هى التى تحمل العقل অর্থাৎ যারা দিয়্যাতের বোঝা বহন করে তাদেরকে عاقلة বলা হয়। দিয়্যাতকে عقل (আকল) বলা হয় এটা মানুষকে রক্ত প্রবাহিত করা থেকে বিরত রাখে বলে। আর عقل-এর শাব্দিক অর্থ বাধা। যেহেতু আকল মানুষকে পাপ থেকে বেধে (বিরত) রাখে এজন্য একে عقل বলে নামকরণ করা হয়েছে। পূর্বের বর্ণিত বিভিন্ন হাদীস দ্বারা বুঝা গেছে যে, ভুলক্রমে (قتل خطأ) এবং অনিচ্ছাকৃত (قتل شبه عمد)-এর ক্ষেত্রে عاقلة-এর উপর দিয়্যাত ওয়াজিব হয়। হ্যাঁ, যদি ইচ্ছাকৃত হত্যা (قتل عمد) হয় এবং পরস্পর চুক্তির বিনিময়ে দিয়্যাত আসে তাহলে এ ক্ষেত্রে হত্যাকারীকেই দিয়্যাত বহন করতে হবে। আকেলার উপর এই দিয়্যাত বর্তাবে না। عاقلة কাকে বলে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

১। ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) মতে যারা সর্বদা বিপদ আপদে সাহায্য-সহযোগিতা করে তাদেরকে عاقلة বলে। হুযূর (সা)-এর যুগে খান্দানের ভিত্তি ছিল সাহায্য-সহযোগিতার উপর। তারা একে অপরকে সাহায্য করত। এজন্য এদেরকেই عاقلة হিসেবে গণ্য করা হয়।

পরবর্তীতে হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে প্রতিরক্ষা সচিব (اهل ديوان) পরস্পরে সাহায্য-সহযোগিতাকারী (اهل تناصر) হিসেবে গণ্য হয়। ঐ সময়ে সকল সাহাবী এটা সর্বান্তকরণে মেনে নেন।

হযরত ওমরের (রা.) এই প্রক্রিয়া রাসূল (সা.)-এর মতের পরিপন্থী নয়।

রাসূল (সা.) এই নির্দেশ দিয়েছিলেন মূলতঃ পরস্পরে সাহায্য-সহযোগিতার ভিত্তিতে। আর সে সময় এটা আঞ্জাম দিত আসাবা (রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়রা)। ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে প্রতিরক্ষা সচিবরা এই দায়িত্ব পালন করে।

মোটকথা, সাহায্য-সহযোগিতার এই ভিত্তি আত্মীয়তা, সুসম্পর্ক, পেশা, দল, জাতি-গোষ্ঠি ইত্যাদি সম্পর্কের উপর। যদি এসব সম্পর্ক না হয় তাহলে কবীলা ও নিজস্ব বংশের লোকেরা عاقلة হিসেবে গণ্য হবে।

হত্যাকারীর যদি উল্লেখিত কোন সম্পর্ক না থাকে যাদের কাছ থেকে সে সাহায্য পেতে পারে তাহলে বাইতুল মাল থেকে দিয়্যাত আদায় করতে হবে।

তবে বাইতুল মাল যদি দিয়্যাত প্রদানে ব্যর্থ হয় তাহলে হত্যাকারীর মাল থেকে তা পরিশোধ করতে হবে। —রদ্দুল মুহ্তার

আর যার কোন প্রকারের عاقلة না থাকে যেমন ঃ জিম্মি, হরবী (যারা মুসলমান হয়েছে) তাদের আকেলা বাইতুল মাল।

২। ইমাম শাফেঈ ও আহমদের মতে হত্যকারীর আসাবা-ই عاقلة হিসেবে গণ্য হবে। ইমামগণ হাদীসে বর্ণিত ঘটনা দ্বারা দলীল পেশ করেন। কেননা বর্ণিত ঘটনায় রাসূল (সা.) আসাবাদেরকে দিয়্যাত আদায়ের নির্দেশ দেন। আহনাফের পক্ষ থেকে এই জওয়াব দেয়া হয় যে, ঐ সময় আসাবারাই عاقلة হিসেবে গণ্য হতো, এজন্য রাসূল (সা.) তাদেরকে এই নির্দেশ দেন। তাই বলে এর অর্থ এই নয় যে, আসাবারাই সর্বদা عاقلة হিসেবে গণ্য হবে।

হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে এর পট পরিবর্তন হওয়া এবং প্রতিরক্ষা সচিব (اهل ديوان) কে عاقلة হিসেবে গণ্য করা একথা প্রমাণ করে যে, এর ভিত্তি মূলতঃ تناصر তথা পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার উপর।

—ই'লাউস্ সুনান খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ২৭৮

فقال حمل بن النابغة الهذلى : يارسول الله كيف اعرم-এর ব্যাখ্যা

হাম্‌ল ইবনে নাবেগা মূলতঃ হাম্‌ল ইবনে মালেক ইবনে নাবেগা। দাদা (নাবেগার) সাথে সম্বন্ধ (نسبت) করে ابن نابغة বলা হয়েছে। এই লোক ঘটনায় উল্লেখিত ঐ দুইজন মহিলার স্বামী।

এই রেওয়ায়াত দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায়, كيف اغرم বাক্যটি হাম্‌ল ইবনে মালেকের। কিন্তু আহমদ ও তাবরানীর রেওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় এ কথাটি বলেছিলেন আঘাতকারিণীর ভাই আ'লা ইবনে মাসরূহ। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) একে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু এই মতটি অতিশয় দুর্বল।

কেননা মুসলিমের এই রেওয়ায়াতটি সনদের দিক দিয়ে অগ্রগণ্য। অতএব এটি অন্যান্য রেওয়ায়াতের উপর প্রাধান্য পাবে।

আহমদ ও তাবরানীর রেওয়ায়াতে আছে, রাসূল (সা.) সর্বপ্রথম আলা ইবনে মাসরূহকে দিয়্যাত আদায় করতে বলেন। কিন্তু তিনি অক্ষমতা প্রকাশ করলে হাম্‌ল ইবনে মালেকের কাছে দিয়্যাত তলব করেন। কেননা সে উক্ত মহিলার আসাবা যদিও সে তার স্বামী।

সম্ভবতঃ এ কারণে কোন রাবী كيف اغرم বাক্যের প্রবক্তা (قائل) নির্ণয়ে সন্দেহে পড়েছেন।

انما هذا من اخوان الكهان من اجل سجعه الذى سجع-এর ব্যাখ্যা

যেহেতু লোকটি ছন্দময় বাক্য দ্বারা শরীয়তের হুকুমকে প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়েছিল এবং তার এই ছন্দময় বাক্য ছিল লৌকিকতা সম্পন্ন এ কারণে রাসূল (সা.) তাকে গণকের সাথে তুলনা করেন। সুতরাং ছন্দময় বাক্য যদি লৌকিকতা মুক্ত এবং জায়িয কাজের জন্য হয় তাহলে তা জায়িয। রাসূল (সা.) থেকে কোন কোন সময় কসমের ক্ষেত্রে এ ধরনেরই ছন্দময় বাক্য প্রকাশ পেত। -ফতহুল বারী, নববী।

باب قطع يد السارق

অধ্যায় ঃ চোরের হাতকাটা প্রসঙ্গে

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ يَدَالسَّارِقِ فِىْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا ـ

"হযরত আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন—রাসূল (সা.) দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা এর চেয়ে বেশি মূল্যের বস্তু চুরির কারণে চোরের হাত কাটতেন।"

চুরির সংজ্ঞা ঃ আল্লামা ইবনে হুমাম (রহ.) বলেন سرقة (চুরির) শাব্দিক অর্থ اَخْذُ الشَّيْئِ مِنَ الْغَيْرِ عَلٰى وَجْهِ الْخُفْيَةِ مَالاً كَانَ اَوْ غَيْرَهٗ কোন বস্তু চুপিসারে নেয়া চাই সেটা মাল হোক বা অন্য কিছু।

আর পরিভাষায় কারো মালিকানাধীন সম্পদ চুপিসারে নেয়াকে سرقة বলে।

হুকুম ঃ চোরের হাত কাটার ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। তবে কি পরিমাণ বস্তু চুরি করলে হাত কাটতে হবে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

১। হাসান বসরী (রহ.), দাউদ যাহেরী (রহ.) প্রমুখের মতে হাত কাটার জন্য বিশেষ পরিমাণ মাল চুরি করা শর্ত নয়। সাধারণ যাই চুরি করুক না কেন হাত কাটতে হবে। তাঁরা বলেন—কুরআনে اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا বলে সব ধরনের চোরের হাত কাটতে বলা হয়েছে। বিশেষ কোন পরিমাণ উল্যেখ করা হয়নি।

তাছাড়া হাদীসেও (لَعَنَ اللّٰهُ السَّارِقَ وَالسَّارِقَةَ) বিনা শর্তে এই হুকুম কার্যকর করতে বলা হয়েছে।

কিন্তু গুটিকয়েক আলিম ছাড়া দুনিয়ার সকল আলিম, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন এ কথার ওপর এক মত যে, যে কোন ধরনের চুরির জন্য হাত কাটা যাবে না বরং এর জন্য নির্দিষ্ট একটা পরিমাণ আছে। অবশ্য এই পরিমাণ নির্ণয়ে মতভেদ আছে। যেমন,

১। আহনাফের মতে সর্বনিম্ন দশ দিরহাম পরিমাণ বস্তু চুরি করলে হাত কাটতে হবে।

২। ইমাম শাফেঈর মতে সর্বনিম্ন এক-চতুর্থাংশ দীনার পরিমাণ বস্তু চুরি করলে হাত কাটতে হবে।

৩। ইমাম মালেক ও আহমদের মতে তিন দিরহাম বা দীনারের এক চতুর্থাংশ পরিমাণ চুরি করলে হাত কাটতে হবে।

আহনাফের দলীল

١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ فِىْ مِجَنٍّ قِيْمَتُهُ دِيْنَارٌ اَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ.

রাসূল (সা.) এক দীনার অথবা দশ দিরহাম পরিমাণ মূল্যের একটি ঢাল চুরি করার কারণে এক চোরের হাত কেটে দেন।

২. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لاَ قَطْعَ فِيْمَا دُوْنَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ـ
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, "দশ দিরহামের কমে হাত কাটা যাবে না"।

৩. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ يُقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ـ

এছাড়াও অসংখ্য হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে দশ দিরহাম বা সমমূল্যের কোন বস্তু চুরি করলেই কেবল হাত কাটা যাবে।

ইমাম শাফেঈ ও মালেকের দলীল

১. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِيْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا ـ

২. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْطَعُ فِيْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا ـ

৩. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ السَّارِقِ فِيْ مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ ـ

রাসূল (সা.) এক চোরের হাত কেটে দেন। যে তিন দিরহাম মূল্যের একটি ঢাল চুরি করেছিল। উল্লেখ্য যে, ইমাম শাফেঈ ও মালেক (রহ.)-এর মাযহাব এক্ষেত্রে প্রায় কাছাকাছি হওয়ার কারণে উভয়ের দলীল একসাথে পেশ করা হয়েছে।

باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار

অধ্যায় ঃ চতুষ্পদ জন্তু কোন কিছুর ক্ষতি করলে, কূপে কিংবা খনিতেপতিত হয়ে মারা গেলে ক্ষপিূরণ ওয়াজিব না হওয়া প্রসঙ্গে

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ ـ

শাব্দিক ব্যাখ্যা ঃ আল্লামা তুরপশতী (রহ.) বলেন— العجماء বলতে এখানে জন্তু-জানোয়ার উদ্দেশ্য। কেননা এরা বাক্য বিনিময় করতে পারেনা।

আর যারা বাক্য বিনিময় করতে পারেনা আরবীতে তাদেরকে اعجم, مستعجم বলা হয়।

الجبار। শব্দের جيم পেশ সহকারে। অর্থ, বেকার অর্থাৎ এতে কোন ضمان বা ক্ষতিপূরণ নেই।

হুকুম ঃ কাজী ইয়ায (রহ.) (ইন্তিকাল ৫৪৪ হি.) বলেন—জন্তুর সাথে যদি চালক বা রাখাল থাকে এবং জন্তু কোন কিছুর ক্ষতি করে বসে তাহলে সকলের মতে রাখাল এর জরিমানা বহন করবে। আর যদি জন্তুর সাথে কেউ না থাকে, এবং দিনের বেলায় কারো ক্ষেত ইত্যাদির ক্ষতি করে, তাহলে জমহুরের মতে এসময় ক্ষতি পূরণ দিতে হবে না। তবে রাতে ক্ষতি করলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

ইমামগণ এই মতের স্বপক্ষে আবূ দাঊদ ও নাসায়ীর একটি হাদীস উল্লেখ করেন—

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ فَافْسَدَتْهُ فَقَضَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلٰى اَهْلِ الْاَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ وَعَلٰى اَهْلِ الْمَوَاشِيْ حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ -

হযরত বারা (রা.)-এর একটি উট জনৈক ব্যক্তির বাগানে ঢুকে বাগানের ক্ষতি করে ফেলে। রাসূল (সা.)-এর ফয়সালা করেন এভাবে যে, দিনের বেলায় বাগানের মালিক বাগান হেফাজত করবে আর রাতে প্রাণীর মালিকরা প্রাণী হেফাজত করবে।"

এই হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, এক্ষেত্রে রাত দিনের হুকুমের মধ্যে তফাত রয়েছে।

আর ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) মতে রাত দিনের কোন তফাত নেই এবং কোন অবস্থাতেই ক্ষতিপূরণ দিতে হবেনা।

তিনি বলেন—হযরত আবূ হুরাইরার (রা.) হাদীসে কোনরূপ পার্থক্য করা ছাড়াই বলা হয়েছে— العجماء جرحها جبار।

সুতরাং হাদীসের (ব্যাপকতার) দাবি অনুযায়ী দিন রাতের কোন ফরক নেই।

গুরুত্বপূর্ণ একটি মাসআলা

আলোচ্য হাদীসের শেষাংশে বলা হয়েছে— "الركاز" এর এক পঞ্চমাংশ যাকাত দিতে হবে। হাদীসে উল্লেখিত الركاز। শব্দ উল্লেখ, উল্লেখের ধরন

ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি খেয়াল করে আলিমগণের মধ্যে বড় ধরনের মতভেদ দেখা দেয়।

যে সব মতবিরোধ পূর্ণ মাসআলাকে গুরুত্বের সাথে নেয়া হয় এটি সেগুলোর অন্যতম। ইমাম বুখারী (রহ.) যেসব ক্ষেত্রে قال بعض الناس বলে ইমাম আবূ হানীফার মত খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন এটি সেগুলোর অন্যতম।

মূলত ঃ এই মতবিরোধটি لغوى তথা একটি শব্দকে কেন্দ্র করে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো।

মাটির নিচ থেকে যে পদার্থ উত্তোলন করা হয় তা সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত এবং এই দুই রকম পদার্থ বুঝাতে তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়।

১। معدن ২। كنز এবং ৩। ركاز, মা'দান বলা হয় ঐ পদার্থকে যা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। এটা দুই প্রকার। (ক) তরল, যেমন—পেট্রোল, ডিজেল ইত্যাদি। (খ) কঠিন পদার্থ। যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি।

২। كنز বলা হয় ঐ পদার্থকে যা মানুষ মাটিতে পুঁতে রাখে।

এটা আবার দুই প্রকার। (ক) ইসলাম প্রাক যুগের পুঁতে রাখা পদার্থ (স্বর্ণমুদ্রা) যাতে কুফরের নিদর্শন পাওয়া যায়।

(খ) ঐসব পদার্থ যাতে ইসলামের নিদর্শন বিদ্যমান।

৩। ركاز-এর শাব্দিক অর্থ জমিনে গেড়ে দেয়া, দাফন করা। মুনজিদ অভিধান প্রণেতা শব্দটির এরূপ অর্থই করেছেন।

মূলতঃ এই শব্দটি নিয়ে ওলামায়ে কিরামের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। মতবিরোধ নিম্নরূপ ঃ

১। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ইমাম আওযায়ী (রহ.) সুফিয়ান সাওরী (রহ.) সহ জমহুর ফোকাহায়ে কিরামের মতে ركاز শব্দটি عام (ব্যাপক)। معدن এবং كنز উভয় অর্থেই এটি ব্যবহৃত হয়।

২। ইমাম শাফেঈ, মালেক, আহমদ, ইমাম বুখারী (রহ.) প্রমুখ ইমামগণের মতে শব্দটি শুধুমাত্র كنز-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং এই হিসেবে خمس শুধুমাত্র كنز (মানুষের পুঁতে রাখা বস্তুর) মধ্যে ওয়াজিব হবে। معدن-এর মধ্যে হবে না।

নিজস্ব মতের পক্ষে ইমামগণের দলীল

আহনাফের দলীল

১। শাব্দিক (لغوى) দলীল ঃ উল্লেখ্য যে, কোন বস্তুর মৌলিক অবস্থা জানার ব্যাপারে لغت (অভিধানের) ভূমিকা অনস্বীকার্য। ইতিহাস খ্যাত অনেক নামী দামী অভিধানবিদরা ركاز-এর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হুবহু আহনাফের অনুকূল।

যেমন, আল্লামা ইবনে আছীর (রহ.) বলেন— اَلْمَعْدِنُ وَالرِّكَازُ وَاحِدٌ তথা معدن এবং ركاز একই বস্তু। (আইনী খণ্ড ৯ম, পৃষ্ঠা ১০০)। আল্লামা যমখ্শরী (রহ.) বলেন— اَلرِّكَازُ مَارَكَزَهُ اللّٰهُ فِى الْمَعَادِنِ مِنَ الْجَوَاهِرِ রিকায হলো ঐসব পদার্থ যা আল্লাহ তা'আলা معدن (খনির) মধ্যে গচ্ছিত রেখেছেন।

প্রসিদ্ধ অভিধান প্রণেতা ও মুহাদ্দিস আল্লামা আবূ উবাইদ (রহ.) বলেন اَلرِّكَازُ اَلْقَطْعُ الْعِظَامُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْوَاحِدُ ركز রিকায বলা হয় স্বর্ণের বড় টুকরাকে, এর একবচন ركز । এতে দেখা যাচ্ছে যে, তিনিও ركاز-কে ذهب তথা معدن বলার প্রবক্তা।

প্রসিদ্ধ শাফেঈ অভিধানবিদ قاموس প্রণেতা বলেন— اَلرِّكَازُ مَا امَّارَكَزَهُ اللّٰهُ فِى الْمَعَادِنِ وَدَفِيْنُ اَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ـ তথা খনির ও মানুষের পুতে রাখা সম্পদকে ركاز বলে।

লিসানুল আরব অভিধান প্রণেতা আল্লামা ইবনে মানযুর, ইবনুল আরাবীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন— اَلرِّكَازُ مَا اَخْرَجَ الْمَعْدِنُ রিকায বলা হয় যা খনি থেকে উত্তোলন করা হয়। —লিসানুল আরব খণ্ড ৭, পৃঃ ২২৩

এছাড়াও আল্লামা তুরপুশতীর বক্তব্য দ্বারা পরিস্কার বুঝা যায় যে, ركاز-এর প্রকৃত অর্থ معدن ই। দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে এটি كنز-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়।

হাদীস ভিত্তিক দলীল

١. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مَرْفُوْعًا قَالَ : فَفِيْهِ وَفِى الرِّكَازِ اَلْخُمُسُ

বর্ণিত এই হাদীসে كنز-কে ركاز-এর মোকাবেলায় উল্লেখ করা হয়েছে। واو عاطفة দ্বারা।

এর দ্বারা বুঝা যায় كنز-এর বিপরীতে উল্লেখ করা ركاز শব্দটি معدن-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা ওলামায়ে কিরাম বলেছেন হাদীসের হুকুমের আওতায় معدن ও শামিল। যদি তাই হয় তাহলে معدن-এর অর্থ আসল কোথা থেকে? নিশ্চয় ركاز-এর মধ্যেই এই অর্থ নিহিত রয়েছে।

٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَرْفُوْعًا : فِى الرِّكَازِ اَلْخُمْسُ قِيْلَ وَمَا الرِّكَازُ؟ قَالَ اَلذَّهَبُ الَّذِىْ خَلَقَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِى الْاَرْضِ يَوْمَ خُلِقَتْ ....

" রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করা হলো ركاز কী? উত্তরে তিনি বললেন ঐ স্বর্ণ যা আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া সৃষ্টি করার সময় মাটিতে সৃষ্টি করেছেন।

আলোচ্য হাদীসে স্বয়ং রাসূল (সা.) রিকাযকে স্বর্ণ (معدن) হিসেবে অভিহিত করেছেন।

٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرِّكَازُ الَّذِىْ يَنْبُتُ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ.

"রিকায বলা হয় যা আল্লাহ তা'আলা ভূমির উপরিভাগে সৃষ্টি করেছেন।"

٤. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَالرِّكَازُ مَارَكَزَهُ اللّٰهُ فِى الْمَعَادِنِ.

রিকায বলা হয় যা আল্লাহ তা'আলা معدن (খনিতে) জমা করে রেখেছেন।

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় ركاز এবং معدن প্রতিশব্দ, একটি আরেকটির অর্থে ব্যবহৃত হয়।

তাছাড়া আরো অসংখ্য হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় যে, ركاز এবং معدن একই অর্থবোধক। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই।

অন্যান্য ইমামগণের দলীল

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَازِ اَلْخُمْسُ.

তাঁরা হাদীসকে এভাবে দলীল হিসেবে পেশ করেন যে, হাদীসে ركاز শব্দকে معدن-এর ওপর عطف করা হয়েছে। আর عطف বিপরীত অর্থ বুঝায়, একই অর্থবোধক শব্দের একটাকে অপরটার ওপর عطف করা হয় না। সুতরাং বুঝা যায় ركاز এবং معدن এক বস্তু নয়, দু'টি ভিন্ন বস্তু।

উল্লেখিত দলীলের জওয়াব

আমরা আগেই বলেছি যে, ركاز শব্দটি عام যা معدن এবং كنز উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর معدن শব্দ خاص আর হাদীসে ركاز-কে عطف العام على الخاص হিসেবে ركاز-কে معدن-এর পরে উল্লেখ করা হয়েছে। مغاير বা বিপরীত অর্থ বোঝানোর জন্য উল্লেখ করা হয়নি। কুরআন, হাদীস ও অলংকার শাস্ত্রে এর বহু নযীর লক্ষ্য করা যায়।

মোটকথা পূর্বোক্ত যাবতীয় মাসআলার মত এই মাসআলায়ও আহনাফের মাযহাব প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য। –তানযীমুল আশতাত খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৭

باب وجوب الحكم بشاهد ويمين

অধ্যায় ঃ সাক্ষী ও কসমের সমন্বয়ে বিচার কার্য সম্পাদন প্রসঙ্গে

ফয়সালা বা বিচার কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে শুধু সাক্ষী জরুরী নাকি সাক্ষী ও কসম (يمين)-এর সমন্বয়ে ফয়সালা দেয়া হবে—এ সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে।

১। ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাঈনের মতে বাদীর পক্ষে ন্যায়পরায়ণ "দুইজন" সাক্ষী থাকতে হবে। একজন সাক্ষী এবং অপর আরেক সাক্ষীর পরিবর্তে কসম দিয়ে দাবি পেশ করা যাবে না।

২। ইমাম শাফেঈ (রহ.) ও আহমদের মতে যদি একজন সাক্ষী বিদ্যমান থাকে তাহলে অপর সাক্ষীর শুন্যতায় একজন 'সাক্ষী' ও 'কসম'–এ দুইয়ে মিলে ফয়সালা প্রদান করা যাবে।

মূলতঃ এখানে মোট তিনটি পন্থা রয়েছে। যার দুটিতে সকল ইমাম ঐক্যমত এবং একটিতে মতবিরোধ রয়েছে। যথা ঃ

১। যদি বাদীর পক্ষে দুইজন সাক্ষী থাকে তাহলে সবার ঐক্যমতে ফয়সালা করা যাবে।

২। যদি একজন সাক্ষীও না থাকে তাহলে সকল ইমামের ঐক্যমতে এক্ষেত্রে ফয়সালা দেয়া যাবে না।

৩। একজন সাক্ষী এবং অপর সাক্ষীর বদলায় কসম। এই পন্থায় মতবিরোধ রয়েছে যা একটু আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমামগণের দলীল

১। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর দলীল

(ক) কুরআনের আয়াত–

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ -

আলোচ্য আয়াতে দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলাকে সাক্ষী বানাতে বলা হয়েছে। সুতরাং দুইজন সাক্ষী না হলে অন্য কোন পন্থায় ফয়সালা করা যাবে না।

আয়াতে লক্ষণীয় বিষয় হলো, সাক্ষী একজন পুরুষ হলে ঘাটতি পূরণের জন্য দুইজন মহিলাকে সাক্ষী বানাতে বলা হয়েছে। যদি সাক্ষী ও কসম উভয়টি মিলে ফয়সালা করা যেত তাহলে অবশ্যই তা উল্লেখ করা হতো।

(খ) অন্য আয়াতেও দুইজন সাক্ষীর কথা বলা হয়েছে। যেমন—

وَاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِنْكُمْ

(গ) হাদীস عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِىْ وَالْيَمِيْنُ عَلٰى مَنْ اَنْكَرَ - بخارى

আলোচ্য হাদীসে শরীয়তের একটি মৌলিক উসূল বর্ণনা করা হয়েছে যে, বাদীর কর্তব্য হলো সাক্ষী উপস্থিত করা এবং বিবাদীর কর্তব্য হলো বাদী সাক্ষী আনতে না পারলে কসম করা।

আর এটাও একটি স্বীকৃত নিয়ম যে, القسمة تنافى الشركة। ("বিবন্টন করণ শরীকানার অস্তিত্ব অস্বীকার করে)।

সুতরাং এই হিসেবে বিবাদীর কর্তব্য (কসম) কে বাদীর আওতায় আনা যাবে না।

হিদায়া প্রণেতা বলেন— اليمين এবং البينة শব্দের استغراق - ال-এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ হলো–সাক্ষী পেশ করার দায়িত্ব বাদীর সাথে এবং কসম করার দায়িত্ব বিবাদীর সাথে খাস।

٤. عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِىِّ اَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ : لاَ : قَالَ فَلَكَ يَمِيْنُهُ قَالَ وَلَيْسَ لَكَ مِنْهُ اِلاَّ الْيَمِيْنَ ـ

রাসূল (সা.) হাযরমী (রা.) কে বললেন—(তোমার দাবির স্বপক্ষে কোন) প্রমাণ (সাক্ষী) আছে কি? তিনি বললেন না।" তখন রাসূল (সা.) বললেন-তাহলে তোমাকে বিবাদীর কসম মেনে নিতে হবে।"

আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যদি বাদীর সাক্ষী ছাড়া বিকল্প কিছুর অবকাশ থাকত তাহলে রাসূল (সা.) তা অবশ্যই বলে দিতেন। তাছাড়া ليس لك منه الا اليمين বলে সুস্পষ্টভাবে একথা বলা হয়েছে যে, يمين তথা কসম করা শুধুমাত্র বিবাদীর দায়িত্ব, বাদীর নয়।

২। ইমাম শাফেঈ (রহ.) ও আহমদের (রহ.) দলীল।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰى بِشَاهِدٍ وَيَمِيْنٍ ـ

রাসূল (সা.) একজন সাক্ষী ও কসম উভয়টি মিলিয়ে ফয়সালা প্রদান করেছেন।"

এ ধরনের আরেকটি হাদীস হযরত আবূ হুরাইরা (রা.)-এর সনদে আবূ দাউদে বর্ণিত রয়েছে।

আহনাফের পক্ষ থেকে এর জওয়াব

১। আল্লামা ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহ.) বলেন—হাদীসটি যঈফ।

২। ইমাম তিরমিযী ও (রহ.) হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। আর এটি বিশেষ অবস্থা সংশ্লিষ্ট একটি ঘটনা, যা সামগ্রিক দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে মানসূখ হয়ে গেছে।

৪। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.) বলেন—এই ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় রাসূল (সা.) মীমাংসা স্বরূপ এরূপ করেছেন—ফয়সালা স্বরূপ নয়। সুতরাং সর্বক্ষেত্রে এই হাদীসটি কার্যকর হবে না।

باب اللقطة

অধ্যায় ঃ পড়ে পাওয়া বস্তুর (لقطة) হুকুম সম্পর্কে

١. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ لُقْطَةِ الْحَاجِّ ـ

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَرِّفْهَا ـ مسلم

"রাসূল (সা.) পড়ে পাওয়া বস্তু (لقطة) সম্পর্কে বলেন-মানুষের মধ্যে এর প্রচার করো।"

لقطة-এর পরিচয় ঃ لقطة শব্দের لام অক্ষরে পেশ, قاف-এ সাকিন এবং ط হরফকে যবর সহকারে পড়তে হয়। এর শাব্দিক অর্থ মালিকহীন বস্তু, রাস্তায় পড়ে পাওয়া বস্তু। উল্লেখ্য পড়ে পাওয়া বস্তুটি যদি প্রাণহীন জড পদার্থ হয় তাহলে তাকে لقطة এবং প্রাণ বিশিষ্ট (যেমন গরু-ছাগল) হলে তাকে ফেকহী পরিভাষায় ضالة বলে।

لقطة-এর হুকুম

মাবসূত গ্রন্থে لقطة-এর হুকুমের ব্যাপারে তিনটি মত উল্লেখ করা হয়েছে।

১। কোন অবস্থাতেই لقطة উঠানো জায়িয নেই।

২। উঠানো জায়িয তবে না উঠানো উত্তম

৩। আহনাফ সহ জমহুর ওলামায়ে কিরামের মতে لقطة ফেলে রাখার চেয়ে উঠানো উত্তম।

بدائع الصنائع গ্রন্থ প্রণেতা আহনাফের মতকে কিছুটা তাফসীলসহ বর্ণনা করেছেন। যথা ঃ

১। যদি পতিত বস্তু নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে তাহলে মালিকের কাছে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে উঠানো উত্তম।

২। নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে উঠানো মুবাহ।

৩। আত্মসাৎ করার নিয়তে উঠানো হারাম।

ঘোষণা ও প্রচার করার সময় নির্ধারণ নিয়ে মতভেদ

১। আহনাফের মতে প্রচার করার জন্য সময় নির্ধারিত নেই। অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতের ওপর এটা নির্ভরশীল। সাধারণত কতদিন পর্যন্ত প্রচার করলে মালিক

খুঁজে পাওয়া যাবে বা মালিক কতদিন পর্যন্ত বস্তুটির তালাশে থাকবে তা স্থান, পাত্র এবং হারানো সেই বস্তুর ওপর নির্ভর করে। সুতরাং উত্তম হলো হারানো বস্তু যদি দশ দিরহাম বা তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে এক বছর যাবত, দশ দিরহামের কম হলে একমাস, তিন দিরহামের কম হলে তিন দিন পর্যন্ত প্রচার করতে হবে এবং মালিককে খুঁজতে হবে।

২। ইমাম মালেক, শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর মতে যে ধরনের বস্তুই হোক না কেন এক বছর যাবত মালিক খুঁজতে ও প্রচার করতে হবে। এর কম-বেশি করা যাবে না।

আহনাফের দলীল

١. عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : وَجَدْتُ صُرَّةً فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً ثُمَّ اَتَيْتُ فَقَالَ : عَرِّفْهَا حَوْلاً ـ (ابوداود)

আলোচ্য হাদীসে দেখা যাচ্ছে যে, রাসূল (সা.) তিন বছর পর্যন্ত প্রচার করার আদেশ দিয়েছেন যাতে বুঝা যায় প্রচার করার সময়টা নির্ধারিত নয়।

২। মুসলিম শরীফের এক রেওয়ায়াতে কোন রূপ সময় নির্ধারণ করা ছাড়া (مطلق ভাবে) বলা হয়েছে قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرِّفْهَا এটা জোরালোভাবে আহনাফের মতকেই সমর্থন করে।

৩। হযরত আলীর (রা.) এক রেওয়ায়াতে শুধু মাত্র তিন দিন প্রচার করার কথা বলা হয়েছে।

অন্যান্য ইমামদের দলীল

١. عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ـ البخارى

ইমামগণ বলেন যেহেতু হাদীসে এক বছর যাবত প্রচার ও ঘোষণা করতে বলা হয়েছে সেহেতু এক বছর যাবত প্রচার করতে হবে, কম করা যাবে না।

لقطة ব্যবহার করার হুকুম

১। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে لقطة প্রাপক ব্যক্তি যদি দরিদ্র হয় তাহলে প্রচার করার পর সে এটা ভোগ করতে পারবে। কিন্তু যদি ধনী বা হাশেমী গোত্রের হয়, তাহলে ব্যবহার করতে পারবেনা, সদকা করে দিতে হবে।

২। ائمه ثلاثة-এর মতে প্রাপক চাই ধনী হোক বা গরীব, রাজা-বাদশা বা ফকীর, হাশেমী বা অন্য যে কেউ প্রচার করার পর তা ব্যবহার করতে পারবে।

আহনাফের দলীল

١. عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِنْ لَمْ يَاتِ صَاحِبُ اللُّقْطَةِ فَلْيُصَدِّقْ بِهِ -

"যদি এর মূল মালিক না আসে তাহলে প্রাপ্ত বস্তু সদকা করে দিবে।"

٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيَتَصَدَّقْ بِهَا الْغَنِىُّ وَلاَ يَنْتَفِعُ بِهَا -

প্রাপক ধনী হলে সেটা সদকা করে দিবে; নিজে এটা ভোগ করবে না।

৩। মুসনাদে আহমদে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল (সা.) এ সম্পর্কে বলেন- ولتكن وديعة منك "তোমার কাছে এটা আমানত স্বরূপ। আর এটা সবাই জানে যে, আমানতের বস্তু ভোগ করা যায় না।

অন্যান্য ইমামগণের দলীল

١. عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : فَاسْتَمْتِعْ بِهَا - ابو داؤد

"উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-কে রাসূল (সা.) বলেন–তুমি এর দ্বারা উপকৃত হতে পার। উল্লেখ্য যে, তিনি ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন, যাতে প্রমাণিত হয় ধনী ব্যক্তিও ইহা ভোগ করতে পারবে।

٢. اِنَّ عَلِيًّا وَجَدَ دِيْنَارًا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ رِزْقُ اللّٰهِ فَاَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِىٌّ وَفَاطِمَةٌ -

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় হাশেমী ব্যক্তিও লোকতা ব্যবহার করতে পারে।

আহ্নাফের পক্ষ থেকে জবাব

১ম দলীলের জবাব ঃ (ক) হযরত উবাই (রা.) গরীব ছিলেন এ কারণে রাসূল (সা.) তাকে ব্যবহার করার অনুমতি দেন।

(খ) হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) প্রথমে গরীব ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ধনী হয়েছিলেন। আর এঘটনাটি ঐ সময়ের যখন তিনি গরীব ছিলেন।

দ্বিতীয় দলীলের জবাব ঃ ইমাম সাওকানী (রহ.) বলেন—এই হাদীসের সনদ নিয়ে কথা আছে, যা দলীল যোগ্য নয়।

তাছাড়া এই হাদীসটি مضطرب আর এরূপ হাদীস দলীল হতে পারে না।

باب لبس الحرير للرجل

অধ্যায় ঃ পুরুষের রেশমী কাপড় ব্যবহার করা প্রসঙ্গে

"হযরত হুযাইফা (রা.) বলেন—রাসূল (সা.) আমাদেরকে রেশমী কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।"

রেশমী কাপড় পুরুষের জন্য জায়িয কিনা এ সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

১। ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এঁর মতে প্রয়োজন দেখা দিলে রেশমী কাপড় পরিধান করা জায়িয। যেমন, যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রচণ্ড শীত বা গরম কালে অথবা উকুন থেকে বাঁচতে।

২। ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতে কোন অবস্থাতেই রেশমী কাপড় ব্যবহার করা জায়িয নয়।

৩। আহ্নাফের মতে পুরুষের জন্য দুই আঙ্গুল পরিমাণ ব্যবহার করা জায়িয, এর চেয়ে অধিক নয়।

ইমাম শাফেঈর দলীল

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ الزُّبَيْرَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ شَكَوَا الْقُمَّلَ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِيْ قُمْصِ الْحَرِيْرِ .

হযরত যোবায়ের ও আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) হুযূর (সা.)-এর নিকট উকুনের অভিযোগ করলে তিনি তাদেরকে রেশমী কাপড় পরিধান করার অনুমতি প্রদান করেন।

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় প্রয়োজন দেখা দিলে রেশমী কাপড় ব্যবহার করা জায়িয।

ইমাম মালেক (রহ.)-এর দলীল

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ ـ (متفق عليه)

হযরত ওমর (রা.) বর্ণনা করেন–রাসূল (সা.) রেশমী কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় কোন কারণেই রেশমী কাপড় ব্যবহার করা জায়িয নেই।

আহনাফের দলীল

١. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : هٰذَانِ مُحَرَّمَانِ لِذُكُوْرِ اُمَّتِيْ حَلَالٌ لِاُنَاثِهِمْ ـ

এই দু'টি বস্তু (স্বর্ণ ও রেশমী) আমার উম্মতের পুরুষের জন্য হারাম, নারীর জন্য হালাল।

এই হাদীসে সম্পূর্ণ ভাবে হারাম হওয়া বুঝালেও অন্য এক রেওয়ায়াতে দুই বা তিন আঙ্গুল পরিমাণ ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং আহনাফ সেই রেওয়ায়াত অনুযায়ী আমল করে।

সেই রেওয়ায়াতটি হলো—

٢. عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ اِلَّا مَوْضِعَ اِصْبَعَيْنِ اَوْ ثَلٰثٍ اَوْ اَرْبَعٍ ـ

অবশ্য সাহেবাঈনের মতে যুদ্ধক্ষেত্রে রেশমী কাপড় ব্যবহার করাতে কোন দোষ নেই। কেননা এক হাদীসে এর অনুমতি দেয়া হয়েছে। যথা ঃ

٣. اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَخَّصَ فِيْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ فِي الْحَرْبِ ـ

আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে রেশমী ব্যবহর করা হারাম নয়, তবে মাকরূহ।

باب احتجاج ادم وموسى عليهما السلام

অধ্যায় ঃ হযরত আদম (আ.) ও মূসা (আ.) এর বিতর্ক প্রসঙ্গে

উল্লেখ্য যে, এটি তাকদীর সংক্রান্ত আলোচনা। হযরত আদম ও মূসা (আ.) কোন এক স্থানে মুখোমুখি হলে মূসা (আ.) আদম (আ.)-কে গন্ধম ফল খাওয়া জান্নাত থেকে বের হয়ে আসা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করেন।

সব প্রশ্ন শুনে হযরত আদম (আ.) মূসা (আ.)-কে তাকদীরের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং এটা যে অবধারিত একটি বিষয় তাও মনে করিয়ে দেন। এতে মূসা (আ.) আদম (আ.)-এর সাথে বিতর্কের ইতি টানেন।

হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু কথা

কোথায় ঘটেছিল এই বিতর্ক ঃ

এ সম্পর্কে নানা রকম মত পাওয়া যায়। কেউ বলেন, রূহের জগতে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। কেউ বলেন মি'রাজের রজনী সকল নবীকে আল্লাহ তা'আলা একত্রিত করলে এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়। আবার কেউ বলেন মূসা (আ.) এর যুগে আল্লাহ তা'আলা আদম (আ.) এর কবর মূসার (আ.) সামনে খুলে দেয়া হলে এই বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) বলেন—এটি এখনো সংঘটিত হয়নি কেয়ামতের দিন সংঘটিত হবে। তবে বিষয়টি যেহেতু নিশ্চিত এ জন্য ماضى-এর সীগা ব্যবহার করা হয়েছে।

কোন পাপী পাপ করে তাকদীরের দোহাই দিতে পারবে কিনা

উল্লেখ্য যে, হাদীসের একাংশে বলা হয়েছে হযরত আদম (আ.) মূসা (আ.)-কে লক্ষ্য করে বলেন—

فَتَلُوْمُنِىْ عَلٰى اَمْرٍ قَدْ قُدِّرَ عَلَىَّ قَبْلَ اَنْ اُخْلَقَ الخ ـ

এর দ্বারা বুঝা যায় পাপী পাপ করে তাকদীরের দোহাই দিতে পারবে। কেননা তাকদীরে লিখা ছিল বলেইতো সে এ কাজটি করেছে।

আলিমগণ এর অনেক রকম জওয়াব প্রদান করেছেন। যেমন, (১) আদম (আ.) এ কথাটি বলেন সে সময় যখন তিনি مكلف নন তথা দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পরের ঘটনা এটি। সুতরাং যিনি مكلف নন তাঁর কথার রেশ ধরে কোন مكلف ব্যক্তি ওযর আপত্তি করতে পারবে না।

২। আদম (আ.) তওবা করে আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত হয়ে এই কথাটি বলেছেন।

সুতরাং নিষ্পাপ কোন ব্যক্তির কথার উদ্ধৃতি দিয়ে নিজের পাপের ওযর পেশ করা যাবেনা।

تمت بالخير

পরিশিষ্ট

উলূমুল হাদীস

ও

সিহাহ্ সিত্তাহ ইমামগণের জীবনী

উলূমুল হাদীস সম্পর্কে দু'টি কথা

✪ বক্ষমাণ পুস্তকটিতে উলূমুল হাদীস সম্পর্কে পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে নিতান্তই প্রাথমিক ধারণা দেয়া হয়েছে। যা এই ইলমের জ্ঞান সমুদ্রের তুলনায় সুচাগ্রের এক ক্ষুদ্র কণার সমানও নয়। তাই এই ফনের জ্ঞানসাগরে অবগাহন করুন। স্বচক্ষে দেখুন এর বিশালত্ব, মায়াকাড়া সৌন্দর্য।

✪ হাদীস সংকলন এবং হাদীসের দালীলিক অবস্থান (حجيت حديث) সম্পর্ক বিস্তারিত জানতে এ সম্পর্কে সংকলিত বিভিন্ন গ্রন্থরাযী অধ্যায়ন করুন। (৪১৯ পৃষ্ঠায় এসব গ্রন্থের কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে।)

✪ সাহাবাগণের জীবনী জানতে اسد الغابة، الاستيعاب، الاصابه ইত্যাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে পারেন।

✪ اسماء الرجال (রাবীদের জীবনী) জানতে الكمال فى اسماء الرجال، الكمال فى معرفة الرجال، تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، تذهيب تهذيب التهذيب ، الكاشف، تعجيل المنفعة بزوائد رجال الا ئمة الاربعة، ذيل الكاشف. ইত্যাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে পারেন।

✪ ভারত উপমহাদেশে ও বাংলাদেশে হাদীস চর্চার ইতিহাস জানতে এ সম্পর্কীয় কিতাব-পুস্তক পাঠ করতে পারেন। মাওলানা নূর মুহাম্মদ আযমী রচিত হাদীস তত্ত্ব ও ইতিহাস ইসলামী ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত "ভারত উপমহাদেশে হাদীস চর্চা" বইয়ের সহযোগিতা নিতে পারেন।

✪ সাহাবা ও রাবীদের জীবনী সম্পর্কে বাড়তি কিছু জানতে উল্লেখিত গ্রন্থরাযী ছাড়াও شذرات الذهب فى احبارمن ذهب، البداية والنهاية سيراعلام النبلاء ইত্যাদি ইতিহাস সমৃদ্ধ গ্রন্থের সহযোগিতা নিতে পারেন।

✪ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত এ বিষয়ের কিতাবাদীর পরিচয় জানতে الرسالة المستطرفة এবং এ জাতীয় গ্রন্থের সহযোগিতা নিতে পারেন।

উলূমুল হাদীস
ইলমে হাদীস সংকলন

বাংলাদেশ ও ভারত উপমহাদেশে হাদীস চর্চা ঃ

প্রথম শতাব্দীর কথা ঃ ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায় সাহাবাগণ তিন পদ্ধতিতে হাদীস সংরক্ষন করতেন। যথা, (১) মুখস্ত করা (২) হাদীস অনুযায়ী আমল এবং (৩) লিখনীর মাধ্যমে।

মুখস্থকরণ বা حفظ روايت

সে যুগে এটি সবচেয়ে নির্ভর যোগ্য পন্থা ছিল। আল্লাহ তা'আলা আরবদেরকে সীমাহীন মেধা দিয়েছিলেন। হাজার রকমের শের-আশ'আর, কেচ্ছা-কাহিনী, নিজেদের আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর এমনকি ঘোড়ার বংশ পরম্পরা পর্যন্ত তাঁরা মুখস্থ রাখতে পারতেন। আরবগণ এই বিস্ময়কর ধীশক্তির বদৌলতে হাদীসকে সুসংরক্ষণ করেন।

আমল করার মাধ্যমে হাদীস সংরক্ষণ

সাহাবাগণ রাসূল (সা.) কে যা করতে দেখতেন বা শুনতেন সে অনুযায়ী আমল করতেন। হাদীস সংরক্ষণের এটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য একটি মাধ্যম। সাহাবাগণ রাসূলের (সা.) নির্দেশের ভিত্তিতে কোন কিছুর আমল করে বলতেন— هٰكَذَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ —

লিখনী (كتابت) এর মাধ্যমে হাদীস সংরক্ষণ ঃ সাহাবাদের যুগেই লিখনীর প্রচলন ঘটে। এর মোট চারটি স্তর রয়েছে। যথা ঃ

(ক) বিচ্ছিন্ন ভাবে হাদীস সংরক্ষণ করা।

(খ) ব্যক্তিগত খাতায় সংরক্ষণ করা,

(গ) কিতাব আকারে "অধ্যায়" (باب) কায়েম করে সংরক্ষণ করা।

(ঘ) কিতাব আকারে باب কায়েম না করে সংরক্ষণ করা।

সাহাবাদের যুগে প্রথম দুই পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন ছিল। রাসূল (সা.) নিজে এর অনুমতি দিয়েছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এর এক রেওয়ায়াতে আছে, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন— قيدوا العلم، قلت وما تقييده قال كتابته. তিরমিযীতে বর্ণিত আছে হুযূর (সা.) একবার বয়ান করার পর আবূ

শাহ (রা.) বললেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ ঃ আমাকে এটা লিখে দিন। রাসূল (সা.) সাহাবাদের লক্ষ্য করে বললেন— اكتبوا لابى شاه -

এসব রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় লিখনীর এই প্রক্রিয়া নতুন কিছু নয়, রাসূলের যুগেই তা চালু হয়েছে। এর কয়েকটি প্রমাণ নিম্নরূপ ঃ

১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) এর সংকলিত الصحيفة الصادقة -

২। হযরত আলী (রা.)-এর সংকলিত صحيفة على

৩। আনাস (রা.)-এর صحيفة انس

৪। صحيفة ابن عباس

৫। صحيفة ابن مسعود

৬। صحيفة جابر بن عبد الله ইত্যাদি।

✪ ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.)-এর যুগে হাদীস সংকলন

ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.)-এর যুগ পর্যন্ত পূর্বে বর্ণিত প্রথম দুই পদ্ধতিতে হাদীস সংকলনের ব্যবস্থা ছিল। তাঁর যুগে এসে হাদীস ব্যাপক আকারে সংকলিত হতে থাকে।

তিনি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত কাজী ও মুহাদ্দিসগণকে হাদীস সংকলনের আদেশ দেন। তাঁর নির্দেশে হাদীসের নিম্নোক্ত কিতাবগুলো সংকলিত হয়।

১। মদীনার কাজী আবূ বকর (রহ.)-এর كتب ابى بكر

২। ইমাম যুহরীর (রহ.) دفاتر الزهرى

৩। সালেম ইবনে আব্দুল্লাহর রেসালা।

৪। ইমাম মাকহুলের السنن لمكحول

৫। ইমাম আমেরের (রহ.) ابواب الشعبى ইত্যাদি।

হিজরী দ্বিতীয় শতক

হিজরী দ্বিতীয় শতকে হাদীস সংকলনের কাজ আরো বিস্তৃত হতে থাকে। এ সময় কালে বিশটিরও বেশি কিতাব সংকলিত হয়। প্রসিদ্ধ কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ

১। كتاب الآثار لابى حنيفة

২। الموطا للامام مالك

৩। جامع معمر بن راشد

৪। جامع سفيان الثورى

৫। السنن لابن جرير ইত্যাদি।

হিজরী তৃতীয় শতক

এই শতকে সংকলনের কাজ তার পূর্ণ যৌবনে পৌছে। এ সময় যেহেতু সনদ দীর্ঘায়িত হয়ে যায় এজন্য বিভিন্ন সনদে হাদীস বর্ণিত হতে থাকে এবং নতুন নতুন পদ্ধতিতে নতুন নতুন কিতাব সংকলিত হতে থাকে। রিজাল শাস্ত্র নিয়েও এ সময় বিস্তৃত আলোচনা হতে থাকে। এই সময় কালেই صحاح سته সংকলিত হয়। এই ছয়টি কিতাব ছাড়া এ সময়কার অন্যান্য কয়েকটি কিতাব নিম্নরূপ ঃ

১। مسند ابى داؤد طيالسى

২। مسند احمد

৩। المستدرك للحاكم

৪। المعاجم للطبرانى

৫। مصنف عبد الرزاق

৬। مسند الدارمى

৭। مسند ابى ليلى

৮। سنن دار قطنى ইত্যাদি।

ভারত উপমহাদেশে ইলমে হাদীসের দরস

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ভারত উপমহাদেশে ইসলামের ব্যাপক পরিচয় ঘটে হযরত ওমরের (রা.) শাসনামলে। তিনি ওসমান ছাকাফীকে বাহরাইন ও ওমানের শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। আর ওসমান ছাকাফী (রা.) স্বীয় ভ্রাতা হাকামকে সিন্ধু এবং অপর ভ্রাতা মুগীরা (রা.)-কে দেবল অভিযানে প্রেরণ করেন। তাঁরা উভয়ে অভিযানে সফল হন এবং কুফরী শক্তিকে পরাভূত করে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেন।

এই বাহিনীতে অসংখ্য সাহাবা ও তাবেঈন ছিলেন যারা এদেশে হাদীসের দরস এবং এর প্রচার প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এরপর ধারাবাহিক ভাবে এদেশে মুজাহিদগণ আগমন করতে থাকেন এবং হাদীসের দরস চালু করেন। এঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ তাবেঈ আব্দুল্লাহ ইবনে সাবীহ সা'দী (রহ.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যিনি ভারত উপমহাদেশের সর্বপ্রথম হাদীস সংকলক বলে পরিচিত।

এরপর হিন্দুস্থানে ঘোরী ও গজনবী শাসনের গোড়া পত্তন হলে আরব শাসনের বিলুপ্তি ঘটে এবং হাদীস বাদ দিয়ে অন্যান্য ইলমের চর্চা হতে থাকে।

এমনকি এ সময়ে মিশকাত পাঠকারীকে সবচে বড় মুহাদ্দিস বলে ধারণা করা হতো।

কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এই ধারা চালু থাকে। এভাবে দশম শতাব্দীতে এসে মিসর ও আরবের মুহাদ্দিসগণ নতুন আঙ্গিকে হাদীস চর্চার জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠেন এবং সে সুবাদে এদেশের আলিমগণ হাদীসের সাথে নতুন করে সম্পৃক্ত হতে থাকেন এবং হাদীস শিক্ষার জন্য তাঁরা বিভিন্ন দেশে সফর করতে থাকেন।

এঁদের মধ্যে শাইখ হিসামুদ্দিন আলী (রহ.) এবং তাঁর শিষ্য মুহাম্মাদ ইবনে আলী (রহ.) এবং তাঁর শিষ্য মুহাম্মাদ ইবনে তাহের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এরপর একাদশ শতাব্দীতে আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) (ইন্তিকাল ১০৫২ হিঃ) ভারত উপমহাদেশে হাদীস শিক্ষা বিস্তৃত করেন। হিজাযে শিক্ষা শেষে দেশে ফেরার পথে তিনি সেখান থেকে বুখারী, মুসলিম এবং মুয়াত্তার একটি করে কপি নিয়ে আসেন।

এর আগে মিশকাত এবং مشارق الانوار পড়ানো হত। তিনি এর সাথে এই কিতাব তিনটি যোগ করেন এবং দিল্লীকে ইলমের মারকায বানিয়ে সেখানে দরস দেয়া শুরু করেন।

তাঁরই কল্যাণে হাদীসের দরস, শরাহ লিখনীর প্রচলন ঘটে এবং মানুষ হাদীসের সাথে গভীর ভাবে সম্পৃক্ত হতে শুরু করে।

এরপর দ্বাদশ শতাব্দীতে ইমামুল হিন্দ হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) সোনালী-যুগের সূচনা ঘটে। তিনি শাইখ তাহের (রহ.) থেকে হাদীস শিক্ষা করে ভারত উপমহাদেশে তা ছড়িয়ে দেন। এ সময় সারা ভারত জুড়ে সিহাহ সিত্তা সহ অন্যান্য হাদীস সমূহের ব্যাপক দরস চালু হয়। তিনি ফারসী ভাষায় المصفى এবং আরবীতে المسوى নামে মুয়াত্তার দু'টি শরাহ লেখেন। যা আলিমগণের কাছে ব্যাপক জন প্রিয়তা লাভ করে।

শাহ ওয়ালী উল্লাহর (রহ.) পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র শাহ আব্দুল আযীয (রহ.) পিতার মসনদে সমাসীন হন এবং এই প্রক্রিয়া অব্যাহত গতিতে চালু রাখেন। এরপর শাহ ইসহাক (রহ.), হুজ্জাতুল ইসলাম, কাসেম নানুতবী (রহ.) এবং মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী (রহ.) এই কর্মসূচী আরো বিস্তৃত করেন।

হযরত কাসেম নানুতবীর (রহ.) প্রখ্যাত শাগরিদ শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান (রহ.) এবং আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) শাইখুল ইসলাম হযরত মাদানী (রহ.)। যাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অসংখ্য শিষ্য শাগরিদ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে আজও হাদীসের দরসে মশগুল রয়েছেন।

বাংলাদেশে ইলমে হাদীসের দরসের সূচনা

সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের শাসনামলে শাহ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা ৬৬৮ হিজরী, মোতাবেক ১২৭০ খ্রিষ্ট্রাব্দে ঢাকার অদূরে সোনার গাঁয়ে সর্বপ্রথম হাদীসের দরস দেয়া শুরু করেন। তিনি এখানে বুখারী, মুসলিম এবং মুসনাদে আবী লায়লার দরস দান করেন।

দিগ দিগন্তের ইলম পিপাসুগণ হাদীস শেখার জন্য এখানে আগমন করতে থাকেন। এমনকি হিন্দুস্তান এবং দিল্লি থেকেও ছাত্ররা এখানে আগমন করে। তাঁর অন্যতম একজন শিষ্য হলেন—শাইখ শরফুদ্দীন আহমদ ইয়াহয়া মুনিরী (রহ.) (ইন্তিকাল ৭৭৩ হি.) তবে কুতুবে সিত্তার দরস সর্বপ্রথম চালু হয় হাটহাজারীতে ১৩২৬ হিজরীতে একং তা চালু করেন শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (রহ.)-এর প্রখ্যাত শাগরিদ এবং খলীফা মাওলানা সাঈদ আহমদ সন্দ্বীপী (রহ.)। এরপর ১৩২৭ হিজরীতে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় এর দরস শুরু হয়। পরবর্তীতে ঢাকা আলিয়া নাম ধারন করে মাদ্রাসাটি ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়।

দলীল হিসেবে হাদীস حجيت حديث

সকল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এ ব্যাপারে একমত যে, হাদীস শুধু কুরআনের মত অকাট্য দলীলই নয় বরং এটি শরীয়তের ভিত্তি, মাদারে ইসলাম এবং আহকামের অন্যতম উসূল। দুনিয়ার হকপন্থী সকল মুসলমান একে দলীল মনে করে এবং কুরআনের পর একেই শরীয়তের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিশ্বাস রাখে।

সর্বপ্রথম কিছু মু'তাযিলা এবং খারেজী সম্প্রদায় হাদীসকে দলীল হিসেবে মানতে অস্বীকৃতি জানায় এবং নানা রকম ভিত্তিহীন কথা বলে নিজেদের মতের

সমর্থন যোগাতে চেষ্টা করে। আহলে হক তাদের এই মত খণ্ডন করার জন্য বিভিন্ন কিতাব রচনা করেছেন। আগ্রহী পাঠকগণ বিস্তারিত জানতে (১) ইমাম বুখারীর (রহ.) كتاب الاعتصام (২) ইমাম শাফেঈর (রহ.) كتاب الاثار المرسلة (৩) ইমাম সিয়ূতীর (রহ.) مفتاح الجنة

(৪) বিচারপতি তকী উসমানীর The Authority of Sunnah (حجيت حديث)

(৫) ড. খালেদ মাহমূদের آثارحديث

(৬) আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহর لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث ـ

(৭) ড. মুস্তফা আস সিবায়ীর السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى ـ

(৮) ড. আব্দুল গনী আব্দুল খালেকের حجيت السنة ـ

(৯) ড. মুস্তফা আযমীর دراسات فى السنة النبوية وتاريخ تدوينه ـ

(১০) মানাযির হাসান গিলানীর تدوين حديث

(১১) ড. আকরাম আল ওমারীর بحوث فى السنة

(১২) শাইখ আব্দুর রশীদ নো'মানী (রহ.)-এর ابن ماجه اور علم حديث

(১৩) শাইখ আব্দুল হালীম চিশতীর فوائدجامعة بر عجاله نافعه

(১৪) ড. হাবীবুল্লাহ মুখতার (রহ.)এর السنة النبوية فى ضوء القران الكريم

ইত্যাদি কিতাবগুলো অধ্যয়ন করতে পারেন।

حجيت حديث-এর পক্ষে সংক্ষিপ্ত দলীল প্রদান করা হলো ঃ

কুরআনের ভাষ্য ঃ ১। ماآتاكم الرسول فخذوه الخ আলোচ্য আয়াতে اتاكم বলে কুরআন ও হাদীস উভয়টিকে মেনে নিতে বলা হয়েছে।

২। ان كنتم تحبون الله فاتبعونى আলোচ্য আয়াতে আল্লাহকে ভালোবাসার শর্ত হিসেবে ইত্তেবায়ে রাসূল (সা.) তথা হাদীসকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩। اطيعوا الله والرسول

৪। وان تطيعوه تهتدوا

৫। من يطع الرسول فقد اطاع الله

৬। وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله

৭। وما كان لمؤمن ولامؤمنة الخ

৮। وما ينطق عن الهوى

৯। فليحذرالذين يخالفون عن امره

১০। فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك আয়াতসমূহে রাসূল (সা.) ও তাঁর হাদীসকে মেনে নেয়ার জন্য জোরালোভাবে তাগিদ দেয়া হয়েছে। সুতরাং হাদীসকে দলীল হিসেবে অস্বীকার করা মানে কুরআন অস্বীকার করা। العياذ بالله

কুরআনে হাদীস (وحى غيرمتلو) এর অবস্থান

নিম্নোক্ত আয়াত প্রমাণ করে যে, হাদীসও কুরআনের মতই অকাট্য দলীল। যেমন—

১। وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَا ঃ আলোচ্য আয়াতে কিবলা বলতে বাইতুল মোকাদ্দাস উদ্দেশ্য। এর দিককে কেবলা বানিয়ে নামায পড়ার হুকুমকে আল্লাহ তা'আলা جعلنا বলে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। অথচ এটি রাসূলের আমল দ্বারা প্রমাণিত। এই মাসআলা বুঝতে একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা সহায়ক হবে বলে মনে করি। তাহলো রাসূল (সা.) মক্কায় থাকা অবস্থায় এমনভাবে নামায আদায় করতেন যাতে কা'বা ও বাইতুল মোকাদ্দাস উভয়টি সামনে পড়ে। কিন্তু মদীনায় আগমন করার পর সেটা সম্ভব না হওয়ায় শুধু বাইতুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করতেন। এই কাজটি وحى متلو তথা কুরআন দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল (সা.)-এর এই কাজটিকে جعلنا "আমি নির্দেশ" দিয়েছি বলে উল্লেখ করেছেন। কুরআনের দ্ব্যর্থহীন এই ঘোষণা প্রমাণ করে যে, সুন্নাহ বা حديث কুরআনের মতই মজবুত ও শক্তিশালী দলীল।

২। عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ تَخْتَانُوْنَ الخ আলোচ্য আয়াতে রোযার মাসে রাতে সহবাস করাকে আল্লাহ তা'আলা খেয়ানত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অথচ রোযার সময় রাতে সহবাস করা হারাম একথা হাদীস দ্বারা সাব্যস্থ করা হয়েছিল। এই আয়ত দ্বারাও বুঝা যায় রাসূলের (সা.) হাদীসও কুরআনের মত দলীল স্বরূপ। এ ধরনের আরো বহু আয়াত কুরআনে বিদ্যমান রয়েছে।

হাদীসের দৃষ্টিতে حجيت حديث

১। الا انى اوتيت القران ومثله معه الخ

২। اَمْرَانِ تَرَكْتُهُمَا فِيْكُمْ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهٖ ـ

৩। مَنْ اَطَاعَنِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ اَبٰى ـ

এসব হাদীসে হাদীসকে দলীল হিসেবে সাব্যস্থ করা হয়েছে এবং এর অস্বীকারকারীকে পথভ্রষ্ট জাহান্নামী বলা হয়েছে।

ইজমায়ে উম্মত ঃ আগেই উল্লেখ করেছি হকপন্থী সমস্ত মুসলিম বিশ্ব হাদীস কে অকপটে দলীল হিসেবে মেনে নিয়েছে। তথা حجيت حديث-এর ব্যাপারে মুসলমানদের ইজমা সাব্যস্থ হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন— لولا السنة ما فهم احدنا القران -হাদীস না থাকলে আমাদের কেউই যথার্থ ভাবে কুরআন বুঝত না। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলেন—"হাদীস কুরআনের ব্যাখ্যা স্বরূপ"।

কিয়াসের দৃষ্টিতে حجيت حديث

কিয়াস অনুযায়ীও হাদীস দলীল হওয়া প্রমাণ করে। উদাহরণস্বরূপ, কুরআনে নামায, যাকাত এবং আরো বিভিন্ন হুকুম বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়নি। বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে হাদীসে। হাদীস যদি দলীলই না হয় তাহলে এসব হুকুম পালন করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

متن، مسند، سند، اسناد-এর অর্থ

سند : سند-এর শাব্দিক অর্থ ঃ سلسلة الرجال الموصلة الى المتن তথা মতন পর্যন্ত রাবীর ক্রমবিন্যাসকে সনদ বলে।

اسناد : اسناد-এর শাব্দিক অর্থও অনেকটা سند -এর মত।

পরিভাষায় اسناد বলা হয়— عز والحديث الى قائله مسندا তথা ধারাবাহিক ক্রম বিন্যাসের সাথে হাদীসকে বক্তা পর্যন্ত পৌছে দেয়া।

متن ঃ متن -এর শাব্দিক অর্থ বস্তুর উপরের অংশ, রাস্তার মধ্যখান, মূল বস্তু, শিকড় ইত্যাদি। পরিভাষায় متن বলা হয় ماينتهى اليه من الكلام السند। তথা সনদের পরের (বাক্যের মূল) অংশকে।

مسند ঃ مسند শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। (ক) কিতাব যা কে রাবীর ক্রমবিন্যাস অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। যেমন ঃ مسند ابی لیلی (খ) ঐ হাদীস যা মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত।

حدیث مرسل (মুরসাল হাদীস)

حدیث مرسل-এর পরিচয়

শাহ্ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) বলেন—

ان سقط الراوی من اٰخر السند بعد التابعی فالحدیث مرسل

তথা সনদের মধ্যে তাবেঈর পরে যদি রাবী বাদ পড়ে যায় সেই হাদীসকে حدیث مرسل বলে। মুরসাল দুই প্রকার। ১। مرسل جلی ২। مرسل خفی

مرسل جلی বলা হয় ঐ হাদীসকে যা এমন রাবী বর্ণনা করেন مروی عنه-এর সাথে যার ملاقات (সাক্ষাত) হয়নি। কিংবা তাঁর কাছ থেকে অনুমতি (اجازت) বা وجادة (কপি) পাননি। অথচ এমন শব্দে হাদীসটি বর্ণনা করেন যাতে মনে হয় مروی عنه-এর সাথে তার সাক্ষাত হয়েছে!

مرسل خفی বলা হয় যা এমন রাবী বর্ণনা করেন যিনি مروی عنه-এর সমকালীন বটে কিন্তু তাঁর সাথে সাক্ষাত ঘটেনি। বা তাঁর থেকে অনুমতি বা কপিও মেলেনি অথচ বর্ণনা করেন এমন শব্দ দ্বারা যাতে মনে হয় তাঁর সাথে সাক্ষাত হয়েছে।

মুরসাল হাদীসের হুকুম

এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়।

تدریب الراوی তে এ ব্যাপারে ১০টি মতামত এবং ظفرالامانی তে ৯টি মতামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে তা পেশ করা গেল।

(১) কোন মুরসাল হাদীসই গ্রহণযোগ্য নয়। যদিও ইরসালকারী সাহাবী হন না কেন।

(২) সর্বপ্রকার মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য।

(৩) قرون ثلثة-এর কেউ ইরসাল করলে তা গ্রহণযোগ্য, অন্য কারো ইরসাল নয়।

(৪) রেওয়ায়াতের ব্যাপারে অত্যন্ত বিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য রাবীর ইরসাল গ্রহণযোগ্য।

(৫) সকল সাহাবী এবং তাবেঈদের মধ্যে শুধুমাত্র সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের حديث مرسل গ্রহণযোগ্য।

(৬) যদি حديث مرسل-এর ভিন্ন কোন সমর্থক হাদীস পাওয়া যায় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য।

(৭) শুধু كبار تابعين-এর حديث مرسل গ্রহণযোগ্য, পরবর্তী কারো ইরসাল নয়।

(৮) কেউ বলেন, মুরসাল হাদীস বরং حديث مسند-এর চেয়ে শক্তিশালী।

(৯) মুরসাল হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করা উত্তম (امر ندبى) ওয়াজিব (امر وجوبى) নয়।

(১০) ইবাদতের ক্ষেত্রে حديث مرسل ছাড়া অন্য কোন দলীল না থাকলে তখন মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য। كتاب المراسيل لابى داؤد পৃষ্ঠা ১.

ইতিহাসের নিরিখে রাবীদের স্তর বিন্যাস

রাবীগণের স্তর ঃ

ইতিহাসের দৃষ্টিকোণে রাবীদের স্তর ১২টি।

সর্বপ্রথম ইবনে হাজার (রহ.) "তাকরিবুত্ তাহ্যীবে" এই স্তর নির্ণয় করেন।

পরবর্তী যুগের সবাই এটাকেই মেনে নিয়েছেন। স্তরবিন্যাস নিম্নরূপ

১। সাহাবাগণের তবকা।

২। كبار تابعين তথা প্রবীণ তাবেঈগণের তবকা।

৩। الطبقة الوسطى من التابعين "তথা তাবেঈগণের মধ্যম তবকা।"

৪। طبقة تلى الوسطى من التابعين "মধ্যমদের পরবর্তী তবকা।"

৫। الطبقة الصغرى من التابعين "তাবেঈদের কনিষ্ঠ তবকা।"

৬। الطبقة الاخيرمن التابعين "তাবেঈদের সর্বশেষ তবকা।"

৭। كبار اتباع التابعين "তাবে-তাবেঈদের প্রবীণ তবকা।"

৮। الطبقة الو سطى من اتباع التابعين "তাবে তাবেঈদের মধ্যম তবকা।"

৯। الطبقة الصغرى من اتباع التابعين তাবে তাবেঈদের সর্বশেষ তবকা।

১০। كبار الاخذين من اتباع التابعين তাবে তাবেঈদের (হাদীস) গ্রহণকারীদের প্রথম তবকা।

১১। الطبقة الوسطى من اتباع التابعين হাদীস গ্রহণকারী মধ্যম তবকা।

১২। الطبقة الصغرى من اخذين من اتباع التابعين তাবে তাবেঈদের থেকে গ্রহণকারী সর্বশেষ তবকা।

ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ১১তম তবকার এবং ইমাম তিরমিযী প্রমুখ ১২ তম তবকার রাবী।

উল্লেখিত ১২ তবকার প্রথম দুই তবকার অধিকাংশ রাবী ১ম শতাব্দীর, ৩ থেকে ৮ নং তবকা ২য় শতাব্দীর এবং ৯ থেকে ১২ পর্যন্ত তবকা ৩য় শতাব্দীর রাবী :

নির্ভরযোগ্যতা (ضبط وملازمت) এর বিচারে রাবীদের তবকা

ضبط-এর বিচারে রাবীদের তবকা পাঁচটি।

আল্লামা আবূ বকর হাযেমী (রহ.) সর্বপ্রথম এই তবকা নির্ণয় করেন। তবকাটি নিম্নরূপ ঃ

১। قوى الضبط كثير الملازمة

২। قوى الضبط قليل الملازمة

৩। قليل الضبط كثير الملازمة

৪। قليل الضبط قليل الملازمة

৫। والضعفاء والمجاهيل

উল্লেখিত তারতীব অনুযায়ী কুতুবে সিত্তার তারতীব নিম্নরূপ।

১। বুখারী

২। মুসলিম

৩। সুনানে নাসায়ী

৪। সুনানে আবূ দাউদ

৫। জামে' তিরমিযী

৬। সুনানে ইবনে মাজা

তারতীবের মাপকাঠি (مدار الترتيب)

ইমাম বুখারী (রহ.) পূর্ণাঙ্গ ভাবে শুধুমাত্র প্রথম স্তর থেকে হাদীস গ্রহণ করতেন তবে কদাচিত প্রমাণ স্বরূপ দ্বিতীয় স্তর থেকেও গ্রহণ করতেন।

একারণে বুখারীর স্থান সবার উর্ধ্বে। ইমাম মুসলিম (রহ.) মৌলিক ভাবে প্রথম দুই তবকা থেকে হাদীস গ্রহণ করতেন, আর প্রমাণ স্বরূপ তৃতীয় তবকা থেকেও গ্রহণ করতেন কখনো।

এ কারণে বিশুদ্ধতার বিচারে মুসলিমের স্থান দ্বিতীয়তে।

ইমাম নাসায়ী (রহ.) প্রথম তিন তবকা থেকে মৌলিক ভাবে এবং চতুর্থ তবকা থেকে প্রমাণ স্বরূপ (استشهاد) হাদীস গ্রহণ করতেন। ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) প্রথম চার তবকা থেকে, ইমাম তিরমিযী (রহ.) প্রথম পাঁচ তবকা থেকে এবং ইমাম ইবনে মাজা সব তবকা থেকে মৌলিকভাবে হাদীস গ্রহণ করতেন। আর এভাবেই এসব কিতাবের স্তর নির্মিত হয়েছে।

সিহাহ সিত্তার ইমামগণের নসবনামা

১। ইমাম বুখারী ঃ শাইখুল ইসলাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে মুগীরা ইবনে বারদিযবাহ আলজু'ফী আল বুখারী (রহ.)।

জন্ম ঃ ১৯৪ হিঃ ইন্তিকাল ২৫৬ হিজরী।

২। ইমাম মুসলিম (রহ.) ঃ আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আল কুশাইরী (রহ.)।

জন্ম ঃ ২০৪ হিজরী ইন্তিকাল ঃ ২৬১ হিজরী।

৩। ইমাম নাসায়ী (রহ.) ঃ ইমাম আহমদ ইবনে শোআইব ইবনে আলী ইবনে বাহার ইবনে সিনান ইবনে দীনার নাসায়ী (রহ.)।

জন্ম ঃ ২১৫ হিঃ ইন্তিকাল ঃ ৩০৩ হিঃ।

৪। ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) ঃ ইমাম সোলায়মান ইবনে আশ'আস ইবনে ইসহাক ইবনে বাশীর ইবনে শাদ্দাদ ইবনে আমর ইবনে ইমরান আল আযদী আস-সিজিস্তানী।

জন্ম ঃ ২০২ হিঃ ইন্তিকাল ঃ ২৭৫ হিজরী।

৫। ইমাম তিরমিযী (রহ.)। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ঈছা ইবনে সাওরা ইবনে মূসা ইবনে জাহহাক সুলামী আল বুগী আত তিরমিযী।

জন্ম ঃ ২০৯ হিঃ ইন্তিকাল ঃ ২৭৩ হিজরী।

সিহাহ সিত্তার পূর্ণ নাম

১। বুখারীর পূর্ণ নাম ঃ الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه ـ

২। মুসলিম শরীফের পূর্ণ নাম ঃ

المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

৩। নাসায়ী শরীফের পূর্ণ নাম ঃ المجتبى من السنن او السنن الصغرى

৪। আবূ দাঊদ শরীফের পূর্ণ নাম ঃ سنن ابى داؤد

৫। তিরমীযি শরীফের পূর্ণ নাম ঃ الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ

৬। ইবনে মাজা শরীফের পূর্ণ নাম ঃ سنن ابن ماجة

تحويل سند-এর অর্থ

সনদের মধ্যবর্তী ح হরফটি تحويل-এর দিক নির্দেশ করে। এর অর্থ সনদের এক অংশ বদলে যাওয়া। এর পড়ার ধরন সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। পশ্চিম মুল্লুকের আলিমগণ تحويل এবং হিন্দুস্তানী আলিমগণ "ح" পড়েন। কেউ আবার কিছু লম্বা করে কেউ লম্বা না করে قصر করে পড়েন।

শাহ সাহেব (রহ.) বলেন দ্বিতীয় পদ্ধতিতে পড়াই উত্তম। প্রখ্যাত নাহ্‌বীদ ইমাম সিবওয়াই (রহ.) কায়দা অনুযায়ী এভাবেই পড়া উচিত।

تحويل-এর প্রকারভেদ

تحويل দুই প্রকার।

১। লিখকের কিতাব থেকে দুই সনদ আলাদা আলাদা চলার পর ওপরে গিয়ে দুই সনদ মিলে যাওয়া। যে বারীর কাছে গিয়ে মিলিত হয় তাকে مدار الاسنا ـ বলে।

২। লিখক থেকে এক সনদ চলার পর ওপরে গিয়ে রাস্তা ভাগ হয়ে যাওয়া। কুতুবে সিত্তায় এই প্রকারের تحويل-এর সংখ্যা খুবই নগন্য। তবে প্রথমটার সংখ্যা প্রচুর।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, تحويل-এর ক্ষেত্রে মুসান্নিফগণ সেই মতন (متن) উল্লেখ করেন যা عالى তথা যার واسطة কম।

صحاح ستة বলার কারণ

সিহাহ সিত্তা বলার কারণে অনেক লোক এ কথা ধারনা করে যে, এর সকল হাদীস সহীহ আর কিছু লোক ধারণা করে এই কিতাবগুলো ছাড়া অন্য কোন কিতাবের হাদীস সহীহ নয়।

উভয় প্রকার লোকের ধারণা ভুল। বাস্তব কথা হলো, সিহাহ সিত্তার সকল হাদীসই যেমন সহীহ নয় তেমনিভাবে এছাড়া অন্য কিতাবের সব হাদীসই যঈফ নয়।

বরং صحاح ستة বলা হয় একারণে যে, যে ব্যক্তি এই ছয়টি কিতাব পাঠ করবে তার সামনে সহী হাদীসের এক বিশাল দিগন্ত উন্মোচিত হবে। সে ইচ্ছা করলে এই ছয়টি কিতাব ছাড়া অন্যান্য কিতাব থেকেও সহীহ হাদীস সংগ্রহ করতে পারবে। যেহেতু এই ছয় কিতাবের বেশির ভাগ হাদীস সহীহ এবং এ সম্পর্কে অবগত হওয়া সহজসাধ্য এ কারণে এগুলোকে صحاح ستة বলা হয়।

–দরসে তিরমিযী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৬

শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহ.) বলেন—

وتسميتها بالصحاح الست بطريق التغليب.

বিশুদ্ধতার সংখ্যাধিক্যের কারণে এই কিতাবগুলোকে صحاح ستة নামকরণ করা হয়েছে।

ইমামগণের হাদীস সংকলনের শর্ত শরায়েত

ইমামগণ হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে কোন ধরনের শর্তারোপ করেছেন, কোন উসূল সামনে রেখেছেন তা যথার্থ ভাবে উপলব্ধি করা মুশকিল। কেননা তাঁরা কোথাও সুস্পষ্ট করে এসব শর্ত বা উসূলের কথা উল্লেখ করেন নি। ওলামায়ে কিরাম তাঁদের কিতাব পাঠ করে এর ধরন, হাদীস সংকলনে তাঁদের কর্মপন্থা ইত্যাদি কতক বিষয় গবেষণা করে কিছু শর্ত শরায়েত বের করেছেন।

এ বিষয়ে ইমাম আবূ বকর হাযেমীর (রহ.) الائمة الخمسة এবং ইমাম হাফেয আবুল ফযল মুকাদ্দেসীর (রহ.) شروط الائمة الستة নামের দু'টি প্রসিদ্ধ রেসালা পাওয়া যায়।

এই রেসালা দু'টিতে এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। এর সার নির্যাস পাঠকদের সামনে পেশ করা হলো।

"সবচেয়ে কঠিন শর্তারোপ করেছেন ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর বুনিয়াদী শর্ত হলো, শুধু ঐসব হাদীস সংকলন করা, যা বিশুদ্ধতার সর্বক্ষেত্রে উত্তীর্ণ এবং শুধু মাত্র পাঁচ তবকা থেকে প্রথম তবকার রাবীর হাদীস নেয়া। তবে কোন সময় কারণ বিশেষে দ্বিতীয় তবকা থেকেও হাদীস নেয়া তবে সেটা মৌলিক হিসেবে নয় আনুষাঙ্গিক ভাবে।

ইমাম মুসলিম (রহ.) যদিও পূর্ণমাত্রায় বিশুদ্ধতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন তবে তাঁর শর্ত ইমাম বুখারীর শর্তের চেয়ে কিছুটা নমনীয়। তিনটি কারণ উল্লেখ করলে বিষয়টা পরিস্কার বুঝে আসবে।

১। ইমাম বুখারী (রহ.) শুধুমাত্র প্রথম তবকা অর্থাৎ قوى الضبط كثير الملازمة (রাবী) থেকে মৌলিকভাবে হাদীস গ্রহণ করেছেন আর কোন সময় আনুষাঙ্গিক বা সমর্থক হিসেবে দ্বিতীয় তবকা থেকে গ্রহণ করেছেন। অথচ ইমাম মুসলিম (রহ.) উভয় তবকা থেকেই মৌলিকভাবে হাদীস গ্রহণ করেছেন।

২। ইমাম বুখারীর (রহ.) মতে حديث معنعن গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য راوى এবং مروى عنه-এর মধ্যে পরস্পরে সাক্ষাত হওয়া জরুরী অথচ ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর মতে সাক্ষাত জরুরী নয়। উভয়ে এক যুগের লোক হলে এবং পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকাই যথেষ্ট।

৩। ইমাম মুসলিম (রহ.) রাবীদের (সমালোচনার) ক্ষেত্রে ইমাম বুখারীর চেয়ে নমনীয়। কেননা তিনি সমালোচিত এ রকম অনেক রাবীর হাদীস গ্রহণ করেছেন যা ইমাম বুখারী (রহ.) পরিত্যাগ করেছেন।

এ কারণেই দেখা যায় মুসলিমের সমালোচিত রাবীর সংখ্যা বুখারীর চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ তথা একশত ষাটজন।

আর বাকী ইমামগণের স্তর তাই—যা রাবীদের স্তর উল্লেখ করতে গিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। একথা মনে রাখতে হবে যে, হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে ইমাম নাসায়ী আবূ দাউদ থেকে আবূ দাউদ তিরমিযী থেকে এবং তিরমিযী ইবনে মাজা থেকে কঠোর।

হাদীসের কিতাবের শ্রেণী নির্ণয়

✪ শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহ্লভী (রহ.) বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন গ্রন্থে হাদীসের কিতাবের পাঁচটি শ্রেণী উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তা পেশ করা হলো।

১। طبقة اولى (প্রথম তবকা) ঃ ঐসব কিতাব যাতে শুধুমাত্র সহীহ্ হাদীস সংকলন করা হয়েছে এবং সহীহ হওয়ার যাবতীয় শর্ত এতে বিদ্যমান। এসব কিতাবকে صحاح مجردة বলে।

নিম্নোক্ত কিতাবগুলো এই প্রকারের মধ্যে শামিল। যথা, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সহীহ ইবনে হিব্বান, সহীহ ইবনে খুযাইমা, সহীহ ইবনে আওয়ানা, মুয়াত্তা, মুস্তাদরাকে হাকিম ইত্যাদি।

(২) طبقة ثانية (দ্বিতীয় তবকা) ঃ ঐসব কিতাব যার সংকলকগণ এই শর্ত করেছেন যে, এতে حسن দরজার চাইতে নিম্ন পর্যায়ের কোন হাদীস উল্লেখ করবেন না। যদি প্রাসঙ্গিকভাবে কোন যঈফ হাদীস এসেও যায় তাহলে তা পাঠকদেরকে অবহিত করবেন।

সুতরাং এসব কিতাবের কোন হাদীসের ব্যাপারে যদি নিরব থাকা হয় তাহলে বুঝা যাবে হাদীসটি সহীহ অথবা حسن এই স্তরের কিতাবের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ হলো নাসায়ী শরীফ। এর পরেই আবূ দাঊদ, তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ এর স্থান।

৩। طبقة ثالثة (তৃতীয় তবকা) ঃ ঐসব কিতাব যাতে ضعيف، حسن، صحيح، منكر এমনকি موضوع হাদীসও উল্লেখ করা হয়েছে। এই স্তরের কয়েকটি কিতাব নিম্নরূপ ঃ

সুনানে ইবনে মাজা, সুনানে দারে কুতনী, মুসনাদে তায়ালেসী হানাফী, মুসনাদে হুমায়দী, মা'আজেমে তাবরানী ইত্যাদি।

৪। طبقة رابعة (চতুর্থ তবকা) ঃ ঐসব কিতাব যার অধিকাংশ হাদীস যঈফ। যেমন আবূ আব্দুল্লাহর نوادرالاصول فى احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم, ইমাম ইবনে আদীর (রহ.) الكامل এবং (উকাইলির (রহ.) كتاب الضعفاء للعقيلى

৫। طبقة خامسه (পঞ্চম তবকা) ঃ ঐসব কিতাব যাতে মানুষকে সতর্ক করার জন্য শুধুমাত্র موضوع হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন— وموضوعات كبرى لابن الجوزى الموضوعات للصنعانى ইত্যাদি।

–দরসে তিরমিযী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬৩

হাদীস বর্ণনার শব্দসমূহ

(تحمل حديث)ঃ (الفاظ اداء حديث واقسام)

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) صيغ الاداء তথা হাদীস বর্ণনার শব্দ সমূহের সংখ্যা বর্ণনা করেছেন ৮টি। تحمل حديث-এর আরো স্তর রয়েছে। পর্যায় ক্রমে তা বর্ণনা করা হবে। সেই ৮টি শব্দ নিম্নরূপ ঃ

(١) سمعت وحدثنى

(٢) اخبرنى وقرأت عليه

(٣) قرى عليه وانا اسمع

(٤) انبأنى

(٥) ناولنى

(٦) شافهنى

(٧) كتب الى

(٨) عن، قال، ذكر، روى

اقسام تحمل ঃ শাইখ (ওস্তাদের) কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা করাকে পরিভাষায় تحمل حديث বলে।

এর পাঁচটি স্তর রয়েছে। সংক্ষিপ্তাকারে তা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

১। السماع ঃ এর অর্থ হলো ওস্তাদ হাদীস পাঠ করবেন আর ছাত্ররা তা শ্রবণ করবে।

এক্ষেত্রে ছাত্ররা سمعت فلانا، حدثنى ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করতে পারবে।

২। القراءة على الشيخ অর্থাৎ ছাত্র হাদীস পাঠ করবে আর ওস্তাদ তা

শ্রবণ করবেন। এক্ষেত্রে একজন হলে انبأني، اخبرني এ জাতীয় শব্দ ব্যবহৃত হয় আর একাধিক ছাত্র হলে انبأنا، اخبرنا শব্দ ব্যবহৃত হয়।

৩। المراسلة والمكاتبة ঃ অর্থাৎ চিঠিতে লিখে কারো কাছে রেওয়ায়াত (হাদীস) পাঠিয়ে দেয়া। এসব ক্ষেত্রে كاتبني، كتب الى، ارسل الى এ জাতীয় শব্দ ব্যবহৃত হয়।

৪। المناولة ঃ অর্থাৎ ওস্তাদ কর্তৃক কোন ছাত্রকে হাদীসের বিশাল সংকলন (পাভুলিপি) দিয়ে দেয়াকে مناولة বলা হয়। এসব ক্ষেত্রে ناولني শব্দ ব্যবহার করতে হয়।

৫। الوجادة ঃ অর্থাৎ ওস্তাদের কোন সংকলন ভান্ডার তাঁর (ওস্তাদের) মাধ্যম না হয়ে অন্য কারো মাধ্যমে অর্জিত হওয়া।

এসব ক্ষেত্রে وجدت بخط فلان বা এ জাতীয় শব্দ প্রয়োগ করতে হয়। এছাড়াও ذكر، روى، قال، عن-এ জাতীয় শব্দ দ্বারা হাদীস বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

اخبرني ও اخبرنا এবং حدثني ও حدثنا-এর মধ্যে পার্থক্য

উল্লেখ্য যে এই সীগা গুলোতে দুই ধরনের মতভেদ রয়েছে। যথা ঃ
(ক) ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মতভেদ (খ) শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় নিয়ে মতবিরোধ।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মতভেদের অর্থ হলো শব্দগুলো কি একবচন ব্যবহার করা হবে না কি বহুবচন ব্যবহার করা হবে। কেউ কেউ বলেন যদি শ্রোতা (ছাত্র) মাত্র একজন হয়, তাহলে একবচন তথা حدثني শব্দ ব্যবহার করতে হবে। আর ছাত্র যদি একাধিক হয় তাহলে বহুবচন তথা حدثنا শব্দ ব্যবহার করতে হবে।

এমনিভাবে ওস্তাদের কাছে পড়ুয়া যদি একজন হয় এবং তার সাথে আর কেউ না থাকে তাহলে একবচনের সীগা তথা اخبرني উল্লেখ করতে হবে আর যদি একাধিক ছাত্র থাকে তাহলে اخبرنا উল্লেখ করতে হবে।

আর কেউ কেউ বলেন—একবচন বহুবচনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সর্বাবস্থায় একবচন বা বহুবচনের সীগা ব্যবহার করা যাবে।-ফযলুল বারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৬৯

দ্বিতীয় মতবিরোধ হলো শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে। অর্থাৎ কারো মতে حدثني উত্তম سمعت বলার চেয়ে। আর কেউ মতপোষণ করেন ঠিক এর উল্টো।

حدثنا এবং اخبرنا সীগাগুলো একটা অপরটার জায়গায় ব্যবহৃত হয় কিনা।

এ ব্যাপারে ইমাম বুখারীর (রহ.) মত হলো এসব সীগা সব বরাবর। একটি অপরটির স্থানে ব্যবহৃত হতে পারে। তবে عن শব্দ দ্বারা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি এতটুকু শর্ত করেছেন যে, لقاء সাবেত থাকতে হবে।

অধিকাংশ متقدمين ওলামায়ে কিরামের মত এটাই যে, সীগাগুলো একটি অপরটির স্থানে ব্যবহৃত হতে পারে।

আর ইমাম মুসলিম (রহ.) সহ কতক ওলামায়ে কিরামের মতে حدثنا এবং اخبرنا-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

حدثنا ব্যবহৃত হয় ঐ ক্ষেত্রে সেখানে ছাত্র ওস্তাদের কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করে আর اخبرنا ব্যবহৃত হয় যেখানে ছাত্র ওস্তাদের কাছে পাঠ করে। এতে অবশ্য একটি মতবিরোধ আছে যে, ওস্তাদের কাছ থেকে শোনা উত্তম না পাঠ করা উত্তম। ইমাম মালেক ও শাফেঈ (রহ.)-এর মতে سماع তথা ওস্তাদের মুখ থেকে শোনা উত্তম। আর ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে ওস্তাদের কাছে পাঠ করা উত্তম। কেননা এক্ষেত্রে ছাত্ররা স্বউদ্যোগী হয়ে নির্ভুল পাঠ করার চেষ্টা করে যার ফলে ভুলত্রুটি কম হয়।

حديث ، خبر এবং اثر-এর অর্থ এবং এগুলোর মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক

حديث ঃ শাব্দিক অর্থ নতুন, নতুনত্ব। পরিভাষায় حديث বলা হয়

هو ما اضيف الى النبى صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او وصف خلقى او خلقى -

"অর্থাৎ রাসূলের (সা.) কথা, কাজ, কোন বিষয়কে সমর্থন এবং তাঁর যাবতীয় আচার অভ্যাসকে حديث বলে।

خبر ঃ শাব্দিক অর্থ সংবাদ (نبأ)। আর পরিভাষায় خبر বলা হয়

هوما جاء من غير النبى صلى الله عليه وسلم

اثر ঃ اثر-এর শাব্দিক অর্থ অবশিষ্টাংশ (بقية الشئ) আর পরিভাষায় الاثر ما روى عن الصحابة والتابعين من اقوال وافعال বলা হয় اثر।

অর্থাৎ সাহাবা ও তাবেঈগণের কথা ও কাজকে اثر বলা হয়।

سنة-এর অর্থ ঃ سنة-এর শাব্দিক অর্থ রাস্তা, তরীকা, পথ।

পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ বলেছেন حديث-এর যে অর্থ سنة ঠিক সেই অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

তবে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। কেননা حديث হলো রাসূলের (সা.) যাবতীয় কথা, কাজ এবং জীবনীর নাম, চাই তা আমলযোগ্য হোক বা না হোক। আর سنة হলো রাসূল (সা.) এর ঐসব কথা বা কাজ যা আমলযোগ্য।

حديث এবং خبر-এর মধ্যে نسبت (সম্পর্ক)

এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। যথা ঃ

১। حديث এবং خبر প্রতিশব্দ (مرادف)।

২। কেউ বলেন উভয়ের মধ্যে বিপরীতধর্মী সম্পর্ক (نسبت تباين) বিদ্যমান। কেননা রাসূল (সা.)-এর কথাকে سنة বলে আর রাসূল (সা.) অন্য কারো কথা বা সংবাদকে خبر বলে।

৩। কেউ বলেন উভয়ের মধ্যে عموم خصوص مطلق-এর সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থ حديث বলা হয় শুধু রাসূলের (সা.) কথাকে আর خبر বলা হয় রাসূল (সা.) ও অন্য যে কারো সংবাদ বা কথাকে।

اثر এবং سنة-এর মধ্যে সম্পর্ক

১। কেউ বলেন উভয়টি একই অর্থ বোধক তথা مرادف

২। অধিকাংশ আলিমের মতে এ দুটি ভিন্ন অর্থধর্মী। কেননা سنة হলো, রাসূলের কথা ও কাজ, আর اثر হলো সাহাবা ও তাবেঈগণের কথা ও কাজ।

حديث مسلسل بالاولية এর পরিচয়

পূর্বযুগের আলিমগণ এবং বর্তমানে আরব এলাকার আলিমগণ বিশেষ এক হাদীস দিয়ে দরস শুরু করতেন। একে حديث مسلسل بالاولية বলে।

যেমন এই হাদীসটি—

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء ـ

নুখবাতুল ফিকারের হাশিয়ায় এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এরূপ —

الذى رواه التلميذ عن شيخه فى اول ملاقاته ـ

অর্থাৎ ওস্তাদের সাথে প্রথম সাক্ষাতে ছাত্র যে হাদীস রেওয়ায়াত করে তাকে حديث مسلسل بالاولية বলে।

হাদীসের কিতাবের প্রকারভেদ

শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহ্লভী (রহ.) العجالة النافعة গ্রন্থে كتب حديث-এর প্রকার উল্লেখ করেছেন পাঁচটি। আবু দাউদের মোকাদ্দমায় প্রকার বলা হয়েছে ১৫টি। নিচে সংক্ষিপ্তাকারে পরিচয় সহ তা পেশ করা হলো।

১। **الجامع** ঃ الجامع বলা হয় ঐ কিতাবকে যাতে ন্যূনতম আটটি বিষয় উল্লেখ করা হয়। যথা ঃ ইতিহাস, শিষ্টাচার, ব্যাখ্যা-তাফসীর, আকীদা-বিশ্বাস, ফেতনা-ফাসাদ, কেয়ামতের আলামত, হুকুম আহকাম এবং মানাকিব তথা বিশেষ ব্যক্তিদের মহত্ত্বের বর্ণনা। এই আটটি বিষয় কবিতায় উল্লেখ করা হয়েছে— سير آداب وتفسير ومناقب * فتن واشراط واحكام ومناقب ـ

যেমন, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী।

২। **السنن** ঃ السنن হাদীসের ঐ কিতাব যাতে ফেকহী তারতীবে হাদীস উল্লেখ করা হয়। যেমন সুনানে নাসায়ী, সুনানে আবূ দাউদ ইত্যাদি।

৩। **المسانيد** ঃ مسانيد বলা হয় ঐসব কিতাবকে যাতে সাহাবাগণের নামের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী হাদীস উল্লেখ করা হয়। যেমন, مسند ابى يعلى، مسند بزار ইত্যাদি।

৪। **المعاجم** ঃ معاجم বলা হয় ঐ কিতাবকে যাতে ওস্তাদের তারতীব অনুযায়ী হাদীস উল্লেখ করা হয়। যেমন ঃ معجم طبرانى

৫। **الاجزاء** : اجزاء বলা হয় ঐ কিতাবকে, যাতে এক বিষয়ের সকল হাদীস উল্লেখ করা হয়। যেমন নামাযের মধ্যে رفع يدين সম্পর্কে ইমাম বুখারীর লিখিত جزء رفع اليدين للبخارى رح

৬। **الصحيح** : الصحيح। সহীহ বলা হয় ঐ কিতাবকে যাতে শুধু সহীহ হাদীস উল্লেখ করা হয়। যেমন—বুখারী, মুসলিম।

৭। **المستخرج** : مستخرج বলা হয় ঐ কিতাবকে যাতে অন্য কোন কিতাবের হাদীস এমন সনদে উল্লেখ করা হয় যেই সনদে সেই কিতাবের মুসান্নিফের নাম আসেনা। যেমন— مستخرج ابى عوانة على صحيح مسلم

৮। **المستدرك** : مستدرك বলা হয় ঐ কিতাবকে যাতে অন্য কোন কিতাবের ছুটে যাওয়া ঐসব হাদীস উল্লেখ করা হয় যেসব হাদীসে ঐ কিতাবের যাবতীয় শর্ত বিদ্যমান। যেমন— مستدرك حاكم

৯। **المفرد** : مفرد বলা হয় ঐ কিতাবকে যাতে কোন বিশেষ একজন শাইখের একক হাদীস উল্লেখ করা হয়। যেমন— كتاب الافراد للدار قطنى

১০। **المراسيل** : مرسل বলা হয় ঐ কিতাবকে যাতে শুধু মুরসাল হাদীস উল্লেখ করা হয়। যেমন— مراسيل ابى داؤد

১১। **الامالى** : বলা হয় ঐ কিতাবকে যেই কিতাব ওস্তাদের নির্দেশে ছাত্ররা লিখে নেয়। যেমন— امالى الحافظ ابن حجر، امالى محمد

১২। **الاربعين** : اربعين। বলা হয় ঐ কিতাবকে যাতে এক বা একাধিক বিষয়ের চল্লিশটি হাদীস উল্লেখ করা হয়।

১৩। **الاطراف** : اطراف। বলা হয় ঐ কিতাবকে যাতে হাদীসের শুরু এবং শেষাংশ উল্লেখ করা হয়ে থাকে এবং শেষে উদ্ধৃতি উল্লেখ করা থাকে।

যেমন— الاطراف لابن عساكر।

১৪। **الرسالة** : رسالة বলা হয় ঐ কিতাবকে যাতে পূর্বে বর্ণিত আটটি বিষয়ের কোন একটি বিষয়ের হাদীস উল্লেখ করা থাকে।

১৫। **الغريبة** : غريب বলা হয় ঐ কিতাবকে যাতে কোন এক শাগরিদ এমন হাদীস উল্লেখ করেন যা অন্য কেউ করেননি।

রাবী সমালোচিত হওয়ার কারণসমূহ (وجوه طعن)

طعن -এর শাব্দিক অর্থ নেযা মারা, দোষারোপ করা, আর পরিভাষায় طعن বলা হয়, এমন কতক দোষাবলী যার কারণে রাবী সমালোচিত ও দোষী সাব্যস্থ হোন। এরূপ কারণ দশটি। পাঁচটির সম্পর্ক عدالت তথা ন্যায়পরায়ণতার সাথে। আর পাঁচটির সম্পর্ক ضبط তথা স্মৃতিশক্তির সাথে।

عدالت-এর সাথে সম্পৃক্ত পাঁচটি কারণ হলো, (১) الكذب। (তথা মিথ্যাবাদী হওয়া) (২) المتهم بالكذب। (মিথ্যার দোষে দোষী হওয়া) (৩) (পাপ কাজে লিপ্ত হওয়া) (৪) الجهلة। (অজ্ঞতা প্রকাশ পাওয়া) এবং (৫) البدعة। বেদা'আতে জড়িয়ে পড়া।

ضبط -এর সাথে সম্পৃক্ত পাঁচটি হলো, (১) الغفلة। (উদাসীনতা প্রকাশ পাওয়া) (২) كثرة الغلط (অধিকহারে ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ পাওয়া)

(৩) مخالفة الثقات। (নির্ভরযোগ্য রাবীর রেওয়ায়াতের সাথে মতবিরোধ করা) (৪) الوهم। (সন্দেহের বশীভূত হওয়া) এবং (৫) سوء الحفظ। (দুর্বল স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন হওয়া)

متهم بالكذب এবং كذب -র অর্থ

كذب-এর অর্থ হলো হাদীসের ব্যাপারে মিথ্যাবাদী সাব্যস্থ হওয়া তথা হাদীস জাল করার দোষে দুষ্ট হওয়া আর متهم بالكذب-এর অর্থ হলো স্বাভাবিক কথাবার্তায় মিথ্যাবাদী সাব্যস্থ হওয়া। হাদীসের ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ না থাকা।

উভয় প্রকারের হুকুম

প্রথম প্রকার হাদীসকে موضوع হাদীস বলে। এরূপ রাবীর হাদীস কস্মিনকালেও গ্রহণযোগ্য নয় যদিও সে তওবা করে। আর দ্বিতীয় প্রকার রাবীর হাদীসকে حديث متروك বলে। সে যদি খালেস তওবা করে এবং এর আলামত সঠিক ভাবে পাওয়া যায় তাহলে তার হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে।

روايت بالمعنى-এর হুকুম

روايت بالمعنى রাবী স্বীয় শাইখের কাছে যে হাদীস শ্রবণ করেন সেই হাদীসকে ঐ শব্দে বর্ণনা না করে নিজের শব্দে এর মূল অর্থ বর্ণনা করাকে روايت بالمعنى বলে।

এর হুকুম ঃ এর বৈধতার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। যথা ঃ (১) যদি রাবীর মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি গুণ থাকে তাহলে روايت بالمعنى জায়িয। গুণ তিনটি হলো,

(ক) আরবী সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হওয়া। (খ) আরবী বাক্যের বাচন ভঙ্গি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হওয়া এবং (গ) আরবী তারকীব এবং বক্তার অন্তর্নিহিত অর্থ হৃদয়াঙ্গম করতে সক্ষম হওয়া।

(২) কারো মতে শুধুমাত্র দু'য়েক শব্দের روايت بالمعنى জায়িয কিন্তু সামষ্টিক ভাবে জায়িয নেই।

(৩) কারো মতে ঐ ব্যক্তির জন্য এটা জায়িয যে হাদীসের মূল শব্দ-বাক্যকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারে। .

(৪) কারো মতে এটা ঐ ব্যক্তির জন্য জায়িয যে হাদীসের অর্থ মনে রাখতে পেরেছে কিন্তু শব্দ ভুলে গেছে।

(৫) আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন—যদিও روايت بالمعنى জায়িয তবুও এরূপ না করাই উত্তম। কেননা এতে করে এক সময় এমন হবে যে, আরবীতে অনভিজ্ঞ লোকেরাও এরূপ করার দুঃসাহস দেখাতে শুরু করবে।

الصحيح لذاته ، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره الشاذ، المنقطع، المعلل المدرج، ইত্যাদির সংজ্ঞা

১। الصحيح لذاته-এর সংজ্ঞা করা হয় এরূপ ঃ

هو الحديث الذى يتصل اسناده بنقل العدل التام الضبط عن مثله الى منتهاه من غير شاذ ولا علل .

অর্থাৎ এমন হাদীস যা ন্যায়পরায়ণ, পূর্ণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ব্যক্তি রেওয়ায়াত করেন এবং এতে علت বা شاذ থাকে না।

২। **الحسن لذاته** ঃ বলা হয় وهو ما رواه عدل خيف الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ ـ

অর্থাৎ এমন হাদীস যা তুলনামূলক কম ধীশক্তির অধিকারী ন্যায়পরায়ণ রাবী মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেন এবং এতে علت বা شذوذ পাওয়া যায়না।

৩। **الصحيح لغيره** ঃ বলা হয় هو الحديث الحسن لذاته اذا تعددت طرقه وانجبرت ضعفه ـ

অর্থাৎ حديث حسن لذاته ই যদি একাধিক সনদে বর্ণিত হয় তাহলে তাকে صحيح لغيره বলে।

৪। **الحسن لغيره** ঃ هو الحديث الضعيف اذا تعددت طرهه অর্থাৎ ضعيف কোন হাদীসের সনদ যদি একাধিক হয় তাহলে একে حسن لغيره বলে।

৫। **المعروف** ঃ এর সংজ্ঞায় মুহাদ্দিসগণ বলেন— هوالحديث الذى رواه الثقة منافيا لما رواه الضعيف অর্থাৎ দুর্বল রাবীর রেওয়ায়াতের বিপরীত শক্তশালী (ছেকাহ) রাবীর রেওয়ায়াতকে حديث معروف বলা হয়।

৬। **المنكر** ঃ বলা হয়, هوالحديث الذى رواه الضعيف مخالفا لماروله الثقة ـ

অর্থাৎ শক্তিশালী রাবীর বিপরীত দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীসকে حديث منكر বলে।

৭। **الشاذ** বলা হয় هو الحديث الذى رواه الثقة مخالفا لماروله الثقات او الاوثق منه ـ

অর্থাৎ শক্তিশালী (ثقه) রাবী কর্তৃক তাঁর সমপর্যায়ের একাধিক শক্তিশালী রাবী কিংবা তাঁর চেয়ে অধিক শক্তিশালী একজন রাবীর বিপরীত বর্ণিত হাদীসকে حديث شاذ বলে।

৮। **الحديث المعلل** ঃ যে হাদীসের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম ও অস্পষ্ট কোন কারণ থাকে যার কারণে হাদীসের বিশুদ্ধতায় প্রশ্ন দেখা দেয় সেই হাদীসকে حديث معلل বলে।

৯। الحديث المدرج ঃ বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে মূল হাদীস বা সনদের মধ্যে রাবী যদি কোন অংশ সংযুক্ত করে দেন তাহলে সেই হাদীসকে حديث مدرج বলে।

مدرج দুই প্রকার ঃ (১) مدرج فى السند অর্থাৎ সনদের মধ্যে কোন অংশ সংযুক্ত করা। (২) مدرج فى المتن তথা হাদীসের মূল অংশ তথা মতনে কোন কিছু সংযুক্ত করা।

১০। الحديث الموقوف ঃ হাদীস বেত্তাদের পরিভাষায় সাহাবাগণের কথাও কাজ (قول وفعل) কে حديث موقوف বলে।

১১। المعلق ঃ যে হাদীসের সনদের শুরু থেকে এক বা একাধিক রাবী বাদ পড়ে যায় সেই হাদীসকে حديث معلق বলে।

এর চারটি পদ্ধতি হতে পারে। (১) সকল রাবী বাদ দেয়া (২) সাহাবা ছাড়া সকলকে বাদ দেয়া (৩) সাহাবাও তাবেঈ ছাড়া আর সকলকে বাদ দেয়া এবং (৪) সনদের শুরু থেকে কয়েক জনকে বাদ দেয়া।

১২। المعضل ঃ যে হাদীসের সনদের মাঝখান থেকে ধারাবাহিক ভাবে দুই বা ততোধিক রাবী ছুটে যায় সেই হাদীসকে حديث معضل বলে।

১৩। المنقطع ঃ যে হাদীসের সনদের মাঝখান থেকে বিক্ষিপ্ত ভাবে এক বা একাধিক রাবী বাদ পড়ে যায় তাকে حديث منقطع বলে।

১৪। المدلس ঃ تدليس-এর অর্থ পণ্যসামগ্রীর দোষ গোপন করা।

আর পরিভাষায় যে হাদীসের রাবী এবং مروى عنه-এর মধ্যে সাক্ষাত হয়েছে কিন্তু রাবী তাঁর থেকে হাদীস শোনেননি তথাপি এমন শব্দ দ্বারা হাদীস বর্ণনা করা যাতে মনে হয় রাবী সরাসরি তাঁর থেকেই শুনেছেন। আর মাঝখান থেকে দু'একজন রাবীকে বাদ করে দেয়া। এ ধরনের রাবীর বর্ণিত হাদীসকে حديث مدلس বলে।

১৫। المتواتر ঃ যে হাদীসের রাবীর সংখ্যা এত অধিক যে, মিথ্যার ব্যাপারে তাঁদের সকলের একমত হওয়া অসম্ভব মনে হয় এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই সংখ্যা বহাল থাকে এবং এর দ্বারা শ্রোতার নিশ্চিত জ্ঞান হাসিল হয় সে হাদীসকে حديث متواتر বলে।

১৬। المشهور ঃ যে হাদীস তিন বা তিনের অধিক রাবী বর্ণনা করেন এবং সেটা متواتر-এর স্তরে পৌছেনা সেই হাদীসকে حديث مشهور বলে।

১৭। الحديث الغريب ঃ যে হাদীসের সনদের কোন এক স্থানে রাবীর সংখ্যা পৌছে যায় সেটাকে حديث غريب বলে।

১৮। المتابع ঃ যে হাদীসের ব্যাপারে এই ধারণা করা হচ্ছিল যে, এটি غريب পরবর্তীতে এর সমর্থক (চাই لفظى ومعنوى হোক বা শুধু معنوى) কোন হাদীস পাওয়া গেলে সেটাকে المتابع বলে।

তবে শর্ত হলো উভয় হাদীসের শেষ রাবী অর্থাৎ সাহাবী একজন হতে হবে।

১৯। الحديث الشاهد ঃ যে হাদীসকে مفرد ধারণা করা হচ্ছিল সে হাদীসের সমর্থক কোন হাদীস পাওয়া যায় এবং উভয় হাদীসের শেষ রাবী তথা সাহাবী দুইজন হয় তাহলে তাকে حديث شاهد বলে।

২০। المحفوظ ঃ পরিভাষায় حديث محفوظ ঐ হাদীসকে বলে যা কয়েকজন নির্ভরযোগ্য রাবী নির্ভরযোগ্য একজন রাবীর বিপরীত রেওয়ায়াত করেন অথবা অধিক নির্ভরযোগ্য রাবী তুলনামূলক কম নির্ভরযোগ্য একজন রাবীর বিপরীত রেওয়ায়াত করেন।

২১। الحديث المتصل ঃ শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহ্লভী (রহ.) বলেন মূলত যে হাদীসের সনদ মুত্তাসিল তাকে حديث مسند বলে। আর حديث مسند এরই অপর নাম حديث متصل

২২। الحديث المفرد ঃ তিনি আরো বলেন—কোন সহীহ হাদীসের রাবী যদি একজন হয় তাহলে সেই হাদীসকে حديث غريب বলে। আর এর অপর নাম حديث مفرد

২৩। المتروك ঃ متروك-এর শাব্দিক অর্থ প্রত্যাখ্যাত, বাদ পড়া। আর পরিভাষায় حديث متروك ঐ হাদীসকে বলে যে হাদীসের সনদের কোন একস্থানে মিথ্যার দোষে অভিযুক্ত (متهم بالكذب) কোন রাবী থাকে।

সাহাবী, তাবেঈ এবং মুখাযরামীর পরিচয়

১। **সাহাবী** ঃ আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) সাহাবীর সংজ্ঞা দিয়েছেন এরূপ ঃ

هو من لقى النبى صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الا سلام ولو تخللت ذلك ردة ـ

অর্থাৎ সাহাবী বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যিনি মুমিন অবস্থায় রাসূল (সা.)-কে দেখেছেন এবং ঈমান সহকারেই মারা গেছেন যদিও, এর মাঝখানে কোন কারণে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলেন (পরে আবার তওবা করেন)।

অবশ্য ইমাম আবূ হানীফা ও মালেক (রহ.)-এর মতে যদি মাঝখানে মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে "সোহ্বত" (সাহাবী হওয়া) বাতিল হয়ে যায়।

২। **তাবেঈ ঃ** তাবেঈর সংজ্ঞায় তিনি বলেন—

التابعى هو من لقى الصحابة مؤمنا بالنبى صلى الله عليه وسلم ومات على الاسلام ولو تخللت ردة ـ

তাবেঈ বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যিনি রাসূলের (সা.) প্রতি ঈমান রেখে সাহাবাদেরকে স্বচক্ষে দেখেছেন এবং ইসলাম নিয়েই ইন্তিকাল করেন—যদিও মাঝখানে মুরতাদ হয়ে যান।

এখানেও ইমাম মালেক ও ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতভেদ রয়েছে।

৩। **মুখাযরাম ঃ** মুখাযরাম বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যিনি ইসলাম ও জাহেলী যুগ পেয়েছেন কিন্তু রাসূল (সা.)-কে দেখেননি। চাই রাসূলের (সা.) যুগেই ইসলাম কবুল করুন বা এরপর।

রাবীগণের জীবনী

(١) عبد الله بن مسعود (٢) عبد الله بن عمر (٣) انس بن مالك (٤) ابو موسى الاشعرى (٥) جابر بن عبد الله (٦) اسماء بنت ابى بكر (٧) ام سلمة (٨) حفصة (٩) خديجة (١٠) قتادة (١١) هشام (١٢) ربيعة الراى (١٣) ابن شهاب الزهرى ـ

১। **আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ঃ** নাম আব্দুল্লাহ। উপনাম আবূ আব্দুর রহমান আল-হুযালী। পিতার নাম মাসঊদ।

ইসলাম গ্রহণ ঃ তিনি একদম শুরু যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। অনেকের ধারণা তিনি ষষ্ঠ নম্বরে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি রাসূলের (সা.) বিশেষ লোকদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। তাঁর অনেক ভেদ জানতেন। রাসূলের (সা.) সফরে

তিনি জুতা ও পানি বহন করতেন বলে তাঁকে صاحب النعلين والطهور বলা হতো।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ ঃ তিনি বদর যুদ্ধ সহ প্রায় সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

রাসূল (সা.) তাঁকে সুসংবাদ দিয়ে ইরশাদ করেন আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে তাতেই সন্তুষ্ট যাতে আব্দুল্লাহ্ সন্তুষ্ট, আর তাতে অসন্তুষ্ট যাতে সে অসন্তুষ্ট।

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন ঃ হযরত ওমর (রা.) এর খেলাফত কালে কুফার গভর্নর ছিলেন। হযরত ওসমানের খেলাফতকালেও কিছুদিন এই দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর মদীনায় আগমন করেন।

ইন্তিকাল ঃ মদীনায় আগমন করার পর ৩২ হিজরীতে তাঁর ইন্তিকাল হয়। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৮৪৮ টি।

২। **আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ঃ** নাম আব্দুল্লাহ। পিতা ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) তিনি কুরাঈশ বংশের আদাভী শাখাগোত্রের লোক ছিলেন।

তিনি অতি অল্প বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ কারণে মানুষ বলে তিনি তাঁর পিতার আগে মুসলমান হয়েছেন।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ ঃ বদর যুদ্ধে বয়স কম হওয়ায় শরীক হতে পারেননি। ওহুদ যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন কিনা এতে মতবিরোধ রয়েছে। এরপর খন্দক সহ প্রায় সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

তিনি সাহাবাগণের মধ্যে ইত্তিবায়ে সুন্নাতের কারণে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেন। ইত্তেবায়ে সুন্নাতের ক্ষেত্রে তাঁর জীবন রূপকথার মত প্রসিদ্ধ। মায়মুন ইবনে মেহরান বলেন—আমি ইবনে ওমরের (রা.) চেয়ে অধিক মুত্তাকী আর কাউকে দেখিনি।

ইন্তিকাল ঃ তিনি ৭৩ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। ইন্তিকালের পূর্বে হিলে দাফন করার জন্য ওয়াসিয়্যাত করে যান। কিন্তু জালেম হাজ্জাজের কারণে তা সম্ভব হয়নি। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৭০০টি।

৩। **আনাস ইবনে মালেক (রা.) ঃ** নাম আনাস, পিতা মালিক। উপনাম আবূ হামযা। তিনি আনসার সাহাবী। বংশগত দিক দিয়ে তিনি খাযরাজ গোত্রীয় ছিলেন। মায়ের নাম উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহান। দশ বছর বয়সে জননী

তাঁকে হুযূরের (সা.) দরবারে নিয়ে আসেন এবং হুযূরের (সা.) খিদমতে সঁপে দেন। দীর্ঘ দশ বছর যাবত তিনি হুযূর (সা.)-এর খেদমত করেন। এ কারণে তাঁকে খাদেমে রাসূল (সা.) বলা হয়।

ইলমী যোগ্যতা ঃ তিনি অসাধারণ স্মৃতি শক্তির অধিকারী ছিলেন। স্মৃতি শক্তির কারণে সাহাবাগণের মধ্যে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। কম বয়সী হওয়া সত্ত্বেও তিনি রাসূল (সা.) থেকে অনেক হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে রেওয়ায়াতকারী শাগরিদের সংখ্যা অগনিত।

হযরত ওমর (রা.)-এর শাসনকালে তিনি বসরায় গমন করেন এবং সেখানে অবস্থান করে মানুষকে দ্বীনি শিক্ষা প্রদান করেন।

ইন্তিকাল ঃ ৯১ হিজরী মতান্তরে ৯০ হিজরীতে তিনি বসরায় ইন্তিকাল করেন। সে সময় তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ১০২ বছর। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১২৮৬ টি।

৪। আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) ঃ নাম আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস ইবনে সুলাইম ইবনে হিসার ইবনে হারব। উপনাম আবূ মূসা এবং এই নামেই তিনি পরিচিত ও প্রসিদ্ধ।

তিনি মক্কায় আগমন করে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং কাফিরদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে হাবশায় হিজরত করেন।

খয়বর যুদ্ধ চলাকালীন আবূ জা'ফর ইবনে আবী তালিব (রা.) সহ তথা "আহলে সফীনার" সাথে তিনি মদীনায় আগমন করেন।

দায়িত্ব পালন ঃ হুযূর (সা.) এর জীবদ্দশায় তিনি ইয়ামেনের গভর্ণরের দায়িত্ব পালন করেন। হযরত ওমরের (রা.) যুগে বসরার এবং ওসমানের (রা.) যুগে কুফার দায়িত্ব পালন করেন।

অন্যান্য গুণাবলী ঃ তিনি অত্যন্ত চমৎকার সুরের অধিকারী ছিলেন। হুযূর (সা.) একবার তাঁর কুরআন তেলাওয়াত শুনে বলেছিলেন—

لقد اوتى مزمارا من مزامير ال داؤد

হযরত ওমর (রাা) তাঁকে দেখে বলতেন— ذكرنا ربنا يا ابا موسى !

ইন্তিকাল ঃ তিনি ৫২ হিজরীতে মক্কায় ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৩৬০টি।

৫। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) ঃ নাম জাবের। কুনিয়াত আবূ আব্দুল্লাহ আল আনসারী আস-সুলামী।

তিনি প্রসিদ্ধ একজন সাহাবী ছিলেন। বদর যুদ্ধসহ প্রায় সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। শেষ জীবনে তিনি অন্ধ হয়ে যান। মদীনায় ইন্তিকাল কারীদের মধ্যে তিনিই সর্বশেষ সাহাবী।

ইন্তিকাল ঃ তিনি ৭৪ হিজরীতে মদীনায় ইন্তিকাল করেন। এসময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৫৬০টি।

৭। **উম্মুল মুমিনীন সালমা (রা.) ঃ** হযরত উম্মে সালমা (রা.) হুযূরের (সা.) সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে আবূ সালমার স্ত্রী ছিলেন। তাঁর ইন্তিকালের পর হুযূরের (সা.) সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর থেকে ইবনে আব্বাস (রা.) হাফসা (রা.) আয়িশা (রা.) সহ অনেক সাহাবী ও তাবেঈ হাদীস রেওয়ায়াত করেন।

ইন্তিকাল ঃ ৮৪ বছর বয়সে ৫৯ হিজরীতে তিনি মদীনায় ইন্তিকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৩৭৮ টি।

৮। **উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা.) ঃ** নাম হাফসা, পিতা ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)। হুযূরের (সা.) সাথে আকদ হওয়ার পূর্বে তিনি খুনাইস ইবনে হুযাফার স্ত্রী ছিলেন। তাঁর ইন্তিকালের পর হুযূর (সা.)-এর প্রস্তাব অনুযায়ী ওমর (রা.) তাঁকে বিবাহ দেন।

ইন্তিকাল ঃ তিনি ৪৫ হিজরী শা'বান মাসে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৬০টি।

৯। **উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা (রা.) ঃ** নাম খাদীজা। পিতার নাম খুয়াইলিদ। প্রথমে আবূ হালাহ এরপর আতীক ইবনে আয়েযের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। এঁদের পর হুযূর (সা.)-এর সাথে পবিত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি সর্বপ্রথম হুযূর (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনেন।

হুযূরের (সা.) যে কয়জন সন্তান জন্ম নেন তাঁর সব গুলোই তাঁর গর্ভে আগমন করে। হিজরতের পূর্বেই তিনি মক্কায় ইন্তিকাল করেন। যায়হুন নামক এলাকায় তাঁকে দাফন করা হয়। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

১০। **কাতাদা (রহ.) ঃ** নাম কাতাদা, উপনাম আবুল খাত্তাব, পিতার নাম দা'আমাহ্। তিনি অত্যন্ত ধীশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। তিনি নিজেই বলতেন—

ما سمعت اذناى شيئا قط الا وعاه قلبى

হযরত আনাস (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে সারজাস (রা.) প্রমুখ সাহাবী থেকে তিনি হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন। তিনি ১০৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

১১। রবী'আতুর রায় (রহ.) ঃ নাম রবী'আ, পিতার নাম আব্দুর রহমান। তিনি উচ্চ মাপের তাবেঈ ছিলেন এবং মদীনার ফকীহদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তিনি আনাস ইবনে মালেক (রা.) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে সায়েব (রা.) থেকে হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন। তিনি ১৩২ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

১২। হেশাম (রহ.) ঃ নাম হিশাম। পিতা ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রা.)। উপনাম আবুল মুনযির। তিনি কুরাইশ বংশীয় উচ্চমাপের একজন তাবেঈ ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.) এবং ইবনে ওমর (রা.) থেকে তিনি হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন। তিনি ৬১ হিজরীতে জন্ম এবং ১৪৬ হিজরীতে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।

১৩। ইবনে শিহাব যুহরী (রহ.) ঃ যুহরী মূলতঃ যুহরা ইবনে কিলাবের সাথে সম্বোধিত নাম। তাঁর মূল নাম আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে শিহাব।

তিনি মদীনায় তাবেঈগণের অন্যতম একজন তাবেঈ। তিনি প্রচুর সংখ্যক সাহাবী থেকে হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন।

তিনি ১২৪ হিজরীর রমযান মাসে ইন্তিকাল করেন।

উল্লেখযোগ্য কয়েকজন সাহাবী এবং তাঁদের বর্ণিত হাদীস সংখ্যা

১। আবূ হুরাইরা আব্দুর রহমান ইবনে সখর (রা.) ইন্তিকাল ৫৯ হিজরী, ৫৩৭৪ টি

২। রঈসুল মুফাস্সিরীন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ইন্তিকাল ৬৮ হিজরী, ২৬৬০ টি।

৩। উম্মুল মুমিনীন উম্মে আব্দুল্লাহ আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) ইন্তিকাল ৫৭ হিজরী, ২২১০ টি।

৪। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) ইন্তিকাল ৬৫ হিজরী, ১৬৩০টি।

৫। সাইয়্যিদুনা জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) ইন্তিকাল ৭৮ হিজরী, ১৫৬০টি।

৬। খাদিমুর রাসূল হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) ইন্তিকাল ৯৩ হিজরী, ১৩৪৬ টি।

৭। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) ইন্তিকাল ৭৪ হিজরী, ১১৭০ টি।

৮। আফ্‌কাহুল উম্মাহ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ইন্তিকাল ৩২ হিজরী, ৮৪৮ টি।

৯। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) ইন্তিকাল হিজরী,৭০০ টি।

১০। আক্‌যাউল উম্মাহ্ আলী মোর্তযা (রা.) ইন্তিকাল ৪১/৪২ হিজরী, ২৫৩৯ টি।

১২। উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা (রা.) ইন্তিকাল ৬১ হিজরী, ২৭৮ টি।

১৩। আবূ মূসা আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস আশ'আরী (রা.) ইন্তিকাল ৪৪ হিজরী, ৩৬০ টি।

১৪। সাইয়িদুনা বারা ইবনে আযিব (রা.) ৩০৫ টি।

১৫। রঈসুয যুহাদা আবূযর গেফারী (রা.) ইন্তিকাল ৩১/৩২ হিজরী, ২৮১টি।

১৬। হযরত সা'দ ইবনে ওয়াক্কাস (রা.) ইন্তিকাল ৫৫ হিজরী, ৪১৫ টি।

১৭। সাহল ইবনে সা'দ (রা.) ১৮৮ টি।

১৮। আবূ দারদা (রা.) ইন্তিকাল ৩২ হিজরী, ১৮৯ টি।

১৯। হযরত ওবাদা ইবনে সামিত (রা.) ইন্তিকাল ৩৫ হিজরী, ১৮১ টি।

২০। আবূ কাতাদা (রা.) ইন্তিকাল ৩৫ হিজরী, ১৭০ টি।

২১। হযরত ওবাই ইবনে কা'ব (রা.) ইন্তিকাল ১৯ হিজরী, ১৬৪ টি।

২২। বুরাইদা ইবনে হোসাইব (রা.) ১৬১ টি।

২৩। হযরত মা'আয ইবনে জাবাল (রা.) ইন্তিকাল ১৯ হিজরী, ১৫৭ টি।

২৪। আবূ আউয়ূব আনসারী (রা.) ইন্তিকাল ৫২ হিজরী, ১৫০ টি।

২৫। সাইয়িদুনা ওসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা.) ইন্তিকাল ৩৫ হিজরী, ১৪৬টি।

২৬। হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) ইন্তিকাল হিজরী, ১৪৬ টি।

২৭। হযরত মুগীরা (রা.)-১৩৬ টি।

২৮। আবূ বাক্‌রা (রা.) ইন্তিকাল ৫১/৫২ হিজরী, ১৩০ টি।

২৯। ইমরান ইবনে হোসাইন (রা.) ইন্তিকাল ৫২ হিজরী, ১৩০ টি।

৩০। হযরত মু'আবিয়া (রা.)-১৩০ টি।

৩১। ছাওবান (রা.) ইন্তিকাল ৫৪ হিজরী, ১৪৭ টি।

৩২। উসামা (রা.) ১২৮ টি।

৩৩। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) ১২৩ টি।

৩৪। আবূ মাসউদ (রা.) ইন্তিকাল ৪০ হিজরী, ১০২ টি।

৩৫। জারীর (রা.) ১০০ টি।

৩৬। হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.)-৯২ টি।

৩৭। আবূ তলহা (রা.)-৯২ টি।

৩৮। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.)-৯০ টি।

৩৯। হযরত সালমান ফারসী (রা.) ইন্তিকাল ৩৬ হিজরী, ৬৪ টি।

৪০। উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা.)-৬০ টি।

৪১। উম্মুল মুমিনীন মায়মূনা (রা.) ইন্তিকাল ৪১ হিজরী, ৪৬ টি।

৪২। উম্মে হানী (রা.)-৪৬ টি।

৪৩। হযরত বেলাল (রা.) ইন্তিকাল ২০ হিজরী, ৪৪ টি।

৪৪। যোবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা.)-৩৮ টি।

৪৫। আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) ইন্তিকাল হিজরী, ৩৫ টি।

৪৬। সাইফুল্লাহ খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) ইন্তিকাল ২১ হিজরী, ১৮ টি।

رضى الله تعالى عنهم ورضوا عنه

এক নজরে সিহাহ্ সিত্তার ইমামগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ইমাম বুখারী (রহ.)

নাম ঃ মুহাম্মাদ, উপনাম আবূ আব্দুল্লাহ। বংশ পরম্পরা নিম্নরূপ ঃ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুগীরা ইবনে বারদিযবা।

নিছবত ঃ এক. "বুখারী" (জন্মস্থানের প্রতি সম্পর্কের কারণে)। দুই. জু'ফী। তাঁর পরদাদা মুগীরা (রহ.) বুখারার গভর্নর ইয়ামান জু'ফীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে বলে (ولاء) ধর্মীয় মৈত্রীর কারণে তাঁর বংশকে জু'ফী নিছবতে স্মরণ করা হয়।

উপাধি ঃ উম্মতে মুসলিমা তাঁকে বিভিন্ন উপাধিতে স্মরণ করে। যেমন, (১) আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস (২) নাছিরুল আহাদীসিন নাবাবিয়্যা (৩) নাছিরুল মাওয়ারীছিল মুহাম্মাদিয়্যা ইত্যাদি।

জন্ম তারিখ ঃ ইমাম বুখারী (রহ.) ১৩ই শাওয়াল ১৯৪ হিঃ মোতাবেক ১৯ই জুলাই ৮০৯ খ্রিষ্টাব্দ রোজ শুক্রবার জুমার পর বুখারায় জন্মগ্রহণ করেন।

বাল্যকাল ঃ বাল্যকালেই পিতা ইসমাঈল (যিনি ঐ যুগের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ ছিলেন) ইন্তিকাল করেন। ফলে পূণ্যবতী মা তার লালন পালনের দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে উঠিয়ে নেন। বাল্যকালে কোন এক কারণে তিনি দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেন। দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাওয়ার জন্য তাঁর মা সর্বদা দু'আ করতে থাকেন। অবশেষে একদিন ইবরাহীম (আ) কে স্বপ্নে দেখতে পান। তিনি বলছেন "নবীকুল শিরোমণি মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর বাণী (হাদীস) সংরক্ষণের জন্য আল্লাহ পাক তোমার পুত্র মুহাম্মদের দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিবেন। সকালে ঘুম থেকে উঠলে দেখা গেলো ইমাম বুখারীর দৃষ্টি শক্তি ফিরে এসেছে। এই ঘটনার পর পাঁচ বছর বয়সে লেখাপড়া শুরু করেন। দশ বছর বয়সে বিভিন্ন বিষয়ের ইল্‌ম হাসিল করে ফেলেন। এরপর নিজের জীবনকে হাদীস সংরক্ষণের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেন। তিনি নিজেই বলেন, ১৫ বছর বয়স না হতেই আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, আল্লামা ওয়াকি' প্রমুখের লিখিত হাদীস ও ফিকহের কিতাব পড়া শেষ করে ফেলি। অতঃপর ১৬ বছর বয়সে তিনি ইলমে হাদীসের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জায়গায় সফর করা শুরু করেন।

ইলমী সফর ঃ ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীস অন্বেষনের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সফর করেছেন। তার মধ্যে অন্যতম হলো তিনটি।

১। **হেজায সফর ঃ** ইমাম বুখারী (রহ.) মা ও ভাই আল্লামা আহমদ ইবনে ইসমাঈল কে নিয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় রওয়ানা হন। হজ্জ শেষে মা ও ভাই দেশে ফিরে এলেও তিনি হাদীস লাভের জন্য হেজাযেই থেকে যান। দীর্ঘ ছয় বছর হেজাযে অবস্থান করে তিনি হাদীস সংগ্রহ করেন।

২। সহীহ হাদীস সংগ্রহের নেশা তাঁকে সর্বদা বেকারার করে রাখে। এ উদ্দেশ্যে তিনি বাগদাদ, মিসর, শাম, কূফা, বসরা প্রভৃতি এলাকায় সফর করেন।

৩। ইমাম বুখারীর অন্যতম একটি ইলমী সফর হলো ২৫০ হিজরী সালের খোরাসানের প্রসিদ্ধ নিশাপুর সফর। এখানে বিশ্বখ্যাত ইলমী মারকায দারুল উলূম নিশাপুরে এসে হাদীস সংগ্রহে লিপ্ত হন।

মেধার প্রখরতা ঃ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মেধার প্রখরতা প্রবাদতুল্য। ঐতিহাসিকগণ তাঁর মেধার প্রখরতা সম্পর্কে ধারণা দিতে প্রায় বিশটির মত ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এর কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হলো। (১) একদা ইমাম দাখেলী (রহ.) হাদীস বর্ণনার সময় সনদ বর্ণনা করছিলেন এরূপ-حدثنا سفيان عن ابى النز بير عن ابراهيم - ইমাম বুখারী (রহ.) তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, "আবূ যোবায়ের ইবরাহীম থেকে রেওয়ায়াত করেননি!" ইমাম দাখেলী (রহ.) এতে কিছুটা মনক্ষুণ্ন হলেও নিজেও পাণ্ডুলিপি দেখে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর দাবি যথার্থ দেখতে পান। এরপর তাঁর কাছে সঠিক সনদ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন— حدثنا سفيان عن زبيرابن عدى عن ابراهيم -

(২) ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ব্যাপারে একথা প্রসিদ্ধ ছিল যে, একবার যে হাদীস তিনি শুনতেন কখনও তা ভুলতেন না। একবার বসরা গমন করে তিনি সেখানে ১৬ দিন অবস্থান করে হাদীসের মাশায়েখদের থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। অন্যরা হাদীস লিখতেন কিন্তু তিনি লিখতেন না। এতে করে তাঁর সঙ্গী আল্লামা ইবনে ইসমাঈল বলে ফেললেন, তুমি তো বসরার আলিমদের থেকে ফায়দা হাসিল করছ না। একথা শোনামাত্র তিনি ১৬ দিনের পাঠ সকল হাদীস মুখস্থ শুনিয়ে দিলেন।

তাক্ওয়া ঃ প্রখর মেধা ও ধীশক্তির সাথে সাথে আল্লাহ পাক তাঁকে বিস্ময়কর তাকওয়াও দান করেছিলেন। দুনিয়া বিমুখতা, ইস্তেকামাত, উত্তম চরিত্র প্রভৃতি গুণে তিনি ছিলেন গুণান্বিত।

দানশীলতা ঃ ইমাম বুখারী (রহ.) ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পৈত্রিকসূত্রে তিনি অনেক সম্পদ লাভ করেন। প্রতিদিন প্রায় পাঁচশ দিরহাম

সদকা করতেন এবং অংশীদার ব্যবস্থায় অর্জিত মুনাফা ছাত্রদের পিছনে ব্যয় করতেন।

ইবাদত-রিয়াযত ঃ তিনি প্রায় দিন রোযা রাখতেন। দরস থেকে ফারেগ হয়েই তেলাওয়াতে মশগুল হতেন। সাহরীর সময়ে একতৃতীয়াংশ কুরআন পড়ার অভ্যাস ছিল এবং রমযান মাসে প্রতিদিন একবার করে কুরআন খতম দিতেন। তিনি অত্যন্ত কম খাবার খেতেন। দীর্ঘ ৪০ বছর তরকারি ছাড়া শুধুমাত্র রুটি খেয়ে জীবন অতিবাহিত করেছেন।

ইত্তিবায়ে সুন্নাত ঃ আল্লামা আবূ জা'যার মুহাম্মদ বুখারী (রহ.) বলেন, আমি স্বপ্নযোগে দেখি তিনি ঠিক রাসূল (সা.)-এর কদম বরাবর কদম রাখছেন। ইত্তিবায়ে সুন্নাতের এই সুফল তিনি লাভ করেন যে, যেদিন তিনি ইন্তিকাল করেন সেদিন রাসূল (সা.)কে জনৈক ব্যক্তি চার খলীফা ও অসংখ্য সাহাবীসহ কোন এক ব্যক্তির জানাযা নামাযের অপেক্ষায় দেখতে পান। স্বপ্নদ্রষ্টা কার জানাযা তা জানতে চাইলে বলা হলো— انتظر محمد بن اسماعيل! আমি ইমাম বুখারীর জন্য অপেক্ষা করছি!

দৈহিক গঠন ঃ খতীব বাগদাদীর মতে ইমাম বুখারী (রহ.) মধ্যম গড়নের অধিকারী ছিলেন। শরীর ছিল খুবই হাল্কা পাতলা ও ক্ষীণ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও রুচিশীলতায় ছিলেন অনন্য। দাড়ি ছিল খুব ঘন। চেহারা দেখামাত্র যে কোন লোক তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হতে বাধ্য হত।

বিপদে ধৈর্য ধারণ

ফেকহী মাসায়েলের ক্ষেত্রে ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের মতভেদের কারণে ইমাম বুখারী (রহ.)কে চার চারবার জন্মভূমি বুখারা ত্যাগ করতে হয়েছে। শেষবার বুখারার গভর্নর খামেদ যুহলী স্বীয় পুত্রকে প্রাসাদে এসে পড়ানোর অনুরোধ করলে ইমাম বুখারী তা প্রত্যাখ্যান করেন। যার ফলে তাঁকে চতুর্থবারের মতো দেশ ত্যাগ করতে হয়।

ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম যুহলীর মধ্যে মতপার্থক্য

ইমাম বুখারী (রহ.) ২৫০ হিজরীতে যখন পুনরায় নিশাপুরে ফিরে আসেন তখন নিশাপুরবাসী তাঁকে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে বরণ করে নেয় এবং ইস্তিকবাল করে। এতে কতক লোক হিংসার বশীভূত হয়ে মনে মনে দগ্ধ হতে শুরু করে এবং ইমাম বুখারী (রহ.)-কে নানামুখী অহেতুক প্রশ্ন করতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা কুরআন মাখলূক বা গাইরে মাখলূক এ ব্যাপারে প্রশ্ন করে বসে। প্রশ্ন শুনে

ইমাম বুখারী (রহ.) জওয়াব দেয়া থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু তারা পিড়াপীড়ি করলে এর জওয়াব দিতে বাধ্য হন এবং বলেন, কুরআন আল্লাহর কালাম এটা غير مخلوق (গাইরে মাখলূক) তবে বান্দার তেলাওয়াতের আলফায (শব্দসমূহ) মাখলূক। এই জওয়াব শুনে হিংসুকেরা মহা সুযোগ মনে করে তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় তোলে। ইমাম যুহলীর কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি কোন ছাত্র যেন বুখারীর নিকট পড়তে না যায় এ মর্মে আদেশ জারি করেন। একমাত্র ইমাম মুসলিম (রহ.) ছাড়া অন্য সবাই ইমাম বুখারী (রহ.)-এর দরস ত্যাগ করে। ফলে তাঁর দরসগাহ রওনক হারিয়ে ফেলে। এতে তিনি পুনরায় বুখারা ফিরে আসেন।

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব

ইমাম বুখারী (রহ.) খোদ প্রদত্ত এক বিস্ময়কর চমক। মেধা, স্মৃতিশক্তি, ইলমী গভীরতা, ইজতিহাদ চিন্তা-চেতনা সর্বক্ষেত্রে তিনি অন্যান্য ইমামদের চেয়ে অগ্রগামী। সর্বযুগের ওলামায়ে কিরাম নির্ভেজাল এই সত্য তথ্যকে মেনে নিয়েছেন। দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তের জগদ্বিখ্যাত আলিমগণ তাঁর নানা রকম প্রশংসার কথাও উল্লেখ করেছেন। ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়েছে তাঁর লিখিত বুখারীর ওপরেও। পাঠক মাত্রই সে সম্পর্কে অবগত।

বুখারীর প্রতিটি অধ্যায়ে বিশুদ্ধ হাদীস সংকলন, তরজমা বা অধ্যায় সাজানোর ক্ষেত্রে বিস্ময়কর প্রতিভা, হাদীসের সাথে কুরআনের আয়াত, সাহাবা, তাবেঈন প্রমুখের উক্তি সংযোগ ইত্যাদি নানা কারণে মানুষ স্বীকার করতে বাধ্য যে, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য।

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ কয়েকজন উস্তাদের নাম

ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর ইলমী জীবনে শত শত হাদীস বিশারদের কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা করেন। তাঁর উস্তাদের সংখ্যা ১১০০ এর ওপরে। মশহুর কয়েকজন ওস্তাদের নাম নিম্নরূপ ঃ

১। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ২। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহ.) ৩। ইমাম আলী ইবনে মাদীনী ৪। ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (রহ.) ৫। ইমাম মক্কী ইবনে ইবরাহীম (রহ.) ৬। মুহাম্মদ ইবনে ঈছা বাগদাদী (রহ.) ৭। কুতবা ইবনে সাঈদ (রহ.) প্রমুখ।

প্রসিদ্ধ কয়েকজন শাগরিদ

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর কাছে শত-সহস্র ইলম পিপাসু আগমন করেন হাদীস শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে। কোন কোন সময় তাঁর দরসে উপস্থিতির সংখ্যা ৯০ হাজার ছাড়িয়ে যেত। আর একথা অনস্বীকার্য যে, সে যুগের প্রায় সবাই ছিলেন ইলম ময়দানের সুদক্ষ শাহ সওয়ার। সুতরাং এতগুলো মানুষ থেকে গুটিকয়েক ব্যক্তির নাম তুলে আনা খুব কঠিন। তথাপি পাঠকদের সামনে কয়েকজন মশহুর শাগরেদের নাম পেশ করা হলো।

১। ইমাম মুসলিম (রহ.)
২। ইমাম তিরমিযী (রহ.)
৩। ইমাম আবূ যুরআ রাযী (রহ.)
৪। ইমাম নাসায়ী (রহ.)
৫। ইমাম আবূ হাতেম রাযী (রহ.)
৬। ইমাম ইবনে খুযাইমা (রহ.)
৭। ইমাম আবুল কাসেম বাগাবী (রহ.) প্রমুখ।

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সংকলন

হাদীস ব্যাখ্যাকারীগণ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর প্রায় বিশটির মত সংকলনের কথা উল্লেখ করেছেন। এর কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ

১। صحيح البخارى
২। جزء رفع اليدين
৩। جزء القراءة
৪। برالوالدين
৫। التاريخ الكبير
৬। التاريخ الاوسط
৭। التاريخ الصغير
৮। كتاب الضعفاء
৯। التفسير الكبير
১০। كتاب العلل
১১। اسامى الصحابة

ওফাত ঃ ইমাম বুখারী (রহ.) ৬২ বছর বয়সে ১লা শাওয়াল ২৫৬ হিজরী মোতাবেক ৩১ই আগস্ট ৮৭০ খ্রিস্টাব্দে ঈদুল ফিতরের রাতে বাদ ইশা খারতঙ্গ এলাকায় ইন্তিকাল করেন।

পরদিন জোহরের নামাযের পর তাঁকে দাফন করা হয়। আল্লামা গালেব ইবনে জিব্রাইল বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.)-কে কবরে দাফন করার পর সেখান থেকে কস্তুরির মতো সুঘ্রাণ আসতে থাকে। এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য যে, বুখারা, সমরকন্দ মা-ওরায়ান্নাহারের বাসিন্দারা দীর্ঘদিন যাবত বিবাহশাদী বা অন্যান্য উৎসব অনুষ্ঠানে খোশবুর জন্য ইমাম বুখারী (রহ.)-এর কবর থেকে মাটি নিয়ে যেত। এক পর্যায়ে অবস্থা নাজুক হতে থাকলে কবরের চতুষ্পার্শ্বে দেয়াল তুলে দেয়া হয়। যা আজ মাজারের আকৃতি নিয়ে দণ্ডায়মান রয়েছে।

সহীহ্ বুখারী

নাম ঃ الجامع الصحيح المسند المختصر من امور رسول الله وسننه وايامه

সংকলন কাল ঃ ইমাম বুখারী (রহ.) দীর্ঘ ১৬ বছর যাবত এই কিতাবটি সংকলন করেন। বুখারা, বসরা এবং হারামাইন সফরকালে এর পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন। মক্কা শরীফে সংশোধন ও পরিমার্জন করেন এবং মদীনাতে تراجم ابواب সংযুক্ত করেন।

সংকলনের শান ঃ ইমাম ইউসুফ ফারাবরী (রহ.) বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.) ইরশাদ করেন, আমি প্রতিটি হাদীস লেখার আগে এস্তেখারা করে নিতাম। যখন আমার কাছে বিশুদ্ধতার বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যেত তখন গোসল করে দু'রাকা'আত নামায আদায় করতাম এবং তারপর হাদীসটি লিপিবদ্ধ করতাম।

সংকলনের কারণ ঃ মুহাদ্দিসগণ বুখারী সংকলনের তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন।

১। একদা ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (রহ.) দরসে বলে ওঠেন, কেউ যদি এমন একটি কিতাব সংকলন করত যাতে শুধু সহীহ্ হাদীস থাকবে তাহলে কতই না ভাল হত! একথার বাস্তবতার রূপ দিতে ইমাম বুখারী (রহ.) কিতাবটি সংকলন করেন।

২। একবার ইমাম বুখারী (রহ.) স্বপ্নে দেখেন, তিনি পাখা দিয়ে রাসূল (সা.)কে বাতাস করছেন এবং এর সাহায্যে মাছি তাড়াচ্ছেন। সকালে স্বপ্ন

বিশেষজ্ঞদের কাছে এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তাঁরা বললেন, আপনি এমন একটি কিতাব লিখবেন যা جامع ও مكمل হওয়ার সাথে সাথে صحيح ও হবে এবং এভাবে আপনি রাসূল (সা.)-এর দিকে সম্বোধিত ভুল ও মওজু হাদীস মাছি তাড়ানোর মত দূরে নিক্ষেপ করবেন। এই ব্যাখ্যা শুনে ইমাম বুখারী (রহ.) কিতাবটি লিখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং তা সংকলন করেন।

৩। কোন কারণ ছাড়াই এ ধরনের একটি কিতাব সংকলন হওয়া জরুরী মনে করে ইমাম বুখারী (রহ.) কিতাবটি সংকলন করেন।

সহীহ বুখারীতে হাদীসের সংখ্যা

একাধিক নুছখা মুদ্রণ পাওয়া যাওয়ার কারণে ব্যাখ্যাকারীগণ সহীহ বুখারীর হাদীস সংখ্যা নির্ণয়ে কিছুটা মতভেদ করেছেন। তবে বর্তমান যে নুছখা রয়েছে এতে এ ধরনের সংখ্যার কথা উল্লেখ রয়েছে। ১। হাদীসে মারফূ'র উল্লেখিত সংখ্যা ৭২৭৫টি এবং তাকরার বাদ দিলে মূল সংখ্যা দাঁড়ায় ৪ হাজার।

২। পূর্ণ হাদীস মারফু'র সংখ্যা ৭৩৯৭টি এবং তাকরার বাদ দিলে সংখ্যা হবে ২৬০২টি। এছাড়া তা'লীক ১৩৪১টি, মুতাবা'আত ৩৪৪টি। এবং সাহাবা ও তাবেঈনের আছার ১৬০৮টি।

সবকিছুর হিসেবে প্রথম মত অনুযায়ী পূর্ণ রেওয়ায়াতের সংখ্যা ১০৫৬৮টি এবং দ্বিতীয় মত অনুযায়ী এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১০৬৯০টি।

"কুতুবে সিহাহ্" এর মধ্যে বুখারীর স্থান

উম্মতে মুসলিমা এ ব্যাপারে একমত যে, হাদীসের কিতাব সমূহের মধ্যে বুখারী এবং মুসলিমের মান সবার ঊর্ধ্বে। ঠিক তদ্রূপ كتب ستة-এর মধ্যেও বুখারীর স্থান সবার ঊর্ধ্বে।

অবশ্য বুখারী ও মুসলিম এ দু'টির কোনটি শ্রেষ্ঠ তা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য আছে। এ ব্যাপারে তিনটি মত প্রণিধানযোগ্য।

১। বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে উভয়টি সমান এবং দু'টি কিতাবই উম্মতে মুসলিমার জন্য এক অমূল্য সম্পদ।

২। পশ্চিমা বিশ্বের ওলামায়ে কিরাম, আল্লামা ইবনে রুশ্দ, আল্লামা ইবনে আব্দুল বার, আল্লামা কুরতুবী সহ অনেকের মতে সহীহ্ মুসলিম সহীহ্ বুখারীর তুলনায় অধিক বিশুদ্ধ।

৩। জমহুর ফোকাহা ও মুহাদ্দিসীনের মতে সহীহ্ বুখারী সামষ্টিকভাবে সহীহ্ মুসলিমের তুলনায় অধিক বিশুদ্ধ।

উভয় প্রকার মতের স্বপক্ষের দলীল এবং নিরপেক্ষ ফয়সালা

পশ্চিমা ওলামায়ে কিরাম মুসলিমকে অধিক বিশুদ্ধ হওয়ার স্বপক্ষে নিম্নোক্ত দলীল সমূহ উল্লেখ করেছেন।

১। ইমাম মুসলিম (রহ.) মাশায়েখদের উপস্থিতিতে মুকিম অবস্থায় হাদীসগুলোকে বিন্যস্ত করেছেন। এ কারণে মুসলিমের ইবারত ও আলফায মাশায়েখদের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী হয়েছে। সাথে সাথে মাশায়েখে কিরাম এসব রেওয়ায়াতগুলোকে সমর্থনও করেছেন। অপরদিকে ইমাম বুখারী (রহ.) নিজের হেফজ থেকে রেওয়ায়াতগুলো কিতাবে সন্নিবেশ করেছেন। আর একথা বলাই বাহুল্য যে, মাশায়েখে কিরামের উপস্থিতিতে রেওয়ায়াতকৃত হাদীস অনুপস্থিতিতে রেওয়ায়াতকৃত হাদীসের তুলনায় তারজীহ্ পাবে!

২। **মুহাদ্দিসগণের বাণী ঃ** আল্লামা আবূ আলী নিশাপুরী (রহ.) বলেন, আসমানের নিচে জমিনের ওপরে মুসলিমের চেয়ে সহীহ্ কোন কিতাব নেই। এই মন্তব্যকে অন্দুলুস ও পশ্চিমা আলিমগণ দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন।

৩। **অধিক সতর্কতা ঃ** ইমাম মুসলিম (রহ.) রেওয়ায়াতের ক্ষেত্রে অধিক সতর্কবান। এ কারণে তিনি حدثنا ও اخبرنا। শব্দের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। অথচ ইমাম বুখারী (রহ.) এ দু'য়ের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি।

৪। **সুবিন্যাস ঃ** ইমাম মুসলিম (রহ.) এক বিষয়ের সকল হাদীস একত্রিত করে দিয়েছেন। যাতে মুজতাহিদ ও তালেব ইলমদের জন্য অশেষ উপকার হচ্ছে। অথচ বুখারীর মধ্যে এই বিষয়টি অনুপস্থিত।

৫। **সহীহ হাদীসের ভাণ্ডার ঃ** সহীহ মুসলিমে শুধুমাত্র হাদীসে মারফূ' উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ বুখারীতে হাদীসে মারফূ' আছারে মাওকূফ, হাদীসে মাক্তূ' সবই উল্লেখ করা হয়েছে। আর এটা সহীহ মুসলিম শ্রেষ্ঠ হওয়ার আলামত।

সহীহ বুখারী অধিক বিশুদ্ধ হওয়ার স্বপক্ষে জমহুর আলিমদের ছয়টি দলীল

১। ছেকাহ রাবী ঃ বুখারীর রাবী তুলনামূলক মুসলিমের রাবীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ। কেননা বুখারীর সমালোচিত রাবী যেখানে ৮০ জন সেখানে মুসলিমের সমালোচিত রাবীর সংখ্যা দ্বিগুণ তথা ১৬০ জন।

২। **সাক্ষাতের শর্ত (لقاء)** ঃ ইমাম বুখারী (রহ.) একযুগের হওয়া সত্ত্বেও مروی عنه ও راوی-এর মধ্যে পরস্পর মোলাকাত হওয়া শর্ত করেছেন অথচ ইমাম মুসলিম তা করেননি। আর এ ধরনের শর্ত অবশ্যই অধিক সতর্কতা ও রেওয়ায়াতের বিশুদ্ধতার আলামত।

৩। ইমাম বুখারী (রহ.) পাঁচ তবকার রাবীর মধ্যে কেবল প্রথম তবকার রাবী থেকে পূর্ণভাবে হাদীস উল্লেখ করেন আর ইমাম মুসলিম (রহ.) প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় তবকা থেকে পূর্ণভাবে হাদীস উল্লেখ করেন।

৪। **সামষ্টিক সংকলন** ঃ ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীসের সাথে সাথে আয়াত, সাহাবাদের বাণী এবং ফকীহদের মত উল্লেখ করেছেন অথচ সহীহ মুসলিমের মধ্যে এসব কিছু অনুপস্থিত।

৫। সহীহ বুখারী "সহীহ" হওয়ার সাথে সাথে "জামে"ও বটে। অথচ সহীহ মুসলিম জামে' কিনা এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে।

৬। অনেক ক্ষেত্রে কিতাবের মর্যাদা নির্ণিত হয় লিখকের মর্যাদার ভিত্তিতে। আর একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর তুলনায় শ্রেষ্ঠ। মোটকথা উভয়পক্ষে মজবুত ও শক্তিশালী দলীল আছে। তথাপি উম্মতে মুসলিমা শহীহ বুখারীকে সহীহ মুসলিমের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং এটিই নিরপেক্ষ ও শতঃসিদ্ধ ফয়সালা।

সহীহ বুখারীর অনন্য কতক বৈশিষ্ট্য

ব্যাখ্যাকারীগণ বুখারী শরীফের ১৬টি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। নিম্নে বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো।

১। সহীহ বুখারী প্রথম কিতাব যাতে শুধু সহীহ হাদীস স্থান পেয়েছে। সর্বপ্রথম ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ হাদীসগুলোকে কিতাব আকারে রূপ দিয়েছেন। كتب ستة বাকী ইমামগণ এক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর পূর্ণ ইত্তিবা করেছেন।

২। বুখারীতে সর্বমোট ২২টি ثلثيات আছে। এতগুলো ثلثيات অন্য কোন কিতাবে নেই। মজার কথা হলো, এই বাইশ ثلثيات-এর মধ্যে ২০টি ثلثيات এর রাবী হানাফী মাযহাবের।

৩। **নিশ্চিত বিশুদ্ধতা ঃ** ইমাম বুখারী (রহ.) কোন একটা হাদীস ততক্ষণ পর্যন্ত কিতাবে স্থান দেননি যতক্ষণ পর্যন্ত না নানা রকমভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও এস্তেখারার মাধ্যমে এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছেন।

৪। **تراجم ঃ** সহীহ বুখারীর تراجم ابواب সবচেয়ে বিস্ময়কর। এটা তাঁর অবিশ্বাস্য প্রখর মেধার দলীল। মুহাদ্দিসগণ বলেন-فقه البخارى فى تراجمه

৫। **ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ঃ** নব্বই হাজার মোহাদ্দিসীন ইমাম বুখারী থেকে সহীহ বুখারী শ্রবণ করেছেন। শুধু আরবী ভাষাতেই ৫৩ জন কলমসৈনিক বুখারীর শরাহ লিখেছেন। এছাড়া ফারসী, উর্দু, ইংরেজি, বাংলা, ফরাসী, তুর্কি এবং অন্যান্য ভাষায় এর অসংখ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখিত হয়েছে। দীর্ঘ প্রায় বারশত শতাব্দী ধরে মুসলিম উম্মা এর দ্বারা উপকৃত হয়ে আসছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত উপকৃত হতে থাকবে।

৬। হাদীসের সাথে সাথে কুরআন, সাহাবা ও তাবেঈনদের বাণী উল্লেখ করা হয়েছে যাতে করে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি সামগ্রিক দলীল লাভ করে পরিতৃপ্ত হতে পারে।

৭। মাসায়েল ও আহকাম আলোচনা করে এগুলোর নাযিল হওয়ার জমানার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৮। রেওয়ায়াতে দ্বন্দ্ব নিরসন করা হয়েছে। অর্থাৎ কোন রেওয়ায়াত যদি মারফূ বা মুরসাল হওয়া রাবীর "শোনা না শোনা" উভয় প্রকার মত থাকে সেখানে মারফূ' বা মওসূল হওয়াটাকে সুপ্রমাণ করা হয়েছে।

সহীহ বুখারীর নুছখা

নব্বই হাজার ছাত্র ইমাম বুখারী (রহ.) থেকে বুখারী শরীফ শ্রবণ করেছেন। তন্মধ্যে চারজনের কল্যাণে কিতাবটি আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। এই চারজন হলেন—

(১) আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ ফারাবরী (রহ.)

(২) আল্লামা হাম্মাদ ইবনে শাকের (রহ.)

(৩) আল্লামা ইউসুফ নাছাফী (রহ.) এবং

(৪) আল্লামা মানসূর ইবনে মুহাম্মদ (রহ.)

উল্লেখ্য যে, ভারত উপমহাদেশে ইউসূফ ফারাবরীর (রহ.) নুছখা প্রচলিত।

বুখারী শরীফের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ

১। إعلام السنن ঃ আল্লামা আবূ সোলায়মান আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ আলখাত্তাবী (রহ.), ওফাত ৬৩৮ হিঃ।

২। التلويح ঃ ইমাম আলাউদ্দীন মুগলতাঈ ইবনে কুলাইজ আত্-তুর্কি আল হানাফী (রহ.), ওফাত ঃ ৭৯২ হিঃ।

৩। الكواكب الدراری ঃ আল্লামা শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আল কিরমানী (রহ.), ওফাত ৭৯৬ হিঃ।

৪। شواهد التوضيح ঃ সিরাজুদ্দীন ওমর ইবনে আলী ইবনে মুলাক্কিন আশ্শাফেঈ (রহ.), ওফাত ৮০৪ হিঃ।

৫। الام الصبيح ঃ আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুদ দায়িম (রহ.), ওফাত ৮৩১ হিঃ।

৬। التلقيح لفهم قاری الصحيح ঃ শাইখ বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ হালাবী (রহ.), ওফাত ৮৪১ হিঃ।

৭। عمدة القاری ঃ শাইখুল ইসলাম বদরুদ্দীন আবূ মুহাম্মাদ মাহমূদ ইবনে আহমদ আল আইনী আল হানাফী (রহ.), ওফাত ৮৫৫ হিঃ।

৮। فتح الباری ঃ হাফিযুদ্ দুনিয়া শাইখুল ইসলাম আবুল ফযল আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আল আসকালানী (রহ.), ওফাত ৮৫১ হিঃ।

৯। مصابيح الجامع ঃ বদরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আবী বকর (রহ.), ওফাত ৮২৮ হিঃ।

১০। التوشيح على الجامع الصحيح ঃ জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে আবী বকর সুয়ূতী (রহ.), ওফাত ৯১১ হিঃ।

১১। فتح الباری ঃ যায়নুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে আহমদ ইবনে রজব হাম্বলী (রহ.), ওফাত ৯৯৫ হিঃ।

১২। الفيض الحاوی ঃ আল্লামা ওমর ইবনে রুসলান আল বালকিনী (রহ.), ওফাত ৮০৫ হিঃ।

১৩। منح البارى : আল্লামা মাজদুদ্দীন আবূ তাহির মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকূব ফিরোযাবাদী আশ শিরাজী (রহ.), ওফাত ৮১৭ হিঃ।

১৪। بهجة النفوس : আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ ইবনে জামরা (রহ.)

১৪। الكوثرالجارى على رياض البخارى : আল্লামা আহমদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ আল কাওরানী আল হানাফী (রহ.), ওফাত ৮৯৩ হিঃ।

১৫। شرح (البخارى) : ফখরুল ইসলাম আলী ইবনে মুহাম্মাদ আল বারযাভী আল হানাফী (রহ.), ওফাত ৮৮২ হিঃ।

১৫। شرح (البخارى) : ইমাম রাজিউদ্দীন হাসান ইবনে মুহাম্মাদ আল হানাফী (রহ.), ওফাত ৬৫০ হিঃ।

১৬। شرح (البخارى) : ইমাম যায়নুদ্দীন আবূ মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ইবনে আবি বকর ইবনিল আইনী আল হানাফী (রহ.), ওফাত ৮৯৩ হিঃ।

১৭। كتاب النجاح فى شرح كتاب زخبار الصحاح : ইমাম নাজমুদ্দীন আবূ হাফস ওমর ইবনে মুহাম্মাদ আন্নাসাফী আল-হানাফী (রহ.), ওফাত ৫৩৭ হিঃ।

১৮। (شواهد التوضيح والتصحيح) (لمشكلات الجامع الصحيح) : জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ.), ওফাত ৬৭২ হিঃ।

১৯। مصباح القارى : ইমাম আব্দুর রহমান আহদাল আল ইয়ামানী (রহ.)

২০। إرشادالسارى : শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ আল খতীব আল কাস্তাল্লানী আল মিসরী আশ-শাফেঈ (রহ.), ওফাত ৯২৩ হিঃ।

২১। فيض البارى على صحيح البخارى : ইমামুল আসর খাতিমাতুল মুহাককিকীন আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.), ওফাত ১৩৫২ হিঃ।

২২। الابواب والتراجم : শাইখুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.), ওফাত ১৪০৪ হিজরী।

ইমাম মুসলিম (রহ.)

নাম ঃ মুসলিম। কুনিয়াত আবুল হাসান। নসব নামা এরূপ, মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম ইবনে ওয়ারদ ইবনে কারশাদ।

উপাধি ঃ আসাকিরুল মিল্লাত ওয়াদ্দীন।

নিছবত ঃ তার দু'টি নিছবত সুপ্রসিদ্ধ। (১) কুশাইরী। এটি তাঁর বংশ সম্পর্কীয় নিছবত। তাঁর বংশীয় নিছবত আরবের বিখ্যাত বাহাদুর ও ইলমী খান্দান বনূ কুশাইরের সাথে। এ কারণে তাঁকে কুশাইরী বলা হয়।

২। **নিশাপুরী ঃ** এটি তাঁর জন্মস্থানের সাথে সম্পৃক্ত নিছবত। খোরাসানের মনোমুগ্ধকর নিশাপুর শহরের বাসিন্দা হওয়ায় ইমাম মুসলিম (রহ.)-কে এই নিছবতে স্মরণ করা হয়।

জন্ম সাল ঃ ইমাম মুসলিম (রহ.) ২০৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

ওফাত ঃ ইমাম মুসলিম (রহ.) ২৪ শে রজব ২৬১ হিজরী মোতাবেক ৪ই মে ৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ রোজ রবিবার মাগরিবের পর ইন্তিকাল করেন। পরদিন সোমবার নিশাপুরের সন্নিকটে নাছারাবাদ নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

দৈহিক গঠন ঃ আকৃতিতে তিনি ছিলেন বেশ লম্বা। গায়ের রং ছিল লাল সাদা মিশ্রিত। চেহারা ছিল কান্তিময়। বৃদ্ধ বয়সে দাড়ি ও মাথার চুল ছিল ধবধবে সাদা। তিনি ছিলেন অত্যন্ত রুচিবান। সর্বদা মাথায় পাগড়ি ব্যবহার করতেন।

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর উস্তাদবৃন্দ ঃ তৎকালীন নিশাপুর ছিল ইলমের মারকায। এ কারণে ইমাম মুসলিম (রহ.) বহু বিখ্যাত ইমামদের থেকে হাদীস সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। তাঁর বিখ্যাত কয়েকজন মাশায়েখের নাম নিম্নরূপ ঃ

১। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)

২। ইমাম বুখারী (রহ.)

৩। ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (রহ.)

৪। ইমাম যুহলী (রহ.)

৫। ইমাম কা'নাবী (রহ.)

৬। ইমাম আবূ যুর'আ রাযী (রহ.)

৭। আল্লামা সাঈদ ইবনে মানসূর

৮। আল্লামা কুতাইবা ইবনে সাঈদ (রহ.) প্রমুখ

উল্লেখযোগ্য কয়েকজন শাগরিদ নিম্নরূপ

১। ইমাম তিরমিযী (রহ.)

২। ইবনে খুযায়মা (রহ.)

৩। আল্লামা আবূ হাতেম রাযী (রহ.)

৪। আল্লামা আহমদ ইবনে সালমা

৫। আল্লামা আব্দুর রহমান ইবনে আবি হাতেম প্রমুখ।

সংকলন

ইমাম মুসলিম (রহ.) সংক্ষিপ্ত এই জীবনে বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। এর কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ

১। الجامع الصحيح

২। المسند الكبير

৩। كتاب العلل

৪। كتاب الاسماء والكنى

৫। الجامع الكبير

৬। كتاب حديث عمرو بن شعيب

৭। كتاب مشايخ امام مالك

৮। مسند صحابة

৯। كتاب أوهام المحدثين

১০। كتاب سوالات احمد بن حنبل ইত্যাদি।

সহীহ্ মুসলিম

কিতাবের নাম ঃ الجامع الصحيح

হাদীস সংখ্যা ঃ আল্লামা আবুল ফযলের মতে এতে বার হাজার হাদীস রয়েছে। আহমদ জাযায়েরীর (রহ.) মতে হাদীসের সংখ্যা আট হাজার। তবে একাধিকবার বর্ণিত (مكرر احاديث) হাদীস বাদ দিলে এর সংখ্যা দাঁড়ায় ৪ হাজার। তা'লীকের সংখ্যা ১৭টি। সাহাবাদের বাণী (اثار) এবং তাবেঈনদের মন্তব্য নেই বললেই চলে।

সংকলনের সময়কাল ঃ ইমাম মুসলিম (রহ.) দীর্ঘ ১৫ বছর যাবত এই কিতাবটি সংকলন করেন। সম্ভবত ২৩৬ হিজরীতে শুরু করে ২৫০ হিজরীতে সংকলনের কাজ শেষ করেন। ভারত উপমহাদেশে যে নুছখা পাঠ করা হয় এটি ইমাম মুসলিম (রহ.) ২৫৭ হিজরীতে লিখিয়েছেন।

সংকলনের কারণ ঃ আল্লামা আবূ ইসহাক ইবরাহীম এবং সমকালীন লোকদের দরখাস্ত অনুযায়ী ইমাম মুসলিম (রহ.) কিতাবটি সংকলন করেন।

সহীহ মুসলিমের বৈশিষ্ট্য

সহীহ মুসলিম এক অনন্য বিস্ময়কর কিতাব। এর বৈশিষ্ট্যসমূহ অন্যান্য কিতাবে পাওয়া ভার। শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)-এর ঐতিহাসিক উক্তি হলো-"ইমাম মুসলিম (রহ.) কিতাবটিতে হাদীস সংশ্লিষ্ট বিস্ময়কর তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। কয়েকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ

১। **مقدمة الكتاب ঃ** এই কিতাবে ইমাম মুসলিম (রহ.) একটি ভূমিকা বা مقدمةالكتاب লিখেছেন। এতে নানা রকম শর্ত-শরায়েত, হাদীসের পরিভাষা, উসূল ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে যা কিতাবটিকে উঁচু মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছে।

২। **সুবিন্যাস ঃ** ইমাম মুসলিম (রহ.) সংক্ষিপ্ত মতন উল্লেখ করা সত্ত্বেও অত্যন্ত সুবিন্যস্তবাবে হাদীসগুলো সংকলন করেছেন। হাদীসের নানা রকম সনদ একত্রিত করে দিয়েছেন, যাতে হাদীসের বিশুদ্ধতার বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে যায়।

৩। **পূর্ণ সতর্কতা ঃ** ইমাম মুসলিম (রহ.) রেওয়ায়াত করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। এজন্য حدثنا ও اخبرنا-এর মধ্যে তারতম্য করেছেন। যে হাদীস তিনি সরাসরি শাইখের মুখ থেকে শুনেছেন সেক্ষেত্রে حدثنا এবং যে হাদীস শাইখের কাছে তেলাওয়াত করা হয়েছে সেক্ষেত্রে اخبرنا শব্দ ব্যবহার করেছেন।

৪। **اثار وتعليقات-এর অনুপস্থিতি ঃ** ইমাম মুসলিম (রহ.) কিতাবটিকে শুধুমাত্র সহীহ হাদীস দ্বারা সুসজ্জিত করেছেন। এ কারণে এতে اثار কিংবা تعليقات-এর তেমন স্থান দেয়া হয়নি। মাত্র সতেরটি تعليقات এতে স্থান পেয়েছে।

৬। **রেওয়ায়াত চিহ্নিতকরণ ঃ** একাধিক সনদে হাদীস বর্ণনা করা সবচেয়ে ছেকাহ রাবীর বাক্যকে واللفظ لفلان, বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৭। **নতুন পরিভাষা ঃ** হযরত আবূ হুরাইরা (রা.)-এর শাগরিদ হাম্মাম ইবনে মুনাব্বেহের (রহ.) সহীফায় যে সব হাদীস সংকলিত সে সব হাদীস রেওয়ায়াত করার সময় فذكر احاديث منها শব্দ উল্লেখ করে এক নতুন পরিভাষা সংযোগ করেছেন।

সহীহ মুসলিমের শরাহ-ব্যাখ্যা গ্রন্থ

সহীহ মুসলিমের শরাহর সংখ্যা অগণিত। যুগের নানা কলম সৈনিক বিশ্বখ্যাত এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন ঃ

১। আল মিনহাজ ফি শরহী মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ ঃ ইমাম নববী (রহ.) ইন্তিকাল ৬৭৬ হিঃ

২। আল মু'লিম ঃ আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল মায্রী (রহ.) ইন্তিকাল ৫৩৬ হিঃ।

৩। আল ইকমাল ফি শরহি মুসলিম ঃ কাজী ইয়ায ইবনে মূসা ইন্তিকাল ৫৪৪ হিজরী।

৪। আল মুফহিম লিমা আশকালা মিন তালখীসি কিতাবে মুসলিম ঃ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে ওমর ইবনে ইবরাহীম আল কুরতুবী (রহ.) ৬৫৬ হিঃ

৫। ইকমালু ইকমালিম মু'লিম ঃ আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে খলীফা আল ওয়াস্তানী আলউব্বি আল মালেকী (রহ.) ৮২৭ হিঃ

৬। আল মুফহিম ফি শরহি গারীবি মুসলিম ঃ ইমাম আব্দুল গাফের ইবনে ইসমাঈল আল ফারেসী (রহ.) ৫২৯ হিজরী।

৭। আদ্ দীবাজ আলা সহীহ মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ ঃ ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) ৯১১ হিজরী।

৮। মিনহাজুল ইবতেহাজ বি শরহি মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ ঃ শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ আল খতীব আল কাসতাল্লানী (রহ.) ৯২৩ হিজরী।

৯। শরহু শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আল হানাফী (রহ.) ইন্তিকাল ৭৮৮ হিজরী।

১১। আল মাতারুস সাজ্জাদ ঃ আল্লামা ওয়ালীউল্লাহ হিন্দী (রহ.)

১২। শরহী মুসলিম ঃ শাইখ আব্দুল হক দেহলভী (রহ.)।

১৩। ফতহুল মুলহিম শাব্বীর আহমদ ওসমানী (রহ.)।

১৪। শরহু মুসলিম ঃ আল্লামা গোলাম রাসূল সাহেব (রহ.) ইত্যাদি।

ইমাম তিরমিযী (রহ.)

নাম ঃ মুহাম্মদ ইবনে ঈসা (রহ.)। কুনিয়াত আবু ঈসা। নসবনামা, মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরা ইবনে মূসা ইবনে জাহ্হাক আস্ সুলামী আল্বূগী আত তিরমিযী (রহ.)।

জন্ম ঃ ইমাম তিরমিযী (রহ.) ২০৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। আর সর্বসম্মতিক্রমে ইন্তিকাল করেন ১৭৯ হিজরীতে। এ হিসেবে তাঁর পূর্ণ হায়াত ৭০ বছর।

দৈহিক গঠন ঃ ইমাম তিরমিযী (রহ.) ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন ও মধ্যম দেহের অধিকারী। শারীরিকভাবে ছিলেন অত্যন্ত বলিষ্ঠ। চেহারা এত সুন্দর ও উজ্জ্বল ছিল যে, কেউ তাঁকে দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারত না।

বাল্যকাল ঃ বাল্যকালেই তিনি ছিলেন ইলমের প্রতি প্রবল অনুরাগী। তিরমিয শহরে প্রাথমিক শিক্ষা হাসিল করেন। তিনি ঠিক এমন সময়ে চোখ খোলেন যখন বিশ্বের প্রতিটি প্রান্ত ছিল বিশ্বখ্যাত আলিমের পদভারে মূখর। তিনি ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম ইসহাক ইবনে রাওয়ায়ের মত বিশ্বখ্যাত মুহাদ্দিসগণ থেকে হাদীস শিক্ষা লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

মেধার প্রখরতা ঃ ইমাম তিরমিযী (রহ.) ছিলেন প্রবাদতুল্য প্রখর মেধার অধিকারী। এ সম্পর্কে বহু আশ্চর্য ঘটনা বর্ণিত আছে। এখানে একটি ঘটনা পেশ করছি। ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন, একবার হজ্জ সফরে জনৈক মুহাদ্দিস সম্পর্কে অবগত হলাম। হাদীস লাভের আশায় ছুটে গেলাম তাঁর দরবারে। আমার সামনে তিনি হাদীস পড়া শুরু করলে আমি সাদা কাগজে আঙ্গুল চালাতে থাকি। দরস শেষ হলে তিনি যখন জানতে পারলেন কাগজে কিছুই লেখা হয়নি তখন ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, তুমি আমার মূল্যবান সময় নষ্ট করলে! ইমাম তিরমিযী (রহ.) বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! আমার সকল হাদীস মুখস্থ আছে। উক্ত শাইখ তাঁর একথা যাচাই করতে অতিরিক্ত আরো ৪০টি হাদীস শোনালেন। ইমাম তিরমিযী (রহ.) এই ৪০টি সহ আগের সবগুলো হাদীস একটানে শুনিয়ে দিলেন। শাইখ অবস্থা দর্শনে বিস্ময়াভূত হয়ে বললেন, ما رأيت مثلك "তোমার মত আর কাউকে আমি দেখিনি।"

ইলমী সফর ঃ ইমাম তিরমিযী (রহ.) তাঁর ইলমী জীবনে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তরে সফর করেছেন। ২৬ বছর বয়সে সফরে বের হন দীর্ঘ ১৫ বছর ইলমী সফর শেষ করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এই দীর্ঘ সফরে তিনি খোরাসান,

হেজায, ইরাক, ইয়ামান মিসর, সিরিয়া প্রভৃতি এলাকার বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা করেন।

ইমাম তিরমিযী (রহ.)-এর ওস্তাদগণ

ইমাম তিরমিযী (রহ.) যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা করে ধন্য হন। নিম্নে তাঁর কয়েকজন মাশায়েখের নাম উল্লেখ করা হলো।

১। ইমাম বুখারী (রহ.)

২। ইমাম মুসলিম (রহ.)

৩। ইমাম কুতাইবা ইবনে সাঈদ (রহ.)

৪। ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (রহ.)

৫। ইমাম আবূ দাউদ সিজিস্তানী (রহ.)

৬। ইমাম দারামী (রহ.)

৭। ইমাম আহমদ ইবনে সানী (রহ.)

৮। হযরত মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (রহ.)

৯। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার (রহ.)

১০। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আমর (রহ.)

১১। হযরত মাহমূদ ইবনে গায়লান (রহ.) প্রমুখ।

সংকলন

ইমাম তিরমিযী (রহ.) জামে' তিরমিযী ছাড়াও আরো অনেক গ্রন্থ সংকলন করেন। যথা ঃ

১। كتاب العلل

২। كتاب المفرد

৩। كتاب التواريخ

৪। كتاب الزهد

৫। كتاب الاسماء والكنى

৬। الشمائل

৭। تفسير ترمذى প্রভৃতি।

জামে' তিরমিযীর বৈশিষ্ট্য

জামে' তিরমিযী এমন কতক বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি যা অন্যান্য হাদীসে লক্ষ্য করা যায় না। কিছু বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ

১। অধ্যায়ের বোধগম্যতা ঃ ইমাম তিরমিযী (রহ.) রচিত بَابْ বা অধ্যায় সংযোজন সবচেয়ে সহজ, বোধগম্য ও উপকারী।

২। ফিকহী বয়ান ঃ এতে হাদীস বর্ণনার পর তদসংশ্লিষ্ট ফিকহী আলোচনাও করা হয়েছে।

৩। হাদীসের মান নির্ণয় ঃ এতে হাদীসের পর্যায় তথা সহীহ্ যঈফ কিনা তা বর্ণনা করা হয়েছে।

৪। রাবীদের নামের সাথে কুনিয়াত কিংবা কুনিয়াতের সাথে নাম বর্ণনা করা হয়েছে।

৫। সঠিক রাবী নির্ণয়ে অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের মতবিরোধের সঠিক সমাধান দেয়া হয়েছে।

৬। অধ্যায় সংশ্লিষ্ট কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করে وفى الباب عن فلان বলে বাকি হাদীসগুলোর প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

৭। হাদীসের সনদ বা মতনে ইজতিরাব থাকলে তা দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৮। ইমাম তিরমিযী একই হাদীসের বেলায় حسن صحيح বলে নতুন এক পরিভাষার প্রবর্তন করেছেন।

৯। কিতাবটির বিন্যাস অসাধারণ। কেননা এর হাদীসগুলোকে ফিকহী তারতীবে উল্লেখ করা হয়েছে।

১০। তাকরারমুক্ত কিতাব। এই কিতাবে একাধিকবার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা খুবই কম।! تلك عشرة كاملة

জামে' তিরমিযীর কয়েকটি প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ

১। قوت المغتذى ঃ ইমাম সুয়ূতী (রহ.) (ইন্তিকাল ৯১১ হিজরী।)

২। عارضة الاحوذى কাজী আবূ বকর ইবনুল আরাবী (রহ.) (ইন্তিকাল ১১০৯ হি.)

৩। شرح الجامع الترمذى আল্লামা আবূ তাইয়্যিব সিন্ধী (রহ.) অবশ্য এই শরাহটির অস্তিত্ব প্রায় দুর্লভ।

৬। الكوكب الدرى على جامع الترمذى ঃ মাওলানা ইয়াহইয়া কান্ধালভী (রহ.)। হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর দরসে শ্রুত ব্যাখ্যা সংকলন করে ইয়াহইয়া কান্ধালভী (রহ.) এই শরাহটির রূপ দেন।

৭। الورد الشذى ঃ শাইখুল হিন্দ মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী (রহ.)। আজকাল এটি التقرير للترمذى নামে প্রসিদ্ধ।

৮। العرف الشذى ঃ এটি মাওলানা মুহাম্মাদ চেরাগ আলী কর্তৃক মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.)-এর ব্যাখ্যা সংকলন।

৯। معارف السنن ঃ আল্লামা ইউসুফ বিন্নুরী (রহ.)।

১০। تحفة الاحوذى ঃ কাজী আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহ.)।

ইমাম আবূ দাউদ (রহ.)

নাম ঃ সুলায়মান, কুনিয়াত আবূ দাউদ। নসবনামা এরূপ, সুলায়মান ইবনে আশ'আস ইবনে ইসহাক ইবনে বশীর ইবনে শাদ্দাদ (রহ.)।

গোত্রের সাথে নিছবত করে আল ইয়্দি এবং বিশেষ করে জন্মভূমির সাথে নিছবত করে তাঁকে সিজিস্তানী বলা হয়।

জন্ম ঃ ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) ১৬ই শাওয়াল ২০২ হিজরী রোজ শুক্রবার সিজিস্তান শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবন ঃ প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন জন্মভূমি সিজিস্তানে। এরপর উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য খোরাসান, শাম, ইরাক, মিসর, হেজায প্রভৃতি এলাকায় সফর করেন। খতীব বাগদাদী (রহ.) বলেন, বাল্যকাল হতেই হাদীস শিক্ষালাভের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল।

বিশ্বখ্যাত একজন হাদীসের ইমাম হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিতান্তই সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেন-তাঁর জামার এক আস্তিন ছিল বড় ও অপর আস্তিন ছোট! এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন, এক আস্তিনে কাগজপত্র রাখতে হয় বলে একটাকে বড় রাখা হয়েছে। অপরটাতে এই প্রয়োজন নেই বলে তা খাটো রাখা হয়েছে।

তাকওয়া ও পরহেযগারী ঃ ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) হাদীসের ইমাম হওয়ার সাথে সাথে তাকওয়ারও ইমাম ছিলেন। দরসে হাদীসের ফাঁকে যখনই সময় মিলত তখনই নফল নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। ইবাদত-বন্দেগী ছিল তাঁর আত্মার খোরাক।

ওস্তাদবৃন্দ ঃ ইমাম আবূ দাউদ (রহ.)-এর বিখ্যাত কয়েকজন আসাতিযার নাম নিম্নরূপ ঃ

১। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)

২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা (রহ.)

৩। ইমাম আবূ দাউদ ত্বায়ালেসী (রহ.)

৪। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহ.)

৫। আলী ইবনে মাদীনী (রহ.)

৬। মাহমূদ ইবনে গায়লাব (রহ.) প্রমুখ।

বিখ্যাত কয়েকজন ছাত্র

১। ইমাম তিরমিযী (রহ.)

২। ইমাম নাসায়ী (রহ.)

৩। আবূ ইয়া'লা লু'লুবী (রহ.)

৪। ইমা আব্দুর রহমান নিশাপুরী (রহ.)

৫। আহমদ ইবনুল আরাবী (রহ.)

৬। আবূ ঈসা ইসহাক রামালী (রহ.)

ওফাত ঃ ইসলামী ইতিহাসের এই বিরল ব্যক্তিত্ব ১৬ই শাওয়াল ২৭৫ হিজরী মোতাবেক ফেব্রুয়ারী ৮৮৯ ইং রোজ শুক্রবার বসরায় ইন্তিকাল করেন।

সুনানে আবূ দাউদ

ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) যখন এই কিতাব লিখা শুরু করেন সে সময় مسانيد ও جوامع সংকলনের রেওয়াজ ছিল। তিনি সুনানের কিতাব লিখে এক নয়াদিগন্তের সূচনা করেন। এর পরবর্তীতে অন্যান্য ইমামগণ সুনানে আবূ দাউদের অনুস্মরণে সুনানের কিতাব লিখেন। এ হিসেবে সুনানে আবূ দাউদের এক আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য

১। উত্তম বিন্যাস। পাঠকমাত্রই তা বুঝতে সক্ষম।

২। গুরুত্বপূর্ণ মাসআলাগুলোতে ফোকাহাদের পরিভাষা অনুযায়ী অধ্যায় সংকলন করা হয়েছে।

৩। একাধিক সনদ হতে শক্তিশালী সনদে বর্ণিত হাদীসকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

৪। কোন সময় মূল হাদীস থেকে শুধু আলোচনা সংশ্লিষ্ট অংশ উল্লেখ করে কিতাবটিকে সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৫। যে রেওয়ায়াতের সনদে দুর্বলতা রয়েছে সেখানে এ ব্যাপারে অবগত করানো হয়েছে।

৬। قال ابوداود এটি সুনানে আবূ দাঊদের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য।

৭। এ কিতাবের বর্ণিত প্রতিটি হাদীস معمول بها তথা আমল ও দলীল যোগ্য।

৮। ثلاثيات এতে একটি ثلاثيات হাদীস রয়েছে ইত্যাদি।

এর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শরাহ

১। معالم السنن ঃ আবূ সোলায়মান খাত্তাবী (রহ.) (ইন্তিকাল ৩৮৮ হিঃ)

২। مرقاة الصعود ঃ ইমাম সুয়ূতী (রহ.) (ইন্তিকাল ৯১১ হিঃ)

৩। اقتضاء السنن ঃ ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) (৮৫৫ হিঃ)

৪। غاية المقصود ঃ আল্লামা শামসুল হক আযীয আবাদী (রহ.)

৫। عون المعبود ঃ আল্লামা শামসুল হক আযীয আবাদী (রহ.) ও তদীয় ভ্রাতা আশরাফ আযীম আবাদীর যৌথ সংকলন।

৬। بذل المجهود ঃ আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.)

৭। التعليق المحمود ঃ মাওলানা ফখরুল হাসান গাঙ্গুহী (রহ.)।

ইমাম নাসায়ী (রহ.)

নাম ঃ আহমদ। কুনিয়াত আবূ আব্দুর রহমান।

নসবনামা ঃ আহমদ ইবনে শোআইব ইবনে আলী ইবনে বাহার ইবনে দীনার আন নাসায়ী। এলাকার সাথে সম্পৃক্ত করে তাঁকে নাসায়ী, নাসাভী, খোরাসানী প্রভৃতি নিছবতে স্মরণ করা হয়।

নাসায়ী নিছবতের রহস্য ঃ নিসা খোরাসানের একটি শহর। মুসলিম বিজয়ীরা যখন সর্বপ্রথম এই এলাকায় আগমন করেন তখন এলাকার পুরুষেরা মহিলাদেরকে রেখে পালিয়ে যায়। পুরুষ শূন্য এই শহরটি পরবর্তীতে নিসা শহর নাম ধারণ করে। কিছুটা রদবদল হয়ে এই শহরের দিকে নিছবত করেই ইমাম আহমদ (রহ.)কে ইমাম নাসায়ী বলে।

জন্ম ঃ ইমাম নাসায়ী (রহ.) ২১৫ হিজরী মোতাবেক ৮২০ খ্রিস্টাব্দে নিসা শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

ওফাত ঃ ইমাম নাসায়ী (রহ.) ৮৮ বছর বয়সে ১৩ই সফর, ৩০৩ হিজরী মোতাবেক ২৮ই আগস্ট ৯১৫ ইং রোজ সোমবার ইন্তিকাল করেন।

শাহাদাত লাভের ঘটনা ঃ ইমাম নাসায়ী (রহ.) শেষ বয়সে দামেস্কে হিজরত করেন। দামেস্ক ছিল বনূ উমাইয়ার শাসকদের রাজধানী। সেখানকার লোকজন ছিল হযরত আলী (রা.)-এর প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ। ইমাম নাসায়ী (রহ.) আহলে সুন্নাতের প্রতিনিধি স্বরূপ খাসায়েসে আলী নামে একটি কিতাব সংকলন করেন। অতঃপর দামেস্কের জামে মসজিদে লোকজনকে এই কিতাবটি পড়ে শুনাতে লাগলেন। মসজিদের কয়েকজন লোক ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর ওপর হামলা করে বসে। এতে তিনি বেহুঁশ হয়ে যান। তাঁর কোন এক ছাত্র তাঁকে মসজিদ থেকে বের করে আনেন এবং ওয়াসিয়্যাত মোতাবেক ইন্তিকালের পর সাফা মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে দাফন করেন। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন তাঁর কবরস্থান হলো রমলা শহরে।

হালাতে যিন্দেগী (বাল্যকাল)

ইমাম নাসায়ী (রহ.) প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন নিজ শহর নাসাতেই। সে সময়কালটা ছিল ওই শহরে বড় বড় মুহাদ্দিস ও ফকীহদের বাসস্থান। এখানে নানামুখী শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি বলখে গমন করেন এবং সেখানে গিয়ে ইমাম কুতাইবা ইবনে সাঈদের দরসে হাজির হন। মূলতঃ তাঁর সংস্পর্শে এসেই ইমাম নাসায়ী (রহ.) হাদীস শিক্ষা সংকলন ও হাদীসের দরস দানের প্রতি আকৃষ্ট হন।

ইলমী সফর ঃ ইমাম নাসায়ী (রহ.) ২০০ হিজরীতে মাত্র ১৫ বছর বয়সে হাদীস শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তরে সফর করা শুরু করেন। একমাত্র তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, কোনকিছুর পরওয়া না করে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে পদব্রজে সফর করেন। খোরাসান হেজায, মিসর, শাম, ইরাক, ইরান প্রভৃতি এলাকায় তিনি একাধিকবার সফর করেন। যেখানে কোন মুহাদ্দিস আছে বলে জানতেন সেখানেই তিনি ছুটে যেতেন।

তাকওয়া ও পরহেযগারী ঃ ইমাম নাসায়ী (রহ.) কেবলমাত্র একজন মুহাদ্দিস ও ফকীহই ছিলেন না। একজন বড় মুত্তাকীও ছিলেন। তিনি সাওমে দাউদের (আ.) পাবন্দী করতেন। একদিন রোযা রাখতেন আরেকদিন তরক করতেন। রাতের অধিকাংশ সময় কাটিয়ে দিতেন নফল ইবাদত ও যিকির আযকারে।

সংকলন

ইমাম নাসায়ী (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ কয়েকটি কিতাব নিম্নরূপ ঃ

১। সুনানে নাসায়ী।
২। খাসায়েসে আলী (রা.)।
৩। ফজায়েলে সাহাবা (রা.)।
৪। মুসনাদে আলী।
৫। মুসনাদে মালেক।
৬। আস সুনানুল কুবরা।
৭। আস সুনানুস সোগরা।
৮। কিতাবুয যু'আফা।
৯। আসমাউর রুআ'ত।
১০। কিতাবুল মুদাল্লিসীন প্রভৃতি।

সুনানে নাসায়ী

খতীব বাগদাদী (রহ.) বলেন, নাসায়ী একটি বিশুদ্ধ ও সহীহ হাদীসের কিতাব। মুহাদ্দিসগণ এর جرح ও تعديلকে একবাক্যে মেনে নিয়েছেন। জমহুরের মতে বুখারী মুসলিমের পরেই সুনানে নাসায়ীর অবস্থান।

সুনানে নাসায়ীর কিছু বৈশিষ্ট্য

১। এতে একই হাদীস দ্বিতীয়বার উল্লেখ করা হয়নি।

২। শুধু সহীহ হাদীস সংকলন করা হয়েছে। তিনি বলেন, السنن كله صحيح "এর প্রতিটি হাদীস সহীহ"।

৩। রেওয়ায়াতকালে حدثنا ও اخبرنا-এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন।

৪। বিস্তারিতভাবে তিনি হাদীসের ইল্লত বর্ণনা করেছেন। হাদীসের সহীহ্ সকীমের জ্ঞানে তিনি ছিলেন আরো দশজনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

৫। সহীহ্ বুখারীর মত নাসায়ীর تراجمও অনেকটা সূক্ষ্ম। এ কারণে তাঁর ব্যাপারেও বলা হয়ে থাকে فقه الإمام فى تراجمه

৬। উত্তম বিন্যাস পদ্ধতি ঃ নাসায়ীর বিন্যাসপদ্ধতি অতি উত্তম ও সুগোছালো।

৭। এতে অনেক সহীহ্ হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে যা অন্য কিতাবে অনুপস্থিত।

৮। মেধা যাচাই ঃ ইমাম নাসায়ী (রহ.) অনেক সময় পাঠকের মেধা যাচাইয়ের জন্য অভিনব পন্থা অবলম্বন করেন। কোন এক শিরোনাম কায়েম করে এতে এমন হাদীস স্থান দিতেন, বাহ্যিকভাবে দেখা যায়, باب-এর সাথে এর কোন মিল নেই। এর দ্বারা ছাত্রদের মেধা যাচাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.)

নাম ঃ মুহাম্মাদ, কুনিয়াত ঃ আবূ আব্দুল্লাহ। উপাধি হাফেয। নসবনামা মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাজাহ (রহ.)।

নিছবত ঃ তাঁর নিছবত দু'টি। এক. রবীঈ। রবী'আ গোত্রের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে তাঁকে এই নিছবতে স্মরণ করা হয়।

দুই. কাযবীনি। ইরানের আযারবাইজানের প্রসিদ্ধ একটি এলাকার নাম কাযবীন। এই এলাকায় ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) জন্মগ্রহণ করেন বলে তাঁকে কাযবীনী বলা হয়।

ماجه শব্দের পরিচয় ও উদ্দেশ্য ঃ ماجه শব্দটি মূলত ফার্সির ماهجه এর আরবী রূপ। ماجه বলতে এখানে কি উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে তিনটি মত পাওয়া যায়।

১। মাজাহ তাঁর মায়ের নাম, ২। এটি তাঁর পিতা ইয়াযীদের লক্বব এবং ৩। "মাজাহ" তাঁর পিতামহ আব্দুল্লাহর লকব। উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় মতটি রাজেহ।

জন্ম ঃ ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) ২০৯ হিজরী মোতাবেক ৮২৪ খ্রিস্টাব্দে কাযবীন শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

ইলম শিক্ষা ঃ ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ করেন কাযবীন শহরে। যুগের খ্যাতিমান লোকদের হাতে তাঁর লেখাপড়ার হাতেখড়ি। পরবর্তীতে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তিনি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে যান। এই তালিকায় আছে হেজায, ইরাক, শাম, মিসর, খোরাসান প্রভৃতি দেশ।

উস্তাদবৃন্দ ঃ ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) অসংখ্য মুহাদ্দিস থেকে ইলমে হাদীস অর্জন করেন। বিখ্যাত কয়েকজন নিম্নরূপ ঃ

১। ইমাম আবূ বকর ইবনে শাইবা (রহ.)।

২। আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্‌শার (রহ.)।

৩। আল্লামা ওসমান ইবনে আবী শাইবা।

৪। ইয়াহইয়া ইবনে হাকিম (রহ.)।

৫। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া নিশাপুরী (রহ.)।

প্রসিদ্ধ কয়েকজন শিষ্য নিম্নরূপ

১। আহমদ ইবনে ইবরাহীম আল কাযবীনী (রহ.)।

২। ইমাম জাফর ইবনে ইদ্রীস (রহ.)।

৩। মুহাম্মদ ইবনে ঈসা (রহ.)।

৪। মুহাম্মাদ ইবনে দীনার (রহ.)।

৫। শাইখ আবুল হাসান কাত্তান (রহ.) প্রমুখ।

সংকলন

তিনি অনেক কিতাব সংকলন করেছেন। এর মধ্যে তিনটি বেশি প্রসিদ্ধ। যথা ঃ

১। সুনানে ইবনে মাজাহ

২। তাফসীরে ইবনে মাজাহ

৩। আত-তারীখ।

ওফাত ঃ ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) ৬৪ বছর বয়সে ২২ই রমযান ২৭৩ হিজরী মোতাবেক ১৮ই ফেব্রুয়ারী ৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে রোজ সোমবার কাযবীন শহরে ইন্তিকাল করেন।

সুনানে ইবনে মাজাহ

সিহা সিত্তার কিতাবগুলোর মধ্যে ইবনে মাজাহ (রহ.) রাবীদের ব্যাপারে একটু বেশি উদার ছিলেন। তিনি রাবীদের পাঁচ তবকার সকল তবকা থেকে (দলীল স্বরূপ) হাদীস উল্লেখ করেছেন। এ কারণে সুনানে ইবনে মাজাহকে একদম শেষ স্তরে রাখা হয়।

সুনানে ইবনে মাজাহর হাদীস সংখ্যা

এর মোট হাদীস চার হাজার। এ কয়েকটি ছাড়া বাকী সবগুলো সহীহ্ হাসান। আল্লামা যাহাবী (রহ.) বলেন, এতে ৩৬টি كتاب এবং পনেরশত باب রয়েছে।

কিতাবের বৈশিষ্ট্য

১। উত্তম বিন্যাস ঃ কিতাবের তারতীব তথা বিন্যাস পদ্ধতি অতি চমৎকার। ফেকহী আন্দাজে তারতীব দেয়া হয়েছে।

২। এতে একই হাদীস দ্বিতীয়বার উল্লেখ করা হয়নি। একমাত্র সুনানে ইবনে মাজাহরই এই বৈশিষ্ট্য অন্য কোন কিতাবে এই বৈশিষ্ট্য নেই।

৩। অনেক হাদীস এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যা বাকী পাঁচ কিতাবে উল্লেখ করা হয়নি।

৪। এতে পাঁচটি ثلاثيات হাদীস আছে احاديث رباعى-এর সংখ্যা অনেক। এ হিসেবে বুখারীর পরেই সুনানে ইবনে মাজাহর স্থান।

৫। সংক্ষিপ্ত ইবারত হওয়া সত্ত্বেও কিতাবটি সব কিছুর সমন্বয় সাধনকারী।

৬। অনেক ক্ষেত্রে রাবীদের বাসস্থান/শহরের নাম উল্লেখ করেছেন।

সুনানে ইবনে মাজাহর ব্যাখ্যা গ্রন্থ

১। ماتمس اليه الحاجة على سنن ابن ماجه ঃ শাইখ সিরাজুদ্দীন ওমর ইবনে আলী আল মুলাক্কীন সংকলিত। ৮ খণ্ডে সমাপ্ত। এতে হাদীসের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা ও তাফসীর পেশ করা হয়েছে।

২। مصباح الزجاجة على ابن ماجه ঃ আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) সংকলিত।

৩। انجاح الحاجة شرح ابن ماجه ঃ আল্লামা আব্দুল গনী হানাফী (রহ.) সংকলিত।

৪। شرح ابن ماجه ঃ আল্লামা আবুল হাসান সিন্ধী (রহ.) সংকলিত।

৫। ماتمس اليه الحاجه ঃ আল্লামা আব্দুর রশীদ নো'মানী (রহ.) সংকলিত।

৬। حاشية ابن ماجه ঃ আল্লামা ফখরুল হাসান গাঙ্গুহী (রহ.)।